ঋত্বিকমঙ্গল



ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * * * ২০০০

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০০, কলিকাতা

প্রকাশক : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০১২

বর্ণ সংস্থাপনায় : লেজার ও প্রিন্ট
২৩৭ / জে, মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪

মুদ্রণ :
জেনিথ অফসেট
২০ বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৪

সমালোচনাসমূহ :

ঘ মূল্যায়ন :

৬ মৃত্যু সংবাদ :

চ স্মৃ তি চা র ণ :

পরিশিষ্ট :

উৎসর্গ

যে নদীর নাম তিতাস

ঘুমের মতন নীরবে নদী
যায়, বয়ে যায়॥
দু'কূলে তার বৃক্ষেরা সব
জেগে আছে ;
গৃহস্থের ঘর-বাড়ি
ঘুমিয়ে গেছে,—
শুধু পরান মাঝি বসে আছে
শেষ খেয়ার আশায় ।
যায়, বয়ে যায়॥
কে জানে কবে কে নাম রেখেছে
তিতাস তোমার ;
যে নামেই ডাকি তোমায়
তুমি কন্যা মেঘনার ।
মোষের মতন কালো সাঁঝ
নামে তীরে ;
আবহমান উলুধ্বনি
বাজে ঘরে ঘরে,—
পোহালে রাত ফর্সা ভোর
আসে নদীর নামায় ।
যায়, বয়ে যায়॥

ভূমিকা



কামরুল হাসান অঙ্কিত ঋত্বিক ঘটকের স্কেচ (১৯৭৭)

বাংলাদেশে ঋত্বিক-চর্চার পূর্বাপর*

ঋত্বিক ঘটক[১] একটি নদীর নাম। বয়ে গেছে দেশভাগ, দেশত্যাগ, নির্বাসন, ছিন্নমূলতার তীর ছুঁয়ে। বয়ে গেছে ধ্বংস, পরাজয়, সৃষ্টির কোল ঘেঁষে। তিনি কখনোই ব্যর্থতা, হতাশা ও শত প্রতিঘাত সত্ত্বেও মানুষের সম্মিলিত যাত্রার তথা প্রাণ ও সভ্যতার প্রবহমানতার প্রতি আস্থা হারাননি।

তাঁর সময়ে ঘটে যাওয়া নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীকে তিনি ধরে রেখেছেন চলচ্চিত্র মাধ্যমে। তাঁর চলচ্চিত্রসমূহ যেন তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। তিনি যে-সব চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, সে-সব যেন তাঁর কালের কথক হয়ে উঠেছে। মানুষ ও সমাজ নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, দার্শনিক অভিজ্ঞান, শিল্পী হিসেবে মানুষের জন্য মর্মবেদনা— সবকিছু একসঙ্গে বিবাহিত হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্র-কর্মে।

চলচ্চিত্র মাধ্যমে কাজ করলেও ঋত্বিক ঘটকের মতে তিনি চলচ্চিত্রকার নন, তিনি শিল্পী। তাঁর সৃষ্টিসমূহ বিশ্লেষণ করলে তাঁর কথার যথার্থতা পরিষ্কার হয়। তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেননি— তিনি মানুষের ও সভ্যতার সম্মিলিত যাত্রার উপাখ্যান ফিতাবন্দি করেছেন। একজন ভাস্কর যেমন পাথব বা কাঠ ঠুকে ঠুকে মূর্ত করে তোলেন ভাস্কর্য, তেমনি ফ্রেমের পর ফ্রেম সাজিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন একেকটি অমর চলচ্চিত্র। কি বিষয়, কি আঙ্গিক, কি ফ্রেমিং, কি কম্পোজিশন, কি কাহিনী-কাঠামোতে ইন্টারভেনশন, কি সেই কাহিনীর ইন্টারপ্রিটেশন— সব কিছুর একত্র বিন্যাসে একজন শিল্পীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় তাঁর কাজে। তাই ঋত্বিক, বিবেচনা করি, 'চলচ্চিত্রকার' নন, 'চলচ্চিত্রকর'।

এই মহান চলচ্চিত্রকর একাধারে অনেক কিছু— গল্পকার, নাটককার, প্রবন্ধকার, অনুবাদক, বাগ্মী, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, অভিনেতা, সংগঠক এবং সব ছাপিয়ে তিনি একজন চলচ্চিত্রকর— যিনি সর্বমোট আটটি কাহিনী-চিত্র নির্মাণ করেছেন। তাঁর চলচ্চিত্র নির্মিতির তত্ত্ব-দর্শনের স্বরূপ উদ্ধার করতে হলে, ধারণা করি, আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

* ঋত্বিক ঘটক-এর পঁচাত্তরতম জন্মদিন পালন উপলক্ষে ৪ নভেম্বর, ২০০০-এ 'চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি' ও 'ভারতীয় হাই কমিশন' কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিবন্ধটি পঠিত এবং ৩ নভেম্বর 'যুগান্তর'-এ মুদ্রিত। বর্তমান ভূমিকাটি ঈষৎ পরিমার্জিত।

১ জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯২৫, ঢাকা ; মৃত্যু : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, কলকাতা।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে বাঙালির মহাকাব্যসম উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর চলচ্চিত্ররূপ দেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও তৎকালীন তরুণ ব্যবসায়ী জনাব হাবিবুর রহমান খান-এর অর্থায়নে। প্রশ্ন জাগে— বাংলাদেশ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন না হলে ঘটক তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে সরব হতেন কী না। যে বাংলা-ভাগ তাঁকে একদিন যুগিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা— সেই বাংলারই পূর্ব অংশ তাঁকে আবার সক্রিয় করে তোলে, তাঁর হাতে ভার দেয় 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর চলচ্চিত্রায়ণের। মূলত এই চলচ্চিত্রকে ঘিরেই এই অঞ্চলে ঋত্বিক-চর্চার সূত্রপাত।

ঋত্বিকের সাক্ষাৎকার, তাঁর কাজ নিয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ, তিতাসকে নিয়ে সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তখন থেকেই। তবে, ষাটের দশকের শুরুতে যখন এই বাংলায় তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রদর্শিত হয়, তখন তা আদৃত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। কিছু সমালোচনাও বেরিয়েছিল পত্র-পত্রিকায়। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এদেশে ঋত্বিক-চর্চার পটভূমি। বাংলাদেশে ঋত্বিক-চর্চার পূর্বাপর ও তার স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে :

এক. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেয়া ঋত্বিকের সাক্ষাৎকারসমূহ : বাংলাদেশে ঋত্বিক-চর্চার দলিল তৈরি করতে গিয়ে দেখতে পাই যে, ১৯৭২-এর ২৭ জুলাই থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ পর্যন্ত ঋত্বিকের ও তাঁর কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের মোট ৭টি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। ২৭ জুলাই, ১৯৭২-এ সাপ্তাহিক বিচিত্রা-য় প্রকাশিত প্রথম সাক্ষাৎকারে চিন্ময় মুৎসুদ্দীকে তিনি জানিয়ে দেন : 'আমি বেঁচে আছি'। আর ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬-এ চিত্রালীতে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত মনোয়ার আহমেদকে দেয়া সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পাই তাঁর নিজের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বলেছিলেন : 'ডোন্ট ট্রাই টু গ্লামারাইজ মি'।

দুই. 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটিকে ঘিরে রচিত সমালোচনাসমূহ : ২৭ জুলাই, ১৯৭৩ থেকে শুরু করে ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ২৪টি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বলা যায়, এই চলচ্চিত্রটিকে ঘিরেই বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সমালোচনার একটি ধারা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে 'সূর্য দীঘল বাড়ি' ব্যতীত তেমন কোন পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি বলে এ ধারা বিকশিত হয়নি। 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র ওপর বেশ ক'টি সমালোচনা ওই সময়কার পত্রিকাগুলোতে দেখতে পেয়েছি। ওগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে চলচ্চিত্র সমালোচনার ক্ষেত্রেও যে এই বাংলা পিছিয়ে ছিল না, তার প্রমাণ মিলবে।

বিভিন্ন সমালোচক-প্রবন্ধকার ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে বিভিন্ন স্তরে গ্রহণ করার ফলে এঁদের আলোচনায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মাত্রা। এই বিভিন্নতার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যাবে, তাঁকে ছেঁকে-ছেঁকে না দেখলে তাঁকে কি বোঝা সম্ভব ? তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণ-তত্ত্ব ও তাঁর ভুবনদৃষ্টিকে জানা কি সম্ভব ? 'তিতাস

একটি নদীর নাম'-এ ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নির্মিতির নিজস্ব ধারা ধরা পড়ে প্রকটভাবে। এর বিষয়বস্তু এপিকধর্মী। একটি সম্প্রদায়ের, বিশেষত তিতাস পারের জেলে সম্প্রদায় 'মালো'দের, সর্বোপরি একটি নদীর অভিযাত্রার বয়ান এই চলচ্চিত্র। ফ্রেমিং ও কম্পোজিশনের কারণে সাধারণ ঘটনা ও চরিত্র পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। মালোদের জীবনযাত্রা, তাদের দৈনন্দিন খুনসুটি, লৌকিক উৎসব, জন্ম-কৈশোর-পেশা-বিবাহ-মৃত্যু-সন্তান উৎপাদন এবং একই সমান্তরালে তিতাস নদীর বাঁচা-মরা— সবকিছুই ঋত্বিক শরীরময় ও মন্ময় করে তুলেছেন এই চলচ্চিত্রে। এই চলচ্চিত্রটিকে ঘিরে যে সমালোচনাসমূহ লিখিত হয়েছিল, তা একদিকে যেমন সুখপাঠ্য তেমনি এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। বিশেষত গবেষক ও চলচ্চিত্র-বিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের কাছে। সমালোচনা ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়াসমূহে ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর কাজের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের মনোভাব প্রতিফলিত। কেউ কেউ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ওঠতে পারেন নি— কেউ কেউ পেরেছিলেন, যদিও ঘটক বরাবরই একটি অসম্ভব দৃঢ় অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি যখন তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে 'মীথ'-এর ব্যবহার করছেন, তখন সেই মীথকে ধর্মীয় বাতাবরণ দিয়ে ঢেকে ব্যবহার করছেন না, বাস্তবের সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করেই ব্যবহার করছেন। মীথকে ভেঙে ব্যবহার করার প্রবণতার কারণে তিনি আক্রমণের শিকার হয়েছে নানাদিক থেকে। এক সম্প্রদায় ক্ষেপেছে ঐতিহ্যবাহী মীথকে ভেঙেছেন বলে, অন্য সম্প্রদায় এইসব মীথকে তাদের নিজস্ব নয় বলে! দর্শকদের দোষ নেই— সাম্প্রদায়িকতার বীজ বহুদূরে ফেলা আসা অতীত-ভূঁইয়ে প্রোথিত বলেই কেউ কেউ 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে নিতে পারেন নি নিজের করে, কেউ কেউ নিয়েছেন।

তিন. প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঋত্বিক ঘটকের মূল্যায়ন বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ : ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ২৮টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো থেকে বাংলাদেশে ঋত্বিক-চর্চার গতি-প্রকৃতির প্রেক্ষিত জানা যাবে। ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর সৃষ্টিসমূহ উভয় বাংলাতেই একই সাথে সমাদৃত ও উপেক্ষিত. আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ, বিশেষ করে এ্যাকাডেমীসিয়ানরা তাঁকে নিয়ে বা তাঁর কাজ নিয়ে মোটেই উৎসাহী হননি। এটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তবে কী তাঁরা ঘটকের কাজকে গ্রহণ করতে অপারগ—তাঁদের প্রথাসিদ্ধ—ঐতিহ্যলগ্ন চিন্তা-কাঠামোর জন্য ? নাকি তাঁরা ঘটকের দেশভাগজনিত ভাবনাকে-মূল্যায়নকে ভয় পেত? ভয় পেত বলেই কী দেশের প্রতিষ্ঠিত জর্নালে তাঁর কাজের মূল্যায়ন প্রায় নেই বললেই চলে ? তবুও তাঁর কাজের মূল্যায়ন যতটুকু হয়েছে প্রবন্ধ-নিবন্ধাকারে, তাতে ঋত্বিক সম্বন্ধে বিদগ্ধজনের মতামত ওঠে এসেছে। একই সঙ্গে এগুলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান দলিল বলেও বিবেচিত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য রচিত 'ঋত্বিক ঘটক ॥ গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস' শীর্ষক প্রবন্ধটি ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সালে চিত্রালীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে একই প্রবন্ধ

একটু পরিমার্জনা করে ছাপা হয় চিত্রবীক্ষণে, অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যায়, ১৯৭৩ সালে। এযাবৎকালে ধারণা ছিল, প্রবন্ধটি প্রথম ছাপা হয় চিত্রবীক্ষণেই— কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, এটি প্রথম ছাপা হয় চিত্রালীতেই।

চার. ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু-সংবাদ ও স্মৃতিচারণ : ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয় প্রায় সব জাতীয় দৈনিকগুলোতেই। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সংস্কৃতি সংসদ' ও 'উত্তরণ'-এর পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় শোকবার্তা। 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (এফডিসি)-এ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছানো মাত্র সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং কর্তব্যরত চলচ্চিত্র-কর্মীরা এক মিনিট নিরবতা পালন করে। ঋত্বিক ঘটকের স্মরণে স্মৃতিচারণমূলক যে ১১টি লেখা গ্রন্থে রাখা হয়েছে, সব ক'টিই কোনো না কোনোভাবে ঘটককে নোতুন করে আমাদের সামনে উপস্থিত করে।

পাঁচ. ঋত্বিক-চর্চায় চলচ্চিত্র সংসদসমূহ, ভারতীয় হাই কমিশন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ : এ ক্ষেত্রে ভারতীয় হাই কমিশনের পাশাপাশি 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ', 'চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি', 'চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র' ও 'ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ'-এর নাম করা যায়। এ-সব সংসদ থেকে বিভিন্ন সময় ঘটক ও তাঁর কাজের ওপর সেমিনার-ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ' ভারতীয় হাই কমিশনের সহযোগিতায় ৬ দিনব্যাপী 'Ritwik Ghatak and Indian New Cinema' শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। 'চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র' ঋত্বিকের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পালন করে ১৯৯৫-তে। 'চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি' ১৯৯৬ সালে 'Ritiwik Ghatak and His Film's' শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী ফিল্ম ওয়ার্কশপের আয়োজন করে গ্যেটে ইন্সটিটিউটের সহায়তায়। 'রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ' আয়োজিত পঞ্চম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয় : ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'সুবর্ণরেখা'। ১৯৯৭ সালে ঋত্বিকের যমজ বোন প্রতীতি দেবী রচনা করেন 'ঋত্বিককে শেষ ভালবাসা' শীর্ষক গ্রন্থ। এম. ফিল.-এর ছাত্র থাকার সময় তিন মাস প্রতীতি দেবীর বাসায় মিটিং দিয়ে তাঁর মুখের কথাগুলো পৃষ্ঠাবন্দী করি। পরবর্তীতে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমাকে না জানিয়ে তরিঘরি করে এই গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় গ্রন্থে তথ্য-বিষয়ক বিভ্রান্তি রয়ে গেছে।

ঋত্বিকের ওপর সেমিনার-ওয়ার্কশপ আয়োজনের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রগুলোও প্রদর্শিত হয়েছে বারবার, আয়োজিত হয়েছে ঋত্বিক রেট্রোস্পেকটিভ। ১৯৯৫ সালে ঋত্বিক ঘটকের ৭০তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে 'চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র' তিনদিনব্যাপী ঋত্বিক নির্মিত চলচ্চিত্রের রেট্রোস্পেকটিভের আয়োজন করে। ঋত্বিক রচিত 'সেই মেয়ে' নাটকের অভিনয়ও হয়েছে এই দেশে। ১৯৮২ সালের ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল এই নাটকের মঞ্চরূপ দেয়।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও ঋত্বিক-চর্চা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। ১৯৯৪ থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নাটক ও নাট্যতত্ত্ব' বিভাগে 'সুবর্ণরেখা' টেক্সট ফিল্ম হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। ওই বিভাগেই 'ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণভাবনা' শীর্ষক পি—এইচ.ডি. থিসিস রচনায় রত আছেন এক গবেষক। ৪ঠা নভেম্বর ২০০০-এ 'চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি' ও 'ভারতীয় হাই কমিশন' যৌথভাবে ঋত্বিকের ও তাঁর যমজ বোন প্রতীতি দেবীর ৭৫তম জন্মদিন পালন করেছে, এটাও তাঁকে স্মরণ ও তাঁর চর্চা অব্যাহত রাখারই একটি উদ্যোগ। এ-সবই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে ঋত্বিক-চর্চা থেমে নেই।

এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাসমূহ সংগ্রহ করার সময় থেকে এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত পর্যন্ত— সকল পর্যায়েই পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক স্বনামখ্যাত উপন্যাসকার সেলিনা হোসেন— তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি 'সংকলন উপবিভাগ'-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে তাঁদের আন্তরিকতার জন্য। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারসহ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে-সব গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি— যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ, পাবলিক লাইব্রেরি (বেগম সুফিয়া কামাল গণ গ্রন্থাগার), চিত্রালী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গ্রন্থাগার— সে-সব গ্রন্থাগারের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মরণ করছি 'কাশবন মুদ্রায়ণ'-এর স্বত্বাধিকারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক-নিরলস প্রচেষ্টার কথা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি 'ডিজিটাল আর্ট'-এর কর্ণধার মোঃ লায়েছুর রহমানের কাছে গ্রন্থভুক্ত স্থিরচিত্রসমূহকে মুদ্রণযোগ্য করার জন্যে। স্থিরচিত্র গ্রাহক আবীর আবদুল্লাহ ঋত্বিক ঘটকের প্রতি শ্রদ্ধাবশত পুরনো পত্রিকা থেকে ছবি তুলে দিয়ে এবং স্থিরচিত্র পরিস্ফুটন বিশারদ মোঃ আনিসুর রহমান পুরনো নেগেটিভ থেকে যত্ন নিয়ে ছবি প্রিন্ট করে দিয়ে গ্রন্থটির শ্রী বৃদ্ধি করেছেন— এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সুনীল আমীন, যিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর স্থিরচিত্র গ্রাহক ছিলেন, তিনি ঋত্বিক ঘটকের প্রতি অনুরাগবশত তাঁর তোলা সেই সময়কার ছবি দিয়ে এই গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁকে সটান দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠুকে অভিবাদন জানাচ্ছি। মনোয়ার আহমেদ তাঁর তোলা ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি দুর্লভ নেগেটিভের সন্ধান দিয়ে গ্রন্থটিকে ঋদ্ধ করলেন— তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। অনুপম হায়াত তাঁর সংগ্রহ থেকে ১৯৭৬ সালে ঋত্বিকের মৃত্যুর পরপরই প্রকাশিত ও খালেদ হায়দার সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *চলচ্চিত্র* [২] সংখ্যাটি

২. 'চলচ্চিত্র' সিনেপল ফিল্ম সোসাইটির মুখপত্র ছিল। ৭-৮টি সংখ্যা বের হয়েছিল। প্রত্যেকটি সংখ্যাই মূল্যবান। বর্তমানে সিনেপলের কার্যক্রম স্তিমিত প্রায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বেশ ক'টি চলচ্চিত্র সংসদ মেধাবী তরুণদের দ্বারা ক্রিয়াশীল ছিল। সংঘবদ্ধ তরুণরা তখন নতুন সিনেমার অন্বেষায়। 'সূর্য দীঘল বাড়ি'সেই অন্বেষার ফসল। কিন্তু এই ধারা বেশি দূর

দিয়ে বর্তমান গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। তাঁকে স্মরণ করছি শ্রদ্ধার সাথে।

যে-সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করেছি, সে-সব গ্রন্থের প্রণেতা ও সম্পাদকদের কাছেও ঋণ স্বীকার করছি। যাঁরা নিজেদের আন্তর গরজে ঋত্বিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, রচনা করেছিলেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, যাঁরা নিন্দা এবং প্রশংসা স্তবক লিখেছিলেন তাঁর সৃষ্ট 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ওপর, যাঁরা তাঁর ছবি তুলেছিলেন এবং যাঁরা তাঁকে অর্থ খরচ করে এই বাংলায় চলচ্চিত্র নির্মাণে নিযুক্ত করেছিলেন— তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রফেসর কে. এ. এম. সা'দউদ্দিন, ড. রংগলাল সেন, প্রফেসর এস. আমিনুল ইসলাম, ড. সেলিম আল দীন, নাসির উদ্দিন ইউসুফ, ওবায়দুল ইসলাম, মফিদুল হক, জয়দুল হোসেন, খুশী কবীর, আবুল খায়ের লিটু, লুভা এন চৌধুরী, এরিন ও' ড্যানিয়েল, ড. মদন গোপাল সিং, সুরমা ঘটক, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সোহিনী ঘোষ, বীরেন দাস শর্মা, চন্দন গোস্বামী, আবুল হাসনাত, তানভীর মোকাম্মেল, আহমেদ মুজতবা জামাল, মানজারে হাসীন মুরাদ, মুনিরা মুর্শেদ মুন্নী, আফসান চৌধুরী, আহাদ খান, নরেশ ভূঁইয়া, ইফতেখারুল ইসলাম টিটন, খন্দকার সাখাওয়াত আলী, শৈবাল চৌধুরী, প্রতীতি দেবী, শমশের আহমেদ, হাবিবুর রহমান খান প্রমুখকে— নানাভাবে উৎসাহ দেয়ার ও সাহায্য করার জন্য। হাবিবুর রহমান খান-এর চলচ্চিত্র নির্মাণ ও বিপণন প্রতিষ্ঠানের গুদামে আমি এবং মোঃ দুলাল অনেক খুঁজাখুঁজির পর আবদুস সবুর কৃত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পোস্টারটি ও কিছু স্থিরচিত্র উদ্ধার করি। মোঃ দুলালকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পোস্টারটি এত ভাল লেগেছিল যে, ওটা দিয়েই গ্রন্থের প্রচ্ছদ করার পরিকল্পনা করি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রচ্ছদ শিল্পী সেলিম আহ্মেদ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাদাকালো স্থিরচিত্র পরিস্ফুটনের কাজে সহায়তা করার জন্য 'দৃক আলোকচিত্র গ্রন্থাগার'-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রুফ দেখায় সাহায্য করার জন্য রহিমা আক্তার কল্পনা, অনন্তের মা নাজনীন শামীম ও আমার নয় বছরের পুত্র ইশরাত শামীম অনন্ত, যে ইংরেজি অভিধান থেকে শব্দের সঠিক বানান খুঁজে দিয়েছে বার বার. এঁদের সবার কাছে ঋণী থেকে গেলাম— এ ঋণ শোধ হবার নয়। অনন্তের মা গত পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত ঋত্বিক-চর্চার দলিল আগলে রেখেছিলেন গভীর মমতা দিয়ে— তাঁর মমতা ও ক্রমাগত উৎসাহ প্রদান ছাড়া এই গ্রন্থ অপ্রকাশিতই থেকে যেত। পারিবারিকভাবেও প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এ-গ্রন্থের পিছনে। বানানের ক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই সমতা রাখা হয়নি—রচয়িতারা যে বানানে লিখেছেন—তাই রাখা হয়েছে সেই সময়ের চিহ্ন ধরে রাখার জন্য। গ্রন্থে লেখক-পরিচিতি ও নির্ঘণ্ট দিতে পারলে ভাল হতো, সময়ের অভাবে সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সংস্করণে এ-ত্রুটি সংশোধন করার ইচ্ছে রইল। ইচ্ছে রইল 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর চিত্রনাট্য সংগ্রহ করে গ্রন্থে সংযোজন করারও।

এগুতে পারেনি—কালো টাকার দাপটের কাছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের নতুন সিনেমার ভাবনা স্তিমিত হয়ে আসে।

আজ উভয় বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর চলচ্চিত্রসমূহ পড়ানো হচ্ছে। এই গ্রন্থ চলচ্চিত্রবিদ্যার ছাত্র-ছাত্রী এবং যাঁরা ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর কাজের ওপর উচ্চতর গবেষণায় উৎসাহী, তাঁদের কাছে একটি আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। অধিকারী ভেদে যে যার খোরাক পেয়ে যাবেন এই গ্রন্থ থেকে, সন্দেহ নেই। গ্রন্থভূক্ত রচনাগুলোর বাইরেও কিছু লেখা থেকে থাকতে পারে যা সংগ্রহ করা হয়নি। আবার সংগৃহীত লেখা থেকেও কয়েকটি লেখা বাদ দেয়া হয়েছে মানহীনতা ও পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্যে।

নদীর যেমন ক্ষয় নেই, থামা নেই— ঋত্বিকও তেমনি থেমে নেই, মৃত্যুর পরও বয়ে চলেছেন সবুজ নালী ঘাস ছুঁয়ে, নদীর নামায় চাপিলা মাছের পেটের মতো ফর্সা ভোর দেখতে দেখতে। আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি : 'সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। যেখানে তিতাসের ক্ষেতে ধান জন্মেছে, সেখানে আর একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, ইনডিভিজুয়াল মানুষ মরণশীল। কিন্তু মানুষ অমর।সে একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে গিয়ে পৌঁছয়।'

ঋত্বিক ঘটকেরও মৃত্যু নেই, তিনি অমর। কাঁধে হাত রেখে যেন বলছেন : চলো, থেমে থেকো না! ঐ তো নতুন বাড়ি ... সুবর্ণরেখার তীরে ... সেখানে বড় বড় শূন্য ঘর আর বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান হয়।

তাঁর শিরে তিনবার তিতাসের জল সিঞ্চন করছি।

সাজেদুল আউয়াল

ঢাকা।

সাক্ষাৎকার



আমি বেঁচে আছি

ঋত্বিক ঘটক

(সা : চিন্ময় মুৎসুদ্দী)

মশাই, আমি সিনেমার লোক নই।

কিন্তু আমি যে সিনেমা পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সাথে আলাপ করতে এসেছি। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম প্রথমে। এই লোকটি সম্পর্কে যে অনেক রকমের কথা শুনেছি।

ঋত্বিক বাবু হাসলেন। বললেন, বসুন।

ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ, বেশ রাত হয়েছে তখন। ঢাকায় একটি সাংবাদিক সম্মেলন শেষ করে নারায়ণগঞ্জ ফিরে এসেছেন। এখানেই থাকেন। বাংলাদেশে এসেছেন ছবি করার জন্যে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'— এই নামে একটি ছবি করছেন। ছবির মহরত হয়ে গেছে।

"আমি এই বাংলাদেশেরই লোক। অর্থাৎ আগে ভৌগোলিকভাবে যা ছিল পূর্ব বাংলা। আপনাদের রবীন্দ্রনাথের শাহজাদপুরের কাছাকাছি আমার বাড়ি, পাবনা জেলায়। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থাকতে পারিনি বলেই চলে গিয়েছিলাম।

ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় গল্প লিখতাম। প্রচুর গল্প লিখেছি। শনিবারের চিঠিসহ অনেক পত্রিকায় লিখেছি। কিন্তু না, যা চেয়েছিলাম তা হলনা। চেয়েছিলাম মানুষ-গুলোকে সচেতন করতে। বুঝতে পারলাম, এর মাধ্যমে হবে না। এ বড় দুর্বল মাধ্যম। সময় লাগবে অনেক। তাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম নাটক নিয়ে লোকগুলোকে তাৎক্ষণিক ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে। আইপিটিএ হল। এর সেক্রেটারি হলাম। নাটক নিয়ে মেতে উঠলাম। কিন্তু পরে মনে হলো এর চাইতেও শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে চলচ্চিত্র। এবারে ছবি বানাতে নেমে গেলাম। আমার কথা আছে, বক্তব্য রয়েছে, তা আমাকে বলতে হবে। চলচ্চিত্র হল মিডিয়ম অব এক্সপ্রেশন। এবং শক্তিশালী মিডিয়ম। অন্যদের মত আমি তাই সিনেমার লোক নই মশাই। আমি, কিছু একটা বলতে চাই। সিনেমার লোক তারাই যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত। অন্তত মানসিকভাবে। যাদের নিয়ে একমনে সংগ্রামে নেমেছিলাম তারা সবাই আজ সরে দাঁড়িয়েছে। তারা পরাজিত। তারা সিনেমার লোক হয়ে গেছে। আমি কম্প্রোমাইজ করিনি। কোনদিন করব না।"

ঋত্বিকের সৃষ্টি ছ'টি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। নাগরিক (অপ্রদর্শিত), অযান্ত্রিক, বাড়ী থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা।

"নাগরিকের চিত্রনাট্য ১৯৫০-৫১ সালের রচনা। তখনকার দিনে বাংলাদেশে বাস্তববাদী ছবি মোটেই হতনা। সেদিক থেকে একটা ভাল বিষয় নিয়ে ছবি করার চেষ্টা

করেছিলাম। চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙলার মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রণার এইটি প্রথম বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ। এক টুকরো নিশ্চিন্ততার সন্ধানে দৃঢ় প্রত্যয় নাগরিকের জীবনপথ পরিক্রমা এর বিষয়বস্তু। টেকনিকের দিক থেকে ছবিটি মোটেই উচ্চাঙ্গের নয়। বরং হয়তো আজকের পরিণত দর্শকদের কাছে এর কিছু কিছু বিষয় খুবই খারাপ লাগবে। যেমন এর সাউন্ডট্র্যাক বা মেকআপ খুবই জঘন্য। তবে বক্তব্য-বিষয় আমার কাছে ভেলিড। আমি তখনকার নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপ বর্ণনা করেছিলাম। সে বক্তব্য আমার কাছে এখনও ভেলিড। নাগরিক মুক্তি না পাওয়ায় দর্শকের কাছে প্রথম দর্শন অযান্ত্রিক। অযান্ত্রিককে পরীক্ষামূলক চিত্র বলা হয়। এটা যে কতদূর সত্য তা আমি জানি না। তবে আমাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমি কাদের জন্যে এই বিশেষ চিত্রটি নির্মাণ করেছি এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার জবাব ছিল একটাই— আমি নিজের জন্যেই করেছি এবং আর কারো কথাই আমার মাথায় ছিলনা"।

কিন্তু জ্যোতির্ময় বসু রায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, এক পরিচয় সভায় যখন জনৈক সমালোচক ঋত্বিক ঘটককে প্রশ্ন করেন : আপনি ছবিটা কাদের জন্য করেছেন? পরিচালক কিছুক্ষণ সমালোচকের মুখে চেয়ে থাকেন। তারপর বললেন— আমার জন্যে। বলে নিজের বুকের উপর তর্জনীটা বার দুই ঠুকলেন। এক মুহূর্ত পরে সেই আঙ্গুলটাই প্রশ্ন কর্তার দিকে ফিরিয়ে যোগ করলেন : আর আপনার জন্যেও। ঋত্বিক ঘটক তার বক্তব্য প্রকাশে এমনি ভাবেই অকপট। অযান্ত্রিক আলোড়ন তুলেছিল, ... বাংলাদেশ (এখনকার পশ্চিম বাংলা) আলোড়িত হয়েছিল। সে আলোড়নে অনেকেই বিভ্রান্ত। বিভ্রান্তি ছবিটির মূলগত রূপ নিরূপণে। "আমাকে অনেক গাল খেতে হয়েছে আদিবাসী ওরাওঁদের নাচের দৃশ্য অসংযতভাবে বড় হয়েছিল বলে। কিন্তু জানেন আমার কাছে কখনও লাগেনি। আমার যে প্রোটাগোনিস্ট বিমল, তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন। আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনই এক, সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণের আবেগ আনার প্রবণতা। এবং এটি একটি আর্কিটাইপাল রিয়েকশন, আদিম প্রতিক্রিয়া। শিশুর যে কোন অসার বস্তু দেখে জুজু কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে ক্ষেপে ওঠা এবং অনাহুত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা একেবারে একই প্রক্রিয়া। অযান্ত্রিকের মেইন থিম, মৌল উপজীব্য ছিল এটাই, যাকে আমরা দ্য ল অব লাইফ, জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরনোটি ভুলে যাবার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য যা বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল এগুলো সেই কথাই প্রকাশ করছে। এ যেন ভেরিয়েশন অন এ মাইনর স্কেল অব দা মেইন থীম, এ সর্ট অব ইকো, যা যে কোন সিম্বলিক স্ট্রাকচার-এর প্রাণবস্তু। আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিলনা বিষয়বস্তু ও পটভূমিকার জন্য। কাজেই ইসোটেরিক হয়ে থাকতে হল। সাধারণ গ্রাহ্য হওয়া গেলনা।"

সাধারণগ্রাহ্য হবার চেষ্টা ঋত্বিক ঘটক কোন দিনই করেননি। ছবি করার সময় পাবলিক-এর কথা তিনি মনে রেখেছেন এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

"আমি কোন সময়ে একটা সাধারণ পুতু পুতু মার্কা গল্প বলিনা যে, একটি ছেলে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে প্রথমে মিলতে পারছে না, তাই, দুঃখ পাচ্ছে পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুললো এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ঐ গল্পের মধ্যেও ইনভলভ করিয়ে দিলাম।— দুই মিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল। খুব খুশী হয়ে বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এর মধ্যে আমি নেই। আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাবো যে, ইট ইজ নট এন ইমেজিনারী স্টোরী বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে হাতুড়ি মেরে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা কিন্তু এর মধ্যে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিসটা বুঝুন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি, সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই আমি আপনাকে এলিয়েনেট করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার প্রোটেস্টাকে যদি আপনার মধ্যে চাপিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা।

"মেঘে ঢাকা তারা-য় আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। কারণ একটা ইউনিভার্সেল থীম নিয়ে আমি কাজ করেছি। এবং পরিব্যাপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করেছি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। ... উমার Symbologyটা এখানে খু'ই পরিষ্কার। নীতা আজ পর্যন্ত আমার সৃষ্ট চরিত্র গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়, আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালি ঘরের গৌরীদান দেয়া প্রতীকরূপে। তার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পূজোতে, তার পাহাড় অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে মিলন হয় মৃত্যুতে। যখন বিদায়ের প্রথম ইঙ্গিত আসে যক্ষ্মার প্রথম আভাসে তখন তারা যেন বিনিয়ে বিনিয়ে মেনকার বিদায়ের বিলাপ গাইতে থাকে। অবলুপ্তির আগের মুহূর্তের যে আলোকময় পারিপার্শিক তার স্বপ্ন দেখে গীতা ছোটবেলায় পাহাড়ে উঠে সূর্যোদয় দেখার স্মৃতির মধ্য দিয়ে। এই ছিল মেঘে ঢাকা তারা-র মূলতম প্রয়োজন। আরও বহু কথা হয়ত এসে গেছে হয়ত আধুনিক জীবনের বহু পাপের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ আছে। কিন্তু ছবিটির সমৃদ্ধি ঐখানে।

"যারা একদিন ঠুকে ঠুকে পায়তারা মেরে বলেছিলেন, 'যা কিছু জীর্ণ, শীর্ণ, যা কিছু সনাতন, পুরাতন সংস্কার আমাদের অগ্রগতির পথ রোধ করে বসে আছে, তার বিরুদ্ধেই আমার আপোসহীন সংগ্রাম। এর জন্য যা কিছু মূল্য দিতে হয় দেবো'— চোখের সামনে দেখলাম তাঁরা একে একে নিজেদের বিক্রি করে দিলেন সনাতনী গতানুগতিকতার কাছে। নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে জোর গলার জাহির করে বেড়াচ্ছেন এটাই নাকি বিধিলিপি। এমনতর হারের খেলায় তাদের সঙ্গে যোগ দেইনি বলে আমি অপাংক্তেয় !"

মশাই আমার শত্রু অনেক। মাঝে মাঝে মনে হয় বাঁচবো কি নিয়ে চারিদিকে শুধু হতাশা, বিদ্বেষ, প্রতারণা, বঞ্চনা, যে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে মহা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম একদিন — তাঁরা যে শুধু আমাকে নিরাশই করেছেন তা নয় তাঁরা আজ শত্রুতাই

করছেন। আমি জানি আমার অপরাধের কথা। তবুও একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমি আজও মরে যাইনি। আমি আজও হার স্বীকার করিনি। আমি নিরবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আজ না পারি কাল, কাল না পারি পরশু প্রমাণ করে দেব। আজ আমি সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখি। তাদের আমি ভুলে যাইনি। অভাব, অনটন, অপবাদ কিছুই আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না— তার জন্য যে মূল্যই দিতে হয় আমি প্রস্তুত। মরবার আগে আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাবো আমার চারপাশের জনতার চাইতে আমি অন্যরকম।[১]



ঋত্বিক ঘটক ও চিন্ময় মুৎসুদ্দী

১. সাক্ষাৎকারটিতে ঋত্বিকের যে কথাগুলো উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে আছে, সেগুলো ঋত্বিকের পূর্বে লেখা ছোট ছোট প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে নেয়া। চিন্ময় মুৎসুদ্দী তাই উদ্বৃতিগুলো যে-সব নিবন্ধ থেকে নিয়েছেন, তার উল্লেখ করলে পারতেন। লেখাটিকে সাক্ষাৎকার না বলে নিবন্ধ বলাই যুক্তিসঙ্গত।

আমি নতি স্বীকার করিনা

ঋত্বিক ঘটক

(সা : চিত্রালী প্রতিনিধি)

যুগের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকাব শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক এখন ঢাকায়। মার্ক্সীয় দর্শনে আলোকিত তাঁর মন, চলচ্চিত্রের সাধনায় নিবেদিত তাঁর জীবন। ভারতের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের তিনি একজন পুরোধা ব্যক্তি। পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। অর্থহীন চটুল প্রমোদ ছবি এবং গিমিক্স-এর গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে যাঁরা চলচ্চিত্রের ভাষায় জীবনের ছবি পর্দায় তুলে ধরার অভিলাষী শ্রী ঋত্বিক ঘটক তাঁদেরই একজন। বস্তুত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে কয়জন মুষ্টিমেয় জীবনবাদী চলচ্চিত্রকারের সাধনায় বাংলা ছবি আজ গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের প্রথম সারিতে নির্দিষ্ট রয়েছে তাঁর স্থান। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি অর্জন করেছেন পদ্মশ্রী ভূষণ।



বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তাঁর ছবি মুক্তি পেয়েছে মাত্র একটি— 'মেঘে ঢাকা তারা'। এবং এই একটি ছবির মাধ্যমেই এদেশে বেশ কিছু সংখ্যক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। বর্তমানে তিনি ঢাকায় অদ্বৈত মল্ল বর্মণের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রায়িত করছেন 'তিতাস একটি নদীর নাম।' ছবিটির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। এ ছবি সম্পর্কে তাঁর কিছু বক্তব্য শোনার জন্য গত সপ্তাহে তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম।

হোটেল গ্রীনে বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন। তাঁর রুমে গিয়ে দেখতে পেলাম একটা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে আছেন তিনি। আমরা যাওয়ার পর একটা বিছানার চাদর টেনে তিনি গায়ে জড়ালেন। বসতে বললেন। চা এলো। চা খেতে খেতে আমাদের আলোচনা শুরু হলো।

... বলুন কি জানতে চান ? প্রথমে প্রশ্ন করলেন ঋত্বিক বাবু নিজেই। "আপনার ছবি সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি।" বললাম আমি। "ছবির কাটিং, এডিটিং ও ডাবিং প্রায় শেষ। রি-রেকর্ডিং শেষ হয়নি এখনো।" বললেন ঋত্বিক বাবু।

... এ ছবিতে কি বক্তব্য আপনি তুলে ধরতে চাইছেন ? আমরা প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে ঋত্বিক বাবু ছবির কাহিনী মোটামুটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন :

তিতাস এবং তিতাসের তীরবর্তী একটি জেলে গ্রামের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এ ছবির কাহিনী। তিতাস একটি বহমান নদী। তার তীরবর্তী গ্রামের জেলেদের ভাগ্য তিতাসের সঙ্গে জড়িত। তিতাসকে কেন্দ্র করেই তার তীরে গড়ে উঠেছে একটা সভ্যতা, একটা সংস্কৃতি। ধীরে ধীরে সে তিতাস একদিন শীর্ণ হয়ে গেলো। জেলেদের জীবনে নেমে আসলো অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তিতাসের তীরে গড়ে উঠেছিলো যে সভ্যতা, নদী শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেটাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগলো। নদী শুকাচ্ছে। চর জেগে উঠেছে। সেই চরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পুঁজিপতি ভূস্বামীদের। তারা চক্রান্ত করে জেলেদের সেখান থেকে উৎখাত করে সে চর দখল করার জন্যে। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিলেও জেলেদের ঐক্য অটুট। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মহাজনেরা নতুন ফন্দি বের করে। জেলেদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে হলে তাদেরকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলতে হবে, মহাজনরা তাই যথাচিতভাবে টাকা ছড়ায়। টাকা দিয়ে ডিঙ্গি ভাসিয়ে বহুদূরে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তারা এখন বাবুদের গুণ গানও গায়। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে। একে একে সবাই গ্রাম ছেড়ে দূরে বহু দূরে চলে যায়। তিতাস মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার তীরবর্তী গ্রামের সভ্যতাও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়। কিন্তু সভ্যতা কি সত্যি নিশ্চিহ্ন হয় ? সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয় না। তার রূপান্তর ঘটে। ছবিতে এ বক্তব্যকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে মৃত তিতাসের বুকে যে চর গজিয়ে উঠেছে তাতে জেগে উঠেছে সবুজ ঘাসের ক্ষেত। একটা উলঙ্গ শিশু হেঁটে যাচ্ছে তার বুক চিরে। সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয় না— তার রূপান্তর ঘটে, এ দৃশ্যের মাধ্যমেই তার ইঙ্গিত ফুটে উঠবে।

... এ কাহিনী আপনাকে আকৃষ্ট করলো কেন ? আবার প্রশ্ন রাখলাম।

উত্তরে ঋত্বিক বাবু জানালেন কাহিনীর সততা ও আন্তরিকতা তাঁকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কাহিনীকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন জেলে পরিবারেরই ছেলে। তবে জেলে পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি বি.এ. পাশ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের দিকে তিনি কোলকাতার এক খালাসী পাড়ায় থাকতেন। সে সময় কোলকাতার আশেপাশে জেলেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো।[১] এত মর্মান্তিক বিপর্যয় যে তাদের অন্ন সংস্থানের সুযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নিজে জেলে পরিবারের ছেলে... তাই জেলেদের দুঃখে কেঁদে উঠেছিলো তাঁর মন। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিন চারটে চাকরি শুরু করলেন। যা রোজগার করতেন তা সবই বিলিয়ে দিতেন জেলেদের মাঝে। শেষে তাঁর এক বন্ধু তাকে পরামর্শ দিলেন এভাবে কোন সাহায্য করা হবে না। তার চেয়ে বরং বই লেখ। বই লিখে টাকা বেশি পাবে সেটা জেলেদের মাঝে বিলিয়ে দিও। বন্ধুর পরামর্শ মনঃপূত হলো তাঁর। জেলে জীবনের কাহিনী নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লেখার কাজ শেষ হলো। কিন্তু সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেদিন তিনি প্রকাশকের কাছে যাচ্ছেন সেদিন মনের ভুলে সেটা দোতলা বাসে রেখে দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লেন। এত দিনের পরিশ্রম সবই বৃথা হয়ে গেল। তবে কাজ ছাড়লেন না। তিনি আবার নতুন করে লিখতে লাগলেন সে কাহিনী। এ যে কত দুরূহ কাজ সেটা যাঁরা লেখেন তাঁরা অনুভব করতে পারবেন। যাই হোক দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে দ্বিতীয় বারের লেখাও সমাপ্ত করলেন তিনি। বইটি প্রকাশকের কাছে দেবার পরই আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মায়। ব্যারাকপুরের এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো তাঁকে। তবে শেষ পর্যন্ত বইটি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। বই প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রচণ্ড সাড়া তোলে। আমি এ কাহিনী পড়ে একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। এবং তখনই স্থির করি যে, বইটি নিয়ে ছবি করবো। ঋত্বিক বাবু বলেন, জেলে জীবনের কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন 'পদ্মা নদীর মাঝি'। সে কাহিনীও অনবদ্য। তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনী তার চেয়েও বেশী সততা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। জেলে জীবনকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেন 'বাবুর চক' থেকে। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেখেছেন একেবারে ভেতর থেকে। কাহিনীর এই সততা এবং আন্তরিকতাই আমাকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, কোলকাতার আশেপাশে জেলে গ্রাম এবং নদীগুলোকে আমার কাছে ঠিক এ-কাহিনী চিত্রায়ণের জন্য উপযুক্ত পটভূমি বলে মনে হয়নি। তাই এতদিন

১. এই জেলেদের অধিকাংশই ছিল সম্ভবত উদ্বাস্তু। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখা হয়েছে : 'তিতাস পারের অনেক মালো পরিবার উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অদ্বৈত কলিকাতার বাহিরে গিয়া তাহাদের দেখিয়া আসেন,— তাহাদের যৎসামান্য সুবিধার জন্য 'দেশ'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'বিশ্বভারতী'-তে কাজ জুটাইয়া লন, আর দুই কাজের পারিশ্রমিক হইতে নিজের শাকান্নমাত্রের বন্দোবস্ত রাখিয়া বাকি সব তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন'।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর চলচ্চিত্রায়ণ থেকে বিরত ছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশে এ ছবি করবো। আজ সুযোগ পেয়েছি। তাই তার সদ্ব্যবহার করেছি।

আমাদের আলোচনার মাঝখানে চিত্রালীর আলোকচিত্র শিল্পী মনোয়ার আহমদ ক্যামেরা নিয়ে তাঁর কক্ষে ঢুকলেন। ঋত্বিক বাবুর একটা ছবি তোলার দায়িত্ব তাঁর। যতক্ষণ ঋত্বিক বাবু কথা বলছিলেন ততক্ষণ তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। কথা শেষ করতেই বললেন, 'দাদা একটা ছবি নেব আপনার।' ঋত্বিক বাবু বললেন 'তা নিতে পারেন। তবে এ অবস্থাতেই। একটা আধময়লা পাঞ্জাবি আছে। যদি বলেন তবে সেটা পরতে পারি। নইলে এ চাদর গায়েই। কোন রকম গ্লামারাইজ করতে চেষ্টা করবেন না যেন।' মনোয়ার বললেন, 'বেশ তাই হবে।' বিছানার চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থাতেই মনোয়ার আহমদ ঋত্বিক বাবুর ছবি তুললেন কয়েকটা। মনোয়ার আহমদের কাজ শেষ হলো। আরেক প্রস্ত চা এলো। আমরা আবার আলোচনায় ফিরে গেলাম।

... এ ছবি করতে গিয়ে আপনাকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছি কি?' প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

উত্তরে ঋত্বিক বাবু জানালেন, 'আর সবাইকে যে সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় আমাকেও তাই করতে হয়েছে। আমার ছবিতে ইনডোরের কাজ নাই। তাই সেই সংক্রান্ত ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়নি। তবে শিল্পীর ডেট, যন্ত্রপাতি—এসব অংক করার ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।' ঋত্বিক বাবু আরও জানালেন 'অবশ্য এটা স্বাভাবিকই। কারণ এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের এখন যা অবস্থা তাতে যে এদেশে ছবি তৈরী হচ্ছে—সেটাই তো বেশি।' তিনি বললেন 'স্যুটিং করার খরচাপাতির ব্যাপারে কোন সমস্যা আমাকে পোহাতে হয়নি। ছবির প্রযোজকরা আমার চাহিদানুযায়ী সব কিছু যোগাড় করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি কোলকাতায় আমি ছবি তৈরি করছি প্রায় সাতাশ বছর ধরে। তবে এরকম উদ্যোগী প্রযোজকের দেখা সেখানে বড় একটা পাইনি।'

... এ ছবিতে বাংলাদেশের শিল্পী ও কুশলীদের নিয়ে আপনি কাজ করেছেন। তাদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

.. কোলকাতার শিল্পী ও কুশলীদের চেয়ে বাংলাদেশের শিল্পী ও কুশলীদের গুণগত মান কোন অংশেই খারাপ নয়। ভাঙ্গা যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানকার কুশলীরা যা করছেন তা বলতে গেলে একটা মিরাকল। শিল্পীদেরকেও লক্ষ করে দেখেছি যে, জানার জন্য, শেখার জন্য তারা ব্যাকুল। খাটতে তারা প্রাণপণ প্রস্তুত। তবে বাজারী ছবির চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাদের কান্না, হাসি, কথা বলার ঢং ইত্যাদি একটা বিশেষ সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। তবে এর জন্য সবটুকু দোষ তাদেরকে দেয়া যায় না। এখানকার শিল্পীরা অভিনয় করতে জানেন না এটা আমি স্বীকার করি না। শিল্পীদের দোষ না দিয়ে কর্তা ব্যক্তিদের উচিত তাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং কি করতে হবে সেটা বলে দেওয়া। তবে

আমার মনে হয় ভুলত্রুটি দেখার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি একটা নেই।

... আপনি কি আপনার ছবির কুশলী ও শিল্পীদের স্বাধীনতা দেন ? আবার প্রশ্ন রাখলাম তাঁর কাছে।

... স্বাধীনতা দেয়ার কথা উঠে তখন, যখন কারও কাজের প্রতি আমি আস্থাবান হতে পারি। শুধু আমার বেলায় নয়, সব পরিচালকের বেলাতেই একথা প্রযোজ্য। আমার কি প্রয়োজন সেটা আমি শিল্পীদের কাছে ব্যাখ্যা করি, বুঝিয়ে দেই। যদি দেখি এর পর তাঁরা ঠিক আমাকে অনুকরণ করেছেন তাহলে তাঁদেরকে আমি আবার সতর্ক করে দিই। কারণ আমাকে অনুকরণ করলে তো আর সেটা শিল্পীর অভিনয় হলো না। আমার অভিনয় হলো। তাতে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। আমি অভিনয়ে স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।

... ছবি করার ব্যাপারে আপনি কি কখনো কোন কম্প্রোমাইজ করেছেন বা করেন ? আমার প্রশ্ন।

... আপনি যে কথাটা বলেছেন সেটা কম্প্রোমাইজ নয়। সারেন্ডার। না, আজ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছে ছাড়া অন্য কোন দাবির কাছে আমি নতি স্বীকার করিনি। আমার যা ভালো লাগে আমি তাই করি। আমি বিশ্বাস করি আমার ভাল লাগাটাই আর দশজনের কাছেও ভালো লাগবে। কারণ আমি শিল্পী। সমাজের আর দশ জনের মন ও দৃষ্টি নিয়ে আমি সবকিছু প্রত্যক্ষ করি। যদি আমার ভালো লাগাটা আর দশজনের কাছে ভালো না লাগে তাহলে আমি শিল্পী নামের যোগ্য হতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক বাবু আরও বলেন, ছবি যাতে বাজার পেতে পারে সেজন্য অনেকে ছবিতে বিশেষ একটি কায়দায় সেন্টিমেন্ট প্রয়োগ করেন। সেই 'সেন্টিমেন্ট' ফুটিয়ে তোলার জন্য শিল্পীদেরকে বিশেষ রকমভাবে 'মুড' আনতে হয়, বিশেষ এক ভঙ্গিতে অভিনয় করতে হয়। আমি এই প্রয়োগকৃত বাজারী সেন্টিমেন্টে বিশ্বাস নই। আমার বিশ্বাস মানুষের গভীরতম উপলব্ধি, অনুভূতি, দুঃখ, বেদনা ইত্যাদিকে অলঙ্কার পরিয়ে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন হয় না। এ সবের স্বাভাবিক প্রকাশই মানুষের মনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'ও দর্শকদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে বলে আমি আশা রাখি।

তিতাসের হাওয়া বৈচিত্রের হাওয়া

বেবী ইসলাম

(সা : চিত্রালী প্রতিনিধি)

পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি এদেশে মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি বিদগ্ধ মহলে সুখ্যাতি পেয়েছিল। 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' শ্রী ঘটকের এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

আজ বাংলাদেশে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনী নিয়ে এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন পরিচালক স্বয়ং। কাহিনীটি ছাপার অক্ষরে কাহিনীকার দেখে যেতে পারেন নি। তার আগেই তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরিচালক শ্রী ঘটকও বর্তমানে অসুস্থ হয়ে কোলকাতার হাসপাতালে রয়েছেন। তিতাসের সৃষ্টির পেছনে যাঁদের সহযোগী হাত অক্লান্তভাবে কাজ করেছে তাঁরা সবাই এদেশেরই শিল্পী-কলাকুশলী। ছবিটির মুক্তি লগ্নে ছবির চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের সঙ্গে তিতাস প্রসঙ্গে কিছু আলাপ হয়েছিল। বেবী ইসলাম অভিজ্ঞ ও প্রবীণ চিত্রগ্রাহক হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়া থেকেই ছবির জগতের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন।

প্রশ্ন : বর্তমানে ধুম-ধারাক্কাপূর্ণ ছবির হিড়িকে 'তিতাস' দর্শকদের কাছে কতটুকু নতুন উপাদান নিয়ে আসছে ?

উত্তর : 'তিতাস' দর্শকদের একঘেয়ে ক্লান্ত চোখকে বৈচিত্রের আস্বাদ দেবে। এটা একটা ব্যতিক্রমধর্মী ছবি। দর্শক এ ছবি দেখে আনন্দ পাবে। তিতাসের তীরে বিচিত্র জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিগুলো দর্শকদের মনে দাগ কাটবে।

প্রশ্ন : পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে কাজ করে আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

উত্তর : 'কোমল গান্ধার' ,'সুবর্ণরেখা'-র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সুদীর্ঘ বার-তের বছর হাত গুটিয়ে বসে থেকে যে সময়টি হারিয়ে ফেলেছিলেন 'তিতাস'-এর মাঝে শ্রী ঘটক সে সময়টিকে আবার ফিরে পেয়েছেন বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের চিত্র গ্রাহকদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম একজন ভাল চিত্রপরিচালকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।

প্রশ্ন : 'অযান্ত্রিক', 'কোমলগান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে বিদগ্ধ মহল 'তিতাস'-এর মাঝে খুঁজে পাবেন কি ?

উত্তর : কিছু কিছু। জবাবটা আপেক্ষিক। ঋত্বিক ঘটক নিজেই বলেছেন 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি নাকি তাঁর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। অথচ এ ছবিটি যদি বিদগ্ধ মহলে

সুখ্যাতি পেয়ে থাকে, 'তিতাস'ও সেই সুখ্যাতি পাওয়ার আশা রাখে।

প্রশ্ন : অভিযোগ তুলে কোন কোন চিত্রনির্মাতা বলেছেন, 'এ দেশে ভাল ছবি করা সম্ভব নয়।' এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

উত্তর : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। একটি ভাল ছবি তৈরির পেছনে এ দেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদেরও যে সুনিপুণ হাত রয়েছে তা প্রমাণ হবে 'তিতাস'-এর মুক্তির পর।

প্রশ্ন : 'তিতাস'-এর চরিত্রগুলোতে তারকা প্রথা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রধানাংশ চরিত্রগুলোতেই দেখা গেছে নামী দামী তারকারা রয়েছেন। এর কারণ কি ?

উত্তর : ছবির স্যুটিং তাড়াতাড়ি শুরু হওয়ার তাগিদ ছিল। সম্পূর্ণ নতুন শিল্পী খোঁজার জন্যে দীর্ঘ সময় নেয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবু বেশ কিছু নতুনদের সমাবেশ এ ছবিতে দেখা যাবে।

প্রশ্ন : পরিচালক ঘটকের সঙ্গে কাজ করে তাঁর কোন দিকটা আপনার ভাল লেগেছে ?

উত্তর : তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাজকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু কাজের আড়ালে বোহিমিয়ান অগোছালো ঋত্বিক ঘটককে চিনতে গেলে মন মাঝে মাঝে চমকে উঠে। মানুষ ঋত্বিক ঘটক তাই মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ অস্থির থাকেন। তাই মাঝে মাঝে মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের ভারসাম্যও তিনি হারিয়ে ফেলেন।

প্রশ্ন . আজকের প্রমোদ ছবির ভিড়ে তিতাসের প্রযোজক এ ছবির পেছনে এত বড় ঝুঁকি কেন নিয়েছেন ? এ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ?

উত্তর : ঋত্বিক ঘটকের অন্যান্য ছবি দেখে এবং সৃজনশীল পরিচালক হিসেবে শ্রী ঘটককে ছবিতে পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার দিতে পেরে প্রযোজক নির্লিপ্ত মনে এ ছবির পেছনে এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহস করেছেন বলে আমার ধারণা।

প্রশ্ন : তিতাসকে যদি দর্শক স্বাগত জানায় আগামীতে আমাদের চিত্র নির্মাতারাও কি এ ধরনের ছবি করতে সাহস পাবেন ?

উত্তর : তিতাস দর্শকদের কাছে সমাদর পেলেও সহসা এ দেশের পরিচালকরা এ ধরনের ছবি তৈরি করতে সাহস পাবেন না বলে মনে হয়। কারণ প্রমোদ ছবির গড্ডালিকা প্রবাহে এ দেশের চিত্র নির্মাতাদের বাণিজ্যিক মনটাকে সংযত করতে সময় লাগবে অনেক দিন।

তিতাসের প্রযোজকের সঙ্গে কিছুক্ষণ

খালেদ হায়দার ও বাকির আবদুল্লাহ

[১৯৭৩ পর্যন্ত ঋত্বিকের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'সুবর্ণরেখা'। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৫তে। দীর্ঘ আট বছর আর কোন ছবি নাই। মাঝে অবশ্য '৬৮তে একবার 'রঙ্গের গোলাম' নামে একটা ছবি বানানোর চেষ্টা নিয়েছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্তই।

১৯৭৩ সালে এই বাংলাদেশের মাটিতে এসে তৈরি করলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। '৬৫ থেকে '৭৩ তাঁর জীবনের একটি বিতর্কিত সময়। তাঁর স্বদেশের মাটিতে (ভারতে) এ সময়ে কেউ এগিয়ে আসেনি তাঁকে দিয়ে ছবি তৈরী করাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এগিয়ে এলো একজন তরুণ প্রযোজক তারুণ্যের উদ্দামতা নিয়ে। প্রচণ্ড এক ঝুঁকি নিয়ে। এ প্রযোজকের নাম হাবিবুর রহমান খান। এর আগে জীবনে কখনো চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেন নি। জীবনের প্রথম প্রযোজিত ছবির পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক। যিনি জীবনে বহু ছবি শুরু করে শেষ করেন নি। কিন্তু 'তিতাস' শেষ হলো। মুক্তি পেল। এই তিতাসের প্রযোজকের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার আমরা এখানে পত্রস্থ করছি।]

প্রশ্ন : মিঃ খান, 'তিতাস' আপনার প্রথম ছবি এবং এর আগে ছবি তৈরির কোনো রকম অভিজ্ঞতাই আপনার ছিলো না। শুরুতেই আপনি ঋত্বিক ঘটকের মতো একজন চলচ্চিত্রকারের পরিচালনায় ছবি তৈরিতে আগ্রহী হয়েছেন কেন আর সে সময়ে তাঁর সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানতেন ?

উত্তর: দেখুন, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমার আগ্রহ স্কুল জীবন থেকেই ছিলো। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাও খুব পড়তাম। ঋত্বিক ঘটকের সম্পর্কে লেখা বিভিন্ন রচনা পড়ে আমি তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম। সহপাঠীদের সাথে শৈল্পিক চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় তারা যদিও সত্যজিৎ রায়কে গুরুত্ব দিতো, তবু আমি এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি যে পথে চিন্তা করি তিনি সেই পথেরই চলচ্চিত্র নির্মাতা। মজার ব্যাপার হলো তার সাথে আমি ছবি তৈরির কথা ঠিকঠাক করেছি তাঁর কোন ছবি না দেখেই। যাই হোক, আমার বন্ধুরা সত্যজিৎ রায়কে এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের সম্মান দিলেও আমি ঋত্বিককেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতাম। এমনি ধারনা আমার হয়েছিলো শুধু ঋত্বিকের লেখা এবং ঋত্বিক সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনা পড়েই, অদ্ভুত ব্যাপার যদিও। কলেজ জীবন থেকেই আমার বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং তারপর আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ছবি তৈরি করতে পারবো আর সেটাই হবে

আমার প্রথম ছবি। উনিশ শ' বাহাত্তুরের একুশে ফেব্রুয়ারির একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভারত থেকে আগত বিভিন্ন শিল্পীদের মধ্যে গায়ক শ্যামল মিত্র আর বরুণ বকশী নামে একজন সংস্কৃতিপাগল লোকের সাথে আমার আলাপ হয়েছিলো। শ্যামল মিত্রের কাছে আমি শুনলাম ঋত্বিক ঘটক ছবি তৈরির নামে প্রযোজকদের কিভাবে ভুগিয়ে থাকেন। সেটাকেও আমি একটা চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম। আমার আগ্রহ দেখে বরুণ বকশী আমার আর ঋত্বিক ঘটকের যোগাযোগে মধ্যস্থতা করতে রাজী হলেন। তিনি কোলকাতায় গিয়ে সেখানকার গাজা পার্ক থেকে ভীষণ রকম অসুস্থ ঋত্বিককে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে উঠালেন, কারণ ঋত্বিকের দেখাশুনা করবার মতো কেউ তখন ছিলো না। খবর পেয়ে আমি শ্রীঘটকের সাথে ছবি তৈরির ব্যাপারে আলাপ করলাম। আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় এমন একটা ছবি তৈরিতে আগ্রহী ছিলাম যাতে বাংলাদেশের রূপ যথার্থ ভাবে ফুটে উঠবে। সে জন্যই অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচন করা হয়। সে উপন্যাসটার স্বত্ব তখন একটা ট্রাস্টের হাতে ছিলো। এর আগে কয়েকজন চলচ্চিত্র নির্মাতা উপন্যাসটির কাহিনী নিয়ে ছবি করতে চেয়েও ট্রাস্টের অনুমতি পাননি। কিন্তু ঋত্বিকের বেলায় ট্রাস্ট আপত্তি করে নি। ছবি তৈরির সময় ঋত্বিকের একটা অদ্ভুত স্বভাব আমি লক্ষ করেছিলাম। লোকেশনে গিয়ে তিনি যে সত্যিকারের তিতাসের কাছে আছেন এ অনুভূতিটাকে গভীর করবার জন্যে প্রায়ই তিনি আঁজলা ভরে তিতাসের পানিতে মুখ মুছে নিতেন।

প্রশ্ন : ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় ছবি তৈরির পর তাঁকে পরিচালক হিসেবে কতখানি সহযোগী বা অসহযোগী বলে আপনার মনে হয়েছে ?

উত্তর: তিতাসের কাজে হাত দেবার আগেই আমি শুনেছিলাম, ঋত্বিক ঘটক ছবি তৈরির সময় বিভিন্নভাবে প্রযোজকদের ভীষণরকম অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ান। কেউ কেউ এমন বলতেন যে, তাঁকে দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে ছবি তৈরি করানো সম্ভব নয়। প্রযোজকদের সাথে এমনি অসহযোগিতার কারণে তিনি 'তিতাস' তৈরির আগের দশ বছর সময় ধরে কোনো ছবি তৈরি করতে পারেননি। 'তিতাসের' কাজ চলবার সময় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ছবির কাজে তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে চলতে, তবুও তিনি যেন অনেকটা খামখেয়ালীর বশে, কখনও বা প্ল্যানিং এর অভাবের কারণে, কখনও আমাকে আর কখনও পুরো ইউনিটকে অনেক রকম অসুবিধায় ফেলেছেন। যেমন ধরুন, একদিন আশি জনের ইউনিট নিয়ে আমরা আরিচার লোকেশান শুটিং-এ গিয়েছিলাম। যাবার আগে, সেখানে পৌঁছেও শ্রীঘটকের কাছে জানতে চাইলাম, তিনি সেখানে শুধু সেদিনই শুটিং করবেন, না একনাগাড়ে কয়েক দিন। উত্তরে তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারলেন না। এমনিভাবে পুরো ইউনিটকে একটা অনিশ্চিত অবস্থায় রেখে হঠাৎ করে সেদিনই প্যাক-আপ করলেন।

প্রশ্ন : একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ একবার ঢাকায় এসে বলেছিলেন, ঋত্বিক ঘটক মূলত একজন ভালো চলচ্চিত্রকার হলেও তিনি নিজে ছবির প্রযোজক নন। ছবি তৈরির সময় তিনি বিভিন্ন ভাবে এতো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেন যে, নিতান্ত জেদী বা ফেসে যাওয়া প্রযোজক ছাড়া আর সবাই তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন, যে কারণে ঋত্বিকের বেশীরভাগ ছবিই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 'তিতাস' তৈরির সময় কি এমনি কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো ?

উত্তর: হ্যাঁ, ব্যাপার ঠিক তাই। 'তিতাস' তৈরিতে আমি হাত দিয়েছিলাম শুধুমাত্র শিল্প সৃষ্টির জন্যেই। টাকা খরচের বেলায় কোনো সীমাবদ্ধতা ছিলো না, আর এ টাকা যে ছবিটার ব্যবসায়িক ব্যর্থতার জন্যে ফেরত পাওয়া যাবে না তাও জানতাম। তার পরেও তাঁর খামখেয়ালীপনা,অতিরিক্ত মদ খাওয়া এসব ব্যাপার যন্ত্রণার মতো লাগতো। কখনও তিনি পুরো ইউনিটসহ লোকেশনে গিয়ে কোনো কাজ না করেই ফিরে এসেছেন। এ সব করে যে বাড়তি খরচ তিনি করিয়েছিলেন তার পরিমাণও বড় কম নয়। কাজের সময় তিনি ভীষণরকম মনোযোগী এবং কাজের প্রতি একাত্ম হয়ে থাকতেন, তবুও মাঝে মাঝেই খামখেয়ালী হয়ে উঠতেন। ছবি তৈরির জন্যে যেসব জিনিসপত্রের দরকার ছিলো, তিনি আগেই তার একটা বড় তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সে তালিকা অনুসারে আমি ব্যবস্থাও করেছিলাম। তার পরেও কখনো কখনো তিনি হয়তো একদিনের নোটিশেই এমন সব জিনিষের অর্ডার দিয়ে বসতেন যার ব্যবস্থা করতে আমার আর ইউনিটের লোকজনের প্রাণান্ত হতো। এমনকি তাঁকে সরবরাহ করা কোনো কোনো জিনিষ কয়েক দিন পরেই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

প্রশ্ন : তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ আছে যে, বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসের কারণে তিনি মনে করতেন, প্রযোজক যেহেতু ধনী ব্যক্তি, তাকে যতো বেশী খরচা করানো যায়, ততোই এক ধরনের ভালো কাজ করা হয়। এমনি ধারণার জন্য তিনি তাঁর প্রযোজকদের অনেক সময় এমন সব খরচে বাধ্য করতেন, যা ছবি নির্মাণের বা তাঁর ব্যক্তিগত প্রযোজনের বাইরে, আর তাই করে ছবির নির্মাণ ব্যয় অকারণে বাড়িয়ে দিতেন। আপনার বেলায় কি তিনি এমনটা করেছেন ?

উত্তর: হ্যাঁ, প্রচুর করেছেন। কোনোদিন হয়তো চায়নিজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে অনেকগুলো আইটেমের অর্ডার দিয়ে অল্প খেয়েই উঠে পড়লেন। অথবা ধরুন লোকেশনে গিয়ে শুটিং না করে ফিরে আসা। এ ধরনের ঝামেলার জন্যে ছবির নির্মাণ ব্যয় কম করেও বাড়তি দু'লাখ টাকা যোগ করতে হয়েছে।[১] আর এ নিয়ে কখনো

১. 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির ইউনিটের সার্বক্ষণিক সদস্য শমশের আহমেদ জানান যে, এই ছবিটি শেষ করতে মোট সাড়ে চার লাখ টাকা ব্যয় হয়েছিল--- সেই সময় দু'লাখ টাকাতেই এই ছবি শেষ করা যেত যদি অতিরিক্ত ব্যয় না হত। এই ছবির প্রযোজনা খাতে এন.এম. চৌধুরী বাচ্চু ও ফয়েজ আহমেদও কিছু অর্থ যোগান দেন বলে তিনি জানান।

অভিযোগ তুললে তিনি বলতেন, 'গরীব মানুষদেরকে কিছু পাইয়ে দিলাম, বুর্জোয়ার কিছু গেল।'

প্রশ্ন : ঋত্বিকের ব্যক্তিজীবন তাঁর কর্মজীবনকে ব্যাহত করতো বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: ভীষণভাবে করতো। আমার মনে হয়, তাঁকে দিয়ে ছবি তৈরী করানোর ব্যাপারটাকে যদি আমি চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ না করতাম, তা হলে এ ছবির নির্মাণ কখনো শেষই হতো না, তাঁর খামখেয়ালীপনার জন্যে। তিতাসের প্রথম পর্যায়ের শুটিং শেষ হবার পর তিনি কোলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি যখন কোলকাতায় গেলাম, তিনি আমাকে একেক দিন একেক সময় একেক জায়গায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে থাকলেন। একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন 'আগামীকাল ভোর পাঁচটায় গাজা পার্কে'। গিয়ে দেখি সেই ভোরবেলাতেই তিনি মাতাল হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তাঁর সাথে যদ্দিন কাজ করেছি তাঁকে সামলে রাখবার জন্যে দিনরাত তাঁর পেছনে লেগে থাকতে হতো আমাকে। কাজের ফাঁকে যখন তিনি কোলকাতায় চলে যেতেন তখন তাঁকে সামলাবার ভার ছিলো আমার সেখানকার বন্ধু-বান্ধবের ওপর। কোনো কোনো সময় তাঁর সাথে আলোচনা করে শুটিং এর সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে তাঁর ঢাকায় আসবার প্লেনের টিকেট যোগাড় করে ফেলবার পর তিনি সেদিন ঢাকায় আসতে রাজী হতেন না। এদিকে সবকিছু তৈরি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাজ পড়ে থাকতো। তাঁকে কাজে ফিরে আসতে রাজী করবার জন্যও অনেক সময় দিনরাত তাঁর পেছনে লেগে থাকতে হতো।

প্রশ্ন : তাঁর খামখেয়ালীপনা আর ব্যক্তিজীবনের প্রভাবে তাঁর কাজের গতি কি খুব ধীর হয়ে যেতো ?

উত্তর: সাংঘাতিকভাবে। তিতাসের কাজ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো এক বছর সময় নিয়েছিলো। শুরু করেছিলাম বাহাত্তুরের জুলাই মাসের প্রথম দিকে, রিলিজ হয়েছে তিয়াত্তুরের ২৭শে জুলাই। সে এক বছর ঋত্বিককে কাজে ধরে রাখবার জন্য আমাকে অন্য সব কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। এর পরেও কোলকাতার অনেকে ছবিটার কাজ শেষ করতে পারায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তবে শ্রী ঘটক ছবিটার প্রথম পর্যায়ের শুটিং খুব খেটে এবং প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। এরপর থেকেই যখন আমি ছবিটার নির্মাণে ভালোভাবে জড়িয়ে পড়েছি, তাঁর খামখেয়ালীপনা চরম আকার নিয়েছিলো।

প্রশ্ন : অন্যান্য দিক, যেমন ধরুন, সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের বেলায় তিনি কতোখানি পারদর্শী ছিলেন ? আর তাঁদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করতেন ?

উত্তর: কাজ আদায়ের বেলায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। ছবির জন্যে তাঁর প্রয়োজন তিনি ঠিকই বুঝে নিতেন। সহকর্মীদের সাথে আচরণের বেলায় মাঝে মাঝে তিনি কেমন যেন আনব্যালেন্সড হয়ে পড়তেন। তাঁর স্ত্রীর সাথে আলাপ করে

জেনেছিলাম, শ্রী ঘটক ডাবল পারসনালিটির, দ্বৈত মানসিক সত্তার রোগে ভুগতেন। সম্ভবত সে জন্যেই এটা হতো। কখনো মদ খাওয়া নিয়েও তিনি রাগারাগি বাঁধাতেন। আমি তাঁকে মদের কোটা করে দিয়েছিলাম। দুপুরে তিন পেগ রাতে ছ'পেগ। তবু তিনি সব সময়ই মদ খেতে চাইতেন।

প্রশ্ন : শ্রী ঘটক সহকর্মীদের কর্মদক্ষতায় কতোখানি ভরসা করতেন বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর: আমাদের এখানকার পরিবেশ তাঁব জন্য ছিলো নতুন। তাই প্রথম দিকে তিনি দ্বিধার ভেতর ছিলেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের শুটিং-এর পর আমাদের ইউনিটের ওপর তাঁর বেশ কনফিডেন্স এসে যায়। যে জন্য পরবর্তী সময়ে তিনি ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলামের কাজের তদারকির খুব একটা প্রয়োজনবোধ করতেন না। তিতাসের সম্পাদক বশীর হোসেনকেও তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্পাদনা করবার লিখিত অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কাজের বেলায় সহযোগীদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিলো কি ?

উত্তর: এ ব্যাপারটায় তাঁর তেমন মাথাব্যথা ছিলো না। তাঁর যে কাজ দরকার সেটা আদায় করাতেই তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন।

প্রশ্ন : তিতাসের ক্যামেরাম্যান. সম্পাদক, সঙ্গীত পরিচালক এদের নির্বাচনে কার ইচ্ছেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো, আপনার না ঋত্বিক ঘটকের ?

উত্তর: ঋত্বিক ঘটকের সাথে আমার এমনি কথা হয়েছিলো যে. তিতাস হবে পুরোপুরিভাবেই বাংলাদেশের ছবি এবং পরিচালক ছাড়া এর আর সমস্ত শিল্পী-কলাকুশলী থাকবেন বাংলাদেশ থেকে। তারপরে শ্রী ঘটক যখন ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানকে সঙ্গীত পরিচালক নির্বাচন করলেন. আমি আপত্তি করেছিলাম। ঋত্বিক বললেন যে. ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানকে নিলে তাঁর অনেক সুবিধা হবে, কারণ তাঁর আগের ছবিগুলোতেও তাঁরা এক সাথে কাজ করেছেন। আমি শিল্পের স্বার্থে সেটা মেনে নিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রের টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে, আপনার ধারণা অনুসারে ঋত্বিক কতোখানি জানতেন ?

উত্তর: এ ব্যাপারে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিলো। ফিল্মের এ টু জেড একেবারে মুখস্ত। ক্যামেরা থেকে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত এমন কোনো ব্যাপার নেই যা তিনি জানতেন না।

প্রশ্ন : ছবি পরিচালনায় তিনি যতোদিন ছিলেন, আপনার স্মৃতিতে কোন স্মরণীয় ঘটনা আছে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে ?

উত্তর: আসলে সবটাই স্মরণীয়— প্রতিটি মুহূর্তই স্মরণীয় যতোদিন ছিলাম। এতো বেশি খামখেয়ালী করতেন যা ঠিক বলার মতো নয়। প্রথমতো তাঁর সাথে সাথেই

থাকতাম। পরবর্তীতে লোক রাখতাম তাঁকে দেখাশোনার জন্য যখন রাতে আমি কাছে থাকতে পারতাম না। আসলে কি জানেন ? উনি প্রথমে এতো অমানুষিক কাজ করতেন যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার মনে হয় এভাবে যদি ছবিটা শেষ করতে পারতেন তবে এ ছবি কি যে হতো ? অনেকেতো ক্লাসিক ছবি বলেন তিতাসকে, আমার মনে হয় তার চাইতেও বেশি কিছু হতো। শেষ দিকে তো তাঁকে কমাণ্ড করতাম। বলতাম আমি জানি অনেক ছবিই আপনি শেষ করেন না কিন্তু আমার ছবি শেষ আপনাকে করতেই হবে। জানেনতো আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তো ভয়ই দেখাতাম। একদিন কি হয়েছে জানেন ? রাত্রে শুটিং শেষের পর বলছেন, আমাকে মদ দিতে হবে। আমি তো মদ খাইনা— এখন মদ কোথায় পাই। শেষ পর্যন্ত এই মদের জন্য আমাকে গণিকালয়ে যেতে হয়েছিলো।

প্রশ্ন : আপনি ঘটকের ক'টি ছবি দেখেছেন ?

উত্তর: চারটা। মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, কোমল গান্ধার এবং তিতাস।

প্রশ্ন : ঘটকের ছবি হিসেবে বিশেষত তিনটে ছবি আলোচিত হয়— সুবর্ণরেখা, কোমলগান্ধার ও তিতাস। তাঁর best creation ? অর্থাৎ তিতাস কে আপনি কোন গ্রেডের মনে করেন।

উত্তর: সেকেন্ড।

প্রশ্ন : বেস্ট কোনটাকে মনে করেন ?

উত্তর: কোমলগান্ধার।

প্রশ্ন : তিতাস নিন্দিত ও নন্দিত হয়েছে এবং আপনি নিজেও বলেছেন দ্বিতীয়। এ ছাড়া প্রচণ্ড খামখেয়ালীপনা আপনাকে সহ্য করতে হয়েছে। এর পরও কি আপনি তিতাস করে হ্যাপী ?

উত্তর: যথেষ্ট অসুবিধা, যথেষ্ট যন্ত্রণা পেলেও ছবি যখন শেষ হলো— পর্দায় দেখলাম, আমার ভালো লাগলো, আমি খুশি কেননা আমি মনে করি ছবি কালেক্টিভ আর্ট, সেহেতু আমি যখন এ ছবির প্রযোজক তখন আমারো কিছু দান এখানে আছে— আমার ইনভলবনেস আমাকে গর্বিত করেছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে তৈরি 'মুখ ও মুখোশ' থেকে আজ পর্যন্ত 'ধীরে বহে মেঘনা' অর্থাৎ যৌথ প্রয়াসসহ যতো ছবি হয়েছে তিতাসের স্থান কোথায় বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর: উপরে। অনেক উপরে। এ ছবির মানকে স্পর্শ করতে বাংলাদেশের অনেক কষ্ট করতে হবে এবং কবে যে ধরতে পারবে তাও বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আপনি তো বেশ কিছু দিন ঋত্বিক ঘটকের সাথে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এমন কোন দিকের পরিচয় কি পেয়েছেন যা তার চরিত্রের সামগ্রিক দোষ ত্রুটি

যার মুখোমুখি আপনাকে অনেকবারই হতে হয়েছে তাকে ছাপিয়ে তাঁর মহৎ হৃদয়কেই প্রতিষ্ঠিত করে ?

উত্তর: এটাতো খুব স্বাভাবিক কেননা ছবি যখন পর্দায় দেখেছি তখনই সব ভুলে গেছি— ছবি তৈরির সময় যত কষ্টের—অশান্তির কারণই হোক না কেন।

প্রশ্ন : ছবির সম্পাদনার ব্যাপারে বিতর্ক দেখা গিয়েছিলো আসলে ব্যাপারটি কি ?

উত্তর: ছবিটা মোটামুটি সম্পাদনা তো তিনিই করেছিলেন, পরে একটু কারেকশনের যখন বাকি ছিল তখন তাঁকে যক্ষ্মা হাসপাতালে চলে যেতে হয়। তিনি অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'দেখ হাবিব, আমি হয়তো আর ফিরতে নাও পারি। তিতাস আমার অনেক সাধনার ছবি, তুই এভাবেই রিলিজ করে দে একটু ঠিকঠাক করে'। আমি বললাম, 'আপনি যদি বলেন তা আমি করতে পারি, কিন্তু আপনার ছবিতে তো কেউ হাত দিতে চাইবে না আর যে দেবে তাকেই ভবিষ্যতে কথা শুনতে হতে পারে। তবে আপনি যদি লিখিত অনুমতি দেন তবে করতে পারে'। তিনি লিখে দিলেন বশির হোসেন এটি সম্পাদন করবে।

প্রশ্ন : পরবর্তীতে বশীর হোসেন বিবৃতি দেন 'ছবি আমি এডিট করিনি', এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

উত্তর: বশীর হোসেন full ok করলেই ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। এখন যদি তিনি বলেন, কি জন্য বলেছেন, কি করে বলি, টেকনিসিয়ানদের ব্যাপার।

প্রশ্ন : পরে তো আবার re-editing হয়েছিলো ? উনি ঢাকায় আসার পর।

উত্তর: সেটা নমিনাল ব্যাপার। আপনারা তো ছবিটা দেখেছেন। ছবির মূল আবেদনের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি।

প্রশ্ন : আপনি ছবি করার সময় ঋত্বিক বাবুকে যতটুকু দেখলেন তারপর তাঁকে কোন্ শ্রেণীর পরিচালক বলে মনে হয় ?

উত্তর: তুলনাবিহীন। উপমহাদেশের কেউই তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারবে না। বিশ্বের অন্যতম পরিচালক।

প্রশ্ন : ঋত্বিক ঘটকের ছবির কোন্ দিকটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে ?

উত্তর: কোন কিছু বলা— যা সরাসরি, যা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়, কোথাও আপোষ নেই, এমনকি কারো বিরুদ্ধে কোন রাগ নেই শুধু সরাসরি বলে যাওয়া।

প্রশ্ন : এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন রাখতে পারি তা হলো এই বলার জন্য তিনি নাকি ন্যূনতম চলচ্চিত্র জ্ঞানেরও অনেক সময় পরিচয় দেন না অনেকে অভিযোগ করেন,আপনি এ প্রসঙ্গে কি বলেন ?

উত্তর: চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তিনি কোন গ্রামার মানতেন না। তিনি বলতেন, যা বলতে চাই তা বোঝা গেলেই হলো। পূর্ব নির্ধারিত গ্রামার আবার কি ? গ্রামার দিয়ে ফিল্ম

হয় না।

প্রশ্ন : মারা যাওয়ায় ব্যথিত নিশ্চয়ই হয়েছেন ?

উত্তর: হ্যাঁ, মারাত্মকভাবে শোকাহত।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। পারিবারিক জীবন কেমন ছিল। তাঁর স্ত্রীর সাথে—সন্তানদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল ? আমরা জানি স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য - বিচ্ছেদ নেমে এসেছিলো ...।

উত্তর: হ্যাঁ তাঁর স্ত্রী-সন্তানরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলো। একটা স্কুলে মাস্টারি করতেন—আসলে উনার খামখেয়ালীপনা উনার ব্যক্তিগত জীবনকেও যেমন তেমনি চলচ্চিত্র জীবনকে অনেক বিপর্যস্ত করেছে।

প্রশ্ন : আমরা একটা কথা শুনেছি উনি বিভিন্ন পুরস্কারের যে সব মেডেল পেয়েছিলেন সে সব বিক্রি করে দিতেন— এ সব কি সত্য ?

উত্তর: হ্যাঁ, চেষ্টা করেছেন। যেমন পদ্মশ্রীটা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

প্রশ্ন : 'তিতাস' বাচসাস কর্তৃক শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত না হবার পর আপনার সাথে কি তাঁর দেখা হয়েছিলো ?

উত্তর: না ওনার সাথে আমার দেখা হয় নি

প্রশ্ন : এ নিয়ে তো এখানে খুব হৈ চৈ হয়েছিলো। আপনি ওনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জেনেছিলেন ?

উত্তর: না। আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ রায় মেনে নিতে পারিনি। আমার ভালো লাগেনি — দুঃখ পেয়েছিলাম এবং এ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রশ্ন : তিতাসের পরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি— যেগুলোকে মোটামুটি ভালো ছবি বলা হয়, সেগুলো দেখলে দেখা যায় সেগুলো ভীষণভাবে তিতাসের প্রভাবিত— মনে হয় কেউ যেন দুর্বল হাতে তিতাসকে অনুসরণ করে চলেছেন। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

উত্তর: এটা অবশ্যই খারাপ। খুব খারাপ। যেমন ইদানিং ১৬ লেন্সের ব্যবহার বেড়ে গেছে তিতাসের পর—আগে যে ব্যবহার হয়নি তা নয় তবে এখন যেন একটু তীব্র হয়ে গেছে। শুধু ব্যবহার করলেইতো হয় না তার ব্যবহারের যৌক্তিকতার দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে হয়।

শেষ সাক্ষাৎকার : প্রথম নমস্কারের আগে*

মুহম্মদ খসরু

১৯৭২-এর ঘটনা। তিনটি ছবির কাজ শুরু হয়েছিল প্রায় একই সাথে। প্রথমটি সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত'। অন্য দুটো যথাক্রমে রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। শেষোক্ত ছবি দুটোর পটভূমি ছিল বাংলাদেশ।

দেশ তখন স্বাধীন। বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত নিসর্গ। ভূমি খুঁড়ে মানুষের হাড় আর মাথার খুলি স্তূপীকৃত করা হচ্ছে তখন। বাতাসে বারুদের গন্ধ। শকুনীরা নীড়াশ্রিত। বাংলাদেশের মানুষ তখন নতুন করে দেশ গড়ার সংকল্পে দৃঢ়-স্থিত। স্বপ্নাকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

১৯৭১। একুশে ফেব্রুয়ারির আমন্ত্রণে বিমানযোগে বাংলাদেশের দিকে আসছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের দুই প্রতিভূ—সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক কুমার ঘটক। বিমান খুব নীচু দিয়ে উড়ছিল। বিমানের জানালায় দুই চলচ্চিত্রকারের মুগ্ধ দৃষ্টিতে বহতা পদ্মা। এই সেই পদ্মা, যার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'ছিন্নপত্র'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এবং ঋত্বিক ঘটক করেছিলেন ছবি— 'দুর্বার গতি পদ্মা'। বাঙালি জীবনের বহতা নদী পদ্মা— যুগে যুগে শিল্পীকে যুগিয়েছে সৃষ্টির প্রেরণা।

রোদ-মাখা পদ্মার জলের মত ঋত্বিক ঘটকের চোখেও ঝিকিয়ে উঠেছিল জল। বিমানের মধ্যে তিনি কেঁদে উঠেছিলেন।

বোধোদয় পরবর্তীকাল থেকে যে দু'জন চলচ্চিত্রকার আমার মানস পটে কিংবদন্তীর নায়কের মত আঁকা ছিলেন তাঁরা হলেন সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক কুমার ঘটক।

তাঁরা আসছেন বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আমরা ভেবেছিলাম ইতালী অথবা ক্যুবার ন্যায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রেও একটা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। যেমন ঘটেছিল সত্যজিৎ গুরু রেনোয়াঁর আগমনে, পশ্চিম বাংলায়। কিন্তু এই দুই বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-পুরুষ সত্যজিৎ-ঋত্বিকের বাংলাদেশে পদার্পণ একটি শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করলেও তা ফলবতী হতে ব্যর্থ হয়।

ঋত্বিকদা-কে আমি প্রথম দেখি 'হোটেল পূর্বরাগে'। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির শুটিং চলাকালীন সময়ে। আমি তখন রাজেনদার (রাজেন তরফদার) 'পালঙ্ক' ছবিতে সহকারী রূপে কাজ করছি। আমাদের ইউনিটের জন্য একটা রুম ভাড়া করা

* সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কাল : ১৩ মে, ১৯৭৪

হয়েছিল পূর্বরাগে। প্রাক-শুটিং পর্বের কাজ চলছে পুরোদমে। রাত তখন প্রায় দু'প্রহর। ক্ষিপ্রগতিতে তিনি ঘরে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করলেন 'রাজেন বাবু কোথায় রে'?

লম্বা ছিপছিপে, চুল উসকো খুসকো অবিন্যস্ত, প্রায় হাঁটু অব্দি তোলা লুঙ্গি, গায়ে ভাঁজহীন মলিন পাঞ্জাবি, মুখে জ্বলন্ত বিড়ি নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তিনি ঘরে ঢুকেই প্রশ্নটা কাকে না কাকে ছুঁড়ে মারলেন। তাঁকে আমি দেখিনি কখনো। আমার সঙ্গে বসে পালঙ্কের অন্যতম সহকারী পুনু সেন (যে পুনু সেন সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'তে অন্যতম সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলেন) স্ক্রিপ্ট-এর ব্রেকডাউন করছিলেন। পুনুদা যেন চম্‌কে উঠলেন : আরে ঋত্বিক দা! চমকে দিলেন আমাকেও।

ঋত্বিকদা বললেন 'কিরে পুইনা, সত্যজিৎ বাবুকে খুব ল্যাং মেরে ঢাকায় আসা হয়েছে, না ? তা পল (শৈলজা চ্যাটার্জী পালঙ্ক-এর ক্যামেরাম্যান), উৎপল (উৎপল দত্ত), রাজেন বাবু এরা সব কই ?' পুনুদা বললেন : ওরা একটু বাইরে গেছেন, এখুনি ফিরবেন, আপনি বসুন।

জ্বলন্ত বিড়িটার হদিস পেলাম না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে আর একটি বিড়ি বের করে সংক্ষেপে ধরিয়ে ঋত্বিকদা বল্লেন, "আমি চললাম রে। ওরা এলে বলিস, আমি এসেছিলাম।" বলেই বেরিয়ে গেলেন।

ঋত্বিকদা ঢাকায় আসা অব্দি তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা ক্রমশ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সুযোগের সঙ্গে সময়ের আতাঁত গড়ে উঠছিল না। যদিও তিতাসের প্রযোজকরা তাঁকে নারায়ণগঞ্জে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর থাকা না থাকা এবং আমার দেখা-না-দেখা কি করে যেন এক হয়ে উঠল। অতঃপর রাত্রি দুই প্রহরে দুই মিনিটে সেই বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটে গেল। একটা জ্বলন্ত বিড়ি মুখে নিয়ে আমার শৈশব-কৈশোরের কিংবদন্তীর এক নায়ক— আমার সম্মুখে এলেন, আর একটা বিড়ি ধরিয়ে চলে গেলেন। মুখে আগুন নিয়ে কি করে ছুটতে হয় দেখলাম। ঋত্বিক ঘটককে দেখলাম। প্রথম নমস্কারের আগেই।

তারপর কিছুদিন। দেখা গেল 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর প্রযোজক হোটেল পূর্বরাগের একটি কামরা ভাড়া নিয়েছেন। তা প্রায় আমাদের পালঙ্ক ইউনিটেরই সংলগ্ন এবং ঋত্বিকদাও থাকেন সেই ঘরে। কলকাতা থেকে তিতাসের সঙ্গীতকার ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ-র ইতিমধ্যে ঢাকা এসে পৌঁছানোর কথা। যদিও তার পূর্বেই বাংলাদেশের খ্যাত অখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পীদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে পূর্বরাগে। পূর্বরাগের সেই কামরাটিতে। যেখানে ঋত্বিকদা আছেন। এবং ঋত্বিকদাই তিতাসের সঙ্গীতের মহলা শুরু করে দিলেন।

শুরু মানেই শুরু নয়। সে ব্যাপক ব্যাপার। কাজের অবসরে মাঝে মাঝে ঋত্বিকদার ঘরে গিয়ে সঙ্গীতের মহলা শুনতাম। তখন তিতাসের গান নির্বাচনের পালা চলছে।

বাংলাদেশের পরিচিত-অপরিচিত লোকশিল্পীরা আকুল হয়ে ভেজা উদাত্ত গলায় গাইছেন। একাগ্র ঋত্বিকদা শুনছেন। উত্তরবঙ্গ এবং সিলেট অঞ্চলের লোকগীতি শোনার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ দেখলাম বেশি। হরলাল কাকু, তাঁর ছেলে রথীন এবং ছোট মেয়ে স্বপ্না রায়কে দিয়ে বারবার ভাওয়াইয়া গাওয়াচ্ছেন তিনি। শুনছেন। ভাবছেন। একদিন দেখলাম হরলাল কাকু তাঁর গানের খাতা সমেত হাজির। অজস্র সংগৃহীত লোকগীতি থেকে ঋত্বিকদার নির্বাচিত গানগুলো স্বপ্নাকে দিয়ে গাওয়াচ্ছেন তিনি। স্বপ্নার গান ঋত্বিকদার খুব ভাল লেগেছিল। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, "এ মেয়েকে আমি কলকাতা নিয়ে যাব, আমার ছবিতে গান গাওয়াব"। লীলাবালী (লীলাবালী লীলাবালী, বর ও যুবতী সই গো কি দিয়া সাজাইমূ তোরে) গানটি আমিও সর্বপ্রথম তিতাসের ঐ সঙ্গীত মহলায়ই স্বপ্নার মুখে শুনি, যা তিতাসের বিশেষ আবহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

এভাবে আরও কিছুদিন।

ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান এসে গেলেন কলকাতা থেকে। তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। একদিন. পূর্বরাগে ডাইনিং রুমে বসে চা পান করছিলেন সবাই। ঋত্বিকদা এবং ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান পান-পর্বটা বোধহয় আগেই সেরে এসেছিলেন কোথাও থেকে। দুজনেরই বেশ টলটলায়মান খোলামেলা আমুদে অবস্থা। উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন ঋত্বিকদা। ঐ উচ্চস্বরই আমাকে টেনে নিয়ে এল ডাইনিং টেবিলে। তিতাসের সহকারী পরিচালক ফখরুল হাসান বৈরাগীও সেখানে উপস্থিত ছিল। বৈরাগী আমাকে দেখিয়ে বলল : দাদা, খসরু এখানকার ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ঋত্বিকদা একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বুকে। আমার বুক পকেটে সেদিন তিনটে কলম ছিল। ঋত্বিকদা বল্লেন, "কিরে হারামজাদা তোর পকেটে তিনটে কলম কেন। আঁতেলীপনা, যাও কবিতা লেখ গিয়ে, ফিল্ম করতে এসো না। ফিল্ম করতে এসে ওসব আঁতেলীপনা চলে না, শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। বুক-জলে দাঁড়িয়ে শুটিং করতে হয়, বুঝলে ?"

এভাবেই কথা উঠলো। কথা. গল্প, খিস্তি এবং প্রাণময় প্রাজ্ঞ আলোচনা। ঋত্বিকদা মুডেই ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের ছবি নিয়েও কথা উঠল। আমি ফরাসী চলচ্চিত্র-ধারার কথা বলতেই উনি বৃটেনের ফ্রি সিনেমার উপর পক্ষপাতমূলক আলোচনা করলেন অজস্র যুক্তিপাতে। জন শ্লেসিংগারের 'কাইন্ড অব লাভিং'-এর ভুয়সী প্রশংসা করলেন। আরও অনেক কথা বললেন সেদিন ঋত্বিকদা। মানুষ, শিল্প এবং চলচ্চিত্রকে জড়িয়ে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। শুনলাম সেদিন ওস্তাদ বাহাদুর খানের সরোদ বাদন—রাত-ভোর।

তিতাসের শুটিং চলছে। পুরোদমে। পালঙ্কেরও।

একদিন ঋত্বিকদা রাজেনদাসহ আমাকে নিয়ে গেলেন এফ.ডি.সি-তে। শুটিংয়ের

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তারপর রাজেনদাকে বল্লেন, "চলুন রাজেন বাবু, কবরীর বাসা হয়ে একটু এয়ারপোর্টে যাব।" আমি তো সঙ্গে রইলামই। যাবার পথে রহিমা খালার সাথে দেখা। ঋত্বিকদা রহিমা খালাকে বললেন, "কিরে বুড়ি কেমন আছিস? তোকে আমি বিয়ে করব।" বলেই হাসলেন অট্টস্বরে। তারপর বাকিটুকু বল্লেন রাজনদাকে, "মশাই, এমন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হয় না। একেবারে যাকে বলে জাতশিল্পী।"

কবরীর বাসায় ঢুকেই একটু ফর্মাল খবর-টবর দেবার ধার না ধরেই ঋত্বিকদা চেঁচিয়ে ডাকলেন 'কবরী আছিস নাকি বাসায়'? এঘর থেকে ওঘর। ঋত্বিকদার গলা শুনেই কবরী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। চোখেমুখে বলল : আরে ঋত্বিকদা ? ঋত্বিকদা বললেন, "শোন ছেমরি, আগামীকাল শুটিং সকাল ছ'টায় তৈরি থাকবি।" বিস্ময়াপন্ন কবরী বলল : কাল যে আমার অন্য ছবির শুটিং আছে দাদা। ঋত্বিকদা প্রায় ধমকে উঠলেন, "রাখ তোর শুটিং। আমি যখন বলছি তখন ওসব শুটিং ফুটিং ক্যানসেল।" অগত্যা । কেন না ঋত্বিকদা-র যে কথা সেই কাজ। এবং এই কথা-কাজের আত্মীয়তাই তাঁকে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কর্মীদের কাছে প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। যদিও প্রথম প্রথম তাঁর সান্নিধ্য থেকে অনেকেই দূরে সরে ছিল। অহেতুক সন্দিগ্ধ কিছু চলচ্চিত্রকর্মী তাঁর বাংলাদেশে আসাটা এবং ছবি করাটা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু 'সময়ে' এরাই ঋত্বিকদার কাজে-ব্যক্তিত্বে যুগপৎ বিস্মিত এবং মোহিত হয়ে ওঠে।

তিতাসের শুটিং প্রায় শেষ।

আমাদের 'পালঙ্ক' ইউনিট তখন ঢাকার অদূরবর্তী কলাকোপা থেকে আউটডোর শুটিং সেরে ফিরেছে। এসেই শুনলাম ঋত্বিকদা অসুস্থ। শুটিং করতে করতেই নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ছুটলাম পি. জি. হাসপাতালে। আমি আর বাদল। যেয়ে দেখি ঋত্বিকদা হাসপাতালের বেডে ম্লানভাবে শুয়ে আছেন। আমরা গিয়ে তাঁর শিয়রে দাঁড়ালাম। কারো মুখে কোন কথা নেই। ঋত্বিকদা শোয়া অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে উঠে হেলে বসলেন। চোখমুখ ফোলা। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারছিলেন না। খুব মৃদু স্বরে বললেন, "জিহ্বা কেটে গেছে।" তার উলঙ্গ পা-তেও দেখলাম ক্ষতচিহ্ন। এমন সময় তিতাসের প্রডাকশন কন্ট্রোলার আব্দুল জলিল ঋত্বিকদার জন্য চাইনিজ খাবার নিয়ে কেবিনে ঢুকলেন। আমাদের বললেন : বেশি কথা বলতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন। আমরা মৌনভাবে বিদায় নিলাম।

ঋত্বিকদার অসুস্থতার কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে জানানোমাত্র তিনি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে ঋত্বিক ঘটককে কলকাতায় নিয়ে এসে উপযুক্ত চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সিদ্ধার্থশংকর রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃণাল সেনকে পাঠালেন ঢাকায়, ঋত্বিকদাকে নিয়ে যাবার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঋত্বিক ঘটকের একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এবং ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মজীবনের উপর ঋত্বিকদা একটি

প্রামাণ্য ছবি তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ছবিটা অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

মৃণাল সেন ঢাকায় শুনেই ছুটলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঋত্বিকদার অবস্থা জানা দরকার। কিন্তু মৃণাল সেন ঋত্বিকদা কারো সঙ্গেই দেখা হলো না। রাজেনদা জানালেন 'মৃণাল সেন কয়েক মুহূর্তের জন্য ছিল, ঋত্বিকদাকে নিয়ে একটি বিশেষ হেলিকপ্টার যোগে কলকাতা ফিরে গেছে।' মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ঋত্বিকদার বাংলাদেশে ছবি করার ব্যাপারটা এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলকে কতটা আলোড়িত করেছিল আমার জানা নেই। কেননা, এদেশের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সবসময় চলচ্চিত্র শিল্প এবং শিল্পমনস্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। বিপরীতে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত শিল্পী-কুশলী কর্মীরাও অন্য কোন শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেননি। ফলতঃ সেতুবন্ধ রচনা হয়নি চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিকের কিংবা চলচ্চিত্রকর্মীর সঙ্গে চিত্রকরের। এবং এই যোগাযোগ-শূন্যতা সামগ্রিকভাবে অন্তরায় ঘটিয়েছে চলচ্চিত্রের (শৈল্পিক) বিকাশের, প্রকাশের। তাই বাংলাদেশে ঋত্বিকদার ছবি করা কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়াটা কিছু মুষ্টিমেয় চলচ্চিত্র অনুরাগীকেই যুগপৎ উত্তেজিত এবং বিমর্ষ করেছে। এটা দুঃখজনক হলেও অনভিপ্রেত ছিল না।

ঢাকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন মুক্তি পেল ঋত্বিকদা তখন কলকাতায়। লোকমুখে খবর পেলাম ঋত্বিকদা এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এদিকে তিতাসের প্রযোজকবৃন্দ ছবিটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই তাঁর ছবিটি চূড়ান্ত সম্পাদনার জন্য ঋত্বিকদাকে পুনরায় ঢাকায় নিয়ে আসার কথাও ভাবছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতায় তিতাসের একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। নির্বাচিত সেই বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলী কর্তৃক ছবিটি বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করে। ঠিক তখন ভারতে ছবিটি বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির কথাও চলছিল, কিন্তু তা আজও 'কথা'ই থেকে গেছে।

হঠাৎই একদিন খবর পেলাম ঋত্বিকদা আবার ঢাকায় এসেছেন তিতাসের পুনঃ সম্পাদনার কাজে প্রযোজকদের বিশেষ অনুরোধক্রমে। উঠেছেন হোটেল গ্রীন-এ। শোনামাত্র ছুটলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। গ্রীন-এ পৌঁছে দেখি তিনি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চুটিয়ে গল্প করছেন। মসৃণভাবে দাড়ি কামানো উজ্জ্বল মুখ সুন্দর স্বাস্থ্য, পরনে পরিষ্কার পাজামা এবং সিল্কের পাঞ্জাবি। এমন সুন্দরভাবে ছিমছাম, সৌম্যমূর্তির ঋত্বিকদাকে এর আগের দেখায় কখনো দেখিনি। আড্ডায় মহেন্দ্রদাও ছিলেন। মহেন্দ্রদার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল কবি শিকদার আমিনুল হকের মধ্যস্থতায়। খাস পাঞ্জাবি হলেও কলকাতাবাসী বাঙালি সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে ঘনিষ্ঠতায় তিনি কলকাতার বিদগ্ধ বাঙালি মহলে বিশেষ সুপরিচিতি হয়ে উঠেছিলেন। মহেন্দ্রদা পেশায় ছিলেন আলোকচিত্রী এবং নেশায় দাবারু। সর্বভারতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় তিনি একবার

রানার্স আপ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথের পেইনটিং এর ওপর তোলা তাঁর প্রামাণ্য ছবিটি দেশে বিদেশে প্রশংসা ও পুরস্কার দুটোই অর্জন করে। এই মহেন্দ্রদার সান্নিধ্যেই ঋত্বিকদার জীবনের শেষ ক'টি দিন কেটেছে। শেষদিকে ঋত্বিকদা যখন মহেন্দ্রদার বাসায় অবস্থান করছিলেন তখন ঋত্বিকদার অনেক আব্দার অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। নির্বিবাদে সহ্য করেছেন সে সব। বিপরীতে প্রয়োজনে ঋত্বিকদাকে শাসন করতেও দ্বিধা করেন নি তিনি। এক কথায় ঋত্বিকদার শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গ নিঃসঙ্গতায় মহেন্দ্রদাই ছিলেন একমাত্র সুহৃদ।

জীবনের ক্রমাগত ব্যর্থতা ভোলার জন্য ঋত্বিকদা আত্মঘাতী পথ বেছে নিলেও স্বীয় প্রতিশ্রুতির প্রতি ছিলেন অবিচল। তাই তাঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনায় আপোস শব্দটির ছায়াপাত ঘটেনা। শিল্প অন্বেষণে ব্যাপৃত তাঁর জীবন। তাঁর শিল্পের বাস্তবতাও এক কঠোর রূপাকৃতির। কোথাও ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার নেই। জীবনটা তো ইচ্ছাপূরণের ব্যাপার নয়। শিল্প জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। জীবনের দুঃখ এবং গ্লানি ভোলার জন্যই তিনি ক্রমশ মদাসক্ত হয়ে পড়েন। হতাশাচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত সমাজে এ্যালকোহলিজমের শিকার হয়ে যান এক শিল্পসাধক।

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য তাঁর কোন এক লেখায় সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সাথে চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্বের তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় এবং নজরুলের সাথে ঋত্বিক ঘটকের তুলনা করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর এ তুলনা (নজরুলের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের) যথার্থ নয়। বরঞ্চ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সৃজনশীলতা এবং জীবনযুদ্ধের বহুবিধ কর্মকাণ্ডের যথেষ্ঠ সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দু'জনই শিল্পসৃষ্টিতে ছিলেন কমিটেড। দু'জনই এ্যালকোহলিক হয়ে পড়েন এবং পরবর্তী জীবনে মানসিক রোগ যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল হিস্টিরিয়া এবং ঋত্বিকদার প্যারানোয়া টাইপ। সহধর্মিনী শ্রীমতী সুরমা ঘটকের এক লেখায় জানা যায় ঋত্বিকদার সিজোফ্রেনিয়া ছিল। এর কারণও সুবোধ্য। সুবর্ণরেখা সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন তাঁর হাতে কোন ছবি ছিল না। নিজের প্রতি অত্যাচারের জেদ তাঁর ঐ সময় থেকেই। মদ তখন তাঁর ব্যর্থতা ভোলার অনুষঙ্গ। ঠিক ঐ সময়ই তিনি একবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং দীর্ঘদিন তাঁকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়।

সেদিন হোটেল গ্রীনে ঋত্বিকদাকে ঐরকম সুন্দর স্বাস্থ্যে চমৎকার আড্ডায় মশগুল দেখে মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি তিনি কখনো অসুস্থ ছিলেন। আড্ডা হালকা হবার সুযোগে ঋত্বিকদার সঙ্গে প্রাথমিক দুটো চারটে কথার পর আমাদের ফিল্ম সোসাইটি প্রসঙ্গ তুলি এবং আমাদের পত্রিকা ধ্রুপদীর জন্য তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তাব রাখি। ঋত্বিকদা বল্লেন : 'হ্যাঁ কলকাতায় যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠি, সত্যজিৎ বাবু একদিন ফোন করে বলেছিলেন, "ঋত্বিক বাবু, আপনার বাংলাদেশের ছবির ওপর ভাল একটি আলোচনা বেরিয়েছে ওখানকার ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকায়", পরে পত্রিকাটি

পাঠিয়েও দিয়েছিলেন।— ভালই লিখেছে ছেলেটি। আমাকে এবং আমার ছবির মূল বক্তব্য ধরার প্রচেষ্টা আছে লেখাটিতে।' ঋত্বিকদা যে লেখাটির কথা বলছিলেন সেটি 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রসঙ্গে। ছবিটি মুক্তির কিছুদিন পরই ধ্রুপদীর তৃতীয় সংকলনটি বেরিয়েছিল। এবং তাতে মাহবুব আলম (সুকদেব বসু নামে) ছবিটি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছিল। তারপর তিনি কলকাতায় তিতাসের বিশেষ প্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়ার কথা তুললেন। বুদ্ধিপ্রভ দর্শক দারুণভাবে নিয়েছে ছবিটি। বিষ্ণুদে-ও নাকি সেদিনকার বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণু দে-র অশেষ স্নেহভাজন ও গুণমুগ্ধ ছিলেন ঋত্বিকদা। বিষ্ণুদে-ও ছিলেন ঋত্বিক ঘটকের শিল্পকর্মের একজন সত্যিকার অনুরাগী। ঋত্বিকদার ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা'র উপর বিষ্ণু দে-র লেখা এবং 'কোমলগান্ধার' ছবিটির নামকরণ ইত্যাদিতে তাঁদের একেব প্রতি অন্যের সমমর্মিতা সহজে অনুমেয়। ঋত্বিকদাকেও পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে বহুবার বিষ্ণু দে-র নামটি শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করতে শুনেছি।

কলকাতায় তিতাসের বিশেষ প্রদর্শনীকালীন বিষ্ণু দে-কে জড়িয়ে একটি ঘটনার কথা বলছিলেন ঋত্বিকদা : হল ভরা মানুষ তিতাস দেখছেন, ছবির প্রায় অন্তিম দৃশ্য। যে সিকোয়েন্সে তিতাসের শুকনো পারে উদয়তারা যেমন করে হোক বাঁচবার জন্য শহরে যাবার কথা ভাবছে, এবং উন্মাদপ্রায় বাসন্তীর মাকে বলছে, "হোচট খামুনা, দেহে যৌবন আছে, তরতরাইয়া পিছলাইয়া যামু"—ঠিক সে মুহূর্তে কে যেন সম্মুখের সীট থেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। সন্দেহ হোল, কেননা আমি জানতাম বিষ্ণু বাবু সামনের ঐ দিকটায় বসেছেন। হলের বাতি জ্বালাতে বলে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। প্রজেকশন থেমে গেল। আলো জ্বলে উঠলো। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। যেয়ে দেখি, বিষ্ণু বাবু চেয়ার ছেড়ে নীচে বসে পড়েছেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন তখনও। আমি হাত ধরে তুলে তাঁকে চেয়ারে বসালাম। সুস্থির হয়ে বসলেন তিনি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বয়স্ক মানুষ, না জানি কি হোল ? হয়তো কোন শারীরিক কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু পরে জানা গেল কারণটা মোটেও তা নয়। তিনি সেই প্রায় অন্তিম দৃশ্যটার সঙ্গে এমন গভীরভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে নিজের ভাবাবেগকে আর চেপে রাখতে পারেন নি, ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। তিনি একটু স্থির হবার পর আবার হলের বাতি নিভল এবং ছবির বাকি অংশটুকু প্রদর্শিত হোল।

সেদিন হোটেল গ্রীন-এ উদ্বাস্তু গল্পের তোড়ে ধ্রুপদীর -জন্য সাক্ষাৎকারের সঠিক দিন সময় নেয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দিন কয়েক পর তাই এফ.ডি. সি-তে গেলাম। ঋত্বিকদা সেখানে তখন তিতাসের পুনঃসম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। সম্পাদনা কক্ষে রয়েছেন দেখলাম সম্পাদক বশির ভাই, তাঁর সহকারী আতিক, তিতাস ইউনিটের বৈরাগী, সানাউল্লাহ, জলিল প্রমুখ। ঋত্বিকদা এডিটিং টেবিলের সামনে বসে— মুভিওয়ালাতে একটা রীলের শেষাংশ। একসময় ছবি চলা থামলো। ঋত্বিকদা হাই তুলে বললেন, "আজ এই পর্যন্ত থাক, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, সকাল আটটা থেকে এ যাবৎ কেবল এক

বোতল মদ খেয়েছি, এই খেয়ে আর কতক্ষণ?" দেখলাম টেবিলে একটা খালি মদের বোতল পড়ে আছে তলানীটুকু সহ। সময় তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। ঋত্বিকদা হাঁক দিলেন "খাবারের কি হলরে?" বৈরাগী বল্‌ল "দাদা এখনি এসে যাবে।" ঋত্বিকদা ক্ষেপে উঠলেন— "আরে রাখো, আমার কি এভাবে সময় কাটানোর দিন নাকি। ফুসফুসে ছ'ছটা পারফোরেশন নিয়ে ছবি সম্পাদনা করছি। আমার তো শালা এই শরীর নিয়ে স্যানিটরিয়ামে থাকার কথা।" তারপর বশির ভাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "বশির চল্ তোর বাসায় বৌমা যা রেঁধেছেন তাই চারটা খাব শেভও করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় আবার তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা আছে"— বলে নিজের রসিকতায় নিজেই মজা পেয়ে হেসে উঠলেন। তাহেরউদ্দিন ঠাকুর তখন তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী।

বশির ভাই'র বাসায় যাবার পথে ঋত্বিকদাকে বল্লাম "দাদা আমাদের পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকারের সময়টা কখন হবে"। ঋত্বিকদা মুখিয়েই ছিলেন, "কই টেপ রেকর্ডার এনেছ? হারামজাদা ,এভাবে ঋত্বিক ঘটকের সাক্ষাৎকার হয়না।" আমি বল্লাম, "দাদা কাল সকালেই সব নিয়ে আপনার হোটেলে আসছি।" ঋত্বিকদা বল্লেন, "তাই এসো।"

পরদিন। সকাল সাতটা। হোটেল গ্রীনে ঋত্বিকদার কাছে যেয়ে হাজির হলাম আমরা ক'জন চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী (কাওসার, প্রিন্স, শাহজাহান, মাহবুব ও আমি)। বলতে গেলে ঋত্বিকদাকে একরকম ঘুম থেকে টেনেই তোলা হল। উনি বললেন, "এত ভোরে এসে গেছ তোমরা। একটু অপেক্ষা কর, আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।" আমাদের সবার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। আমরা চা খেয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। টেপ রেকর্ডারের প্লাগটা বোর্ডের সকেটে লাগালাম। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ থেমে গেল। ঋত্বিকদা পাজামা পরে আদুল গায়ে বেরিয়ে এলেন। মাথা গলিয়ে ঢলঢলে হাতার গেঞ্জিটা গায়ে চাপিয়ে এক কাপ চা খেয়ে নিলেন। তারপর বিছানায় আসন গেড়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে বল্লেন, "এবার শুরু করা যাক। বল কি জানতে চাও তোমরা।" টেপ রেকর্ডারটা অন করা হলো। প্রশ্নোত্তর শুরু হোল।

শুরুর শুরুতেই মনে একটা দ্বিধা ছিল, ভয়ও। হয়তো ঋত্বিকদা সব প্রশ্নগুলো হেসেই উড়িয়ে দেবেন। কিংবা ধমক টমক দেবেন। কিন্তু কথোপকথন শুরু হতেই লক্ষ করলাম ঋত্বিকদা অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠলেন; তাঁর বলার ভঙ্গি, চলচ্চিত্র সম্পর্কে অসাধারণ বাগ্মিতা আমাকে মুগ্ধ করল। সে মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিলো আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছি তিনি শুধু এই উপমহাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারই নন, একজন শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিক্ষকও বটে।

সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহ নিয়ে আলোচনার পরও চলচ্চিত্র এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কিছু আলোচনা হোল। ঋত্বিকদা একসময় বললেন, "আশা করি তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে।" বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পর্ব

আপাতত এখানেই শেষ।" ঋত্বিকদা একটা বিড়ি ধরালেন। আমরা টেপরেকর্ডার গুটিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে এলাম। ঋতিকদাকে সেই প্রথম নমস্কার—শেষ সাক্ষাৎকারের আগে।

ফেরার পথে ঋত্বিকদার একটা কথাই কানে বাজছিল, "চলচ্চিত্রকে নূতন করে ভালবাসতে এসেছ তোমরা, এই ভালবাসার মর্যাদা রেখ।" সেই মর্যাদার জন্যেই আমরা চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীরা লড়ে যাচ্ছি।

সাক্ষাৎকার

মুহম্মদ খসরু : মারী সীটন তাঁব এক লেখায় বলেছিলেন আপনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'বিদ্রোহী শিশু'। তাঁর ধারণায় আপনার অতিরিক্ত মননশীলতা আপনার নিজের কিংবা আপনার চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি?

ঋত্বিক ঘটক : এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামতই নেই। কারণ বিদ্রোহী শিশুটা তো বাংলা করা হয়েছে। ওটা আসলে 'Infant terrible'। এর কোন বাংলা প্রতিশব্দই নেই। আর এটা লিখেছিল 'অযান্ত্রিকের' সময়। 'অযান্ত্রিক' হচ্ছে ১৯৫৭-'৫৮ সালের ছবি। আজকের চুয়াত্তরে তার উত্তর দেয়ার তো কোন মানে হয়না। আমার কোন কিছু বলার নেই। একজন সমালোচক আমার সম্বন্ধে কি বলেছে তা দিয়ে আমি কি করবো।

মু. খ. : শিল্পাঙ্গনের কতকগুলি মাধ্যম পেরিয়ে আপনি চলচ্চিত্রে এসেছেন। যেমন প্রথম জীবনে কবি ও গল্পকার, তারপর নাট্যকার-নাট্যপরিচালক ইত্যাদি এবং অবশেষে চলচ্চিত্রকার। শিল্পমাধ্যমের প্রতি অগাধ মমত্ববোধই সাধারণত: শিল্পীকে তাঁর ভাললাগা মাধ্যমের প্রতি টেনে আনে। আপনি 'চিত্রবীক্ষণে'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন "... যদি কাল চলচ্চিত্রের চেয়ে better medium বেরোয় তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। আমি সিনেমার প্রেমে পড়িনি। ... I don't love film ..."। এইসব কথায় মাধ্যমটির প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না কি?

ঋ.ঘ. : একেবারেই পায়না। মাধ্যমটা কোন প্রশ্নই না। আমার কাছে মাধ্যমের কোন মূল্য নেই। আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ সমস্ত মাধ্যম change করেছি, বদলেছি? কারণ বক্তব্যটা মানব দরদী। বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোন কাজেরই কথা না। ও সমস্ত যারা aesthets তারা করুন গিয়ে। Art for arts sake যারা করেন তারা করুন গিয়ে। All art expressions should be geared towards the betterment of man— for man. আমি গল্প লিখছিলাম, তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছে না। কটা লোক পড়ছে? নাটকে immediate hit—আরো বেশী লোককে convert করা যায়। I am out to convert. তারপর দেখলাম নাটকের থেকেও ভাল কাজ হচ্ছে সিনেমায়। অনেক বেশি লোককে

approach করা এবং convert করা যায় এতে। So cinema is important. cinema as such এমন কোন value নেই। I don't think it has any value এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালবাসেনা, নিজেকে ভালবাসে। এ জন্যই কাল যদি একটা better medium পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এখন পর্যন্ত আর medium কোথায় ? আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত জনতার কাছে পৌঁছতে পারে এমন medium হচ্ছে cinema. কালকে TV হতে পারে। এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে সিনেমাই সবচেয়ে বেশি লোককে at the same time reach করতে পারে। কাজেই আমার বক্তব্যের হাতিয়ার হিসাবে একেই বেছে নিয়েছি।

মু. খ : আপনাদের চলচ্চিত্রে আগমন— অর্থাৎ আপনি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার এরা সাধারণত ইতালীয় 'নিও রিয়ালিজম' দ্বারা অণুপ্রাণিত। যুদ্ধ পরবর্তী ইতালীতে চলচ্চিত্রে যে বিপুল শৈল্পিক উৎকর্ষতা ঘটেছিল তদ্বারা আমার মনে হয় কম বেশি সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের শেষভাগে এবং ষাটের দশকে ফরাসী দেশে যে 'নবতরঙ্গ' চলচ্চিত্র আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দোলনের ধারা কি আপনাকে আলোড়িত করেছিল ? ফরাসী 'নবতরঙ্গ' এবং নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতম চলচ্চিত্রকার জাঁ লুক গদার সম্পর্কে আপনি কিছু মন্তব্য করুন।

ঋ. ঘ : প্রথম কথা হচ্ছে যে মৃণাল বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন, সত্যজিৎ বাবু একদিক দিয়ে এসেছেন আর আমি আর এক দিক দিয়ে এসেছি। এটা কোন একটা আন্দোলন—সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে আসেনি। যেমন সত্যজিৎ বাবু ছবি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রেনোয়াঁ সাহেব যখন এলেন ছবি করতে তখন তাঁর সঙ্গে থেকে তিনি highly influenced হলেন। রেনোয়াঁই তাঁর গুরু। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন। নিওরিয়ালিজমটা তার পরে। আমি সম্পূর্ণরূপে আইজেনস্টাইনের বই পড়ে influenced হয়ে ছবিতে আসি। ১৯৫২-তে film festival- এ যে neo-realistic ছবিগুলো দেখান হয়েছিল সেগুলো আমাদের definitely খুব মোহিত করেছিল, কিন্তু কাকে influence করেছিল আমি ঠিক বলতে পারিনা। কেননা সত্যজিৎ বাবুর ছবিতে রেনোয়াঁ সাহেবের লিবিসিজ্‌ম এবং ফ্লাহার্টির লিরিসিজম—নেচার লাভ এই থেকে তাঁর আরম্ভ। আমার ছবি কারোই বোধহয় না। যদি থাকে আইজেনস্টাইনের আছে। কেননা neo-realistic ছবি আমার 'অযান্ত্রিক' একদমই না। 'নাগরিক'-ও না। 'অযান্ত্রিক' কমপ্লিটলি একটা fantastic realism, একটা car—একটা গাড়ি without any trick shot ওটাকে animate করা হয়েছে। She is the heroine, আর driver হচ্ছে হিরো। Whole গল্পটা একটা ড্রাইভার আর তার গাড়ি। আর কিছুই নেই। এটার সঙ্গে neo-realism এর সম্পর্ক কি ? ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে fantastic realism বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব powerful ছিল। এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের খুব ভাল লেগেছিল। unconsciously হয়তো খানিকটা। সেই সারা পৃথিবীর ছবি দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানী ছবি দেখেও হয়েছে।

মু. খ : না, আপনাদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির পরপরই ভারতে Subjective Realism-এর যুগ শুরু হয় বলে বলা হয়েছে। এ জন্যেই আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম।

ঋ. ঘ : হ্যা, এরকম অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত lebelling এর কোন মূল্য নেই। ওই levelগুলো lebelই। ওগুলো কোন কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে চলেছে। আর ঐ ফরাসি 'নিউ-ওয়েভ' আমি একেবারে পছন্দ করিনা। ওটা একটা stunt আমার মতে।

মু. খ : আমরা 'নিউ-ওয়েভে'র কিছু ছবি দেখেছি, যেমন ক্রফোর 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' কিংবা গদারের 'ব্রেথলেস'। এগুলো দেখে মনে হয়েছে যে এরা একটা আন্দোলনের ফসল।



ঋ. ঘ : 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ'। ওটা নিউওয়েভই না; তবে খুব ভাল ছবি। আর 'ব্রেথলেস' আমি দেখিনি, ওদের যেটা দারুণ 'নিউ ওয়েভ' রেনের 'লাস্ট ইয়ার এট মারিয়ানবাদ', ওটা একেবারে completely existentialist ছবি। 'নিউ ওয়েভ'টা কি? লেবেলিং এর ব্যাপারগুলো কাটো তোমরা পথের থেকে। তোমরা নতুন করে ছবি ভালবাসতে এস্ছো। এই লেবেলগুলো হচ্ছে অত্যন্ত false critic দের তৈরি। লেবেলিং

বলে কিছু নেই। একটা অবস্থা থেকে একটা পটভূমি থেকে এখন তোমাদের ঢাকায় নতুন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিল্পীরা পৃথিবীর ছবি দেখে তার থেকে infleunced হবে যেমন, তেমনি এদেশে ইতিহাসের যে পটভূমি, তাদের suffering sorrow-র যে পটভূমি— তা থাকতে বাধ্য। তার থেকে নাম লেবেল করার দরকারটা কি? এক একজন এক এক দিক থেকে করবে। I don't believe in names.

মু. খ : বেশ, আপনি গদারের ছবি সম্পর্কেই কিছু বলুন।

ঋ. ঘ : গদার কি new wave নাকি ? Godard is an utter communist film maker. এবং একেবারে bold. He believes in street—fight from the street— এই তো বক্তব্য তাঁর। সে 'নিউ ওয়েভ' মোটেই না। আর সেও বদলাচ্ছে তো। তাঁর best statement গুলো কি? ত্রুফোর সাথে গদারের কোথায় মিল? আঁলা রেনের সাথে গ্রিয়ের কোথায় মিল ?

মু. খ : ফর্ম-এর দিক থেকে কিছু মিল থাকতে পারে।

ঋ. ঘ : তা হলেতো সব ছবিতেই কিছু কিছু মিল যাওয়া যাবে। ফর্ম-টর্ম কিছু একটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে conten. —approach, তার থেকে expressionটা আসে। formটা শুধু expression এর জন্য। যেমন গদার completely একজন working communist. সে ভেবেছিল গল্পের কোন value নেই। এই ছিলো তার stand. এখন সে বলছে যে, না গল্পের দরকার আছে। এখন he has changed, লোকে অভিজ্ঞতা থেকে, নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী দেখে, তার ছবি দেখে অন্যের reaction দেখে আস্তে আস্তে বদলায়। যে আমি 'অযান্ত্রিক' করেছিলাম সে আমি কি আছি? সত্যজিৎ বাবুর 'সীমাবদ্ধে'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কি মিল? 'অশনি সংকেত' এর সাথে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটা শট-ফটে মিল থাকতে পারে, আর কি মিল ?

মু. খ : কোন এক লেখায় বার্গম্যানকে আপনি নকলনবীশ বলে উল্লেখ করেছেন।

ঋ. ঘ : জোচ্চোর বলেছি।

মু. খ : আপনি বলেছেন বার্গম্যান সব জিনিষকে খানিকটা ভাইকিংসদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন যাকে, আপনি চমক্ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আপনি 'তিতাস'-এর শুটিং চলাকালীন এক সময়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন বার্গম্যান হল শিল্পের জোচ্চোর। আপত্তি না থাকলে বার্গম্যান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটা একটু বিশদভাবে বলুন।

ঋ. ঘ : বার্গম্যান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। বার্গম্যানের দু'একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্যযুগ, আদি মধ্যযুগ, ক্রুসেডের পিরিয়ড এবং তারো আগের পিরিয়ড এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে। কেন হয়েছে ? তার কারণ হচ্ছে

যে সুইডেন হচ্ছে one of the last countries to be christianised. সুইডেনে বিশেষ করে whole Scandineviaতে Vikings philosophy যেমন সারাজ, হালহালা ইত্যাদি একটা খুব vigorous ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গে লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে Christianity কে। এখনও সেই conflictটাকে althrough refer back করে continuously। যেমন Virgin Spring, Virgin Springটা কি ? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা চার্চ স্থাপন করে তার পিছনে একটা মিথ্যা গপ্‌পো তৈরি না করলে তো লোক-কে আর টানা যায় না। সেই জন্যই গপ্‌পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে raped হয়েছিল but she was so innocent যে সেখানে একটা spring grow করলো, এবং সেখানে বিরাট করে Cathedral তৈরি শুরু হলো। এখন এর পেছনে একটা গুল তৈরি করতে না পারলে তো পুরুষদের জমবে না। সেই জন্য একটা গুল তৈরি করা— সে মেয়ে হেন তেন, আসলে কিছুই না। আসলে হচ্ছে যে একটা emotional surcharge না করে তো আর Pagan philosophyকে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে ঐ জায়গায় একটা পীর, ওখানে একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরুদেব এই সমস্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে—উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই এটা হয়েছে। এই যে গুল—এগুলো কি ? What is this 'Seventh seal'? Terrific. জোচ্চোর বলেছি এইজন্য— জোচ্চোর তো আর যাকে তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে বলবে, One of the supreme brain, one of the supreme technician যে জেনেশুনে বদমাইশি করছে। গাধাদের কাছ থেকে তো এটা আশা করা যায় না— যে জোচ্চোরি করতেই জানে না। If he does not know the truth, he cannot cheat. So knowing fully well he is cheating. Do you follow me ? সেই জন্যই তাকে জোচ্চোর বলেছি।

মু. খ : কিন্তু তাঁর কিছু কিছু ছবি যেমন ধরুন 'Soul' ব্যতিক্রমধর্মী মনে হয়।

ঋ. ঘ : Terrific ছবি। শুধু Soul কেন, 'The Face'ও terrific ছবি। শেষটায় আমার মনে হয় যেন ego থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা আজকের agony কে ধরার চেষ্টা আছে। 'Silence' ও তাই। তাই বলছি যে series of film যেমন 'Winter light', 'Wild strawberries'—christian philosophyর সেই ডাক্তার— সেই স্টিগমেটারের চিহ্ন, ক্রসের চিহ্ন, সিম্বল সমস্ত Biblical । এই জিনিষগুলি I don't like.

মু. খ : এটা তো social consciousness এর ব্যাপার।

ঋ. ঘ : এখানে social consciousness কোথায়? seventh century কি eighth century-র Sweden এর সাথে আজকের সুইডেন এর কোন সম্পর্ক আছে? social consciousness এর মানে কি ? একবার করলাম সেটা একটা কথা। তা করছে তো। পাসোলীনি করেনি ? 'Gospel According to St. Mathews' সম্পূর্ণ

biblical কিন্তু কি terrific ভাবে সেটা আজকের context এ টেনেছে। কাজানজাকিস, কাকোয়ানীস এরাও তো ক্রিশ্চিয়ান myth গুলো নিয়েই ছবি করেছেন এবং আজকের context এ টেনে। কিন্তু এ ব্যাটা শুধু পেছনের দিকে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করছে। এঁরা ঐতিহ্যটাকে টেনে আজকের দিনের সঙ্গে তার মানে তৈরি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এ ভদ্রলোক চেষ্টা করেছেন আমাদের পিছনমুখী করতে। একই জিনিষ— ওটা আমি কেন করব না। আমি করতে পারি— আমিও কি রামায়ন, মহাভারতের গল্প করতে পারিনা? করা মানে, আমি কি করবো ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ? মোটেই না। ওখান থেকে টেনে আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের দেশের কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকার আছে। এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে। আমি দেখাচ্ছি যে এই হচ্ছে ছবিটুকু।

মু. খ : সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের তো বক্তব্য থাকতে পারে।

ঋ. ঘ : আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার চাষী বসে আছে। আর তোমরা নেচে কুঁদে যাচ্ছ। সক্কলে নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্ছে এক বুড়োকে দিয়ে। বুড়োর কিছুই নেই। শেষও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বসেই আছে। সে কাশ্‌ছে। কি করবে ? আর দাদারা সব করে যাচ্ছে। বাকতাল্লা বাজিয়ে বড় বড় কথা, হ্যান ত্যান। সকলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে করে বসে আছে। কি করে মুক্তি আসবে ? কি করে সব কিছু হবে? সক্কলে জানে— সব ডাক্তার। সব গদীর জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। এই তো বক্তব্য আমার। আমি এটা as a common citizen of India, who has gone through all these things, এর point of view থেকে দেখেছি। No political issues. আমার universal গালাগালি। সেটা হলো এই জন্য যে ওরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি জানিনে solution, আমার কাছে কোন theory নেই।

মু. খ : এটা এক ধরনের exposition. কিন্তু আপনার নিজের একটা বক্তব্য থাকতে পারে তো ?

ঋ. ঘ : সুইডেন-এর definitely অধিকার আছে করার। crusades, প্রথম Christianity advent, Pagan philosophy এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পত্তিটাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো ? যেহেতু সে extremely powerful— one of the greatest film makers of the world. সে জন্যই ও কথা বলা হয়েছে। একটা হেজী, পেজী, Tom, Dick and Harry কে তো আর কেউ জোচ্চোর বলবে না। That fellow does not know, বুঝেছ ?

মু. খ : আপনার নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে ছবি 'যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো'-কে সরাসরি পলিটিক্যাল ছবি বলতে চেয়েছেন। পলিটিক্যাল ছবির যদিও কোন নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই তথাপি আপনিও কি মৃণাল সেনের মত কোন বিশেষ একটি মতবাদে কিংবা

রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হবেন, নাকি অন্য কিছু ?

ঋ. ঘ : না, ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭২ সালে পশ্চিম বাংলার যে রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাতে কোন মতবাদের ব্যাপার নেই। আমি সেটাকে দেখেছি from a point of view of not a politician. political কোন মতবাদকে যেমন Naxalite মতবাদ আমার please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধীকে please করার কথা না, CPM কে please করার দরকার নেই, CPI কেও please করার দরকার নেই— আমার থাকলেও ছবিতে আমি শ্লোগানে বিশ্বাস করি না। ওর থেকে যদি কিছু emerge করে, through situation, through conflict একটা কিছু যদি তোমাদের mind এ আসে তো এলো। কিন্তু আমি এইটেই solution বলতে পারি না।

মু. খ : অবশ্য এটা কোন ছবিতেই আপনি বলেন নি।

ঋ. ঘ : না, বলা যায় না। আমি তো মনে করি বলা উচিতও না। কিন্তু এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের 'পরে দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি।

মু খ : আপনাব প্রায় সব ছবিতেই একটা optimism লক্ষ করেছি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

ঋ. ঘ : ও সমস্ত অপটিমিজ্‌ম বুঝি না। মোদ্দা বাংলা হচ্ছে— এই হচ্ছে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। একে যদি তোমরা political বলো তো political, non politcal বলো তো non-political But no slogan, no party-বাজী, universal condemnation. আমার কিছু বক্তব্য নেই। I am not a political man, আমি politics করি না। কাজেই কোন party করি না। কিন্তু চারপাশে আমি reality দেখেছি তো।

মু. খ : আপনি কি কোন 'ইজমে' বিশ্বাস করেন ?

ঋ. ঘ : আমি কিসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য জায়গায়। As an artist আমি সেটাকে চাপাতে চাইনা। আমি mainly present করতে চাই যে এই ব্যাপারগুলো হয়েছে। এখন তুমি decide করো।

মু. খ : তার মানে আপনি কোন ideology impose করতে চান না।

ঋ. ঘ : Automatically থাকবেই ভিতরে, কিন্তু সেটা সোচ্চার নয়। তোমরা 'সুবর্ণরেখা' দেখনি ? এতে ideology নেই ? এতেও থাকবে।

মু. খ : হ্যাঁ দেখেছি। ভীষণ আশাবাদী ছবি।

ঋ. ঘ : আশাবাদ ছাড়াও ideology একটা definitely আছে। Analysis of the condition of the then West Bengal তার পরে একটা comment আছে তো? এখানেও একটা comment থাকবে। আব সেই comment টা দিয়ে আমি একটা slogan mongering বা ঐ সমস্তের মধ্যে নেই।

মু. খ : ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন যাদের টাকা দিচ্ছে আর যারা এফ, এফ, সি,র টাকা পাচ্ছেনা এ নিয়ে দুটো গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তাদের বক্তব্যও দু'রকম। এফ,এফ, সি,র পক্ষপাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকাররাই এফ, এফ সি-র অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন। নতুনরা যারা ভাল ছবি করতে চাইছে তাঁরা তাঁদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে দেন- দরবার করতে করতে উৎসাহ ধৈর্য্য দুটোই হারিয়ে ফেলছেন। এতে কি এফ, এফ, সির দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে না ? তা হলে আর ভালো ছবি সৃষ্টিতে এফ, এফ, সি-র ভূমিকাটা রইলো কোথায় ?

ঋ. ঘ : FFC এ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে, আমি ঠিক exactly এর পরিসংখ্যানটা বলতে পারবো না, তবে জন্ম থেকে গোটা ষাটেক ছবি finance করেছে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কি, আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমাত্র মৃণাল সেন এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি। আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে কেউ পায়নি। আর প্রতিষ্ঠিত সব নতুন নতুন ছেলে তাদের মধ্যে more than 75% যারা ছবি করতে গিয়েছিলো টাকা মেরে পালিয়েছে। Straight টাকা মেরে হাওয়া হয়েছে। যেমন একজনের নাম বলছি, অচলা সচদেব বলে একজন actress আছেন তাঁর স্বামী জ্ঞান সচদেব। আড়াই লাখ টাকা advance নিয়ে বসে আছে। ফেরত নেওয়ার কোন উপায় নেই। এইভাবে সয়লাভ করছে। আর তারা যে নতুন ছেলেদের টাকা দেয়নি তা না। আমারই student, gold medalist from Film Institute of Pune মনি কাউলের দু'দুটো ছবিকে finance করেছে এবং ওর দুটো ছবিরই যথেষ্ট নাম হয়েছে। He has established himself, not only that, এ বছর ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সেমিনার হয় সেখানে Jury হয়ে সে গিয়েছে। এতকিছু সম্মান সে পাচ্ছে। কুমার সাহানীকেও FFC একটা ছবি করতে দিয়েছে। সে ছবিটা এখনো release হয়নি। কে বলেছে, নতুন ছেলেদের দেয় না ? একজন দুজন এখানে ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে। এখনকার মধ্যে আমি যতদূর জানি পূর্ণেন্দু পত্রীকে ওরা দেয়নি। সে জন্যই এতসব ব্যাপার। কিন্তু He is not a new director. সে 'স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিলো। তারপর এখন 'স্ত্রীর পত্র' করেছে। কাজেই তাকে— You cannot say, he is a new one.

মু. খ : কিন্তু তাঁর অভিযোগটা খুব বড় করে দেখান হয়েছে।

ঋ. ঘ : সেটা আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ। Because he works in আনন্দবাজার। তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের কিস্‌সু যায় আসে না। আনন্দবাজার তো হচ্ছে একটা fascist organisation. Fascist ও নয়, CIA agent ।

মু. খ : এটা কি Off the record না কি ?

ঋ. ঘ : Off the record কেন, on the record. I shout from the house

tops, from the house tops to the streets. আজকে তোমাদের এখানে off the record করতে যাব কি জন্য ?

মু. খ : পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষক-হিসেবে ক'বছর ছিলেন ? সেখানে শিক্ষক থাকাকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

ঋ. ঘ : এটা কে বললো, আমি ছিলাম মানে ? পুনায় আমি visiting professor হিসাবে দু'বছর জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক দু'মাস পর পর যেতাম। দশদিন করে থাকতাম— চলে আসতাম। তারপর আমি vice principal হিসাবে মাত্র তিন মাস ছিলাম। পুনায় আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমি মনে করি আমার জীবনে যে কয়টা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাল্লার একদিকে দেয়া হয় আর মাস্টারিটা যদি আরেক দিকে দেয়া হয় তবে ওজনে এটা অনেক বেশি হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রী আজকে উঠছে। I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my won film making, আমি বলছি তো ওজনে ওটা অনেক বেশি।

মু. খ : পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আপনার ছাত্রদের মধ্যে কুমার সাহানী 'মায়া দর্পণ' এবং মনি কাউল 'উসকী রোটী' ছবির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনি দারুণ গর্বিত। পুনা থেকে পাশ করা কে. কে. মহাজনও আপনার ছাত্র যে এখন সবচাইতে প্রতিভাবান আলোকচিত্রী। আপনি শিক্ষক থাকাকালীন পশ্চিম বাংলার কোন ছাত্র ছাত্রী কি পুনায় ছিল না যাদের প্রতিভা উপরোক্ত শিল্পীদের সাথে তুলনা করা চলে ?

ঋ. ঘ : ছিলো। বেশ কয়জন ছিলো। ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি বসু ও সোমেন বলে দুটো ছেলে ছিল এবং এরা দু'জনেই সুযোগ সুবিধা পেলে মহাজনের থেকে খারাপ কাজ করবে না। ব্যাপার হচ্ছে ফিল্ম লাইনে ভাল কাজ জানলেই তো আর নাম করা যায় না। প্রতিযোগিতাও করা যায় না। মহাজন lucky যার ফলে সে একটা ভাল break পেয়ে গিয়েছে। এরা break এখনো পাচ্ছে না তাই ডকুমেন্টারী ফকুমেন্টারী করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের কাজ খুব ভাল।

মু. খ : দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙা বাংলার প্রতি আপনার যে মমত্ববোধ সেটা আপনার ছবির একটা বিশেষ দিক। অন্তত সে কারণেই আপনার বিষয়গত ভাবনা সমন্বিত ট্রিলজী 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আপনার মতে আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটার কারণেই আজকের এই অর্থনৈতিক সংকট। স্বাভাবিকভাবে তাই আপনার ছবিতে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলোকিত হয়। আপনি কি ভাবেন না ভাবেন সেটা বড় কথা নয়, আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে এই হয়েছে বলে এ রকম হচ্ছে. এই না হলে হয়তো অন্যরকম হতো ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আপনি সেরকম

একটা ছবি করলেন না কেন ? বিষয়বস্তুর দিক থেকে আপনি 'তিতাস' কে বেছে নিলেন কী কারণে? এ ছবিটা তো আরো পরে হতে পারতো। কেননা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পূর্বেকার চিন্তা ভাবনাগুলো আরও উন্নতভাবে প্রকাশ পেতে পারত।

ঋ. ঘ : যখন আমার তিতাস করার কথা আসে তখন এ দেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে। এবং most unsettled. এখন যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু তবু তখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কি চেহারা নেবে। সব শিল্পই দু'রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আরেকটা হচ্ছে উপন্যাস— যেটা lasting value। সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়— ভাবতে হয়। It takes two-three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest.তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগুজে তো নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি। কাজেই তখন ফট করে এসে— পঁচিশ বছর যেখানে আসিনি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে না বুঝতে নাড়ীর যোগ না করতে করতে দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাঠে, শহরে যাদের দেখিনা, জানিনা, চিনিনা— আমি পাকামো করতে যাব কোন দুঃখে? আমার কোন অধিকারই নেই। এই হচ্ছে এক। আর দু' নম্বর হচ্ছে তখন condition কেমন fast changing এটা, ওটা, সেটা, নানা রকম তার মধ্যে থেকে একটা pattern আস্তে আস্তে বেরোক। আমি ভাববার সুযোগ সুবিধা পাই। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক বারে বারে। আস্তে আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েস দিয়ে শিল্প হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কি 'রাঘবশাহী' খাব কি 'রস কদম্ব' খাব তা নয়। 'দে দাও মরণ চাঁদের' এ ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতরে থেকে যখন ইচ্ছে আসবে তখন করবো। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে তিতাস-টা ছিলো আমার পক্ষে আইডিয়াল। কারণ তিতাস ছিলো একটা subject যে subject মোটামুটি যে বাংলাটা নেই, তার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা। তার উপর তো পটভূমিটা। এর subject টা হচ্ছে এমন যা বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোরার সুযোগ দেয়— গ্রাম বাংলাকে বোঝার সুযোগ দেয়। গাঁয়ে গিয়ে shooting করাটা বড় কথা নয়। shooting করার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাথে মেশা, নাড়ীর স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই তিতাস-টা একটা অজুহাত এদিক থেকে। এবং ঐ অবস্থায় তিতাস ধরে করলে হয় কি—সেই মা কে ধরে পূজো করা হয়। তা এতগুলি কারণেই এই। তিতাস পরে হতে পারতনা। এখনো তিতাস আমার একটা study আর আমার একটা worship হিসাবে দেখা যেতে পারে। This river, this land, this people এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর সঙ্গে নিজেকে re-establish করা। আর শেষ কথা হচ্ছে ও সময়ে ওটা time ছিল না এবং time এখনো আসে

নি। এখনো serious study করে serious work যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সে রকম ছবি করার অবস্থা এখনো আমার আসে নি। মানে আমি এখনো এতটা বুঝে উঠতে পারি নি— কোন দিকে যাবে ইতিহাস। আমি যেদিন তাগিদ বোধ করবো, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে পেরেছো ?

মু. খ : আপনি তো বাংলাদেশে একটা ছবি করলেন। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলী এবং যান্ত্রিক আয়োজন নিঃসন্দেহে ভাল ছবি তৈরির পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়ত তিতাসের মত মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তবু কেন বাংলাদেশে ভাল ছবি হচ্ছে না? বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে যতটুক্ জেনেছেন তাতে কি মনে হচ্ছে আপনার? গলদটা কোথায় ?

ঋ. ঘ : আমার জানা নেই। কারণ এতো ভালো করে জানিও না। আর এ কথা আলোচনা আমার কি করা উচিত ?

মু. খ : আমাদের একটা suggestion হিসাবে যদি কিছু বলেন, আমরা যারা আছি তাদের প্রতি আপনার একটা উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি তো ইন্ডাস্ট্রিতেও কিছুদিন ছিলেন।

ঋ. ঘ : suggestion হচ্ছে, এখানে ছবি না হওয়ার কারণ হচ্ছে যে পঁচিশ বছর ধরে তোমাদের দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখা ছিল। কিস্সু দেখতে, শিখ্তে কিংবা পড়তে দেওয়া হয় নি। Some how this has happened. হঠাৎ দরজা খুলেছে। এখন এই সুযোগটা গ্রহণ করে তোমাদের উচিত, যে করে পাবো Film Society movement করার সাথে সাথে একটা পাঠাগার তৈরি করা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ Film সম্পর্কে বই, ম্যাগাজিন এবং ক্লাসিক বইগুলো জোগাড় ক'রে নিজেরা পড়াশুনা করো। আসলে জিনিষটা হচ্ছে যে Serious attitude টা develop করা উচিত। কিন্তু attitude develop করতে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে পড়াশোনা। কারণ আমাদের কারোই মুরোদ ছিল না Film করি বা বিদেশের ছবি দেখি। ঠিক এই অবস্থা ছিল কলকাতার, তা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০ এ শুরু হলো আমাদের world ক্লাসিক্স এবং অন্যান্য ভালো ছবি দেখা, যদিও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন (Calcutta Film Society) শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে। তার আগে আমরা কি করেছি? আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাইনের Film Form, Film Sense, পুদভকিনের Film Technique & Film Acting ক্রাকাওয়ের, এবং পল রথার বই জোগাড় করে, রজার ম্যানভিলের বই জোগাড় করে, পড়ে, বুঝবার চেষ্টা করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি। আমাদের এই চেষ্টাটা Film Industryর completely বাইরে ছিলো। আমরা সকলেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জড়িত ছিলাম। যেমন আমি Assistant Director ছিলাম, আমি গল্প লেখকও ছিলাম আবার এ্যাকটিংয়েও ছিলাম। কিন্তু সেটা ছিলো একটা দিক। কারণ ওখানে এসব কথা বললে হাসতো

আজকের মত। একই, কোন তফাৎ নেই। নিজেদের individual চেষ্টায় বা বন্ধু বান্ধবরা কয়েকজন মিলে এদিক ওদিক করতে করতে এক আধটা বই নিয়ে, পড়ে, আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করা। এই করতে করতে বছর খানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যে একটা আন্দোলন দানা বাঁধলো। তখন society তৈরি করার একটা অবস্থা তৈরি হলো। এই ভাল ছবির movement টা, সত্যিকারের সৎ ছবির movement টা এই commercial world এর বাইরে করতে হয়। পরে commercial world-এ তার effect পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আঘাতটা করবে কে? অপ্রস্তুত সেপাই কতগুলো— হাতে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার— তাতো আর করতে পারবে না, তাদের তো complete mental preparation থাকা উচিৎ। আর ভেতরে কি আছে সেটার দরকার নেই। সব পৃথিবীতেই সমান আর কী।

মু. খ : উভয় বাংলার মানুষদের নিয়ে তো আপনি যথেষ্ট ভাবেন। আপনার চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতেও তারই পক্ষপাতিত্ব। এখন এই যে দু'দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময় এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র সৃষ্টির কথা উঠছে, এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন।

ঋ. ঘ : করা উচিত। যত বেশি পারা যায় যৌথ প্রযোজনায় ছবি করা উচিত। আদান প্রদান হওয়া উচিত। যাওয়া আসা উচিত। মেশা উচিত। এটা তোমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণভাবে আশা করা যায় না যে এ সমস্ত ব্যাপারে সরকারি আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোন জায়গায় কোন Film Society কোন Film movement কোন Art movement কোনদিন burreaucrat দের দিয়ে হয়নি। এরা একটা চেহারা করে পাঠাবে, আবার তারা ওখান থেকে একটা চেহারা করে পাঠাবে। এ চলবেই, এগুলো inevitable। কতগুলো ব্যাপার, তোমাদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত। কিছু বই পড়া উচিত। কিছু মেশা উচিত। আবার ওখান থেকে ছেলেপেলে এখানে আসা উচিত। ঠিক same। তার একটা পথ হচ্ছে ঐ joint production. ওখান থেকে কিছু ছেলে কিছু কর্মী এলো, তোমরা কিছু জুটলে। ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য যদি মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাক ... নিজেদের মধ্যে জোর আনতে হবে, পরে সরকারকে convince করতে হবে। যেমন Indian Government এখন আর এই media-র গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। যার জন্য তার FFC তৈরি করতে হয়েছে, Film Institute তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার আগে কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই seriousness টা ঢোকাতে হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বললে কেউ দিত নাকি? 48-এ ভাবতে পারত নাকি কেউ যে সরকার টাকা দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে Film কে?

মু. খ : FFC আর Film Development Board-এর মধ্যে পার্থক কি?

ঋ. ঘ : কলকাতার West Bengal Film Development Board— সেটা

Provincial আর এটা হচ্ছে All India থেকে। Development Board টা সবে হয়েছে,ওটার কোন কাজ-টাজ নেই।

মু. খ : ভারতের ভাল বাংলা ছবি, শিল্প ছবি কিংবা চলচ্চিত্র আন্দোলনের কথা উঠলেই আবশ্যিকভাবে তিনটি একঘেঁয়ে নাম এসে যেত— সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন। কিন্তু আশার কথা সম্প্রতি এর সাথে আর একটি নাম যুক্ত হয়েছে পূর্ণেন্দু পত্রী। কিন্তু এদের বাইরেও কি প্রতিশ্রুতিশীল চলচ্চিত্রকার নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম অনুচ্চারিত কেন ?

ঋ. ঘ : এ তো বাংলা ছবির কথা হচ্ছে।

মু. খ : না আপনি All India Ba... -এ বলুন।

ঋ. ঘ : মনি কাউল, কুমার সাহানী এদের নাম তো এখন উঠছে। আর কলকাতায় এখন পর্যন্ত কাউকে দেখা যায় নি। কাজেই এদের কথা কি বলবো।

মু. খ : চলচ্চিত্র সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শিল্পীদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে না জানলেও বোধহয় স্বীয় মাধ্যমে করে খাওয়া যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রকারকে সকল প্রকার শিল্পকলা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আদৌ কোন উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন না বরং এ মাধ্যমটির প্রতি তাদের চরমতম অনীহা। চলচ্চিত্রের প্রতি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কি ?

ঋ. ঘ : ঐ বললাম তো, লোককে জোর করে তো আর কিছু করানো যায় না ? সাহিত্যিকদের অনীহার কারণ হচ্ছে সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখছেন তার ভিত্তিতে হবে অনেকটা। কাজেই তারা যখন দেখবেন কিছু ছেলেপেলে কিছু serious চেষ্টা করছে, পারুক আর না পারুক, সবাই যে successful হবে এমন তো নয়। কিন্তু attempts হচ্ছে। Some good boys, রুচিবান কিছু ছেলে পুলে কিছু করার চেষ্টা করছে। তখন automatically সাহিত্যিকরা বুঝবেন যে জিনিষটা serious. এখন বললে তাঁরা বলবেন যে এখানে যা হয় তাতে আমরা কি বলবো? ভালো একটা গল্প দেবো, কেউ নেবেনা। তাই তো এখন সত্যি সত্যি ঘটনা। আমরা করাবোটা কিভাবে? How to help and why to get interested? তাদের সবাইকে interested করতে গেলে এখান থেকে একটা force আসা উচিত। তাহলে automatically তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আসবে। আগ্রহ এলেই interested হবে। এবং তখন তারা সেই দিকে লেখার কথা ভাববেন। Filmic story কাকে বলে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। যাঁরা তোমাদের এখানে sincere লেখক আছেন তাঁরা এটা করবেন। কিন্তু এখন how do you expect serious people to be interested ?

মু. খ : যতদূর জানি এ যাবৎ আপনার কোন ছবি সরকারিভাবে কোন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত হয় নি। জর্জ শার্দুলের আমন্ত্রণের পর কি 'সুবর্ণরেখা'কে কোন

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল ? আপনার ছবি বিদেশে না পাঠানোর ব্যাপারে কারণটা কি— সরকারি আমলাদের কারসাজী, না কি রাজনৈতিক ?

ঋ. ঘ : আমি তো সমস্ত কিছু বলতেও পারবো না। তবে এটা ঠিকই যে সরকারিভাবে কখনো আমার কোন ছবি যায়নি। আর আসল কথা হচ্ছে যে 'সুবর্ণরেখা'র পিরিয়ড পর্যন্ত আমি ব্রাত্য ছিলাম— আমি অপাংক্তেয় ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক কারণে তো বটেই। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার ট্যাপার থাকে। এখন আমি জাতে উঠেছি। তখন তো আমি ছিলাম না এমন। কাজেই এখান থেকে ওখান থেকে নানা রকম খোঁচাখুঁচি— অমুক তমুক। যেমন 'সুবর্ণরেখা' তারা আটকাতে পারেনি। তখন India তে ভালো Subtitle হতো না। কোন ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে Subtitle না করে পাঠানো ঠিক নয়। You cannot expect তারা Venice কিংবা Cannes-এ বসে বাংলা বুঝবে।

মু. খ : শুনছি বাংলাদেশে সৃজিত আপনার ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারিভাবে, কিংবা অন্যকোন বাধা এসেছে কি? আর তিতাস যে বাণিজ্যিকভাবে ভারতে প্রদর্শিত হবার কথা ছিল তার কি হলো ?

ঋ. ঘ : এ সবগুলোই চেষ্টা চলছে। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে এরা বিভিন্ন festival এ যেখান থেকে দাওয়াত পেয়েছেন সে সব জায়গায় এরা পাঠাবার কথা ভাবছেন। সে নিয়ে আলোচনা চলছে। সে একই ব্যাপার কলকাতায় দেখানোর ব্যাপারেও। ওখানেও এটা আলোচ্য অবস্থায় আছে। এখনো final কিছু হয় নি।

মু খ : সত্যজিৎ রায় কোন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতবর্ষে এখন তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি—এবং আমি সত্যিই জানিনা যে তার অর্থ কি? কমিউনিস্ট পার্টির এই দ্বিধা বিভক্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

ঋ. ঘ : তিনটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমার আপত্তি—ওটা ফিল্মের কোন ব্যাপার নয়। ওটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে আমার বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসবে, আর রাজনীতি আলোচনা আমি করতে পারি। ৮/১০ ঘণ্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু why— লাভটা কি! ওটার সাথে ফিল্মের কি সম্পর্ক আছে? কমিউনিস্ট পার্টি-ফার্টির কথা তুলে লাভ কি আছে। আমি তো মনে করি না যে as a film maker আমার politics নিয়ে কথা বলা উচিত। As a social being I may have some feelings, some ideas. যা আছে ছবিতেই আছে, ওটা নিয়ে আমি কোন মতামত দিতে চাই না।

মু. খ : ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবেন বলে একবার ভেবেছিলেন তার কি হলো ?

ঋ. ঘ : ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবো বলে ভেবেছিলাম, তার স্ক্রিপ্ট হয়েছে এবং সে স্ক্রিপ্ট ছাপাও হয়েছে। সবই হয়েছে। কিন্তু ছবি হওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা না ? ছবি করা গেল না।

মু. খ : ওটা কি একেবারে বাদই দিয়েছেন, নাকি ছবি করার ইচ্ছে আছে আপনার।

ঋ. ঘ : এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায় ? এখন আর ছবি করার কোন মানেই হয় না।

মু. খ : 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র পর কি ছবি করবেন ? কোন পরিকল্পনা থাকলে কিছু বলুন।

ঋ. ঘ : এখনো আলোচনা চলছে, ভাবছি। এখনো কিছু final হয় নি। কথাবার্তা চলছে।

মু. খ : আপনার অধিকাংশ ছবির কিছু কিছু চরিত্র Archetypal symbol হয়ে প্রকাশ পায়। আপনি মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং এর কালেকটিভ আনকনসাসনেস দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাই আপনার ছবির চরিত্ররা যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, গৌরী, 'কোমল গান্ধার' এর অনসূয়া, শকুন্তলা, 'সুবর্ণরেখা'র সীতার মা, সীতা এবং তিতাসের রাজার ঝি, ভগবতী প্রত্নপ্রতিমার আদলে গঠিত। আপনার 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এবং আগামী ছবিতে কি এ ধরনের আর্কিটাইপাল ইমেজের প্রকাশ ঘটবে ?

ঋ. ঘ : আর্কিটাইপাল ইমেজ এমন একটা জিনিষ যেটা অঙ্ক কষে আসে না। আর দ্বিতীয়ত সে চিন্তা এখন যদি আমার থাকে তবে ওটা প্রভাবিত হবেই কোন না কোন চরিত্রে।

মু. খ : বাংলাদেশের কোন ছবি দেখেছেন কি? দেখে থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন।

ঋ. ঘ : বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছি আমি, 'জীবন থেকে নেয়া'। হ্যাঁ, 'ওরা এগারোজন'-ও দেখেছি। এই দুটো, দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কি বলবো। 'জীবন থেকে নেয়া' আমি কলকাতায় দেখেছি। ও সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি এখানে বসে করা, এর জন্য বুকের পাটা দরকার। ছবির contentএর দিক থেকে বলছি। Form বা Structural ব্যাপার এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। তখনকার যে অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এরকম Bold ভাবে কাজ করতে পারে, ভাবতে পারে, সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আর 'ওরা এগারোজন'—ঠিক আছে।

মু. খ : 'তিতাস' এখানকার দর্শক নেয়নি। এর কারণটা কি? আপনি নিজে এ ব্যাপারে কি মনে করেন।

ঋ. ঘ : আমি তখন প্রথমত মৃত্যু শয্যায়। কাজেই কে নিয়েছে কে নেয় নি তারপরে যে লেখা 'তিতাস' সম্পর্কে এখানে হয়েছে তা উড়ো উড়ো শুনেছি। আমি পড়িও নি কিছু। কারণ আমি বলতেই পারবো না। কারণ আমি এখানে ছিলামও না এবং কোন interest নেওয়ার মত অবস্থাও আমার ছিল না। আমি হাসপাতালে তখন পড়ে আছি।

আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ পাই টাই নাই। কাজেই এর সম্বন্ধে আমি বলি কি করে। কেন নেয়নি সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে। তোমরাতো এখানে উপস্থিত ছিলে। আমি তখন এখানে নেই। So how can I tell !

মু. খ : 'চিত্রবীক্ষণের' সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা 'তিতাস' করার সময় প্রথম প্রথম আপনাকে সুচক্ষে দেখে নি। পরে নাকি এই বিরূপ ভাবটা প্রীতির সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু 'তিতাস' মুক্তি পাবার পর এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলো আপনি পড়েছেন কি না জানি না, অনেকেই আপনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গালাগাল করেছে। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

ঋ. ঘ : এ বিষয়ে আমার বলার মত কোন ব্যাপার আছে? প্রথম যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন সত্যি সত্যি কিছু লেখা টেখা বেরিয়েছিল। সেগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা খুব ভালভাবে নেয় নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ করাকালীন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় টরিচয় যখন হলো আমি দেখলাম যে তাদের more or less আমার প্রতি বেশ ভালই attitude, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে কিছু করে থাকে— প্রথমত কে করেছে, কে করে নাই— বললামতো আমি কিছু জানি না। যদি করে থাকে তার উত্তর দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি। আর যদি ইচ্ছা করে না করে তার সত্যিই মনে হয়ে থাকে তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, কিন্তু এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসন্ধিমূলনভাবে কোন কিছু করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিৎ ? কি লাভ হবে দিয়ে ?

মু. খ : বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি করার কথা ভাবছেন কি না।

ঋ. ঘ : না এখনো পর্যন্ত ভাবার মতো সময় আসে নি।

মু. খ : ডাক পড়লে আসবেন কি ?

ঋ. ঘ : সে সব পরের কথা পরে হবে। এ সব conjectural কথা বার্তাগুলো আলোচনা করে লাভ কি ? কেউ যখন এখনো ডাকেনি তখন ডাক পড়লে আসবো কি না তা ভেবে কি হবে ? তা ছাড়া নিজের হাত এখন full। এই তিতাসের পুরোটা তৈরি করতে হবে তো, 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' শেষ করতে হবে। তা আমার হাত তো at least for a month or two full. তার পরে এ দুটো ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে Director-এর বিশেষ করে কলকাতায় ছবি রিলিজের জন্য তার দায়িত্ব বেশি, তাই সেই রিলিজের পেছনে দৌড়াও, তারপর রিলিজের সময় লোককে ইয়ে করো, কাজেই ঐ সব দিকে এখন concentrate করতে হবে, কাজেই immediately এখন বলে কি লাভ ?

মু. খ : ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রামাণ্য ছবি (যাকে আপনি প্রামাণ্য ছবি না বলে Character study বলতে চেয়েছেন) করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ? এ ধরনের বিষয়বস্তু আপনার চলচ্চিত্র মানসের সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক এবং চিন্তার দিক

থেকেও যা একান্তই ভিন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর উপর এই ছবি করতে যাওয়াটাকে অনেকে আপনার কম্প্রোমাইজিং এ্যাটিচ্যুড এবং স্ববিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করতে চাইছে। এ সম্পর্কে আপনি যদি স্পষ্ট করে কিছু বলতেন।

ঋ. ঘ : আমার স্পষ্ট করে কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে, ছবিটা আদ্দেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়— ছবি যখন বেরোবে তখন কেন করতে চেয়েছিলাম পরিষ্কার দিনের আলোর মত হয়ে যাবে। এবং স্ববিরোধিতা কিনা ওটাই প্রমাণ করবে। এবং compromise কিনা ওটাই প্রমাণ করবে। আর্টিস্ট এর কাছে এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কথা যে wait কর। See it and then condemn it.

মু.খ : কিছু কিছু লোক এ ধরনের মন্তব্য করেছে যে 'ঋত্বিক ঘটক তো এখন ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ছবি করছে।' এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি ?

ঋ. ঘ : এ সমস্ত কথার উত্তর দেবার কি আছে ? যে উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরই। অভিসন্ধিমূলক কথার উত্তর দেওয়াটা ঘৃণ্য। ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই যদি বোঝা যায় যে আমি অভিসন্ধিমূলক কাজ করছি— কি আমি compromise করছি, আমি স্ববিরোধিতা করছি, তখন আমাকে তুলে খিস্তি করো। তার আগে যেটা হয় নি, হবে কিনা তা জানা নাই, সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় না ?

মু. খ : পুনাতে যে দুটো শর্ট ফিল্ম হয়েছে যেমন 'রঁদেভোঁ' আর 'ফিয়ার' ওগুলো কি আপনিই করেছেন না ছেলেরা করেছে আপনার তত্ত্বাবধানে ?

ঋ. ঘ : 'রঁদেভোঁ' টা ছেলেরা করেছে আমার তত্ত্বাবধানে। For Direction students. আর 'ফিয়ার'টা, আমি করেছি for Acting course.

প্রতি ইঞ্চি ঋত্বিককে রক্ষা করতে হবে*

সুরমা ঘটক

০০ প্রথমে আপনার নিজের কথা কিছু বলুন। যেমন আপনার ছেলেবেলা, কৈশোর তারপর রাজনীতি-কর্মকাণ্ড, ঋত্বিকদার সাথে পরিচয়, বিয়ে ... ।

০ আমার জন্ম করিমগঞ্জে, দাদা মশাই'র বাড়িতে। আমার বাবা শিলং-এ কাজ করতেন। শিলং-এই বড় হয়েছি। পড়াশুনা করেছি। মামার দেশ ছিল সিলেটে। সিলেটে আমার মা মারা গেলেন ১৯৪১ সনে। তারপর দু'বছর আমি সিলেটে ছিলাম মামার বাড়িতে। তখন ওখানে থেকে সিলেট গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল থেকে আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি। সিলেট-শিলং খুব কাছাকাছি। সুতরাং আমরা প্রত্যেক ছুটিতে, যেমন পূজোর ছুটি, শীতের ছুটিতে সিলেটে দেশের বাড়ি যেতাম। পূজো- বাড়ি, বাড়ি- পুজো, কাশফুল, ধানের ক্ষেত, পুকুর, গ্রাম—এইসব স্মৃতি। এই কয় বছরের স্মৃতিই আর কি, তারপরে দেশভাগ। দেশভাগ মানে স্বাধীনতা যে বছর আসবে তখন থেকে আমার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ। সিলেটে যখন আমি ছিলাম তখন খুব সমৃদ্ধ জায়গা সিলেট এবং সেখানে কমিউনিস্ট পার্টিও তখন বেশ নামকরা ছিল। এবং আমার নিজের বড় মামীমা এবং ছোট মাসী তখন কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করতেন। তখনই আমি খালেদ চৌধুরী বা ওখানকার যে বড় বড় লিডার্স— তাঁদের নাম শুনেছি। কিন্তু আমি তো ছোট্ট ছিলাম, তাই রাজনীতির মধ্যে ছিলাম না। তারপরে আমি যখন বি. এ. পড়ি. তখন আস্তে আস্তে রাজনীতিতে আসছি। তখন হেমাঙ্গদা[১] ছিলেন শিলং-এ। উনি আমাদের নিয়ে ছিলেন। তখন গ্রামের দেশ থেকে চিঠি আসে যে ওখানে রেফারেন্ডাম হবে— গণভোট। সিলেটটা কোথায় যাবে ? এটা আসামে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে। এ নিয়ে গণভোট। তা আমি শিলং থেকে সিলেটে গিয়ে কাজে নামলাম। বিরাট সভা। বিশ্বনাথ মুখার্জী বক্তৃতা দিচ্ছেন, জনসমুদ্র এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং তখন যে গানটা হয়েছিল সেটা এখনও মনে আছে :

> ভাঙনের স্রোতে ভাঙিতে কি চাও সোনার সুরমা ভূমি
> স্বদেশ দরদী হিন্দু-মুসলমান জাগো জাগো আজ তুমি
> কাঁদিছে সুরমা ভূমি।

* ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী এবং সুলেখিকা সুরমা ঘটক ঢাকায় এলে ২৯শে মে, ১৯৮৮ তাঁর এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক তানভীর মোকাম্মেল। সহযোগিতা করেন ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী মাহমুদুল হোসেন এবং জাহিদ হাসান মাহমুদ।

১. প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

সুরমা নদীর দুই তীরে তীরে একসাথে মোরা রয়েছি তো ঘরে
হিন্দু-মুসলমান বাঁধ এক ডোরে একই পথে সহযোগী
স্বদেশ দরদী হিন্দু-মুসলমান জাগো জাগো আজ তুমি।

তারপর হাসন রাজা, বিপিন নাগ—এই সমস্ত নাম ছিল। কিন্তু আমি জানতাম না, অনেক পরে জেনেছি, ওটা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা গান। মনে আছে যে, হিন্দুরা আসছে ভোট দিতে একটু ছাড়া ছাড়া ভাবে। এই ক্ষেত-খামার করছি, যাচ্ছি। কিন্তু মুসলমানরা খুব একতাবদ্ধ হয়ে এসেছিল। ভোট হয় এবং তারপরে তো ভোটের ফল বেরুলো যে সিলেটের অধিকাংশই পাকিস্তানে চলে যাবে আর কিছু অংশ করিমগঞ্জ—এইসব আসামে থাকবে। আমার রাজনৈতিক চেতনার তখন উন্মেষকাল মাত্র। তারপরে আমি পার্টির মেম্বারশিপ পেয়েছি। আমরা দেখলাম কিভাবে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে স্বাধীনতা এলো এবং দেশভাগ হলো। এবং তার ফলে অনেক পরে ফোরটি এইট থেকে বোধ হয় কমিউনিস্ট পার্টি তখন শ্লোগান দিল যে— "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়..."। আমরা আন্দোলন আরম্ভ করলাম। তা ক্ষতিটা হলো দুই দেশের লোকের। নেতারা সিংহাসনে বসলেন।— ক্ষতিটা হলো দু'দেশের সাধারণ মানুষের।



সুরমা ঘটক (১৯৯৯)

০০ আপনারা পার্টিশনের পর কোথায় যান ?

০ আমি তো শিলং— এই, আসামে।

০০ আচ্ছা, তখন আপনার ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে ?

০ বি.এ. পাশ করেছি এবং তারপর আমি ক্রমশ পার্টির কাজে বেশি জড়িত হয়েছি। পরে পার্টির উর্ধ্বতন কমিটির মেম্বার হলাম। তারপর আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গেলাম। জেলে গেলাম। এবং এ সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কলকাতায় আসি। এবং এই যে ব্যাপারটা এই ফোরটি সেভেন- ফোরটি এইট থেকে আজ চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। চল্লিশ বছর পরে আবার আমি এই দেশে এসেছি। আমি তো এই দেশেরই মেয়ে। এটা আমার মাতৃভূমি কিন্তু এদেশ সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুব অল্প। আমি শুধু সিলেট শহর, আমার গ্রাম আর আমার মামার বাড়ি— এটুকুই শুধু জানি। কারণ সেভেনটি থ্রিতে আমার স্বামীকে যখন নিতে এসেছিলাম তখন শুধু দু'রাত ছিলাম। তা ঐ হাসপাতালেই থাকতাম। কিন্তু এই নদীমাতৃক বাংলাদেশ, এর সভ্যতা, সংস্কৃতি—শুনেছি কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ হয়নি। চল্লিশ বছর পর এদেশে এলাম। আসার পর ক্রমশ নদী দেখার সুযোগ হলো। কুমিল্লা গেলাম মেঘনা দেখলাম, কালকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলাম ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র দেখতে পেলাম। দুই তারিখ থেকে (২রা জুন) আমি একটু ঘুরতে যাচ্ছি কয়েকটি জায়গা— শাহজাদপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা, কুষ্টিয়া, শিলাইদহ। যদি ঠিকমতো ঘুরে আসতে পারি, তবে মনে হয় আবো দেখার সুযোগ হবে।

দ্বিতীয় কথা হলো যে, আমার এসে খুবই ভালো লাগছে। কারণ দু'দেশের মানুষ একই রকম। 'তিতাস' ছবিটা যখন উনি করেছিলেন তখন আমি বীরভূমে সাঁইথিয়ায় চাকরী করতাম। আমার তিনটা ছেলেমেয়ে সুতরাং আমি আসতে পারিনি। ওরাও সেরকম আমন্ত্রণ জানায়নি। এবং 'তিতাস'-এর সম্পর্কেও আমি ডিটেলস কিছু জানি না। যতটুকু জানি তা তাঁর মুখ থেকে শুনেছি আর কি। এইখানে এসেছি দু'টো কারণে— এক হলো দেশ দেখা. ঘোরা। কিন্তু আসলে হলো 'তিতাস'-এর সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করা। আর সেই সাথে এখানে বাংলা একাডেমী, চলচ্চিত্র সংসদ ইত্যাদি— যে সব আছে ... সবার সঙ্গে দেখা করা, সবার সঙ্গে প্রীতি এবং ভালবাসার বিনিময় করা এবং আমাদের দু'দেশের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আরো স্থাপিত হয়, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি এফ.ডি.সি. তে গিয়েছি। ওখানে বই দিয়েছি। আপনাদের ঋত্বিকদার একটা বড়ো ছবি দিয়েছি। জাকির সাথে দেখা হয়েছে। সালাহউদ্দিন জাকি। তাঁকে অনেকগুলো পোস্টার দিয়েছি। আর আর্কাইভ-এ দিয়েছি বই। আজ বাংলা একাডেমীতে গিয়েছিলাম। আর এমনিতে যাঁরা আর্টিস্ট রয়েছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিছু ইন্টারভিউ কিংবা তথ্য জানবার চেষ্টা করেছি। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কালকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে দেখা হলো ওখানকার নাট্য সংস্থার সম্পাদকের সঙ্গে। সম্পাদক মনজুরুল আলম। আর প্রাণতোষ চৌধুরী।

উনি হলেন স্টীল ফটোগ্রাফার ও কর্মকর্তা, জেলা শিল্পকলা একাডেমী। এবং উনি বললেন যে ওঁর কাছে অনেক পুরোনো 'অমৃত'-এ ঋত্বিক ঘটকের একটা গল্প আছে। তো আমি বললাম, আমরা যা কালেকশন করেছি তার মধ্যে 'অমৃত'-এর গল্প আছে বলে আমার মনে পড়ছে না। উনি আরো বললেন যে, আরো দু'একটা লেখা-টেখা আছে। এবং এগুলো সব জেরক্স করে পাঠিয়ে দেবেন। এদিক থেকে খুব সাহায্য হয়েছে। আর যেটা ঐ ভদ্রলোক বললেন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একটু দূরে গোকর্ণ ঘাট ওখানেই ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের বাড়ি। ওখানেই তাঁর জীবন, ওখানেই উনি কষ্ট করে পড়েছেন।তাঁর জীবন উপন্যাসের অনন্তের সঙ্গে মিলে যায়। আরেকটা কথা বললেন এই যে তিতাসের সঙ্গে ওদের শিল্প-সংস্কৃতি সবকিছুই জড়িত। তিতাসটা যদি শুকিয়ে যায়, তবে ওখানকার সবকিছু শুকিয়ে যাবে। এবং এটা বলেছেন, "তিতাস নদীকে আমরা টোটেম এর মতো মনে করি"। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-এর সবকিছুই এর সঙ্গে জড়িত। এবং এটা খুব উল্লেখযোগ্য জায়গাও। উৎপল দত্তের বাড়ি এখানে ছিল, তারপর আলাউদ্দিন খাঁ, বাহাদুর খাঁ, তারপর উল্লাসকর দত্ত—তখকনকার দিনের বিপ্লবী, আরো অনেকের নাম বললেন। এবং শচীন দেব বর্মণও এখানে পঁচিশ বছর কাটিয়ে তাঁর অনেক গানের সুর দিয়েছিলেন। আর উনি বললেন, "যখন ঋত্বিকদা এসেছিলেন তখন আমরা খবর পেয়ে যাই। একটা টিলার উপর উনি পাজামা-পাঞ্জাবি-চটি পরে বসেছিলেন। বিড়ি খাচ্ছিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখান থেকে যাত্রাবাড়ির টেক যাওয়া যাবে কিনা।" যাত্রাবাড়ির টেক উপন্যাসে আছে। ওখানে অনন্ত স্বপ্ন দেখেছিল তিতাস শুকিয়ে যাচ্ছে এবং স্রোতটা উল্টো দিকে যাচ্ছে। উনি এখানে এসেছিলেন নদীর অবস্থানটা বোঝার জন্যে এবং সমস্ত জিনিসটাকে এখানে আত্মস্থ করার জন্যে। তো সেদিক থেকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম। আরেকটা ব্যাপার হলো আমি ঋত্বিকের উপর যে দ্বিতীয় পর্ব লিখছি তাতে আমি যা জানি তাইতো লিখছি— তো সেদিক থেকে আমার খুব সাহায্য হয়েছে, আমি অনেকটা এখানে এসে জানতে পেরেছি। বুঝতে পারছি।

০০ আপনি কলকাতায় গেলেন কখন ? শিলং থেকে কোন বছর ?

০ ফোরটি ওয়ানে, মা মারা গেলেন তো। মামার বাড়ি ছিলাম। সব সময় বাবার জন্যে মনটা খারাপ লাগতো। ভাবতাম যে বাবাকে কে দেখবে। আমরা এক ভাই এক বোন। ভাই রইলো। আমি চলে এলাম। তারপর থেকে বাবাকেও দেখেছি। পড়াশুনা করেছি। প্রচুর আত্মীয় স্বজন আমাদের বাড়িতে। কেউ পড়তো, কেউ চাকরি করতেন। জ্যেঠামশাই, জ্যেঠি মা, ভাই, বোন ভর্তি হয়ে থাকতো বাড়িটা। এদের সাথে থেকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। আর তখন পার্টির কাজও করেছি। অল্প দিনের মধ্যে পার্টির উর্ধ্বতন কমিটির মেম্বার হয়েছি, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কাজ করেছি। কিন্তু এসব করে আমার এম এ. পড়া আর হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস হলো এই যে অভিজ্ঞতাটা লাভ করলাম— যারা Scums of the Society—চোর, খুনী, পাগলী এবং

প্রস্টিটিউটস-মেয়ে তাদের আমি জানবার সুযোগ পেলাম। আমরা তখন ছিলাম জেল ফ্রন্টে। সেই জন্যে প্রত্যেকটা ব্যাপারই আমরা স্টাডি করতাম। কেন চুরি করেছে, কেন খুন করেছে, কেন পাগলী হয়েছে, কেন পতিতাবৃত্তি নিয়েছে... এবং আমরা যে দিবস পালন করতাম, ওরা আমাদের কাছে আসতো, আমাদের সাথে দিবস পালন করতো। এবং আমরা যখন হাঙ্গার স্ট্রাইক করতাম তখন ওরা ওদের দাবি নিয়ে এবং আমাদের সমর্থনে আমাদের সাথে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতো। হয়তো একদিন, দু'দিন কিন্তু করতো। আমরা সাতদিন, চৌদ্দদিন, একুশ দিন পর্যন্ত করেছি। দশমাস আমরা এইভাবে ছিলাম। তারপর আসামের যতো মেয়ে রাজনৈতিক বন্দী তাদের নিয়ে আসে শিলং জেলে। রিলিজ হতে হতে আমাদের নিয়ে গেলো সুপ্রিম কোর্টে। আমি এবং আরেকটি মেয়ে— ওর বয়স সব থেকে কম। আমাদের নিয়ে গেলো ফিরিয়ে।

আমাদের সাবভারসিভ এক্টিভিটিজ গ্রাউণ্ড আছে। আমাদের উকিল ছিলেন শ্রী সাধন গুপ্ত। ওদের ছিলেন ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ। ফিরে আসার পর বসে বসে আমি লিখেছি। তিনটে খাতায় কভারে পর্যন্ত লিখেছিলাম। অনেক পরে ঋত্বিককে দেখিয়েছিলাম। দেখানোর পর উনি খুবই প্রশংসা করেন। তবে বলেছিলেন, রাজনৈতিক কচ্‌কচিটা আরেকটু কমিয়ে দিও। দিয়ে, রিপোর্টাজ ভঙ্গিতে এভাবে লেখো। আমি তোমাকে প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেবো। আমি ভাবতাম যে আমি কি লিখবো। সব সময় মনের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল লেখা কেমন হবে ...।

তারপরই উনি তো হাসপাতালে— সেভেনটি সিক্স-এ উনি মারা গেলেন। আর সেভেনটি সেভেন এ- ঋত্বিকের উপর লেখার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ আসে। তা আমি বলেছিলাম যে আমার পক্ষে সম্ভব না। জ্ঞানী গুণীরা লিখবেন। তারপরে, যাক, বিশেষ অনুরোধে আমি লিখতে আরম্ভ করি। লিখতে আরম্ভ করার পরে আমি এইভাবে ব্যাপারটা নিয়েছি উনি যেটা বলেছেন, উনি যেটা করেছেন. ...যার জন্যে আমি তাঁর সমস্ত সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র সমস্ত কিছুর কোটেশন দিয়েছি, এই জন্যে কারণ ওখানে তাঁর মনের প্রকাশটা থাকছে এবং আমি হয়তো নিজে লিখে সেটা ভালো করে বোঝাতে পারবো না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। তার আগে একটা কথা বলে নি, আপনারা ছোট বেলার কথা জানতে চেয়েছেন তো, তা আমার ছোটবেলা হলো— আমার মা ছিলেন খুব তেজস্বিনী। মায়ের ষোল বছর বয়সে আমার জন্ম, আঠার বছরে ভাইয়ের জন্ম। এবং আমার সামনেই মা ম্যাট্রিক পাশ করলেন। মা মহিলা সমিতি করতেন, অনেক কিছু করতেন। এবং মা যখন অকস্মাৎ মারা গেলেন তখন মা'র নামে একটা সমিতি হয়েছিল। আর বাবা অফিসের কাজ ছাড়া শিলং এর সাহিত্য পরিষদে ত্রিশ বছর সম্পাদক ছিলেন,তাছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটি, বিভিন্ন স্কুল কলেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—সব কিছুর সঙ্গে বাবা যুক্ত ছিলেন।

আই.পি.টি.এ., প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদ

বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় যে বিরাট আন্দোলন সে সময়ে গড়ে উঠেছিল যার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম— সে ব্যাপারগুলো আরো কিছুদিন ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছিল আর কি। এই সময় আমি ঋত্বিক ঘটকের নাম শুনেছি, বক্তৃতাও শুনেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রাধা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে উনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেটা শুনেছি। তারপরে বোম্বেতে যে কনফারেন্সটা হয়, আই. পি. টি.এ.-এর সেখানে প্রধান প্রস্তাবটা নেয়া হয়, নদীমাতৃক বাংলাদেশ এবং তার সংস্কৃতি— এ সমস্ত বয়ান টয়ান ঋত্বিক ঘটকের। পার্টির মেম্বার হিসেবে ছিলেন। আর ওখানে এক নাটকে বিয়ের সিনে আমি অভিনয় করেছিলাম। উনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর আমি শিলং চলে গেলাম এবং এসে দেখলাম যে উনি গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ' নাটকটি অনুবাদ করেছেন। ওরা আমাকে পার্ট দিয়েছিলেন। তারপর তো শোনা গেল পার্টির থেকে উনি এক্সপেলড্ হয়ে যাবেন, কমিশন বসেছে ইত্যাদি।

০০ কি ধরনের অভিযোগ পার্টি তাঁর বিরুদ্ধে এনেছিল ?

০ আমি ঠিক তা বলতে পারবো না। তখন 'নাগরিক' মুক্তি লাভ করলো না। ঐ সময়তো আমার তার সাথে পরিচয়। মনের মধ্যে একটা হতাশা। তারপরে গল্প শুনতাম যে 'বেদিনী' ছবিটি করেছিলেন। সেটা সুবর্ণরেখা নদীর ধারে, বোলপুরে, বিরাট বিরাট আর্টিস্ট নিয়ে করেছিলেন। সেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রভাদেবী, উৎপল ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, কেতকী গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত ছবিটা ব্লাঙ্ক হয়ে যায়। প্রথমে 'বেদিনী' এরকম হয়ে গেলো, তারপর 'নাগরিক', তারপর আমার সঙ্গে পরিচয়। আমি বোম্বেতে ওঁর করা নাটকটি দেখেছিলাম। সেটি বোম্বে কনফারেন্সে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। অন্য নাটকও দেখেছি। আর সব থেকে বড় কথা এবং তাৎপর্যপূর্ণ কথা হচ্ছে যখন এ সমস্ত কিছু চলছে তখন উনি আমার সামনে বসে কালচারাল রেভোল্যুশনের ওপর একটা থিসিস লিখলেন। সংস্কৃতির জন্যে সবকিছু, সংস্কৃতি সব— প্লেখানভ, লেনিন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাকে যখন বলা হলো তুমি ওর সঙ্গে বেশি মিশো টিশো না, তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার কিন্তু প্রথমে তেমন অনুরাগও ছিল না; কিন্তু আস্তে আস্তে আমি ওঁর কাছাকাছি চলে আসি। এবং আমার যা বুঝবার আমি বুঝে নিয়েছিলাম। সেটা হলো ওঁর ফিলসফিক ডেপ্থ এবং ব্রেন। সুতরাং আস্তে আস্তে চলে আসি। উনি তারপর 'সাঁকো' নাটকটি লেখেন। এরপর 'বিহার' এর উপর ডক্যুমেন্টারিটা করতে গেলেন। এগুলো করে তারপর আমরা শিলং গেলাম। বাবা বিয়ে দিলেন।

০০ কবে হলো বিয়েটা ?

০ ফিফটি-ফাইভে। আর আমার শাশুড়ি আমাকে খুব ভালবাসতেন। তবে উনি আট মাস পরে মারা গেলেন। বিয়েও ঠিক হয়েছে, টেলিগ্রামও এসেছে। ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউর পরে ওঁর চাকরি হয়ে যায়। সামান্য মায়না দিত। স্ক্রীপ্ট-রাইটার। উনি তিনমাস পরেই

চাকরি ছেড়ে দেন। আমার স্বভাব হলো যেটা ধরতে হবে. দৃঢ়ভাবে ধরবো। আমি যেমন কমিউনিস্ট পার্টিকে দৃঢ়ভাবে ধরেছিলাম, ঋত্বিক ঘটককেও তেমনি আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। সুখে-দুঃখে দিন কেটে গেছে। তারপর যখন 'সুবর্ণরেখা' মুক্তিলাভ করলো না, আলাউদ্দিন খাঁর উপর ডক্যুমেন্টারি শেষ করার পরও প্রোডিউসার বললেন যে ওটা আর উনি করাবেন না, তারপর 'আরণ্যক'এর জন্যে চেষ্টা করেছিলেন সেটা হলো না। গ্যারান্টারের অভাবে...। মাঝখানে আমার ছেলের জন্ম। মাঝখানে আমি এম.এ. পড়তাম—এম. এ. পরীক্ষা চারটে পেপার দেয়ার পর ড্রপ করেছি। 'কোমলগান্ধার' বইটা ফ্লপ করলো। তারপর আমিও শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ি, আর উনিও দুর্বল হয়ে পড়েন। তারপর উনি যখন পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে তখন আমি শিলং-এ ছিলাম। আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এবং জ্যেঠামশায় সুস্থ করলেন। ফিরে এলাম। ফিরে আসার পর সিক্সটি ফাইভ থেকে সেভেনটি ফাইভ পর্যন্ত উনি তো অসুস্থ ছিলেন। এবং কাজের তালিকা সেটা তো অন্য—কিন্তু যেটা আমার 'ঋত্বিক' বইতে আমি লিখেছি যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এইভাবে উনি সৃষ্টি করে গেছেন। এটাই হলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। এই যে এতো অসুস্থতা, কোনো ছবি রিলিজ হয়নি, কোনো ছবি অর্ধ-সমাপ্ত, কোনো ছবির টাকা পাননি— এইতো ইতিহাস। এর মধ্যে কিন্তু উনি প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু সৃষ্টি করেছেন। একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অনেক বারই উনি আমাকে মৃত্যুর কথা বলতেন। কিন্তু প্রতিবারই হাসপাতালে দিলে উনি সুস্থ হয়ে যেতেন। প্রায় মন থেকে আমার ভয়টা চলে গেছে। ফেব্রুয়ারি '৭৬-এ তাঁর মৃত্যু। মৃত্যুটা আমার কাছে খুব আকস্মিক। সে মুহূর্তে দেখলাম যে ছেলেমেয়ে খুব ছোট, আমাকেই সবকিছু করতে হবে। তখন আমি সবকিছুই করেছি। এর পরেই আমার বিরুদ্ধে ইনজাংকশন, তারপর হাইকোর্ট। সলিসিটর, ব্যারিস্টাররা আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন এবং আমার একটা চাকরিও হয়েছিল। তারপরে আমার বিরুদ্ধে অবজেকশন আসে। সেটা কিন্তু অপ্রত্যাশিত। তখন আমার হাতে কিছু নেই। কিন্তু আমি খুব দৃঢ়ভাবে ব্যারিস্টারের কাছে গিয়েছি। পিটিশন হয়েছে এবং তারপরই ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হয়েছে। সেটা একটা ভীষণ লড়াই। তারপর হলো ইনটেনসিভ সার্চ। কারণ আমি তো সবই রক্ষা করতাম। এটা আমার হবি। এরপরেও দেখলাম যে ওঁর গল্প কিছুই নেই! তারপর সব গল্প—চৌদ্দটা গল্প খুঁজে পেলাম। এরপরও এই বইটা[২] বেরুবার পরেও আরও দু'তিনটা গল্প পেয়েছি। ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টে আছেন, আমাদের খুবই সৌভাগ্য, সত্যজিৎ রায়, উনি অসুস্থতা সত্ত্বেও সবসময় খুব মূল্যবান উপদেশ দেন। আর বাগেশ্বর ঝাঁ, উনিও বৃদ্ধ এবং অসুস্থ, উনিও উপদেশ দেন। এবং ঋতবান[৩] তাঁদের কাছে থেকে কাজ শিখেছে। ঋতবান সবসময় ওঁদের কাছ থেকে জেনে আসে কিভাবে কি করতে হবে, এভাবে

২. 'ঋত্বিক ঘটকের গল্প'—ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত ঋত্বিকের গল্প সংকলন।
৩. ঋতবান ঘটক— ঋত্বিক ঘটকের পুত্র।

আমাদের কাজ এগুচ্ছে। আমার ছেলে হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করেছে। এখন ফিল্ম নিয়েই কাজ করছে। বাবার লাইনে থাকবে এটাই ইচ্ছা। কোমল গান্ধারের মাত্র দশটা রীলের নেগেটিভ, চৌদ্দটা নেই। আমি যে ফিল্মগুলো উদ্ধার করেছিলাম, ক্যান থেকে, ১১৮ টা ক্যান থেকে উদ্ধার করে তিনটে প্রিন্ট করেছিলাম। তার থেকে নিয়ে আর যা যা পেয়েছে আমার ছেলে তা দিয়ে ও প্রায় চৌদ্দটা রীলের নেগেটিভ তৈরি করেছে। তারপর এই যে গল্পের বইটা দেখলেন এর জন্য সমস্ত আর্টিস্টদের ছবি কালেক্ট করা, অন্যসব করা—এ সবই ও করেছে। তারপর ইংরেজি বইয়ের ব্যাপারেও প্রচুর খেটেছে। এখন আমরা বাংলা প্রবন্ধের বই করবো। এবং অনেক অজানা লোকও আমাদের সাহায্য করেছেন। একটি লোক আমাদেরকে একটি নাটক পাঠিয়েছে। আর প্রবন্ধ আমরা প্রচুর পেয়েছি।

০০ ঋত্বিকদা' যে যে নাটকগুলো লিখেছিলেন, নাটকগুলো কি আছে ?

০ আছে। কিছু আছে। খুব একটা সংখ্যায় বেশি না। দু'চারটে আছে। অনুবাদ।

০০ আচ্ছা, এগুলো প্রকাশ করার উদ্যোগ কি ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট নিয়েছে ?

০ সব। সমস্ত । আমি আর আমার ছেলে। এবং ওঁরা উপদেশ দিচ্ছেন।

০০ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি, তো ঋত্বিকদার এই দিকগুলো, একজন গল্প লেখক হিসেবে, মানে গল্প, নাটক লেখক— এইগুলো একটু কম জানি। তাঁর লেখার ধারাটা কি ধরনের ছিল, উনি কিভাবে লিখতেন ?

০ গল্প তো বললাম যে আমার কাছে কিছুই ছিল না। আপনারা গল্প সংকলনটা পড়লে বুঝতে পারবেন। ফোরটি সেভেনের দিকে লেখা এইটি সেভেনে প্রকাশ পেয়েছে। চল্লিশ বছর পর। তখন তার কী-ই বা বয়স ছিল ? বুঝতে পারছেন ? তো সেই বয়সেই তো তাঁর বেশির ভাগ গল্প লেখা। কী রকম, মানে কি বলবো? অত্যন্ত বলিষ্ঠ আর আগেও উনি 'অমিয় ধারা' সম্পাদনা করতেন, তাবপরে নাটক করতেন।

০০ আচ্ছা, ঋত্বিকদা'র এই যে ফিল্মগুলো, যেমন 'কত অজানারে', বা 'বগলার বঙ্গদর্শন ...'

০ 'বগলার বঙ্গদর্শন'— যতটুকু হয়েছে ততটুকু প্রোডিউসার অনুমতি দিয়েছেন— আমরা দেখিয়েছি। আমরা প্রিন্ট করে দর্শককে দেখিয়েছি। 'কত অজানারে' আমরা পারমিশন পেয়েছি। কিন্তু আমাদের এখনও সে সঙ্গতি নেই যে ওটা রিটাচ্ করে, প্রিন্ট করে দেখাবো। যখনই পারবো, আমরা দেখাবো। আর 'রামকিঙ্কর'ও ১৬ মি. মি. থেকে আমি ৩৫ মি. মি.-এ ব্লো আপ করে রাফ এডিটিং করিয়েছি। ওটাকে শেষ করবো। ওটা কালারে।

০০ ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো সাহায্য পান নি ?

০ না, আমরা এমনিতে কোন সাহায্য পাইনি। তবে এই বইয়ের ব্যাপারে বোধহয় কিছু করবেন কিংবা করছেন, সামান্য। সবই আমরা নিজেরা করছি। আমরা একবারই টিভিতে দেখিয়েছিলাম। ঐ 'মেঘে ঢাকা তারা'। 'কোমলগান্ধার'-এর জন্যে চেষ্টা করছি। কিন্তু ওটা হয়নি এখনও। হলে হয়তো আমরা সাহায্য পাবো কিছুটা।

০০ এখন ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ছাড়া ঋত্বিকের স্মৃতি রক্ষার জন্যে সরকারিভাবে কোন উদ্যোগ আছে ? কিংবা কোন চেষ্টা ?

০ না, একমাত্র 'নন্দন'-এ, যে নন্দন হয়েছে শুনেছেন তো, ওর যে লাইব্রেরিটা সেটা ঋত্বিক ঘটকের নামে।

০০ আচ্ছা, 'নাগরিক' যে মুক্তি পেল, '৭৭-এর দিকে এটা কেমন করে সম্ভব হলো ...।

০ এটা হলো বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে আমাদের এডিটর রমেশ যোশী এবং ব্রহ্মা সিং—ওরা পজিটিভ ফিল্ম পায়, তখনই মিস্টার নারায়ণকে জানানো হয় এবং উনি জানালেন, 'আমরা এভ্‌রি ইঞ্চ অব ঋত্বিক ঘটক প্রিজারভ করবো।' তখন এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে সেভেনটি সেভেন-এ সেপ্টেম্বরে একটা হলে প্রথম ছবি 'নাগরিক' এবং আরেকটা হলে শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' মুক্তি লাভ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, এগুলো ছিল ফিক্সড্ বুকিং। জনগণ দেখতে চাইছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরে ছবিগুলি নামিয়ে ফেলতেই হলো। 'নাগরিক' যদি সত্যি তখন চলতো, এটা ইতিহাস হয়ে থাকতো, কিন্তু খবরের কাগজে সেরকম দেয়া হয়নি। এবং তারপর কি হলো— 'নাগরিক' সে-ই পড়ে রইল ক্যানে আর 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'ও পড়ে রইল। ডিস্ট্রিবিউটর যে সে হয়তো অনেককে দেখিয়ে টাকা করেছে, কিন্তু আমিতো কোন টাকা পেলাম না। করপোরেশন আমার বিরুদ্ধে আরবিট্রেশন করলো, আর আমার পার্টনার আগেই টাকা নিয়ে চলে গেছেন। এন.এফ.ডি.সি.-র সঙ্গে নেগোসিয়েশন করে অর্ধেক টাকা দিয়ে ছবিটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাইট পায়। এবং আমি কিছু পাইনি। এইভাবে 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিটা চলে যায়। সুতরাং আমার রাইট হলো 'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'কোমল গান্ধার' ঋত্বিক আমাকে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর 'নাগরিক' ছবিটার, তিনজন প্রোডিউসার। কিন্তু প্রধান যে টাকা দিয়েছিলেন বিভূতি নন্দী তিনি আমাকে ছবিটা লিখে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এটা ট্রাস্টের সম্পত্তি। উনি এটার টাকা চাননি।

০০ ট্রাস্টটা গঠিত হলো কবে ?

০ এইটি টুতে। সেটা ছিল 'নাগরিক' এর ত্রিশ বছর। সে উপলক্ষে—নাগরিকের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সেমিনার করি এবং একটা স্যুভেনির প্রকাশ করি।

০০ আচ্ছা, ঋত্বিক ঘটক যে শর্টফিল্মগুলো বানিয়েছিলেন— 'আমার লেনিন'— এগুলোর মালিক কে ? এগুলো কোথায় আছে ?

০ 'পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য' গভর্নমেন্টের আর 'আমার লেনিন' হলো প্রোডিউসারের, ওটা

সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি এখনও।

০০ এই বামপন্থী সরকারের আমলেই সেন্সর পাচ্ছে না ?

০ সেটা আমি জানি না।

০০ এই সেন্সর না পাওয়া কি কোনো রাজনৈতিক ...।

০ আমি কিছু বলতে পারবো না। ওটা সেন্সর সার্টিফিকেট পায়নি, কিন্তু মস্কোতে *দেখানো হয়েছিল, কারণ প্রোডিউসার নাকি কে একজন ওখানে গিয়েছিল।* প্রোডিউসারের হাতে এখন ছবিটা। 'ইয়ে কিঁউ' আমাদের কাছে আছে। এটা অবশ্য বিক্রি হয়নি। আর 'রামকিঙ্কর' তো আমরা শেষ করবো। আর দুটো—যেটা 'ওঁরাও' বলা হয়, তার নেগেটিভ আমার ছেলে পেয়েছে, পেয়ে আমরা প্রিন্ট করেছি— একটার নাম হলো 'আদিবাসী কা জীবনস্রোত' আরেকটা হলো 'বিহার কা দর্শনীয় স্থান'—এ দুটো প্রিন্ট করে আমরা দেখিয়েছি।

০০ আচ্ছা ইন্দিরা গান্ধীর উপর ঋত্বিক ঘটক একটা ছবি করেছিলেন ...।

০ হ্যাঁ, ওটা আমি বোম্বেতে দেখে এসেছি।

০০ আমাদের আগ্রহের বিষয় ছিল যে ওটার মধ্যে শেখ মুজিবের ওপর হয়তো কিছু ফুটেজ ছিল ...।

০ হ্যাঁ, আছে। দু'জনের অনেক ছবি আছে। উনি নিজে ডায়াসের ওপর উঠে— নিজেই অনেক ছবি নিয়েছেন। সেটা আমি প্রযোজক রামদাসের কাছে জানবার চেষ্টা করছি। কি ব্যাপার ? মানে কেন শেষ হলো না, কি ব্যাপার। সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি।

০০ উনি কি 'নকশী কাঁথার মাঠ' এর উপর একটা চিত্রনাট্য করেছিলেন ?

০ স্ক্রিপ্ট করেননি, ভেবেছিলেন।

০০ তারপর কোন কাজ হয়নি, না ?

০ না।

০০ আচ্ছা বেশ আগে 'তিতাসের' একটি প্রিন্ট গিয়েছিল পশ্চিম বাংলায়, তারপর কি হয়েছিল সেটা কিছু বলেন। আমরা এদিককার ব্যাপারে কিছুটা জানি।

০ ওটা হলো যে, আমি যখন সেভেনটি থ্রিতে ঋত্বিককে নিতে এলাম, হাসপাতালে তো। তখন তাঁর নির্দেশ নিয়ে ছবি এডিট করে, রেকর্ডিং করে রিলিজ করা হয়। তারপর উনি সেভেনটি ফাইভে আসেন। ইট ইজ ভেরি ইমপরটেন্ট। এবং নিজে এসে এডিট করেন ছবিটা। এবং সেই ছবি উনি নিয়ে যান। এবং আমরা সেভেনটি ফাইভ থেকে সেভেনটি এইট পর্যন্ত মাঝে মাঝে এই ছবিটা দেখেছি, প্রিন্টটা দেখেছি।

০০ ওটা তখন রিলিজ করা যায়নি ? কোনো হলে ...।

০ না না, ওটা তখন তো কারুরই না। উনি এসে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন। উনি

তো আর রিলিজ করতে পারেন না। তখন একটা চেষ্টা হয়েছিল. ওটা ইণ্ডিয়াতে এবং বিদেশে পাঠানো হোক। কিন্তু বাধা আসে। কিভাবে আসে সেটা আমি আমার বইতে লিখবো।

খুব দুঃখের বিষয়, যার জন্যে উনি জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলেন না যে 'তিতাস' ইন্ডিয়াতে গেল না বাইরে গেলো। চেষ্টা করেছিলেন। দুই নম্বর হলো, তারপর থেকে প্রিন্টটার কি হলো আমরা আর জানি না। আমরা জানি যে হাই কমিশনের থ্রুতে চলে গেছে। তারপরে শুনলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওটা কিনবে। কিনতে লাগলো দু'বছর। তারপর আমি নিজে দেখেছি আমার বাড়ির পিছনের অভিনয়মঞ্চে। ওখানে কোনো টাইটেল নেই। মানে কে গল্প লেখক, কে পরিচালক, কে অভিনেতা, কে অভিনেত্রী. কে টেকনিশয়ান, কিচ্ছু নেই— ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে। এবং ফুল লেংথ্ অব পিকচার নেই। তারপরে আমার ছেলে এদেশে এসেছিল এবং সে প্রোডিউসারের সঙ্গে অনেক কথা বলে একটা প্রিন্ট নিয়ে গেছ্ল। আমি টিভিতে দেখাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বললো যে, না তোমরা টিভিতে দেখাতে পারবে না। আর তারপরে ওরা ছবি নিয়ে চলে গেলো। মানে প্রডিউসার গিয়ে আবার ছবি নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, আমরা আমাদের তরফ থেকে খুবই চেয়েছি যে, আমরা সাহায্য করতে রাজি আছি কিংবা দুই পক্ষ মিলে যদি কিছু করা যায়। যাহোক এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনেছেন, বাংলাদেশের ছবি, আমাদের ডিরেক্টলি তো কিছু কবার নেই। তবে সুযোগ পেলে আমরা সাহায্য করতে চেষ্টা করতাম আর কি, যাতে ছবি সুষ্ঠুভাবে, মানে সম্পূর্ণ ছবিটা হয় আর কি। এবং আমার ছেলে খানিকটা দেখিয়েও দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেকনিশিয়ান এসেছিল। ফুল লেংথ্ অব পিকচার নেই। আর এখন গবর্ণমেন্ট কি করবেন তা আমি বলতে পারবো না। তবে একটা কথা যে, আমি এতো বছর পরে এসেছি, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলাম, সেই জায়গাটা দেখলাম, 'তিতাসের' সবার সঙ্গে দেখা করেছি। একটা নস্টালজিয়া নিয়ে তো উনি এখানে এসেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা, নদীমাতৃক দেশ, এবং এই উপন্যাসের গল্প, বুঝতে পারছেন? এবং উনি আজকে নেই সত্যি কথা। কিন্তু উনি তাঁর জীবন দিয়ে ছবিটা শেষ করেছেন। হ্যাঁ, — সুতরাং আমার মনে হয়, এটা প্রত্যেকেরই দাবি থাকা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গে ও ইণ্ডিয়ায় এবং সমস্ত জায়গায় ছবিটি দেখানো হবে। এটা প্রত্যেকেরই দাবি থাকা উচিত।

০০ আসলে আমাদের এখানে চলচ্চিত্র সংসদগত ভাবে, আমাদের নিজেদের আন্দোলনেরই একটা দাবি 'তিতাস'কে দেখানো ...।

০ কিংবা যদি বিদেশে পাঠানো যায় ...।

০০ আমরা সব সময় পত্র-পত্রিকা, লেখা. সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে ঋত্বিকদার কথা বলার চেষ্টা করি। তবে বুঝতেই পারেন অসুবিধা, সমস্যাটা কোথায়। অসুবিধা ওখানে যা, এখানেও তা-ই। আচ্ছা, ঋত্বিক ঘটক, শিল্পী হিসেবে আমরা তাঁর সম্পর্কে কমবেশি

জানি। তো মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন ? ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ?

০ সে হলো, ওরা তো নয়জন ভাই-বোন। ওদের সবার মধ্যে একটা ভালবাসা ছিল। এবং এভাবেই উনি বড় হয়েছেন। দাদা, দিদি, মা-বাবা, এবং যখন কলেজে পড়তেন তখন ছুটি হলে দেশের বাড়িতে যেতেন, সেখানে পূজো হতো, সেখানে শরৎকাল, পূজো, তারপর দুষ্টুমী, ভীষণ দুষ্টুমী, নানারকম গল্প শুনেছি। তাঁর কাছ থেকেও শুনেছি। তাঁর সঙ্গে যারা দেশে যেতেন, তাদের কাছ থেকেও। সবাইকে ভালোবাসতেন। ভাগ্নে-ভাগ্নী-অমুক-তমুক সবাইকে ভালোবাসতেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লেখা, পত্রিকা সম্পাদনা করা, নাটক করা, অভিনয় করা—বাঁশি বাজাতেন, খুব সুন্দর বাঁশি বাজাতেন। তারপর উনি যখন এখানে এলেন, কোলকাতায় এসে নাটক, অভিনয়— এই সমস্ত, তারপর আস্তে আস্তে ফিল্মে। অনেক বড় বড় অভিনেত্রীর সঙ্গে তো উনি কাজ করেছেন। প্রভা দেবী থেকে আরম্ভ করে কেতকী দত্ত, মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সোম, তারপর শোভা সেন ইত্যাদি। আর আমিও তো ওখান থেকে এসেছি। আমার জীবনের অনেক কিছু আছে, যে সব কিছুই এখন বলবো না। ঋত্বিকের ব্যাপারও আছে। একে তো বললাম যে মা নেই, তারপর পারিবারিক এমন অবস্থা, তারপর বাবা, তারপর কমিউনিস্ট পার্টি— অনেক কিছুই হলো এবং অনেক কিছুই, অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি যখন এসেছি তখন পরিচয় হলো আর কি, যখন এই পরিচয় হয়, তখন তো আমি আর বিরাট অভিনেত্রী না,— কিন্তু একটা স্নেহ, ভীষণ একটা স্নেহ! প্রেমটা হলো একটা স্নেহ আর আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম যে উনি সবকিছুই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছেন—সেদিক থেকে উনি, মানে, খুবই বুঝে আমাকে বিয়ে করেছিলেন। এবং আমাদের মধ্যে যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা হয়েছিল সেটা খুবই গভীর এবং আমি খুব নির্ভয় ছিলাম। লোকটি তখন খুব রোগা ছিল, ভীষণ রোগা, 'নাগরিক' প্রডিউস হয়নি, আর্থিক তো কোনো ব্যাপারই নেই— এই অবস্থা, কিন্তু কোনো রকম ভয় পাইনি। হ্যাঁ,— যে আমরা কিছু করে যেতে পারবো— এরকম একটা ভাব ছিল। তখন তো বিহারের উপর ডক্যুমেন্টারিটা করেছেন এবং আরও একটা ছবি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায় বিয়ে হয়েছে। আর ঐ যে বললাম বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটা হয়ে যায়, খুব সামান্য চাকরি। তারপর উনি চাকরি ছেড়ে দিলেন, 'মধুমতি' লিখলেন। 'মুসাফির' লিখলেন। আরেকটি ছবি— গল্প উনি লিখে ছিলেন 'দোজ ফরগোটেন ওয়ার্ডস'।

০০ কি নিয়ে ছিল বিষয়টা ?

০ ওটা একটা বিদেশি গল্পের অবলম্বনে। এবং তারপরে 'অযান্ত্রিক'। এবং 'অযান্ত্রিক' থেকে আরম্ভ করে 'সুবর্ণরেখা' পর্যন্ত আমাদের জীবনটা একটা ছন্দে চলেছে। এবং এই সময় আমি সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম, মানে শুটিং-এ বাইরে যেতাম। তারপরে মিউজিক ডিরেকশান দিচ্ছেন, এডিটিং-এ তো আর ওর সঙ্গে থাকার প্রশ্ন নেই। সবসময় একই সঙ্গে থাকতাম। সুতরাং এরকমই আমাদের জীবন কাটবে—এটাই জানতাম; কখনো

টাকা হয়তো কম কখনো হয়তো একটু বেশি আসবে, কখনো আসবে না। এরকমই চলেছিল আর কি। কিন্তু 'সুবর্ণরেখা' রিলিজ হলো না। সিক্সটি টুতে শেষ হলো— সিক্সটি থ্রি, সেই বছরেই আলাউদ্দিন খাঁর ডক্যুমেন্টারিটা শেষ করেছিলেন। তারপরে প্রোডিউসার জানালেন যে, ওঁর সাথে টেম্পারমেন্টে মিলবে না, ওঁকে দিয়ে আর কাজ করাবেন না। ড্রিঙ্কটাও একটু বাড়ছিল আর এই করতে করতে একটা অ্যাভাল্যান্স! এসময় আমার ছেলের জন্ম। এবং আমিও অনেকটা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তারপরে তো পুনা। পুনা, 'বগলার বঙ্গদর্শন', তারপরে সিক্সটি ফাইভে ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল, তারপর চাকরি ছেড়ে এলেন, আমি তখন শিলং-এ। এই শিলং-এই পড়ছি, শিলং থেকে এলাম। হাসপাতালে তাকে ভর্তি করলাম। তারপরে তো অনেকবার হাসপাতালে দিয়েছি। তবে প্রতিবারই সুস্থ হয়ে যেতেন। এবং শেষবার যখন হাসপাতালে তখন তো ওখানে বসেই নাটক লিখছেন, নাটক করছেন। 'কুমার সম্ভব', হাসপাতালে বসে লেখা। 'সেই মেয়ে' নাটক ওখানে লিখে, ওখানে বসে অভিনয় করেছেন, পরিচালনা করেছেন। সুতরাং ঐ দিকটাই মানুষটার দেখেছি, আমিতো এই বলেই বিয়ে করেছি। বুঝতে পারছেন! আর এইটা জানা কথা-ই সাংসারিক জীবনে, এই রকম একটা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে সব সময় সংসার রক্ষা, তিনটে ছেলে মেয়ে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, খুবই ভয়াবহ ব্যাপার ছিল। কি করে যে আমার দিন গেছে। পরে মনে হতো যে মৃত্যুঞ্জয়ী। কিন্তু কথা হলো যে চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্যে তাঁকে সুস্থ করবার চেষ্টা করেছি। আর অন্যদিকে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। আমার এম. এ.টাতো ইনকমপ্লিট। আমি পোস্ট গ্রাজুয়েটে ভর্তি হই। ভর্তি হয়ে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে পাশ করি। পাশের পরে আমার নিজের চেষ্টায় আমি এই চাকরি খুঁজে পাই। যখন কোলকাতায় চাকরি পেলাম না। তখনই আমি সাঁইথিয়ায় পারমানেন্ট চাকরিটা পেয়ে যাই।

০০ এটা কলেজ না স্কুল ?

০ স্কুল, কলেজে আর কি করে পড়াবো— যেহেতু এম.এ. ডিগ্রি নেই। সুতরাং আমি মাইনেটা খুব কম পাই। আমার সারভিস পিরিয়ডও খুব কম। কারণ আমি তো একদম শেষে গেছি। বুঝতে পারছেন ? কিন্তু আমি অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট। আর ছবিতে আমাদের কোনো নেই— মাত্র তো এই দু'টো ছবি। 'নাগরিক' অবশ্য আমরা পেয়েছি, তো 'নাগরিক' দিয়ে তো আর ব্যবসা হয় না, এবং সেটা আমরা করবোও না। ভূপতি নন্দী ত্রিশ না পঁচিশ হাজার টাকা বাড়ি মরটগেজ দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনভাই মিলে সে টাকা শোধ করেছেন। সুতরাং ওটা একটা জাতীয় সম্পত্তি হিসেবেই আমরা রাখবো। এটা যে পেয়েছি এটাই আমার ভাগ্য। সুতরাং দু'টো ছবিতে আমাদের রাইট। সেটা বিশেষ চিন্তা আমরা করি না। একটা অভিযোগ ছিল যে এভাবে জীবন শেষ করার কি মানে হয়। কারণ এরাও তো সৃষ্টি— এই সংসার এবং ছেলেমেয়ে। তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার বাবা আমার জন্যে করেছেন কিংবা আরো অনেকে করেছেন। কিন্তু

কথা হচ্ছে যে ওঁর মৃত্যুটা খুব আকস্মিক আমার কাছে। কিন্তু মৃত্যুর পরে যখন এতো কিছু— তখন একটা প্রশ্ন থাকতে পারে— এতো দায়িত্ব আমার, আমি কি করবো? আমি চেষ্টা করেছি, করছি, এখনও করে যাচ্ছি। এই প্রথম চল্লিশ বছর পর আমি বেরোলাম। আমার সময়ই হয়নি জীবনে। আমার তিনটে ছেলেমেয়ে বাবাকে খুব ভালোবাসতো। সেইজন্যে আমি আপ্রাণ দেখবার চেষ্টা করেছি, ওদের পড়ার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়। কিন্তু আমার কোনো বাসস্থান ছিল না। আমার সাড়ে দশ বছর কলকাতা শহরে কোনো বাসস্থান ছিল না। এখন অবশ্য একটা হয়েছে আর কি। সুতরাং আমি সবকিছু নিজের চেষ্টায় ... আমার বাড়ি, আমি নিজে চাকরি করেছি, আমার স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। সমস্ত কেস্ আমি করেছি এবং শেষের যে কেস্‌টা, আরবিটেশন, সেটাও আমি ফেস করেছি। এটাই সান্ত্বনা যে, এতদিন পরে আমি বেরিয়েছি, নিজের দেশটাকে একটু চোখে দেখবো এবং 'তিতাস'-এর ব্যাপারেও সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে, একটা প্রীতি এবং সম্প্রীতির আদান প্রদান হবে। এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে খুব ভালো সহযোগিতা পাচ্ছি এবং লিখতে আরম্ভ করছি। আমার শিলং জেলের ডায়েরিটা আমি কমপ্লিট করেছিলাম। ওটা হেমাঙ্গদা দেখেও দিয়েছিলেন। ওটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার লেখার জন্যে না, এই চরিত্রগুলো জনগণের সামনে আসুক। এই চোর, খুনী, পাগলী, প্রস্টিটিউট্‌স ... আমরা কি স্বপ্ন দেখেছিলাম ? আমরা দেখেছিলাম নতুন সমাজ হবে। এই সমাজে এদের জীবনের অবসান হবে। একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সেটাতো হয়নি। এখনও সেই চোর, খুনী, পাগলী, প্রস্টিটিউট চলছে। সুতরাং স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে এই বইটা বেরুনো গুরুত্বপূর্ণ। আর স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেই আমি আবার এই দেশে এসেছি। দেখছি, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, একটা কষ্ট হচ্ছে— দেশটা আমাদের সবার ছিল। তবে কথা হচ্ছে যে বাস্তবকে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু মানুষতো আমরা দু'দেশের আছি। আমরা একই ভাষায় কথা বলছি, একই ভাষায় কাজ করছি, একই সংস্কৃতি আমাদের। সুতরাং যতবেশি আমরা এই ভাষাকে এই সংস্কৃতিকে এক হয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ততই আমার মনে হয় যে আমাদের সম্পর্ক আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হবে এবং দুই দেশই আরও বেশি এগিয়ে যাবে। উনি যে কালচারাল থিসিসটা লিখেছিলেন, সেটা আমি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছি— কোথাও পাইনি। পাওয়া যাবে কিনা জানিনা। কিন্তু ওঁর মতো আমিও মনে করি সংস্কৃতির জন্যেই সকল কিছু। ঋত্বিক মোমোরিয়াল ট্রাস্ট সবকিছু রক্ষা করছে। টু প্রিজারভ এন্ড টু প্রোমোট—এটাই হলো উদ্দেশ্য। সে নিয়ে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করি আমরা তাঁর সবকিছু রক্ষা করে যেতে পারবো, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম সবকিছু পায়। দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা এই যে এসেছি, বেড়ানো এবং 'তিতাস' ছাড়া আমাদের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সম্প্রীতিমূলক একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটাও একটা উদ্দেশ্য। যতখানি পারি করে যাবো। আমার ছেলেরও সেটা ইচ্ছা। ও বলেছে, 'মা, তুমি সবার কাছে যাবে, সবার সঙ্গে দেখা করবে"।

০০ আচ্ছা ঋত্বিক দা ভিয়েতনামের ওপর একটা ছবির চিত্রনাট্য করেছিলেন— ছবিটা কি হয়েছিলো ?

০ আমি এই তথ্যটা পেয়েছিলাম 'চিত্রবীক্ষণ' ঋত্বিক সংখ্যায়— সেটা আমি আমার ঐ বইতে দিয়েছিলাম। তবে চিত্রনাট্যটা তো খুবই সুন্দর— এবং হলে খুব ভালো হতো।

০০ ঋত্বিকের জীবনে দেশভাগের ট্রাজেডি তো সারাজীবন তাঁকে তাড়না করে ফিরেছে, ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে আপনি কী রকম দেখেছেন ব্যাপারগুলো ?

০ ব্যাপারটা হলো, উনি সবাইকে খুব ভালোবাসতেন। কাউকে বোন, কাউকে ভাই বলতেন। এই যে, যেমন বেবী ইসলামের স্ত্রীর কাছে যান, একমাস ওখানে পড়েছিলেন। 'তোকে মাছ রান্না করে খাওয়াতে হবে, আমি তোর এখানে থাকবো...'। একমাস ওখানে ছিলেন। ওর ছোট বাচ্চাটাকে এতো ভালোবাসতেন যে 'ওকে আমি কি দিয়ে যাবো—' বলতেন। 'তিতাস' শেষ হয়েছে ওর ছেলেকে দিয়ে। বাঁশিটা বাজাচ্ছে। এই যে ভালোবাসাটা বুঝতে পারছেন, এতো ভালোবাসতেন, স্ত্রী-পুত্রকেও উনি খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে একটা স্বামী যা করেন, সেটা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। টাকা যা উপার্জন করতেন, হাতে তাই এনে দিতেন। যখন কম থাকতো, কম দিতেন, যখন বেশি থাকতো, বেশি। কষ্ট ঠিকই হতো। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে, তাঁর যে ডিপার্টমেন্ট সেখানে আমি কখনো হস্তক্ষেপ করিনি। আমি সঙ্গে থাকতাম, দেখতাম। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক জেনেছি অনেক বুঝেছি, এভাবে জীবনে শিক্ষালাভ করেছি আর কি বলতে পারেন। তবে অসুবিধাটা নিশ্চয়ই হয়েছে, তবে সেটাতো আমাকে সহ্য করতেই হবে। আর পরে বুঝেছি যে, এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপরে প্রথমেশ বড়ুয়া, তারপরে আপনার মাইকেল মধুসূদন—এঁদের মতোই উনি মারা গেছেন। এঁদের আটকে রাখার কোনো উপায় নেই। এঁরা একই ধরনের সৃষ্টি। এটা অনেক পরে বুঝতে পেরেছি। সুতরাং যা সহ্য করেছি সেটা আমি এখন আস্তে আস্তে ভুলে গেছি। কারণ আফটার অল উনি আমাকে সম্মানটা দিয়ে গেছেন।

০০ সাঁইথিয়া আপনারা কবে ছেড়ে এলেন ?

০ বহু বছর হয়ে গেছে, দশ বছর।

০০ আপনার ছেলে মেয়ে ...।

০ আমার দুই মেয়ে এক ছেলে। ছোট মেয়ে ফাইন আর্টস পাশ করেছে। শান্তি নিকেতন থেকে। ও পার্ট টাইম করে বাচ্চাদের শেখায়। ললিতকলা একাডেমীতে আছে ; ওখানে ওর নিজের কাজ করে। দিল্লিতে একটা ছবি বেশ ভালো দামে গত বছর বিক্রি হয়েছে। এ বছর মাদ্রাজে একটা বিক্রি করেছে, একজিবিশনে। ও এখন আবার কাজ আরম্ভ করেছে, নিজের কাজ আরম্ভ করেছে। ছেলে এ সমস্ত কাজ নিয়েই ব্যস্ত আছে, এর মধ্যে দিয়েই ওর শিক্ষা হচ্ছে। এবং আস্তে আস্তে ছবি আরম্ভ করবে।

০০ আমরা বুঝতে পারি যে অত্যন্ত ঝোড়ো জীবন গেছে আপনার, একটা দুর্যোগময়,—

০ আমি ভেবেছিলাম যে 'ঋত্বিক' বইতে এসব একটুখানি যোগ করবো। কিন্তু এখন দেখছি যে নতুন করে লিখতে হচ্ছে। অনেকটা লেখা হয়ে গেছে। আশা করি এখন এটা লিখে শেষ করবো। এরপরে আমি সিলেট নিয়ে লিখবো। সিলেটের ওপর মানে পরিবেশ, যাতে আমাদের পূর্ব বাংলাটা থাকে। ওটাওতো হারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, নতুন প্রজন্মের কাছে। সবকিছু মিলিয়ে ...

০০ তবে ধরেন যে কষ্টের দিকটা ছিল ঋত্বিকদা'র, সারাটা জীবনই তো কষ্টের। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু ভালো স্মৃতিও ছিল, বিশেষ কিছু মনে করতে পারেন যে, কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন বা কোনো একটা দিন ...।

০ এই যে 'অযান্ত্রিক'-এর সময় রাঁচি গেলাম। তারপরে, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে যেখানে যেখানে গেছি।

০০ ঋত্বিকদার কি ডায়েরি লেখার অভ্যেস ছিল?

০ না, না।

০০ এখানে কার কার সঙ্গে দেখা হলো?

০ যাদের যাদের কাছে গেছি সবার কাছেই খুব আন্তরিকতা পেয়েছি। কাজ হলো এফ. ডি.সি.তে গেলাম। সালাহউদ্দিন জাকির সঙ্গে দেখা হলো। একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটা দিলেন। বৈরাগীর আজকে পর্যন্ত শুটিং। তারপরে ওর সঙ্গে বসবো আর কি। তারপরে বেবী ইসলামের বাড়িতে গেছলাম। ওঁ খুবই আন্তরিক। বললো বউদি এখানেই থাকবেন, ছ'মাস থাকুন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। আমাকে বললেন ঋত্বিকদা যখন এখানে ছিলেন তখন প্রতিদিন একটা করে ইলিশ মাছ খেতেন।

০০ প্রতিদিন একটা (হাসি)?

০ তারপর আবার ঐ গোস্ত দিয়ে কি একটা বানিয়ে দিতো। খুব আদর যত্ন করেছে। উনিও ওদের খুব ভালোবাসতেন। কুমিল্লাতো ভীষণ ভালো লেগেছে। এই প্রথম এলাম। ওখানে আমরা গিয়েছিলাম পরিমল দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। ৮৮ বছর বয়স। উনি খুব ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গান।

০০ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গেলেন, 'তিতাস'টা একটু দেখলেন না?

০ দূর থেকে দেখেছি। তবে আমি যেটা বলব যে ওখানকার সব কিছুই 'তিতাস'-এর সঙ্গে জড়িত। শিল্প, কৃষ্টি সংস্কৃতি—সবকিছুই। এবং একটা তীর্থ মনে হবে আর কি—কারণ ওখানে এতো লোকের জন্ম, ঐ জায়গায় যে খুব ভালো লাগে। ওদের খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি থাকি ...।

০০ তো আপনি আরও একটু সময় নিয়ে যেতে পারলে, থাকতে পারলে ওরা খুব খুশি হতো।

০ হ্যাঁ, তা আর থাকতে পারলাম না। তবে জানা রইলো আর কি। সুতরাং যেখানেই যাচ্ছি, সেখানেই মানে ভীষণ ভালোবাসা পাচ্ছি আর তথ্য পাচ্ছি, প্রীতি, ভালোবাসা এবং এদেশের সবই ভালো লাগছে। আর কি— তবে এটা তো জানি যে দু'দেশেরই অবস্থা আসলে এক, বুঝতে পারছেন ? সেটাতো একই। এ ব্যাপারে কিছু তো আর বলার নেই আমাদের। দেশটাকে আস্তে আস্তে দেখছি আর কী। এদেশের— মাতৃভূমি হলেও— আমি কিছুই দেখিনি আগে। এখন আমি দেখছি, আরো দেখব, আমার খুব ভালো লাগছে। আমার জীবনের একটা ব্রেক এটা আর কি।

০০ আমরা 'ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ' করেছি, ঋত্বিকদার কথা স্মরণ করে— তো আমরা কি করতে পারি, আপনার কোন সাজেশন্স থাকলে — বলতে পারেন আপনি— একদম ডিরেক্ট বলবেন, একেবারে নিজের ছেলের মতো করেই।

০ হ্যাঁ। একটা জিনিস হলো এই যে, চলচ্চিত্র সংসদ করে শুধু, মানে ছবি তো দেখবেন— কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলোও প্রফেশনাল হয়ে যায় আর কি। যেমন কোলকাতায় দেখেছি— তো সেটা একদম করবেন না, হ্যাঁ ...

০০ না, না, সেটা আমরা করতে চাই না। আমরা আস্তে আস্তে মানে প্রোডাকশন ছবিটবি বানাতে চাই, অলটারনেটিভ ধারা তৈরি করতে চাই। আমাদের পরিকল্পনা আছে— তবে কতদূর কী করা যায় .. ।

০ হ্যাঁ, সেটাতো নিশ্চয়ই।

০০ আমাদের এখানে একটা ধারা শুরু হয়েছে যে, কমার্শিয়াল হলে রিলিজের অলটারনেটিভ কোনো বিকল্প বের করা যায় কিনা। এবং সেটা আমরা খুব সামান্য হলেও কিছুটা করতে পেরেছি। আমরা ১৬ মি. মি.-এ ছবি তৈরি করি। আমরা কিছু শর্ট ফিল্ম তৈরী করেছি, আমরা ছবিগুলি দেখাই। সিনেমা হলে দেখাই না। আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেই। অমুক স্থানে অমুক তারিখে অমুক ছবির শো হবে— এবং কোনো একটা অডিটোরিয়াম ভাড়া নিই, বিশেষ করে পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়াম, ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এবং প্রায় অবিশ্বাস্য যে হাজার হাজার লোক ছবি দেখতে আসে এবং দশ টাকা করে টিকেট কেটে তারা এসব ছবি দেখতে আসেন। দুটো তিনটে ছবি এক সঙ্গে এবং এই ভাবে আমাদের এইসব ছবির খরচ প্রায় উঠে আসছে। এবং আমরা কমার্শিয়াল হলগুলোতে যেতে চাই না। ১৬ মি. মি. ছবির একটা প্যারালাল আন্দোলন ধীরে ধীরে কিছুটা হলেও ডেভেলপ করেছে ...।

০ খুব ভালো কথা ...।

০০ তো আমাদের 'ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ' আর আট দশটা ফিল্ম সোসাইটি থেকে একটু আলাদা, অন্যান্য চলচ্চিত্র সংসদের মতো এটা সীমিত হয়ে থাক তা আমরা চাই না। এটা আন্দোলন ওরিয়েন্টেড, রাজনীতি ওরিয়েন্টেড ...।

০ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাকে একটু লিখে দিবেন কি কি ছবি আপনারা করেছেন ?

০০ জ্বী, ঠিক আছে। তো, সেই জন্যে ঋত্বিকের জীবন থেকে আমরা অনেক শিখেছি। এতো সৎ, পরিশ্রমী, প্রতিভাবান মানুষ। শুধু এই অর্থের বৃত্তের জগতের যারা মালিক, তারা কি ভাবে তাঁকে সাফার করালেন, তাদের সিস্টেমের কারণে সেটা আমরা দেখেছি। তাদের সঙ্গে স্ট্রাগল করতে হবে তো বটেই, কিন্তু অন্যভাবে কিছু করা যায় কিনা— তা ভেবেই, আমরা অলটারনেটিভ চ্যানেল হিসেবে— ৩৫ মি. মি. এ ছবি বানাতে যাইনি, বানিয়েছি ১৬ মি. মি.-এ। কারণ ৩৫ মি. মি.-এ গেলেই কিন্তু আমাদেরকে সিনেমা হলে যেতে হতো, একজিবিটর, ডিস্ট্রিবিউটরদের খপ্পরে পড়তে হতো। তারপর ছবি ক্যানবন্দী হয়ে পড়ে থাকতো। আমাদের ছবি কিন্তু বসে থাকার ছবি নয়। ছবি চলে যায়। কোথায় রংপুর চলে গেলো, কেউ দিনাজপুর নিয়ে গেলেন, কেউ যশোরে, কেউবা কুমিল্লা—১৬ মি. মি. প্রোজেক্টর অনেক জায়গায় আছে। বড় ঘরে, ইস্কুলে মাঠে ময়দানে ছবিগুলো দেখানো হচ্ছে।

০ কিসের উপর ছবিগুলো করেছেন ?

০০ বিভিন্ন বিষয়ের উপর। মুলত মুক্তিযুদ্ধই আমাদের এখানে বড়ো থীম। আমাদের কাছে। কারণ এটা আমাদেরকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে তো। ঋত্বিকদাকে যেমন দেশভাগ ধাক্কা দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে ভীষণ haunt করে। এখানে যারা ছবি করছে, শর্ট ফিল্ম— তাদের ছবিতে '৭১ সালটাই বড়ো করে আসে। এ ছাড়া আমাদের সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ— এসব থীম আর কি। সবগুলো ছবি যে ভাল হয়েছে তা নয়। চার-পাঁচটা ছবি হয়েছে তার মধ্যে দু'একটা ছবি মোটামুটি ভালো।

০ আসলে সুস্থ সংস্কৃতির অভাব আছে, তেমনি চেষ্টাও আছে। দুই দেশেই— চেষ্টাও আছে।

০০ পশ্চিম বাংলায় আপনাদের একটা সুবিধা আছে যে, বিশাল একটা কালচারাল হেরিটেজ আছে। সমাজে সাধারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির মান অনেক উঁচু, সেক্ষেত্রে আমাদের তো অনেক পেছনে থেকে শুরু করতে হচ্ছে। তারপর ধর্মীয় ব্যাপার স্যাপার ...।

০ কিন্তু আপনাদের তো মাতৃভাষা আছে। আপনারা মাতৃভাষাটা ধরেছেন তো— এ কিন্তু সাংঘাতিক। এই যে আজকে দেখলাম, বাংলা একাডেমীতে একটা কর্ণার করেছে ওরা —প্রাচীনতম সব কিছুকে রক্ষা করা, সাংঘাতিক ব্যাপার। এগুলো তো সাংঘাতিক কাজ, তাই না ? সুতরাং...। কোলকাতায় এরকম কোথাও আছে কিনা আমি জানি না। এবং অনেক কাজ করেছে, সেই জন্যেই বলছি যে হতাশ হবার কিচ্ছু নেই ...।

০০ আমাদের এখানে সংস্কৃতিটা কিন্তু বেশ একটা সংগ্রামের ব্যাপার। কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারবেন। এখানে একটা মানুষকে কালচারাল মানুষ হতে হলে সংগ্রামী হতে হচ্ছে। কারণ এস্টাব্লিশমেন্টটা পুরোপুরিই সুস্থ সংস্কৃতির বিপক্ষে। ফলে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার জন্যে এক সময় এদেশের মানুষকে রাস্তায় মিছিল বের করতে হয়েছে। ষাট

দশকে আমাদের তাই-ই করতে হয়েছে।

০ এটা তো হবেই জানা কথা। তবে দু'দেশেই সৎ চেষ্টা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা দু'দেশেই এক। কিছু লোকের হাতে টাকা একটু বেশি, কিছু লোকের হাতে নেই।

০০ আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন একটু করি— তা হচ্ছে ঋত্বিকদার ছবিতে আর্কিটাইপের প্রভাবের ব্যাপারটি—ঋত্বিকদার মায়ের ব্যাপারটি কি ? পারিবারিক ব্যাপারটি কি রকম ছিল ?

০ আমি যখন দেখেছি ওঁর মা তখন বৃদ্ধা। ঋত্বিক ভালোবাসতেন সবাইকে— এ তো আমি বললাম। কিন্তু বিশেষ আলাদা কোনো কিছু নেই, আর আমার কথা শুনে আমার মাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মা'র সম্পর্কে আমি তেমন বিশেষ কিছু জানিনা। একটা জায়গায় আছে, অযান্ত্রিক— যে 'আজকে শুটিংটা খুব ভালো হয়েছে, আজকে মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে'। ওখানে চিঠিতে ছিল 'মায়ের কথা এবং তোমার কথা'। ওটা আমি কেটে দিয়েছিলাম কিন্তু এবার যখন প্রকাশ করি তখন রেখে দেই। মানে মা'র কথা আর তোমার কথা মনে পড়ছে।

০০ তাঁর একটা লঙ্গিং ছিল— যে মাদার–

০ এটা তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। উনি বলতেন যে মায়েরাই আর কি রক্ষা করতে পারে— এঁরাই পরিবার রক্ষা করে, সমাজ রক্ষা করে। তাছাড়া মা একটি শক্তি। মায়ের যে শক্তি —মাদারহুড। এবং সেটাতো নিজের প্রবন্ধেই বলেছেন। বিভিন্ন জায়গায়। এটা আদিমকালে ছিল। উনি একটু বড় করেই দেখেছেন—মাদার আর্কিটাইপ। যেমন ধরুন 'তিতাস'-এ। তারপরে 'পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য'-এ মেয়েটা যখন ছৌ নিয়ে নাচছে তখন মাতৃরূপিণী শক্তিটাকে তিনি দেখিয়েছেন।

০০ আর আদিবাসীদের ব্যাপারে উনি একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন— এটার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা ...।

০ এটা বোধ হয় ওদের সরলতা, ওদের মধ্যে যে সরলতা ছিল। ওদের সমস্ত সাইকেলটা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ —'অযান্ত্রিক'-এর যে সমস্ত জিনিসটা— ওটা হলো জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—এই ব্যাপারটা আর কি। আসলে আমিও তো পড়াশোনা করেই জেনেছি, কারণ এমনিতেই তাঁর সঙ্গে আছি, কাজ করছি, তারপর লিখতে আরম্ভ করলাম, তখন প্রবন্ধগুলো পড়তে পড়তে দেখলাম যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ— এই পুরো সাইকেলটা 'অযান্ত্রিক'এর মধ্যে আছে আর 'আদিবাসী কা জীবন স্রোত'— তাতে ওদের জীবনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সাইকেলটা পুরো এসেছে।

০০ এখন এ দুটো ছবির কি অবস্থা— 'বিহারকা দর্শনীয় স্থান' এবং 'আদিবাসী কা জীবন স্রোত'— ছবি দু'টোর মালিক কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার না ট্রাস্ট ?

০ ট্রাস্ট।

০০ আমরা সিরিয়াসলি ভাবছি যে, ঋত্বিকদার ছবিগুলো নিয়ে ঢাকায় একটা উৎসব করবো। একা তো পারবো না আমরা, ভারতীয় হাই কমিশনের সহযোগিতায়। শুধু আমরা, 'ঋত্বিক চলচ্চিত্র সংসদ'ও পারবো না—কারণ বিষয়টা খুব বড় ব্যাপার। এখানের ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজকে ইনভলভ্ করে আমরা ফিল্ম উৎসব হিসেবে, হয়তো এখন না দু'এক বছর পরে। কারণ ঋত্বিককে তো আমরা আমাদেরই লোক মনে করি। দুঃখের বিষয় ঋত্বিকদার ছবি আমরা দেখতে পারছি না— আর আমাদের টেলিভিশনও দেখাক সেটা আমরাও চেষ্টা করবো।

০ রেট্রোস্পেকশনের ব্যাপারটা তো খুবই ভালো। ... আমরা সাহায্য করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

০০ ভারতীয় হাই কমিশনে 'অযান্ত্রিক'-এর প্রিন্টটা আছে, সেটা দেখানো হয় মাঝে মাঝে, এখানে। আমরা 'ঋত্বিক' থেকে যে প্রদর্শনী করি দ্বিতীয়বারের মতো, সেখানে আমরা 'অযান্ত্রিক'টা দেখেছি। তবে বহুবার দেখানোর ফলে প্রিন্টটা আগের মতো ভালো আর নেই।

০ ওটাই তো মুশকিল।

০০ আর 'মেঘে ঢাকা তারা' ওটাও একটু নষ্ট হয়ে গেছে। সাউণ্ড ট্যাকটা। সাউন্ড ট্যাকটা তো ও ছবিটায় খুবই সমৃদ্ধশালী। ফলে ওটা ঠিক না করলে ছবিটা দেখানো অসুবিধের।

০ আর্কাইভে কি 'সুবর্ণরেখা'র প্রিন্ট আছে?

০০ এখানে নেই। এখানে ভিডিও ক্লাবগুলোর মাধ্যমে 'সুবর্ণরেখা'র ভিডিও পাওয়া যায় শুনেছি। তবে প্রিন্ট খুবই খারাপ।

নীলকণ্ঠ তো এক অর্থে ঋত্বিক ঘটকই

বেবী ইসলাম

(সা : তারেক আহমেদ)

বেবী ইসলাম: ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম লাইনে এসেছিলেন অনেক পরে। ততদিনে আমি আমার গুরু অজয় করের সাথে কাজ করতে মাদ্রাজ-বোম্বে চলে গেছি। '৫৪ সালের দিকে এঁদের নাম খুব শুনতে লাগলাম। সত্যজিৎ, ঋত্বিক— এঁদের তো সত্যিকার অর্থেই কিছু করতে পারার কথা। কারণ, তাঁদের হেরিডিটিতেই এনলাইটেনমেন্টটা ছিল। সত্যজিৎ রায়ের যেমন ছিল, ঋত্বিক ঘটকেরও ছিল তেমনই। ঋত্বিক ঘটকের সাথে 'তিতাস' করার আগে আমার আলাপ ছিল না। হয়তো নাম শুনে থাকবেন কারও কাছে। অজয় করের সাথে কাজ করেছি, এটাই হয়তো শুনেছিলেন। করবাবুকে তিনি 'দাদা' বলে ডাকতেন, সেই সুবাদেই আমার নাম শুনেছেন। সেই জন্যে যে-প্রযোজক তাঁকে ছবি করতে এখানে নিয়ে আসেন, তাঁকে এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার কথা। আমিও তাঁর নাম শুনেছি আগেই, ছবি দেখেছি— 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা'। 'অযান্ত্রিক' দেখে তো মাথা খারাপ হবার দশা। একটা গাড়ির জন্যে যে লোকে কাঁদতে পারে, ছবির লোক নয়, দর্শক কাঁদতে পারে, সেটা ভেবেই তো আমার ভিরমি খাওয়ার দশা। তখনই আমি ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে ধারণা করেছিলাম, তাঁর বড়ত্ব সম্পর্কে তখনই জেনেছি। তারপর ঢাকায় এসেছেন। একদিন ফোন পেলাম, 'বেবী ইসলাম সাহেব আছেন ?' আমি জবাব দিলাম। উনি বললেন, 'আমি ঋত্বিক কুমার ঘটক।' শুনেই মনে হল আমার মাথায় যেন একটা হ্যামার পড়ল। তারপর বললেন, 'আপনি কি একটু সময় করে আসতে পারেন ? আমি একটু কথা বলব আপনার সাথে।' সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠলাম, 'বলুন কখন কোথায় আসব ? কী জন্যে ?' স্বাভাবিকভাবেই তখন মনের কী অবস্থা বোঝাতে পারব না। উনি ঠিকানা দিলেন। আমি বললাম যে বিকেলে আসব। ভাবলাম, অমন নাম-করা একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, একটু স্মার্ট হয়ে যাই। টাই-স্যুট পরে হাজির হলাম। দরজায় নক করতেই জবাব এল, 'কে ?' বললাম, 'ঋত্বিকবাবু আছেন ?' তিনি এলেন। আমি বললাম, 'আমিই বেবী ইসলাম।' উনি কাপড়টাপড় ঠিক করে উঠে এলেন। ভেতরে গিয়ে বসলাম। উনি বলতে শুরু করলেন, 'আমি একটা ছবি করব। নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আপনি কি কাজ করবেন আমার সাথে ?' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁ', কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কী তোলপাড় হচ্ছিল তা বোঝাতে পারব না। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে কাজ করব, ভাবতেই কেমন লাগছিল। যদিও আমি তার অনেক আগে ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে ঢুকেছি, তবু তাঁর সাথে কাজ করতে গিয়ে মনে হল যে ফিল্মের কিছুই জানি না, শিখিনি। লাইটিং থেকে শুরু

করে কম্পোজিশন, ফটোগ্রাফি অনেক কিছুই তাঁর কাছে শেখা হয়েছে আমার।

প্র : এমনিতো যেটা শোনা যায়, ঋত্বিক ঘটক ইউনিটের সবাইকে ভীষণ ডমিনেট করতেন, সে সম্পর্কে আপনার কী মনে হয় ?

উ : এটা অস্বাভাবিক কিছু না। একজন পরিচালক ডমিনেট করতে চাইতেই পারেন, তাঁর কথা অনুযায়ীই তো কাজ করতে হবে। তবে ডমিনেট করা যে-অর্থে বলছ, সেরকম কিছু মনে হয়নি। তাঁর কাছে কাজটা যদি বোঝার চেষ্টা করা হয়, তবে সেটা তিনি একশবার বোঝাতে বাধ্য। কোন ব্যাপার যদি বোঝা না যায়, তবে আমি ক্যামেরাম্যান হিসেবে তাঁর সাথে কমিউনিকেট করতে পারব না ? এইখানেই লক্ষ্য করেছি, আমি যতই ডাল হই না কেন, যতবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, জানতে চেয়েছি, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বুঝিয়েছেন। কারণ তিনি বুঝতেন যে, কোন কাজ করার জন্য যা যা জিনিশ ক্যামেরাম্যান বা অন্য কোন লোকের বোঝার দরকার তাকে যথার্থভাবে তা বোঝাতে পারলেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে। এটা যতবারই হোক, যতভাবেই হোক, বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তাতে ডমিনেটিং বলে মনে হয়নি কখনও। যদিও তাঁকে পাঁড় মাতাল অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু কাজের ওপর তার কোন এফেক্ট তিনি পড়তে দিতেন না। কাজের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড একটা স্পৃহা ছিল, ক্রিয়েটিভ ইনট্যুইশন ছিল।

শুনেছি 'তিতাস' করতে আসার আগে তাঁর অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রীতিমতো অ্যালকোহলিক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। রাস্তায় পড়ে থেকেছেন, সেখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে লোকে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল। ঐ সময়ে বাংলাদেশ থেকে এক প্রযোজক গিয়েছিলেন, কলকাতায় 'তিতাস' করবেন বলে, সত্যজিৎ রায়ের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন। তিনিই বলে দিয়েছিলেন, বিষয়টা আমার নয়, আপনারা ঋত্বিক ঘটকের কাছে যান। তাঁরও একটা অবদান স্বীকার করতে হবে এ ছবির পেছনে। সত্যজিৎবাবু সত্যিকার গুণী লোক ছিলেন বলেই জানতেন, কোন্ বিষয়টা তাঁর, কোন্টা তাঁর নয়। তাই তিনিই ঋত্বিক ঘটকের কাছে যাবার কথা তাদের বলে দিয়েছিলেন।

আর আমাদের এখানে বিষয়টা ইমমেটিরিয়াল, পয়সাটাই আসল। সেই জন্যে আমরা পরিচালকরাই গল্প-কাহিনী লিখি, সংলাপ লিখি, গান লিখি। কোন কবি বা কাহিনীকার কারও দরকার নেই, পরিচালক একাধারে সবকিছু। এগুলো সব নিয়ে তারপর প্রযোজকের কাছে যাই। এখানেই আমাদেব সঙ্গে তাদের তফাৎ।

প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে ফটোগ্রাফি অসাধারণ। কম্পোজিশন, লাইটিং, বৃষ্টি সবই এককথায় অপূর্ব। এই ফটোগ্রাফি সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

উ: ফটোগ্রাফি অসাধারণ, এটা সবাই বলে, আমিও শুনেছি এ কথা। লাইটিং-এর যে কথা বলা হয়, লো-কি লাইটিং— তার জন্যে ঋত্বিক ঘটকের ইনফ্লুয়েন্সের চাইতে আমিও চেষ্টা করেছি বেশি। আর বৃষ্টির কথা বলছি, আমার সন্দেহ হয় অমন অসাধারণ

বৃষ্টি— রিয়্যালিটিতে এই বৃষ্টি অন্য বিদেশি ছবিতেও খুব দেখা গেছে কিনা।

কম্পোজিশনের ব্যাপারে ঋত্বিকবাবুর সহায়তা তো পেয়েছি ৯০ ভাগ। তাঁর কাছে এ ব্যাপারে পুরোটাই আমি শিখেছি। এ জিনিশ অন্য কারও কাছে শিখতে পারিনি। ইভন আমার গুরু অজয় করের কাছেও পারিনি। যদিও বলা ঔদ্ধত্য মনে হবে, তবু আমার মনে হয় 'সপ্তপদী' ছবি করার সময়ই তাঁর সত্যিকার উত্তরণ ঘটেছে। কারণ, এতকাল কাজ করার ফলে কোন ছবি ভালো কোন্‌টা মন্দ, কিছুটা হলেও বুঝি। 'তিতাসে'র কথায় ফিরে আসি। আমি ঋত্বিকের কাছে সবকিছুই শিখেছি। কম্পোজিশন, ফ্রেমিং সবই তাঁর কাছে শিখতে পেরেছি। যেমন একটা সিকোয়েন্সের কথা বলছি— একটা গাছ দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'তুই এইখানে ক্যামেরা ধরবি'। কোথায় ফ্রেম করব তা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'প্যান করতে-করতে এইখানে যাবি।' লাস্ট ফ্রেমটা হবে—দেখিয়ে দিলেন— একটা বটগাছে এসে ক্যামেরাটা থামবে। বললেন, 'একজ্যাক্টলি এই জিনিশটাই চাই।'

আমি বললাম, যে কোন জায়গায় এসেই তো থামতে পারি। তিনি বললেন, 'না। এই জিনিসটাই চাই, একজ্যাক্টলি।' এই যে কম্পোজিশনের সেন্স, এটা তাঁর নিজস্ব, নিজের ধ্যানধারণা থেকে সৃষ্ট। আমি হয়তো আজও বুঝিনি এ ফ্রেমটা কি মিন করে, কি মানে আছে এভাবে ফ্রেমিং-এর। কিন্তু আমাকে ঐটেই করতে হয়েছে। কারণ ঐখানে তাঁর ওরকম ফ্রেমিংটাই দরকার। কাজেই তখন আমাকে দেখতে হল, ফ্রেমের টপে কি আছে, মাঝে, রাইটে বা লেফটের দিকে কি আছে, একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে তবেই ফ্রেমিংটা ঠিক করলাম। তারপর তাঁকে ডেকে দেখালাম, দেখুন এসে ঠিক ঠিক হয়েছে কিনা। এইভাবে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সেই কম্পোজিশনের মানে হয়তো আমি আজও বুঝতে পারিনি।

কম্পোজিশন যে কত অদ্ভুত আর পাওয়ারফুলি এক্সপ্রেস করতে পারে, তা তাঁর ছবি না-দেখলে বোঝা যায় না। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা বলছি। কম্পোজিশনে যে কতটা শেখার জিনিস তা বোঝা যায় শেষ দৃশ্যটা দেখে। নীতা বলছে তার ভাইকে, 'দাদা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম'— ক্যামেরা প্যান করতে শুরু করে। একেবারে ভরাট ফ্রেম— গাছপালা, পাহাড় এসবকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে প্যান করে। শেষে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায় যেখানটা একেবারে শূন্য। একেবারে এম্পটি একটা স্পেস। মনে হবে যেন মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে নীতা। মাটি তাকে ছেড়ে যেতে চায়, আবার সে তাই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। লাস্টে ফ্রেমটা একদম ব্লাঙ্ক। একেবারে শূন্যতা, নিঃসীম হাহাকার। কম্পোজিশনের যে এত গুরুত্ব, সেটা এ চরিত্রের বাঁচা, তার বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা, সবকিছুর সাথে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ঋত্বিকের ছবির শেষ কথাটাই হল, 'যুগ শেষ হয়ে যায় না, সভ্যতা থেমে থাকে না। চলে গেলেও তা ফিরে আসবে আবার।' 'মেঘে ঢাকা তারা'র শেষে যেমন নীতার

দাদা শঙ্কর দেখতে পায় নতুন একটি মেয়ে, তার চটিও ছিঁড়ে গেল। তবু থেমে না থেকে সে আবার চলা শুরু করেছে। এই চলাটাই আসল কথা। খুব সিলি একটা ঘটনা, কিন্তু কত অসাধারণ, এক্সপ্রেসিভ। তার মানেটা হল এই সভ্যতা থামবে না, চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর কথা বলছি। বাসন্তী শেষ হয়ে যাচ্ছে, পানি বের করতে চাইছে মাটি খুঁড়ে। এই সময় ইলিউশন, দেখছে, দূর থেকে আসছে একটি শিশু। ছোট্ট একটি বাচ্চা সবুজ হয়ে যাওয়া ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে দৌড়ে আসছে। ঋত্বিকের প্রত্যেকটা ছবিতে আছে এটা। আমরা শেষ হব না ...

বলতে বলতে বেবী ইসলাম অতঃপর আবেগাক্রান্ত হলেন। তাঁর দু'চোখ ভিজে উঠেছে ততক্ষণে। ঋত্বিকের সাথে সখ্যতায়, হৃদ্যতায়, আবেগে, একসাথে কাজ করার আনন্দে, হয়তো বা অকালপ্রয়াত সেই মহান চলচ্চিত্র স্রষ্টার কথা আরও একবার তাঁর নিজের হৃদয়েও বেজে উঠেছিল। হয়তো বা ভাবনায় এসেছিল সত্যিই তো সভ্যতা থেমে থাকে না। বাসন্তী, নীতারা মরে যায়, শেষ হয়ে মিশে যায়, তবু জীবন থেমে থাকে না, চলতেই থাকে। ... প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স যে মানুষটির, ঋত্বিকের অসাধারণ দু'টি ছবির চিত্রগ্রাহক, বহু খ্যাতির অধিকারী, জীবনের অপরাহ্নে পৌঁছে হয়তো একই ভাবনা ছুঁয়ে থাকবে তাঁকেও। ... কিছুক্ষণ পর সরব হলেন তিনি, স্বাভাবিক স্বর ফিরে এসেছে খানিকটা।

বেবী ইসলাম : আমি সিওর ছিলাম, ঋত্বিক যদি বেঁচে থাকতেন, এই বেবী ইসলামকে ছাড়া ছবি করতেন না। তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'— সেটাও আমার হাতে করা। এটা অবিশ্যি আমি অনেক পরে দেখি। নেগেটিভ দেখেই আমায় চলে আসতে হয়েছিল। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র শেষ দৃশ্যও ঐ একই রকম— নীলকণ্ঠের অভিনয় করেছিলেন ঋত্বিক নিজেই, মরে গিয়েও শেষ দৃশ্যে হাতে মদের যে গ্লাস ছিল, সেটা ক্যামেরার গায়ে ঢেলে দিয়ে গেলেন। ভাবটা হয়তো এরকম ছিল, সবকিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাক। তাঁর নিজের জীবনটাই এক অর্থে এই ছবিতে তুলে এনেছেন তিনি। নীলকণ্ঠ যে-চরিত্রটা, সেটা ঋত্বিক ঘটকই এক অর্থে।

তিতাস-প্রসঙ্গ : প্রাসঙ্গিক তথ্য



'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির লোকেশানে একদিন

মনোয়ার আহমেদ

রাত প্রায় শেষ। দু'টো গাড়ি বোঝাই করে কলাকুশলী ও শিল্পীসমেত রওয়ানা হলাম আরিচা ঘাটের দিকে। ভোরের শীতল হাওয়ায় মনে হচ্ছিল শীত আগত প্রায়। ভালই লাগছিল বহু দিন পরে এই রকম একটা সকাল পেয়ে।

এক গাড়িতে আমি, কবরী চৌধুরী, রোজী, পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক, ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ও প্রযোজক হাবিব সাহেব। অন্য একটি গাড়িতে ছিলেন সুপ্রিয়া ও অন্যান্য কলাকুশলীরা। আমাদের দু'টি গাড়িই অন্ধকার ভেদ করে দু'টো ফেরী পার হয়ে ছুটে চলল আরিচা ঘাটের দিকে। বেলা ছ'টা নাগাদ আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছল আরিচা ঘাটে।

এসে দেখি এখানে শুধু আমরা একা নই। অনেকেই আছেন। এদেরকে পূর্বপ্রাণ কথাচিত্রের প্রোডাকশন কন্ট্রোলার একটি বাসে করে আগেই নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন রহিমা খালা, সবিতার মা, মেসবাহউদ্দিন, নতুন নায়ক প্রবীর মিত্র, আবদুল মতিন এবং আরও কয়েকজন একস্ট্রা শিল্পী। ইউনিটের লোকসংখ্যা সব মিলিয়ে ছিল মোট চুয়ান্ন জন।

সবাই সকাল বেলার নাস্তা নিয়ে ব্যস্ত। একমাত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছাড়া। পরিচালক আরিচা নেমেই তাঁর সহকারীদের বুঝিয়ে দিলেন বিভিন্ন কাজ। সহকারীরা নিজ নিজ কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেলেন। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মেকআপম্যান শাহজাহানকে নির্দেশ দিলেন মেজবাহ, মতিন ও ছোট শিল্পীকে মেকাপ করার জন্য। আর নিজে স্ক্রীপ্ট নিয়ে বসলেন কবরী ও রোজীকে দৃশ্য ও চরিত্র বোঝাবার জন্য। পরিচালক যখন কবরী ও রোজীকে চরিত্র বোঝাচ্ছিলেন তখন ওই ঘরে কারও প্রবেশ ছিল নিষেধ। প্রডাকশনের সবাই নতুন। তাই কাকে কিভাবে সমাদর করতে হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আমি দেখলাম এইভাবে বসে থাকলে সকালের নাস্তা ভাগ্যে জুটবে না। কি খাওয়া যায়—কারণ সব কিছুতেই তো ভেজাল। ঠিক করলাম আজ সকালে বাঙ্গালী নাস্তা করবো।

আমি আরিচা ঘাট থেকে আস্ত দু'টো নারকেল কিছু মুড়ি ও বাতাসা কিনে নিয়ে মেকাপ রুমে গেলাম। মেকাপ রুম হচ্ছে আরিচার ডাক বাংলো। নারকেল ভেঙ্গে মুড়ি ও বাতাসা মিশিয়ে কবরী ও রোজীকে জিজ্ঞেস করলাম মুড়ি, নারকেল ও বাতাসা চলবে নাস্তা হিসেবে? তারা সব্বাই রাজী হয়ে নাস্তা খাওয়া আরম্ভ করে দিলেন। কি আর করা যাবে এ ছাড়া আর উপায়ও ছিল না।

পরিচালককে বললাম, দাদা মুড়ি-- ᅟ তোরাই খা।

পরিচালক ঋত্বিক ঘটক লুঙ্গি পরে ও খালি গায়ে কবরী ও রোজীকে ছবির কিছুটা কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। একজন সহকারী এসে খবর দিলেন—দাদা সব রেডি। পরিচালক বললেন, যাও কন্টিনিউটি দেখে শিল্পীদের কষ্টিউম পরিয়ে দাও। এদিকে ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ক্যামেরা নিয়ে অপেক্ষা করছেন নদীর ঘাটে। ক্যামেরাম্যানকে পরিচালক বললেন— তুমি আর কবরী, মতিন, মেজবাহ ও এই বাচ্চাসহ এই নৌকায় আমার সঙ্গে ওঠ আর অন্য নৌকায় রিফ্লেক্টরসহ সহকারী ও লাইট বয়দের ওঠাও।



নৌকার ছইয়ের নীচে বসে আছেন রাজার ঝি মানে কবরী, অনন্ত (সফিক) মানে কবরীর ছেলে, নিতাই (মেজবাহ) গৌর (মতিন)। অনন্ত রাজার ঝির একমাত্র সন্তান। মেজবাহ উদ্দিন তার আশ্রয় দাতা, অনন্ত তার খেলার সামগ্রী নিয়ে আপন মনে নৌকার পাটাতনের উপর সব কিছু সাজিয়ে চলেছে।

রাজার ঝি নীচের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। থেকে থেকে তার চোখ জলে ভরে আসছে। হাল বাইতে বাইতে গৌরেরও চোখ জলে ভরে উঠছে। চোখা চোখি হতেই রাজার ঝি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে। নিতাই ব্যাপারটা দেখে গৌরের দিকে তাকায়। পরিচালক নিজ হাতে ফ্রেমিং করলেন। তারপর বললেন 'বেবী টেক কর'।

ক্যামেরাম্যান শট নেওয়ার জন্য তৈরী হলেন। সহকারী পরিচালক বৈরাগী স্ক্রীপ্ট খুলে বসলেন। পরিচালকের নির্দেশ মত যথা সময়ে ক্যামেরা চালু হল, নেপথ্য থেকে স্মারকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সহকারী পরিচালক বৈরাগী। তাকে লক্ষ করে সবাই সংলাপ বলছে। প্রথম শট এনজি। দ্বিতীয় শট ওকে। এতক্ষণ দৃশ্য চিত্রায়িত হচ্ছিল যমুনা নদীর উপর নৌকায় পাশাপাশি। দূরে নৌকা চলছে যমুনার বুক চিরে, নৌকা ভাটির দিকে যাচ্ছে।

সকাল থেকে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ভদ্রলোক একটানা কাজ করে যাচ্ছেন লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে। আশ্চর্যের বিষয় এতটুকুও ক্লান্তি বোধ করছিলেন না। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক একটি ব্যতিক্রম চরিত্রের অধিকারী। ঘটক একটা নাম একটা জলন্ত প্রতিভা। তিনি ইচ্ছা করলে একটা সদ্য নবজাত শিশুর কাছ থেকেও কাজ আদায় করে নিতে পারেন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল।

বেলা প্রায় একটা থেকে দেড়টা হবে। আমি, কবরী ও রোজী একটা নৌকায় বসে গল্প করছিলাম। আর অন্য দিকে অন্যান্য শিল্পীদের শট চলছে। সকলেরই ক্ষিদে পেয়েছে। আমরা অধীর হয়ে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি আর অন্য দিকে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নায়ক প্রবীর মিত্রের একটা দৃশ্য চিত্রায়িত করছেন। এক সময় নৌকা থেকে বেরিয়ে দেখি ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ক্যামেরা নিয়ে গলা পানিতে দাঁড়িয়ে আছেন, নায়ক প্রবীব মিত্র তার বাবা ও মা-র শট নেওয়ার জন্য। আমি এই সুযোগ হারাতে চাইলাম না— সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। একটা ব্যাপার দেখে আশ্চর্য লাগল, ঋত্বিক বাবু ভেজা কাপড়ে এই রোদে দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এক সময় খাবারের কথা শুনলাম। এক নৌকাতে বসে আছি আমি, কবরী, রোজী, সুপ্রিয়া আর সবিতার মা। আমাদের সামনে হঠাৎ কযেক থালা ভাত, কিছু মাছ ও ডাল এল। মুখে যেই ভাত দেব সেই সময় একজন এসে বল্লেন যে ডালে ও ভাতে ব্যাঙ পরেছিল। এই কথা শুনে আমার আর খাওয়া হল না। অন্যান্যরা কোন রকমে কিছু খেলেন।

এদিকে সূর্য যাওয়ার পথে। গৌর ও নিতাই রাজার ঝিকে তার গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে গেলেন।

তাকে সান্ত্বনা দিলেন রহিমা খালা, বিধবা বাসন্তী (রোজী), মৃংলী। বাসন্তী তাকে প্রশ্ন করলেন :

—ছাওয়ালের বাপ কোন হানে আছে দিদি ?

—জানি না। উত্তর দিল রাজার ঝি।

—বলি মইরাতো যায় নাই ?

—জানি না।

—আমি কই বিয়া তো একটা হইছিলো দিদি।

—জানি না।

—পোড়া কপাল কই এই ছাওয়ালডা আইছে একটা বিয়া অইয়াতো ?

—জানি না।

—খালি জানি না জানি না জানি না। তুমিতো দিদি কিছুই জান না।

বাসন্তীর কণ্ঠে উস্মার আভাস। রাজার ঝি মাথা নিচু করে থাকে। অনন্ত দেখছে যে দূরে গৌর নিতাই চলে যাচ্ছে। গৌর নৌকার ভিতরে বসে বসে কাঁদছে।

কবরী ও রোজী শট ওকে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক বাবুকে বললেন, দাদা ছ'টা থেকে আমাদের (অস্পষ্ট) সুটিং আছে। আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন। ঋত্বিক বাবু বললেন, আচ্ছা তোমরা যাও। আমরা তাড়াহুড়ো করে একটা নৌকায় এসে উঠলাম। হঠাৎ শুনি প্যাক আপ। মানে আজকের মত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির সুটিং শেষ। পরিচালক এবং অন্যান্য কলাকুশলীরা আর একটা নৌকায় উঠে বসলেন। আমাদের নৌকা কিছু দূরে যাওয়ার পর নৌকার গুণ ছিড়ে যায়। দেরী হওয়াতে নৌকা থেকে নেমে নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আরিচা ঘাটের দিকে। আমরা হাঁটছিলাম— কবরী, রোজী, সুপ্রিয়া, রহিমা খালা ও সবিতার মা। অবশেষে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছলাম আরিচা ঘাটে।

আমরা যেভাবে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই গাড়িতে উঠে বসলাম। আমাদের গাড়ি অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলছে ঢাকার দিকে আর ঋত্বিক দা' একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছেন। অবশেষে রাত সাড়ে নয়টায় আমরা ঢাকা পৌঁছলাম।

ঋত্বিক ঘটককে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে

(চিত্রালী, ৪ মে, ১৯৭৩, পৃ. ৩/৯)



যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ঋত্বিক কুমার ঘটক

ভারতের বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক অসুস্থ শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটককে গত মঙ্গলবার ভারত সরকারের বিশেষ ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে কলিকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পরিচালক শ্রী ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন। গত ২২ এপ্রিল ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ঢাকার মহাখালী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে ভর্তি হন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য যে, অসুস্থ পরিচালক শ্রী ঘটককে দেখার জন্যে ভারতের অপর একজন প্রখ্যাত পরিচালক শ্রী মৃণাল সেন গত সপ্তাহে ঢাকায় এসেছিলেন।

Information Minister Inaugurates 'Titas Ekti Nadir Nam'

(Morning News, 27 July, 1973, p.6)

The premier show of 'Titas Ekti Nadir Nam' directed by Ritwik Kumar Ghatak and produced by Purbapran Kathachitra was held yesterday at a local cinema. The film was inaugurated by the Minister for Information and Broadcasting Mr. Sheikh Abdul Aziz. The Minister, in his inaugural speech, said that it was time now to start the task of nation building through the medium of film and other mass media. The Minister observed that film was not merely for recreation. It had a vital role in imparting knowledge and ideas to the masses, he said. He expressed his delight over the Indo-Bangladesh venture in the making of the film 'Titas Ekti Nadir Nam' and said that it would go a long way to strengthen the friendship of these two neighbouring countries.

Mr. Habibur Rahman a co-producer of the Purbapran Kathachitra confessed the guilt of the local producers to the effect that they stole the purses of the cinema-goers by catering to them all stuff and non-sense so long "In the name of entertainment what we did so far was, mere commercialism. There must be an end to it and we are devoted to this cause," he said.

A message from Mr. Ritwik Kumar Ghatak the maker of this film now in convalescences in Calcutta, was read out to the audience wherein he expressed his sorrow for his absence on this occasion. Mr. Ghatak also tendered his whole-hearted thanks to the artists, the producers, the technicians and the people connected with the film industry here who in his language, "rendered very valuable co-operation in every respect."

The show was well attended by the local film-circle, the press and the connoisseurs.

A Human Document : 'Titas Ekti Nadir Nam'

The moving tale of a village on the river Titas : its inhabitants — their hopes and desires causes and conflicts, superstitions and prejudices, love and desolation, rites and rituals along with a tinge of radiant ray of optimism behind an arid murky darkness — all these are combined together in a film, nay a human document, called 'TITAS EKTI NADIR NAM'.

I feel inclined to call the film a human document because it deals with the life of toiling masses, at least with a fraction thereof, adroitly.

Every shot, scence and sequence bear the masterly touch of imagination of Ritwik Kumar Ghatak. Ustad Bahadur Husain Khan's music is a precious addition to the Titas. Baby Islam's camera painted the Titas vividly.

In the acting parts Rosy, Kabori, Rousan Jamil, Probir, Mustafa, Khalil and all others played their roles well.



Mustafa, Khalil and others in 'Titas Ekti Nadir Nam'.

ঋত্বিকের বাণী : তিতাস কলকাতায় এলে খুশী হবো

চলচ্চিত্র প্রতিনিধি

(বাংলার বাণী, ৩ আগস্ট, ১৯৭৩, পৃ. ৩/৫)

পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'ছবিটির বাংলাদেশে শুভমুক্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে বাণী পাঠিয়েছেন। এ বাণীতে শ্রী ঘটক আশা প্রকাশ করেছেন যে, ছবিটি যদি পশ্চিম বাংলায় একযোগে মুক্তি পেতো, তাহলে তিনি এবং পশ্চিমবঙ্গীয় লোকেরা খুশী হতেন। উক্ত উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আবদুল আজিজ। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক অসুস্থতার জন্যে এ প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রী সমীপে আবেদন জানিয়েছেন যে, 'তিতাস' যেনো পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায়। সেজন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেছেন। শ্রী ঘটক বলেছেন, আমাকে প্রথমে শোনানো হয়েছিলো, বাংলাদেশে শিল্পী নেই, কলাকুশলী নেই এবং সেজন্যে ভাল ছবি তৈরী হয় না। এ ধারণা ভুল। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। এ পরিচয় আমি 'তিতাস' নির্মাণকালে পেয়েছি। তিনি বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন।



ঋত্বিক ঘটক



তিলকের ভূমিকায় ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক বলেন : আমি ছাড়া তিতাস হতো না
চিত্রালী রিপোর্ট

"আমি ছাড়া তিতাস সৃষ্টি হতো না। তিতাস ছিল আমার স্বপ্ন। আমার মমতা দিয়ে এ কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না।" গত ২৪শে জুলাই বৃহস্পতিবার স্থানীয় মধুমিতা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটির প্রিমিয়ার শোতে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক প্রেরিত এক স্মারক লিপিতে একথা বলেন। পরিচালক শ্রী ঘটক অসুস্থ হয়ে বর্তমানে কোলকাতায় অবস্থান করছেন।

স্মারকলিপিতে পরিচালক ঘটক বলেন, "আমাকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশে ভাল ছবি তৈরি করার মত ভাল কলা-কুশলী নেই, দক্ষ অভিনয়ের জন্যে ভাল শিল্পী নেই। কিন্তু বাংলাদেশে 'তিতাস' সৃষ্টি করতে গিয়ে সে ধারণা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভুল বলে মনে হয়েছে। আমি জোর গলায় বলবো বাংলাদেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের দ্বারা যে কোন ভাল ছবি করা সম্ভব।"

স্মারকলিপিতে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস' ছবির চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছবির প্রযোজক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এমন প্রযোজক এর আগে আমি আর কখনো পাইনি।



'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর স্যুটিং-এ ঋত্বিক ঘটক ও প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান (চায়ের কাপ হাতে চশমা পরিহিত)

Exempt Quality Films From Taxes

Film Correspondent

(The People, 24 August, 1973, p. 6)

One cannot but be alarmed at the fast emaciation of the standard of our films. The enormous rate at which films are being produced here, and the rate of which their prestige is dwindling are almost concomitant. The producers of the recent years have found in the cine-world an alluring spot for realising their desired to lucrative ends. The people here, who are starved for entertainment, are being thoroughly exploited. It is high time that a check be given to this.

On the other, art and experimental films are hardly forthcoming. Even if there be a few stray attempts, they are not given due worth so low has come down the tastes of the ordinary cine-viewers. There are, course, some who understand and sympathise. But a producer cannnot be spend a huge amount,not to be realised, only to comfort those handful person.

On the one hand, our film environment is vitiated by commercial motives, and on the other, experimental and worthy attempts are thoroughly undone by financial crisis. The Govt. must come to play a positive role here.

'TITAS EKTI NADIR NAM' —a gallant attempt by the reputed director, Ritwik Kumar Ghatak, is a case in point. Notwithstanding the status of the film, it has been a master-piece attempt. Evidently, it has proved a commercial flop.

Should such films as 'TITAS EKTI NADIR NAM' be encouraged to purge the cheapness of entertainment in our films, the Govt. should at least exempt them from all its taxes, and even subsidize them in some measures.

স মা লো চ না স মূ হ



রাজার ঝি চরিত্রে কবরী চৌধুরী

মহান সামাজিক মানব-দলিল : তিতাস একটি নদীর নাম

হীরেন্দ্রনাথ দে

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা সাহিত্যের আশ্চর্য-সম্ভার। লোক জীবনবৃত্তের উপাখ্যান— ঋত্বিক ঘটকের চিত্রনাট্যে যে জীবনবৃত্ত বিভিন্ন বৃত্তাংশে অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং সহজে বিশ্লিষ্ট। ক্যামেরা কাছাকাছি থেকে আহরণ করেছে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ, স্পর্শ করতে পেরেছে লোক-জীবনের মানসিকতা এবং আবেগের সীমানা। চিত্রনাট্যে ঘটনাবিন্যাস সেনট্রিপিট্‌ল্[১] রীতি আশ্রয়ী। জাম্পকাটের সাহায্যে একেকটি বৃত্তের ঘটনা অগ্রসর হয়েছে, দৃশ্যকল্প এবং সংলাপে গল্পের নির্মিতি।

একক কাহিনীনির্ভর গল্প নয়, জীবনের এক তাৎপর্যময় অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে গল্প-বৃত্তের সমন্বয়ে,জীবনবোধের ও ইতিহাস চেতনার গভীরতায়। গল্পাংশে নাটকীয়তা আছে, তবে নিছক নাট্যরস সৃষ্টির উপায়স্বরূপ নয়, জীবনের নাটকের প্রকাশের জন্য এবং গতির অনিবার্য বাহন হিসেবে।

কিশোর-রাজলক্ষ্মীর অচরিতার্থ জীবন ; তাদের ছেলে অনন্তর কচুরিপানার মত ভাসমান জীবন ; বাসন্তীর ব্যর্থ যৌবন, অপূর্ণ জীবনের হাহাকার ; বাসন্তীর সইয়ের সংসার জীবন ; বনমালীর বোনের মাতৃত্বের তৃষ্ণা : রামপ্রসাদের একলা জীবন ; কাদের আলী এবং গৃহস্থ কৃষক পরিবারের কথা ... প্রত্যেকটি গল্পাংশেই জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র অল্পপরিসরে স্পষ্টতা পেয়েছে। চিত্রনাট্যের গ্রন্থনার সমন্বয়ের প্রয়াস প্রশংসনীয় (তবে মাঝে মাঝে কোথাও শিথিলতা দেখা গেছে)। অবশ্য সে জীবন নগণ্যসংখ্যক নাগরের (?) জীবন নয় ; হাজার বছর ধরে বাংলার প্রাকৃত মানুষের সমাজ-জীবনচিত্র যাবা মাছ ধরে, ফসল ফলায়, উৎপাদনের চাকা ঘুরিয়ে যায়।

উভয় বাংলায় এযাবৎ নির্মিত কোন ছবিতেই বাংলার প্রাকৃত জনের জীবন-সমাজ এতো আন্তরিকভাবে চলচ্চিত্রের পর্দায় উঠে আসেনি। ঋত্বিক এ বিষয়ে দুঃসাহসী পথিকৃত। তিতাস নদী-পারের একটি জেলে গ্রামের কয়েক ঘর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকসমষ্টির ইতিহাসনিষ্ঠ সমাজ-জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়েছে এক অনন্য জীবনদর্শনের সত্যস্পর্শে। উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'তিতাস একটি নদীর নাম' এক স্মরণীয় মহান সামাজিক মানব-দলিল চিত্রের সম্মান পাবেই।

নদী এদেশের সভ্যতার উৎস আবার ধ্বংসেরও কারণ। নদীগর্ভে দেশীয় সমাজ-

১. কেন্দ্রাভিমুখী

সভ্যতার বহু কিছু বিলীন হয়ে গেছে। নদীপথ পরিবর্তনে সমৃদ্ধশালী বন্দর-শহর জনশূন্য প্রান্তর হয়ে গেছে। নদীর ভাঙ্গা-গড়ার সাথে মানুষের ভাগ্যের ভাঙ্গা-গড়া অবিচ্ছেদ্য। বাংলার ইতিহাসে চক্রাকারে এই নদীর খেলাই চলে এসেছে। একদিকে চর পড়েছে, অন্য দিকে নতুন মাটি জেগেছে। স্বশাসিত গ্রাম ও সমাজ উজাড় হয়ে গেছে, অন্যদিকে নতুন বসত্ত এবং নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। এইতো বাংলার প্রাণ ও জীবনের ইতিহাস। কিছু মানুষের জীবনচিত্রের রূপকে এই ইতিহাস চেতনাকেই ব্যপ্ত করতে চেয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। যে কারণে এই ছবি একান্তই বাংলার ও বাঙালির জীবনকাব্য।

তিতাসের ধারা শুকিয়ে গেলে বিপর্যয় নেমে আসে তিতাস পারের গ্রামে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা দুর্বহ হয়ে উঠল। চতুর্দিক থেকে বিপদের সূত্রপাত ঘটল। মহাজনের হামলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভাব-অনটন একতাবদ্ধ সমাজের ভিত্তিভূমিতেই পচন ধরিয়ে দিল। একটি সম্পন্ন গ্রামের কপাল ভাঙল। খেটে খাওয়া স্বনির্ভর মানুষ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে ভিক্ষাজীবী, মজুরে পরিণত হল। সম্পন্নরা নগরের ভিড়ে সামিল হল। সে সময় বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবকাল চলছে, বাবুরা নাগর-সংস্কৃতির কাপ্তেন হয়ে উঠেছে। দেশ-কালের সমস্ত প্রতিক্রিয়াই, তির্যক এবং কৌণিকভাবে ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসীদের স্পর্শ করেছে। দেশকালের এই চেতনা উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রে দুর্লভ।



নতুন বাড়ির সন্ধানে রাজার ঝি ও অনন্ত

তিতাস পারের গ্রামের একটি সম্পন্ন পরিবারের উপরেই ঋত্বিক ক্যামেরাব চোখ প্রথম রেখেছিলেন। নানা জীবনবৃত্ত ছুঁয়ে সেই পরিবারের মেয়ের উপরে ক্যামেরা শেষবারের মত স্থির হয়ে তাকিয়েছে। তখন দারুন দুঃসময়। ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম। চারদিকে মৃত্যুর পদধ্বনি। সামনে জলহীন তিতাসের খাঁ-খাঁ বালুচর। জীবনের হাতে ঘা খাওয়া, ব্যর্থ ব্যক্তিজীবনের পটভূমিকায় জীবনযুদ্ধে অবিচল সেই মেয়ে বাসন্তী, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও দু'চোখে যে জীবন-তৃষ্ণার আলো জ্বেলেছে তা শাশ্বত মানবিক। ছবির পরিণতি এবং সমাপ্তি এই জীবন-তৃষ্ণার স্থির চিত্র।

শেষাংশে জীবনবোধের গভীরতা এবং ব্যঞ্জনার তীব্রতায় যে প্রচণ্ড জীবনধর্মিতার প্রকাশ ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির কিছু সাধারণ ত্রুটি, অসঙ্গতি, শিথিলতা ধামাচাপা পড়ে গেছে।

কাহিনী বিন্যাসে চিত্রনাট্য আরো দৃঢ়বদ্ধ এবং ডিটেলসমৃদ্ধ হতে পারত। ঘটনা বিন্যাসে রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু; মাখন সরকারের আত্মহত্যা আকস্মিক মনে হয়েছে, পূর্বাভাষ থাকলে দু'টি মৃত্যুই আবেদনময় ও তাৎপর্যবাহী হত। মালোদের সংস্কার, বিশ্বাস, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডিটেলের কাজ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে ঐ সমাজের আরো নিখুঁত ও জীবন্ত উপস্থাপনার কিছু অনিবার্য ডিটেল ব্যবহার করা যেত। বন্যা, মাছ ধরার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সরঞ্জামের চিত্র, মহামারী এসব বিভিন্ন ডিটেলের প্রয়োগ বিভিন্ন পর্বাংশের গল্পে ইনসার্ট করা যেত।

সংলাপের সজীবতা ও উপযোগিতা প্রশংসনীয়। তবে আঞ্চলিক উচ্চারণের বিশেষ রূপটি অভিনেতারা আয়ত্ব করতে পারেন নি। অভিনয়াংশে সবাই যথাসাধ্য পরিচালকের নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেছেন। রোজী, কবরী, সুফিয়া, রানী সরকার, রহিমা চরিত্রের দাবি মেটাতে পেরেছেন। স্বল্প পরিসরে রওশন জামিল, গোলাম রব্বানী, মোস্তফা উল্লেখযোগ্য। প্রবীর মিত্র মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় আকর্ষণীয় এবং সম্ভাবনাময়।

আবহসঙ্গীতে লোকগীতির ব্যবহার মেজাজ তৈরী করেছে। বিশেষ করে লাঠালাঠির মুহূর্তে তবলার উচ্চগ্রামবোল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে আরো পরিচর্যা এবং সুসমন্বয় ছবিটির শৈল্পিক মান বাড়াতে সহায়ক হতে পারত। ফটোগ্রাফি পরিচ্ছন্ন, বহু দৃশ্য সুগৃহীত।

প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। কতিপয় 'মুড' নির্মাণে 'আউট অব ফোকাস'- এ ক্লোজ-আপ ব্যবহার ; অনন্তর মা-র মৃত্যুর পর মা-কে চিন্তা করার সূত্রে ভগবতীর রূপকল্পনার প্রয়োগ ; অনন্ত গ্রাম ত্যাগ করার মুহূর্তে নদী তীরে দাঁড়ানো বাসন্তীর মানসিক বিক্ষিপ্ততা এবং ক্রোধ প্রকাশে পিঁড়িতে কাপড় আছড়াবার উচ্চগ্রাম শব্দ ব্যবহার চলচ্চিত্র ভাষার দক্ষ প্রয়োগ। অবশ্য উল্লেখযোগ্য শেষ দৃশ্যে বাসন্তীর চোখে ফসলের ভরা ক্ষেতে হেঁটে যাওয়া বালকের ভেঁপু বাজানোর রূপকল্পনা। (তুলনীয় 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে শেষ দৃশ্য, সেখানে মাটির পথে ইট বিছানো হচ্ছে নতুন রাস্তা বানাবার জন্যে)।

তিতাস একটি নদীর নাম

চিত্র সমালোচক*

মালো পরিবারের সেই ছেলেটি, অদ্বৈত মল্লবর্মণ যার নাম, তাঁর জীবনেরও একটি স্মরণীয় ঘটনা ছিল। তা হোল তাঁর গ্রন্থের পান্ডুলিপিটি হারিয়ে যাওয়া। তার চাইতেও মর্মান্তিক ছিল সে তাঁর সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ছাপার অক্ষরে পুস্তকাকারে দেখে যেতে পারে নি। দীর্ঘকাল পর তাই (দশ এগার বছর পর) শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক সেই উপন্যাসের চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্রসংগে তাঁর বিশ্বাসের গভীর থেকে উচ্চারণ করেছিলেন— 'তুই প্রযোজক যদি মারা যাস, তাতে কিছু এসে যায় না ; আমি পরিচালক যদি মারা যাই তাতেও কারো কিছু এসে যায় না ; কিন্তু তিতাস একটি নদীর নাম— ছবিটা যদি না হয়, বিশ্বের মানুষ একটি মহৎ সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।' বাংলাদেশের অধিকাংশ নিস্পৃহ দর্শক চলচ্চিত্রের গভীরে যেতে নারাজ কিংবা অক্ষম এটা তাদের 'চলচ্চিত্র বোধ'-এর অভাব অথবা চিন্তাদৈন্য, সে কারণেই সম্ভবত ঋত্বিক ঘটক তাঁর মহৎ সৃষ্টি থেকে বাংলাদেশের বঞ্চিত হবার সংকীর্ণ আশংকাকে পৃথিবীর বিশালতায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তিতাস একটি নদীর নাম। অজানা, অচেনা, অখ্যাত একটা নাম। কিন্তু এর পারের মানুষ, গোকর্ণঘাটের সেই জীবন—ঝড়-রৌদ্রে যারা জলে নৌকা ভাসায় নদীতে জাল ফেলে, উঠোনে গাবের খাদা-চরকী-টেকো-তকলী নিয়ে সুতো কাটে, প্রকৃতির পরিবেশে যাদের জীবনে আসে সুখ, আনন্দ, ও প্রাণ ; পূজা-পার্বণ, দারিদ্র্য, অভাব, অসুন্দর, ঈর্ষা. ঝগড়া, লড়াই, মৃত্যু—এ-গুলোতো অপরিচিত নয় এই শাশ্বত বাংলার সূত্রধরদের কাছে। তিতাস একটি নদীর নাম তাই বাংলার সেই খেটে খাওয়া অখ্যাত জনদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত— সেই পরিচিত জনদের জীবনের ছবি।

ঋত্বিক ঘটক প্রায়শ তাঁর ছবিতে সমকালীনতার প্রেক্ষিতে অখণ্ড জনসমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনবোধের বিশ্লেষণের গভীর থেকে একটি বক্তব্যকে তুলে ধরেন। সুবর্ণরেখার মত তিতাস একটি নদীর নামের বিষয়বস্তুও তাই বাংলাদেশ। মালো সমাজের জীবনকে বিধৃত করে এ চিত্র। কিন্তু সমাজ গঠনে প্রতিজ্ঞ এবং সক্রিয় করে তুলবার ছবি এ নয়। এতে আছে চলচ্চিত্রকারের নিগূঢ় অনুভবের শিল্প দ্যোতনা। পুনরায় তাই তাকে 'নৈরাশ্যবাদ' এবং 'অবক্ষয়' প্রচারে চেষ্টিত বলে আখ্যা দেয়া হলে তিনিও সম্ভবত যথারীতি প্রতিবাদ করবেন এই বলে যে "... আমি বিশ্বাস করিনা যে আমার কোন শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার

* মাহবুব আলম। 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ'-এর কর্মী। সম্ভবত এই লেখাটিরই বর্ধিত রূপ 'ধ্রুপদী'-তে ১৯৭৪ সালে 'সুকদেব বসু' নামে লেখক প্রকাশ করেন।

দেশের সংকটকে কোনো না কোনো দিক থেকে উদঘাটিত করে তুলতে পারি"— যেমন করেছিলেন 'সুবর্ণরেখা'য়। তিনি যেমন উত্তালভাবে শ্লোগান-পিয়াসী নন, তেমনি শুধুমাত্র মানবিক সম্পর্কবোধ প্রকাশের জন্য ছবি করাকে ঘৃণ্য বলে মনে করেন তিনি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের মূল উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর আটটি স্তরকে ছবির সামষ্টিক প্রয়োজনে এবং বাস্তবতার বিচার্যে একটি চূড়ান্ত শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছানোর তাগিদে চলচ্চিত্রকার কখনোই কাহিনীকে অনাবশ্যক বিস্তৃত হতে দেননি। এ নিয়ে তাই অনেকের ক্ষোভ করবার কারণ রয়েছে। এবং সাহিত্য-কীর্তি চিত্রায়ণে চলচ্চিত্রকারের চরম সমস্যা এখানেই। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক 'কনটেন্ট' এবং 'ফর্মের' সংঘর্ষে তাঁর দর্শনের অনিবার্যতায় এগুলো করেছেন।

ছবির শুরুতে টাইটেলেই তিতাসের উপস্থিতি—লালনের গান 'তোমার আজব লীলা, নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই'—মুহূর্তে একটি সাঙ্গীতিক উপলব্ধিকে আমন্ত্রিত করে। চলচ্চিত্রে আবহসঙ্গীতের আত্মীয়তা অনুভবের মাচাঙ্গে দোল খায়। এ সঙ্গীত ছবি'র শেষ ফ্রিজ শটটির পূর্ব মুহূর্তে সমাহৃত। এ ছবিতে সঙ্গীতকে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আনা হয় নি। প্রয়োজনে, অত্যন্ত নিরুপদ্রবভাবে তা এসেছে. ছবির শরীরে। ছবিতে তাই যতক্ষণ গান আছে–– জীবন আছে, গান নেই, জীবনের ক্রম ক্ষয়িষ্ণুতা সমস্যা-বিপর্যয় আস্তরিত।

মাঘমণ্ডলের ব্রত। বাসন্তী-সুবল-কিশোরের ছেলে বেলা। সঙ্গীত-মুখর, চৌয়ারী-ভেউরা ভাসানো জীবন। রামপ্রসাদ (মোস্তফা) তিতাসের জলের সমান্তরলতায় দৃষ্টি রেখে বলছে 'মরণকালে যেই জল মুখে না দিলে প্রাণডা বাইর অইতে চায় না, একদিন হয়ত দেহুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই। হুগাইয়া খটখইট্টা অইয়া গ্যাছে, ডেংগা' (সেই রামপ্রসাদ সত্যি একদিন শুকনো তিতাসের চরে কৃষকদের সঙ্গে লাঠালাঠি করে মারা যায়, তিতাসে যখন সত্যি জল নেই। জল গেছে, মালোরাও গেছে— এটা সে মানতে চায়নি)। কিন্তু ক্যামেরা ততক্ষণে রামপ্রসাদ এবং বাসন্তীকে ছাড়িয়ে তিতাসের জলে। নৌকো, নৌকোর পাল। একটা, দুটো ক্রমশ অনেক। সময় অতিক্রান্তের দুটো শটই নেয়া হয়েছে তিতাসের জলে। এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে এবং ঋত্বিক ঘটকের পরিণত 'ভিজ্যুয়াল সেন্স'-এর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তিনি 'টাইম ল্যাপস'-এর প্রচলিত রীতিগুলোকে অগ্রাহ্য করে সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্রকারদের নির্দিষ্ট সীমানায় বৃত্তায়িত।

যেমন নদীর পাড়ে অল্প পানিতে ধীরস্বভাব ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। রাজার ঝি (কবরী) অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাত্রি শেষ। সূর্যোদয়ের পূর্ব আলো। ছপ ছপ শব্দ করে একটা নৌকো এগিযে আসছে। তাতে পাল নেই। নৌকো থেকে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ নেমে এসে রাজার ঝিকে তুলে নিল। পুরো ফ্রেমে একটা নৌকোর পাল এসে ঘুরে গেল। তারপর আরও। নদী-জল। পালতোলা নৌকা। একটা দুটো অনেক। বর্তমানে প্রবাহিত অতীত-মুখী সময়, বছর।

ঋত্বিক ঘটকের দৃশ্য গঠনশৈলীর অনন্যতা এবং বলিষ্ঠতা তিতাস একটি নদীর নামের প্রতিটি স্তর এবং তন্নিষ্ঠ ভাব বিশ্লেষণে সুসামঞ্জস্য মিশ্রণ ঘটিয়েছে। বিশেষত কিশোর (প্রবীর) এবং রাজার ঝি'র যন্ত্রণাময় মানসিকতার গভীরতর ক্রমবিবর্তনে উজানী নগরের খলাতে দোল পূর্ণিমার উৎসবে রাজার ঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কিশোর তাকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়েছে। সরোদ-নিঃসৃত সুরে তার অস্থির দৃষ্টি রাজার ঝি'র শান্ত মুখে। এই একই দৃশ্য পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে আর একটি দোল-উৎসবে, কিশোর যখন পাগল।

রাজার ঝি, সে তখন অনন্তর মা। কালুর মা'র ভিটেয় মুংলীর (রানী সরকার) সঙ্গে চার ঘর হয়ে। বাসন্তী (রোজী) তখন সুবলার বিধবা বৌ, রাঁড়ি, অনন্তর মাসী। এ দু'টি চরিত্রকে পরিচালক কখনো এক হতে দেননি। তাই 'পরসতাব' বলতে গিয়ে অনন্তর মা যখন বলছে— জানিনা ; বাসন্তী তখন বলছে— জানি, কিন্তু কমুনা। 'আলন্তির' দিনে পিঠা বানানোর আনন্দময়তার মধ্যে পরিচালক দুটি ভিন্নমুখী চরিত্রের সমান্তরাল দুঃখকে আলোকিত করেছেন।

যেমন বাসন্তী যখন মা-বাবাকে বলছে—'শিশুকালে বিয়া দিছলা। মইরা গ্যাছে। জানলাম না কিছু, বুজলাম না কিছু। সেই অবুঝকালে ধম্মে কাঁচারাঁড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অব্দি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে ঘুরি। তোমরা ত সুখে আছ। তোমরা কি বুঝবা, আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন।' আবার অনন্তর মা কে প্রকারান্তরে নিজকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে— 'আমারও দিদি সময় সময় মনডা অচল হইয়া পড়ে। কিন্তুক আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখছি, এই ভাবেই চালামু'। সে প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত, যখন বিপর্যস্ত মালো পরিবারের ক'টা নারী অসম্ভব নীচে নেমে গিয়ে জীবনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে, তখন বাসন্তীর প্রত্যয়াংকিত বিগ ক্লোজ-আপে সমূহ চরিত্রগুলোকে অনুপস্থিত করা হয়।

অন্যদিকে অনন্তর মা যখন মাত্রিক বিশ্বাসে ধুচনীতে পিঠে নিয়ে পাগল কিশোরের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন কিশোর তাকে দা উঁচিয়ে মারতে গেল। কিন্তু অনন্তর মা'র অবিশ্বাস্য আবেগে স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। সাউন্ড ট্রাকে কয়েক মূহূর্ত কোন শব্দ নেই। তারপর সেই বিয়ের গানের রিপিটেশন—"লীলাবালি, লীলাবালি বর ও যুবতী সই গো কি দিয়া সাজাইমু তোরে"...। ক্রমে শব্দ উঁচুতে। কিন্তু ক্যামেরা যখন কিশোরের মুখে আপতিক অর্থে এল তখন গান উল্টো ট্রাকে। কিশোরের বিস্মরণ বোঝাতে চলচ্চিত্র সঙ্গীতে 'থিম মিউজিকের' এইটুকু প্রয়োগই যথেষ্ট। সেই অনন্তর মা'র কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞা নেই বাসন্তীর মত। সে তার বিশ্বাসের অসহায়তায় নিজেকে সমর্পিত করছে এই বলে যে 'আমি কেবল জানি একলা জীবন চলে না, পাগলেরে পাইলে তারে লখ কইরা জীবন কাটাই'। এখানেই চরিত্র দু'টির ভিন্নতা।

ছবির পাচঁটি মৃত্যুর একটি অনুপস্থিত। সেটি সুবলের। কিশোর এবং অনন্তর মা'র মৃত্যুদৃশ্য রচনায় ঋত্বিক ঘটক যে সমৃদ্ধ চিত্রভাষার প্রয়োগ করেছেন, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

চলচ্চিত্রকারবৃন্দ, যাঁরা প্রথম জীবনে অংকন শিল্পী ছিলেন তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনন্তর মা'র অজ্ঞান দেহটাকে তুলে নিয়ে কিশোর নদীর পাড়ে উঠে আসছে— যখন সে বিশ্বাসের কণ্ঠদেশে এবং অনুভবের বুকে মুখ রেখেছে। গান হচ্ছে, কীর্তন— 'একি অপরূপ ... রাধাকৃষ্ণের মিলন হোল'। আবার গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কোলাহল। লাঠি হাতে একদল লোকের প্রবেশ। প্রহার। দু'টো অচেতন দেহ পড়ে আছে তিতাসের পাড়ে। এর সবটুকু দেখানো হয়েছে নদীর পাড়ে রাখা একটা অকেজো নৌকোর মধ্য দিয়ে। তারপর কিশোরের 'বউ' শব্দোচ্চারণ, অনন্তর মা'র আকাশ দেখা, গড়িয়ে যেয়ে তিতাসের জল ছুঁয়ে মৃত্যু, প্রশান্তি, একটা পাখীর বিশ্রী ডাক—এ সব কিছুতে চলচ্চিত্রকারের শিল্পভাবনা যত্নশীল।

'মেঘে ঢাকা তারা'র কিছু কাজ এবং 'সুবর্ণরেখা'য় যেমন পুরাকল্পীয় চিত্রকল্পরূপে কালীর অবতারণা, এ ছবিতেও তেমনি মা ভগবতী এসেছে প্রত্নপ্রতিমার ভাবরূপ নিয়ে। এগুলো পরিচালকের নিজস্ব সৃজনশীল শিল্পচিন্তার কারুকাজ।

হবিষ্যির দিন। রাত্তিরে অনন্তর মাসী ধীর গলায় বলছে—অনন্ত শুনছে, নতুন লাগছে কথাগুলো— 'মা যদি মইরা যায় সেই মা আর মা থাকে না, শত্রু হইয়া যায়। মইরা যেই হানে যায় পোলাডারেও হেই হানে লইয়া যাইতে চায়। তার আত্মাডা পোলাডার চাইর পাশে ঘুইরা বেড়ায়। একা পাইলে কিংবা আন্ধারে কি বট পাইন হিজল তেঁতুল গাছের তলায় কিংবা নদীর ঘাটে পাইলে কাছে কেউ না থাকলে লইয়া যায়। নিয়া মাইরা ফালায়।' অমনি প্রতিবাদ করে ওঠে অনন্ত— 'না, আমার মায় অমন না। মায় আমারে দেখা দেয়, চোখে বড় ব্যথা, কান্দে। কি জানি কয় ঠাহরও পাইনা।' অতঃপর অনন্তর মা'র ভগবতী বেশ। বাসন্তীর কোলে অনন্ত শুয়ে আছে, এ দৃশ্যকল্প রচনার সম্পূর্ণতা একটা ঝড়ে। এর আগে টুকরো টুকরো দু' একটা শটে অনন্তর মনে তার মায়ের ভগবতী রূপকল্পনার ইমেজটাকে যত্নতার সঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ ঋত্বিক ঘটকের শ্রেষ্ঠ কাজ যেটুকু তা হচ্ছে নৌকা বাইচের আরম্ভটা এবং এর শেষ। চিত্রালোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই হয়ত এর শিল্পকৃতি নিয়ে দুর্বল ধিক্কার উচ্চারণ করবেন এবং তর্কের সিঁড়িতে 'গঙ্গা'কে এনে দাঁড় করাবেন। কিন্তু রাজেন তরফদার তাঁর 'গঙ্গা' প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন, এর প্রত্যেকটা 'এপিসোড' এক একটা জীবনের টুকরো টুকরো ছবি। তাই তিনি কখনো কোন চরিত্রের পরিণতির কথা ভাবেননি। অথচ ঋত্বিক ঘটক আইজেনস্টাইনের 'দি জেনারেল লাইন' কিংবা দভঝোঙ্কোর 'আর্থ'-এর মত চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমকে অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে চিত্র সম্পাদনার নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিত্রল ভাষায় একটি সমাজের অনেকগুলো জীবনের ধ্বংসোন্মুখীনতার ইঙ্গিত করেছেন। বিষয়বস্তুর কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাই এতে নাটকীয় উপাদান এসেছে। কিন্তু সংলাপ বাহুল্য অথবা আঙ্গিকসর্বস্বতায় চলচ্চিত্র সৃষ্টির নিজস্ব রীতিভঙ্গিকে কখনো জড়িয়ে ফেলেননি তিনি।

তারপর যে কথাটি তা হচ্ছে 'গঙ্গা'য় রাজেন তরফদার 'জলের জীবনের' উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সর্বাধিক। কিন্তু ঋত্বিক ঘটক সেই জলের জীবনের প্রেক্ষিতে ডাঙ্গায় উঠে এসেছেন। গোকর্ণঘাটের তীরের মানুষগুলোর হাসি, গান, পূজা-পার্বন এবং আনন্দের পশ্চাতে তাদের বিপর্যয়ের মুখোমুখি তাঁর ক্যামেরার চোখকে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

নৌকা বাইচের ঐ একটি দৃশ্যময়তার জন্য তিনি অনেকগুলো টুকরো টুকরো দৃশ্য নির্মাণ করেছেন। যেমন উদয়তারার (সুফিয়া) সঙ্গে অনন্তর চলে যাবার দৃশ্য, অনন্তর দৃষ্টিতে তার মাসীর জলভেজা পা থেকে মুখ পর্যন্ত ক্যামেরা তুলে আনা। 'কুত্তা' এই একটি মাত্র শব্দোচ্চারণে স্নেহকে বিতাড়িত করে ক্ষোভকে আমন্ত্রিত করা। কান্নার সঙ্গে প্রকৃতি নিয়তির একাত্মতা একটা বৃষ্টিতে— যখন ফ্রেমে রোজীকে প্রলম্বিত রেখে একটা খালি নৌকা চলে যাচ্ছে। তারপর নৌকা বাইচের প্রস্তুতি। এক একটা নৌকা ভিন্ন ভিন্ন গান। জীবনময়তা। মুখর তিতাস। এরই মাঝে অনন্তর সঙ্গে অনন্তর মাসীর সাক্ষাৎ। দু'টি প্রবল মাতৃস্নেহ মনের অন্তপ্রতিযোগিতা চূড়ান্ত রূপ নিল যখন একটি কলহে, ঠিক সেখান থেকে কাট করে নৌকা বাইচের শুরু। আবার প্রচণ্ড উত্তেজনাকর নৌকা বাইচের শেষে ভীষণ রকমের নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দ ফ্রেমে তিনটি মুখ— বাসন্তী, অনন্ত, উদয়তারা। এদের দৃষ্টি প্রসারিত তিতাসের আবির জলে। একটি দিনের শেষ। বেলা ডুবছে ক্রমশ। কর্মোৎসব ক্লান্ত ছায়া ছায়া ঘরমুখো মানুষগুলো তখন তিতাসের ধীরস্থির জলে অল্প শব্দে বৈঠা ফেলে সে নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে।

অনন্ত ... একদিন বনমালীর সঙ্গে নৌকোয় মাছ ধরতে যেতে চেয়েছিল। জালের নকশী জলফোঁটার ফাঁকে ফাঁকে অনন্তর গলার ধড়ার সুতোয় হাত রাখা আদুল গা উজ্জ্বল চোখ, দুর্বল দু'টি হাত দিয়ে জোর করে নৌকোর গলুই ধরে রাখার অন্তিম চেষ্টা। এবং অতঃপর জলেব ওপর দিয়ে ক্যামেরায় অনন্তর পেছন থেকে নৌকোর চলে যাওয়া— এ দৃশ্যের সঙ্গে বাসন্তীর নিরুত্তাপ খেদ 'অনন্ত যেমন আমার কাছে একটা নাম, তিতাসও তেমন একটা নাম অইয়া রইল। নামটা আছে, নদীডা মরছে'—এর যে সুসংবদ্ধতা এটা ঋত্বিক ঘটকের চিন্তা-সৃষ্ট। আবার যেমন ছবির শেষ অংশটুকু। বাসন্তী শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের বালু খুড়ে ঘটিতে জল তুললো। মুখে দিতে গিয়ে অলস হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গিয়ে প্রায় সবটুকু জল শুষে নিল তিতাসের বালু। ঠিক তখন যখন ক্লোজ আপে বাসন্তীর পিপাসার্ত মুখ, সেই চোখের অবাকতায় ভেসে এল নারকেল পাতা-বাঁশির সুরধ্বনি। গোকর্ণঘাটের দোল উৎসব এবং নৌকা বাইচের পর এই প্রথম এবং শেষবারের মত আবার ছবিটিতে সাঙ্গীতিক প্রয়োগ। মালোদের সম্ভাবিত শত্রু কৃষকদের দখল করা চরে ফসলের মাথা দোলা। তার মাঝে দিয়ে উঠে এল একটা জীবন। গান। সেই ফসলের ক্ষেত ধরে গামছা কাছা দেয়া আদুল গায়ের শিশুটি হেঁটে গেল বাঁশি বাজিয়ে। পাতার বাঁশি। তিতাসে আবার জীবন। আবার সেই নতুন ভবিষ্যৎ। অতঃপর পুরো ফ্রেমে বাসন্তীর আনন্দময় বেদনাক্লিষ্ট মুখের শটটি ফ্রিজ হয়ে যায়। এই শট নির্মাণে ঋত্বিক ঘটক যে সহজবোধ্য প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন তা কোন মতবাদের

শ্লোগানে উচ্চকিত নয়। জীবনের সত্য তাতে স্পর্শায়িত।

তিতাসে সমাজ বিশ্লেষণে পরিচালকের একটা চেতনমন কাজ করেছে গভীর অনুভবে। সে কারণে সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারি শাখার ম্যানেজার বিধুভূষণ পাল মালোদের যাত্রা দিয়ে অন্তরে মারার এবং ট্যাহা দিয়ে প্রাণে মারার দুঃসাহস করে। রজনী পাল যদিও জানে যে মালোরা তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে কয়না কিন্তু আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে রাধাচরণের দুঃস্বপ্ন সত্যি হলে তিতাসই এদের পাক খাওয়াবে। মালোদের সামাজিক নীতির বন্ধনও শ্লথ হয় তামসীর বাপের মত বামুন কায়ত ঘেঁষা স্বার্থান্বেষী মালোর কারণে। 'পান-তামাক খাবা, দশজনের দশ কথা হুনবা' এবং ভরতের বাড়ির উঠান চালার বিচার দৃশ্য যত না বাস্তবতার চাইতে সত্য, কেষ্টচন্দ্রর মত নৈতিক দুর্নীতিবোধ সম্পন্ন বিশ্বাসহন্তার প্রতি রামপ্রসাদের আক্ষেপ— 'শাস্ত্র এগোরে ভেড়া বানাইয়া থুইছে। আমি তো ধর্মের শত্তুর।' কিন্তু এর বিপরীতটাও আছে—প্রতিবাদ। বিপর্যয়-হতাশা ক্রমশ যখন গ্রাস করছে মালো সমাজকে তখন বাসন্তীর পুরুষ্ট গলার সতেজ চিৎকার— 'মালো সমাজের গায়ের রক্ত কি তিতাসের জল অইয়া গ্যাছে'।

আবার এই সমাজ বিশ্লেষণের কারণেই কাদির মিয়াকে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মের বিভিন্নতায়ও সমাজে রামপ্রসাদ এবং কাদির মিয়াদের মত সমান্তরাল চরিত্রের মানুষ বিদ্যমান। যদিও সে বাস্তববোধের বিশ্বাস থেকে 'রুমু'কে বই হাতে মক্তবে না পাঠিয়ে পাঁচন হাতে গুরুর পিছে মাঠে পাঠাতে বেশি আগ্রহী।

এ ছবির ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে যে কথাটি অবশ্য বলবার তা হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের যথাপ্রচলিত সুসজ্জিত সেটের বিরুদ্ধে একটি স্বধর্মী প্রতিবাদ। যদিও কাহিনী বিস্তারের স্বাভাবিকতায় তাঁকে এটি করতেই হোত, যেমন করতে হয়েছিল ইতালীয় নব্যবাস্তববাদী ফরাসী চলচ্চিত্রকার জ্যাঁ রেনোয়াঁর সুযোগ্য সহকারী ভিসকন্তিকে তার 'ওসেসিওনের' বেলায়। তাতেও প্রকৃতি-পরিবেশের একাগ্রতা লক্ষণীয়। বিশেষত তিতাসের কিছু শট নির্মাণে বিশ্বাসযোগ্য স্থান নির্বাচন। যেমন মাগন সর্দার যখন বলছে 'দোহাই তোমার কাদির মিয়া, শুধু একটিবারের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সর্বনাশতো অনেকেরই করলাম। আর কারও সর্বনাশ আমি করবো না। শেষবারের মত শুধু তোমার এই সর্বনাশটুকু আমাকে করতে দাও, বাধা দিওনা, প্রতিবাদ কোর না শুধু সহ্য করে যাও। এই আমার দোষ। দেখো তোমার সর্বনাশ করার পর আমি ভালো হয়ে যাব।' এবং কাদির মিয়া তাতে সম্মতি দিল। তখন ক্যামেরা নদী-পাড়ের শিকড় প্রায় উপড়ানো সেই ফলহীন উঁচু নারকেল গাছটার তলা থেকে উপরে উঠে এল। তারপর আবার মাগন সর্দারের ক্লোজ-আপ, মাগন সর্দারের দৃষ্টিতে নদী, আকাশ, নারকেল গাছের মাথা, যেখানে সে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এরকম আরো টুকরো টুকরো পরিকল্পিত, সুনির্বাচিত কিছু দৃশ্য। যেমন, গেরাপী দেয়া নৌকায় অনন্তর উঠে আসা এবং গাছের নীচে জমা জলে পাতায় ধরে থাকা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া, শুকদেবপুরের 'রাই জাগো' গানের সকাল, কালুর মা'র উঠোনে উদয়তারার

শ্বশুরের তুমরী খেলার বেত্তান্ত ইত্যাদি।

ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের প্রযোজনা এবং ওয়াহিদুল হকের গ্রন্থনায় সঙ্গীত ব্যবহারে এমন নিষ্ঠা বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোন ছবিতে নেই। এই অর্থে যে আঞ্চলিক লোকগীতি কীর্তন কিংবা লালন শাহের গান ব্যবহারের অনিবার্যতা এবং আবহ সঙ্গীত রচনার এ পরিমিতিবোধ এই প্রথম। এ প্রসঙ্গে ভিন্নার্থ মার্কিন ছবি 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'র কথা উল্লেখ করতে হয়, যে ছবিটি সঙ্গীত মুখর হয়েও যথেচ্ছ ব্যবহারে সঙ্গীতভারাক্রান্ত নয়।

নিষ্ঠাবান চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলামের পরিচালনায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ ক্যামেরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে। তাঁর কৃতিত্ব ছবির সর্বশরীরে বিতরিত। বিশেষত ক্রিয়েটিভ কিছু মিড ক্লোজ শট কয়েকটি দৃশ্যকল্পকে গর্ভবতী করেছে।

ভাল ছবির দুর্ভিক্ষাবস্থায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' যখন একটি ভাল ছবি তখন এর কিছু ত্রুটি ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু ক্লাসিক কিংবা আর্ট ফিল্মের স্বপক্ষে যে দু'টো জিনিস অবশ্য ক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে সম্পাদনা এবং এফেক্ট সাউন্ড। কিন্তু ছবিটিতে এর দু'টোই পবিপূর্ণতা পায়নি, যদিও চেষ্টার অন্তিমেও তা আন্তরিক। এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী এফডিসি'র যন্ত্রপাতি এবং অব্যবস্থা। নতুবা 'তিতাস একটি নদীর নাম'—এর চাইতেও বিশুদ্ধ ছবি হতে পারতো।



রাজার ঝি ও বাসন্তী

'Titas Ekti Nadir Nam' : A unique ballad on the impoverished

Film Critic

Titas, the familiar river of Bangladesh, appears to all with its serene nonchalance and forceful silence— a common scene perception of it would tell so. But then, enough of common sense is genius, where in Ritwik Ghatak, with his qunique touch of clairvoyance has found, incarcerated within the rythms of Titas, choked murmurs and smoulders of the people living alongside it.

Painted against this river is the Kaleidoscopic pageantry of a generation— 'Titas Ekti Nadir Nam.'

In the film, we find a distillation of Ritwik Ghatak's percipient attitude towards life, not regarding the contentiousness of man but the plain uncertainties that chain him down to a telling futalism.

Though a fragmentary analysis,'Titas Ekti Nadir Nam' envisages the spectrum of Bangalee life, in its entirely, carried through the vicissitudes of time. The film is a brilliant study in contrast— pleasure and pathos, sorrows and sentiments ; hopelessness in living and yet the impossibility of an escape the religious sensibilities and the endurance of superstition and tradition the typifying image and the universality of its appeal ; the sure approach to an end and yet, the continuity of living and civilization ; a recumbency and a resilience all at once.

In the simplest words, 'Titas Ekti Nadir Nam' is a vivid delineation of the typically pallid and impoverished living in Bengal.

Ritwik Kumar Ghatak, the famous Indian director, has taken on 'Titas Ekti Nadir Nam', only in the interest of pursuing the traditions that are very much his. We, in Bangladesh, have had the opportunity to enjoy his 'Meghe Dhaka Tara', a mediocre story done into exquisite verses. According to Ritwik Ghatak himself, 'Meghe Dhaka Tara' carries tacit, touches of commercialisation. He is of the opinion that 'Subarnorekha' is the most that he has achieved so far. Indian cine critics and journalists are prone to accept 'Komal Gandhar' and

Ajantric' as also among the best exponents of art-films. As a matter of fact, Ritwik Ghatak is still regarded as the best spokesman of art-film making in the intellectual quarter. They are of the contention that where Satyajit Ray give in, Ritwik begins. However firm the contention is, the basic discrepancy between the line of thinking of this two stalwarts is that the former is lyrically philosophical while the latter is rudely practical. Unlike Ray, who is aware of the suppleness and tenderness of human suffering, Ritwik takes to a sympathetic study of the uncouthness and gruesomeness of existence that he finds arround. He believes in poignancy though his treatment of the subject is ruthless ; he has a monumental distaste for ploughing into the hidden pathes of philosophic platitudes. He has a commitment allright politically or socially but he is never didactic about it. He simply places the vicious problems of life in all their ugliness and pristine form. 'Titas Ekti Nadir Nam' is one more promise in the tradition of Ritwik Ghatak.

By all means, Bengalees as we are, we ought to tender a note of gratitude to Ritwik Ghatak in whom we find an obsession for the land and people of Bengal. In asmuch as in any of his films, this warmth of a feeling is palpably felt in 'Titas Ekti Nadir Nam'.

The story of 'Titas Ekti Nadir Nam' by Adwaita Malla Burman, a resident on the bank of Titas opens up showing the people along the river trying to make a living out it. Fishing or otherwise they manage to brave the rigours of want or poverty. Against the canvas of this universal striving, Kishore Chand Burman (Prabeer Mitra) and Rajar Jhee (Kobori) are unexpectedly, and as effectedly by norms of conservatism united by the bonds of marriage. As ill luck would have it, the two are estranged the night after when Kishore is going back to his village, and attacked by gangsters. Rajar Jhee makes an escape by diving into the stillness of Titas. But this is a jump from the frying pan into the fire, since she does not even recall the name or face of Kishore, and hence loses herself in the wilderness. Kishore on the other, fails to withstand the shock and is mentally derailed : Incidentally Basanti (Rosy) of Kishores village, has been long expecting a hand from Kishore— circumstances change, and she gets married elsewhere and widowed almost at once. Rajar Jhee with her son Ananta (Shafiq) who moves about aimlessly in search of Kishore,

finds a happy and warm shelter in Basanti. Kishore and Rajar Jhee are near to each other, but the moment they recognise each other, both of them pass away quite queerly. The events there after revolve around Basanti the centrifugal force, and in whom we find an uncanny identity with mother. Bengal— with all her patience and forbearence to thwart off from her mopish and moribound state. The Titas changes course due to alluvial deposits the village go dry. Basanti dies of hunger and thirst, but only on a note of optimism — she beholds the green fields and a new generation aheads. And in the manner, the director has recognised and received an eternal truth.

The velocity of the events was rather slow but meaningful. Together with it, the director gave a sedulous treatment of a frightful but trenchant monotomy and voidness. These were powerful attachments to the story.

Ritwik Ghatak has been successful in giving a natural touch to every episode which all smelled the odour of a miasma that our rural living intinged with— indeed a ca eful painting of colourless life.

Again we are caught by Ritwik's sense of optimism, which in itself is a remonstrance against the existing order of things.

Speaking on the technical side, the director has elegantly used a few covers— the frequent rains, the pale darkness, the stickyness of a sequence— all very much redolement of a tranquility, an indolense and a retirement.

New sequences were strikingly pungent — Ananta recalling his dead mother is caught by the vision of mother Basanti. Titas in a shot is shown an insignificant row in the screen being ridiculously dwarfed by the interminable expanses of the skies.The water-hyacinth and Ananta shown together question our sympathy. The rigmarole of the village woman adds to the honesty of the theme. The oozings from the trees, after the rainfall, have been movingly significant, and seemed to be in union with the beatings of the heart.

'Titas Ekti Nadir Nam' is however, not without its gags. In the first place, there were too many shades to the woft and the warp that built the texture, which went thick and opeque to purposefulness. It has been felt that the character of Basanti has not been properly handled. Care should have been taken not to make it loud and melodra-

matic. The dual role of Mustafa as Ramprashad and Kader lacked a spark except to drive home the director's non-communal feelings. Kader-Kalu (Khalil) episode appeared extraneous to the main currents of the film.

Basanti's re-union with Kishore appeared a coincidence, and hence temperd with the naturalness of the treatment. However, there seemed a few apparantly disjointed sequences— the boat race, the quarrel over the new land etc. which hampered the flow of film.

In the cast of 'Titas Ekti Nadir Nam', Kabori, Mustafa and Rosy stand out convincingly for doing justice to their respective roles. Others played so-so. Rani Sarkar overstand her role while Shafiq in the role of Ananta played well but should have been more orphan-like.

Music by Ustad Bahadur Hussain Khan was controlled and meaningful, particularly the back-ground notes.

Photograph by Baby Islam was elegant and vivid. It went hands in glove with the mood of the sequences and the director.

Editing and sound recording was poor and definitely told upon the smoothness and of the theme.

A Falguni Kathachitra presentation, 'Titas Ekti Nadir Nam' is a fresh and daring attempt at rendering art-films in Bangladsh. With that touch of sophistication and art-making from Ritwik Kumar Ghatak. 'Titas Ekti Nadir Nam' has been a spell-binding exposure of our rural Bengal, a monumental and incisive study of the anals of civilisation of ours. in its barest attire, and a trenchent expostulation therein.

ঋত্বিক ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস'কে আঁকতে পারেন নি

সাইদ তারেক

মহরত উপলক্ষে একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল হোটেল ম্যান্ডারিনে। ডান পাশে হাসান ইমাম আর বাঁ পাশে বেবী ইসলাম, মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক ঘটক সেদিন বলেছিলেন তাঁর আগামী ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিভাবে তুলবেন, কেমন হবে ওটা, কে কে থাকবেন তাতে ইত্যাদি। জনৈক সাংবাদিক সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন : অদ্বৈত মল্লবর্মণকে কি আপনি সত্যিই জীবন্ত করে তুলতে পারবেন ?

পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে দু'ঠোঁটের ফাঁকে পুরেছিলেন তিনি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ওটা ধরিয়ে জবাব দিয়েছিলেন : কাজটা খুবই কঠিন। তিতাসের পাড়ে পাড়ে গড়ে ওঠা জেলেদের সমাজ-সংস্কৃতি, ওদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যত আপনার করে বুঝতে পেরেছিলেন, আর কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। তবুও তাঁর সমগ্র বইটা পড়ে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় মল্লবর্মণের মূল বক্তব্যটাকে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তারই ছবি তুলবো। সে বিশ্বাস আমার আছে।

সে বিশ্বাস আমাদেরও ছিল। আমরা বাংলাদেশের বাঙালিরা ঋত্বিক ঘটককে খুব সামান্যই দেখেছি। ওইটুকুতেই তাঁর সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তাতে আমাদেরও বিশ্বাস ছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে তিনিই জীবন্ত করে তুলতে পারবেন।

সেই তিতাস মুক্তি পেয়েছে। মুক্তি পেয়েছে এমন এক সময়, ছবিটির নির্মাতা শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটকের যখন কোলকাতার একটা নার্সিং হোমে রাজরোগের চিকিৎসা হচ্ছে। গত মে মাস পর্যন্তও তিনি এদেশে ছিলেন। মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সহকারী সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ থেমে থাকতে দেননি।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনার তীরে তীরে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। ফিটের পর ফিট ছবি তুলে গেছেন। পছন্দ হয়নি, ফেলে দিয়েছেন। সহকর্মীদের গালাগাল করেছেন। এবং অবশেষে তিতাস মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু ছবিঘর পর্যন্ত এসে টিকেছে মাত্র চৌদ্দ হাজার দু'শো বারো ফুট লম্বা সেলুলয়েডের ফিতে। ঋত্বিক ঘটক তাতে আঁকতে চেয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে।

কিন্তু পারেন নি। অদ্বৈত মল্লবর্মণের মূল উপন্যাসটি যাঁদের পড়া রয়েছে, ছবিটি দেখে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, ঋত্বিক ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসকে সেলুলয়েডের ফিতেয় আঁকতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিতাস যে নদীটির নাম, তাকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মেঘনা নদী থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে যে ছোট নদীটি আবার মেঘনারই বুকে এসে আছড়িয়ে পড়েছে, তিতাস নামের ঐ নদীটিকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে রূপে দেখেছিলেন, সে রূপ আজ আর তার নেই, তিতাসের পাড়ে পাড়ে গড়ে ওঠা মালোদের বসত, তাদের সমাজ, গোষ্ঠী, বিচার, আনন্দ, দুঃখ—অদ্বৈত মল্লবর্মণকে যা হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, সে সবের কিছুই হয়তো আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১]

অদ্বৈত বর্মণও আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কিন্তু তাঁর উপন্যাসটি রয়েছে। যার শুরুতেই তিনি বলে নিয়েছেন, তিতাস এমনই একটা নদী, 'দুষ্ট পল্লী বালক তাকে সাঁতরাইয়া পার হইতে পারে না, আবার ছোট নৌকায় ছোট বউ নিয়া মাঝি কোন দিন ওপারে যাইতে ভয় পায় না।'

অথচ ঋত্বিক ঘটকের তিতাসকে এমনটি মনে করার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতে তিতাসকে কখনো মনে হয়েছে পদ্মা-মেঘনার মতই বিশাল, আবার কখনো মনে হয়েছে বুঝিবা শীর্ণকায়া কোন খাল।

তিতাস পাড়ের মালো পাড়াগুলোর অবস্থান নির্দিষ্টকরণও পুরোপুরি সফল হয়নি। এক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক ছবিতে কোন রকম জিওগ্রাফিক্যাল চার্ট মেইনটেইন করতে পারেন নি। যার ফলে রাম প্রসাদকে মনে হয়েছে গোর্কণ ঘাটেরই অধিবাসী। ধলা গ্রামটিকে মনে হয়েছে আশে পাশেরই কোন একটা গ্রাম। উদয়তারার নিজের গ্রামটিকেও মনে হয়েছে তেমনি।

যার ফলে তিতাস এবং তার পাড়ের গ্রামগুলোকে এক এবং অভিন্ন বলে মনে হয়েছে। অথচ চিত্রনাট্যে দু'একটা ছোটখাট শট সংযোজিত করে বা শিল্পীদের ঠোঁটে কয়েকটা সংলাপ জুড়ে দিয়েই এই জটিলতা খোলসা করা যেত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে তৎকালীন জেলে সমাজ এবং তাদের আচার-সংস্কৃতির চিত্র আঁকতে সহস্র চরিত্রের আমদানী করেছেন। প্রতিটি চরিত্রই আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এবং উজ্জ্বল। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি এগুলো এঁকেছেন, এরই মাঝে কয়েকটা চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। ওগুলোর ওপর তাঁর ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল বলেই।

কিশোর-বাসন্তীর প্রেমোপাখ্যান বা অনন্ত, বাসন্তী, উদয়তারাকে নিয়েই অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর গল্প ফাঁদেন নি। তিনি আঁকতে চেয়েছেন ওই বিশেষ সমাজটিরই সঠিক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটিতে যেন বাসন্তী, কিশোর, অনন্ত এরাই প্রাধান্য পেয়েছে। এদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী, সমস্যা, গড়ে ওঠা সম্পর্ক, প্রেম

---

১. লেখকের এই বক্তব্য সঠিক নয়। সব কিছুই আছে, পরিবর্তন কিছু কিছু হয়েছে বটে, তবে মালোরা এখনো আছে, তিতাসও আছে। গত ১ জানুয়ারি ২০০১ সালেও 'সাহিত্য একাডেমী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া' ও 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি পরিষদ' থেকে অদ্বৈতের ৮৬তম জন্মদিন তাঁর বাস্তুভিটা গোকর্ণঘাটে পালন করা হয়—সেই অনুষ্ঠানে তাঁর স্ব-জাতির অনেকেই ছিলেন।

প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদিই মূর্ত হয়ে উঠেছে ছবিটির প্রতিটি দৃশ্যে। অন্যান্য চরিত্রগুলো এসেছে এদেরই প্রয়োজনে। কিশোর-অনন্তের মা'র নাটকীয় মৃত্যু, অনন্তর রহস্যজনক অন্তর্ধান এবং বাসন্তীর করুণ মৃত্যু— এগুলোর সঙ্গেই যেন এসেছে মালো সমাজের ভাঙন, তিতাসের মৃত্যু ইত্যাদি (ছবিতে যেমন মনে হয়েছে)।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিন্তু তেমনটি চাননি।... (অস্পষ্ট) চেষ্টা করেছেন এই সমাজটিরই অবক্ষয়ের কারণসমূহ উপাখ্যানে বর্ণনা করতে। কি করে স্বার্থবাদী চক্র এদের একতার মূলে কুঠারাঘাত হেনে ওদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, আচারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আধুনিক যাত্রাগানের জোয়ারে, কি করে এদের বিশ্বাসের শিকড় উপড়ে ফেলা হলো, কি করে এদের ধ্বংস করা হলো— অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসের 'দুরন্ত প্রজাপতি' খণ্ডে অত্যন্ত সুন্দর করে সেই সব চিত্র এঁকেছেন। অথচ ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই পরিচ্ছেদটি একেবারে অনুপস্থিত বললেই চলে। জমিদার, জোতদার, সামন্তপ্রভু, সুদখোর, মহাজন, গ্রাম্য টাউট, নব্য ধনিক গোষ্ঠির সুপরিকল্পিত চক্রান্তে কি করে মালো সমাজের একতার ভিত ভেঙে গেল, এই পর্বটি ছবিতে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। এবং এভাবেই অদ্বৈত মল্লবর্মণের মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যেত।

এ সব ছাড়াও মূল উপন্যাসের সঙ্গে ছবির অসঙ্গতি আরো অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তকে শহরে পাঠিয়েছেন, শিক্ষিত করে তুলেছেন, এবং একবার গোকর্ণ ঘাট গ্রামেও ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ছবিতে তেমনটি হয়নি। নৌকা বাইচের সময় উদয়তারার সঙ্গে বাসন্তীর মারামারির পর থেকে অনন্তকে বিদেয় করে দেয়া হয়েছে। অথচ অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনন্তবালা নামক জনৈক বালিকার সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

পাগল কিশোর এবং অনন্তর মা-র মৃত্যু দৃশ্যটিও অতি নাটকীয় তো বটেই অত্যন্ত হাস্যকরও। নদীর ঘাট থেকে একজন পাগল একটি সন্তানের মা-কে কোলে তুলে নিয়ে পালালো। নদীর তীরে এনে নামিয়ে রাখলো। সমাজসেবীর দল এসে পাগলকে ডান্ডা পেটা করলো এবং এরপর থেকে দু'জনের মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কোন একটি প্রাণীও (যারা নদীর ঘাটে ছিল) এগিয়ে এলো না, ওই ঘটনা নিতান্তই হাস্যকর। অথচ মূল উপন্যাসে এই অংশটুকু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কিশোরের বাড়ির উঠানে। সকলের সামনেই। কিশোর মারা যায় পরদিন ভোর রাতে আর অনন্তের মা মারা যায় চারদিন পর।

বাসন্তীর মৃত্যু দৃশ্যটিও ঋত্বিক বাবুর কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

ঋত্বিক কুমার ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের কাব্যময়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি বলেই এমনটি হয়েছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দেখে মনে হয়েছে ঋত্বিক ঘটক যেন তাঁর মন থেকে এই নাটকের নাটকীয়তাগুলো ঝেড়ে ফেলে

দিতে পারেন নি। যার জন্যে তাঁর চিত্রনাট্যটিও রচিত হয়েছে ঐ নাটকের ধাঁচে।

মূল উপন্যাস থেকে এতকিছু বাদ দিয়েও ঋত্বিক বাবু শেষ পর্যন্ত পর্দায় যতটুকু এনেছেন, তার প্রশংসা করতেই হবে। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পে, যে দুটো শব্দ প্রচলিত আছে অর্থাৎ 'আর্ট ফিল্ম' এবং 'কমার্শিয়াল ফিল্ম'— নিঃসন্দেহে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি সত্যিকার আর্ট ফিল্ম। ঋত্বিক বাবু এক্ষেত্রে প্রযোজকের সঙ্গে আপোষ করেন নি। এবং তা করেন নি বলেই তিনি ছবিটিকে এত সুন্দর করতে পেরেছেন। বিদগ্ধ মহলে এমনও মন্তব্য শুনেছি, রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা'র চেয়েও কোন কোন অংশে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ভালো হয়েছে।

চিত্রনাট্য অত্যন্ত সবল। সংলাপ মূল উপন্যাস থেকেই নেয়া। সেই সঙ্গে শট ডিভিশনও নিঃসন্দেহে গল্পের ঘটনা পরম্পরার মাঝে মিল রাখতে সমর্থ হয়েছে।

অবশ্য ছবিটির কোন কোন স্থান দুর্বোধ্য ঠেকেছে। মূল উপন্যাস থেকে অনেকখানি করে ঘটনা কেটে ফেলে সম্পাদনা করা হয়েছে বলেই এমনটি হয়েছে। এমনও দেখা গেছে একই প্রেক্ষাপটে নেয়া একটি শটের কাট টু শটই হচ্ছে চার বছর পরের ঘটনার শট। যার জন্যে অনেকক্ষেত্রে সময়ের পরিবর্তন বুঝতে হয়েছে— রাম প্রসাদের মাথার কাঁচা চুলের পরিবর্তে সাদা চুল দেখে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির পরিচালক হিসেবে ঋত্বিক কুমার ঘটক বরাবরের মত এ ছবিতেও তাঁর কৃতিত্বের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পীর কাছ থেকে তিনি কাজ আদায় করে নিয়েছেন ষোল আনা। ফাঁকি কেউ দিতে পারেন নি। এক কথায় বলতে গেলে রোজী, মোস্তফা, কবরী, রানী সরকার, খলিল সবাই ভালো অভিনয় করেছেন। প্রবীর মিত্রও যথাসাধ্য করেছেন। তবে তাঁর চরিত্রটি ছিল আরো অদ্ভুত। চিত্রনাট্যে তা সম্পাদনা করা হয়েছে।

ছবিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন 'তানহা' ছবির পরিচালক-ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম। ফটোগ্রাফি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে (যদিও প্রিন্টের দোষে অনেক সময় উল্টো চলে এসেছে)। বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ শটগুলো গ্রহণে ফ্রেম কম্পোজিশনে, আলোক নিয়ন্ত্রণে বেবী ইসলামের প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঋত্বিক বাবু অসুস্থ হয়ে পড়লে মোটামুটি বেবী ইসলাম, সহকারী পরিচালক ফকরুল হাসান বৈরাগী, সম্পাদক বশীর হোসেন এদের উপরই পুরো ছবিটার দায়িত্ব এসে পড়েছিল। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে শেষ পর্যায়ের কাজগুলো এদেরকেই শেষ করতে হয়েছে।

সম্পাদনার কতগুলো অংশ চমৎকার হয়েছে। বাসন্তী-উদয়তারার মারপিটে উদ্যত শট থেকে নৌকা বাইচে কাটটু শটের সংযোজনা নিখুঁত। ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে শব্দ গ্রহণ। যার জন্য সংলাপ প্রায় সবগুলোই অস্পষ্ট। বিশ্রী হয়েছে টাইটেল অংশটুকু। ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের পরিচালনায় গানগুলো শ্রুতিমধুর। আবহসঙ্গীতের উচ্ছ্বাস এ

ছবিতে নেই বললেই চলে। এটা নতুন মনে হয়েছে।

পর্দায় যতটুকু আমরা দেখেছি, তার প্রতিটি ছত্রেই ঋত্বিক ঘটক অনুভূত হয়েছেন। মনে হয়েছে ছবিটি যেন ঋত্বিক ঘটক ছাড়া মানাতোই না। অদ্বৈত মল্লবর্মণকে তিনি যতটুকুই রেখে থাকুন না কেন, চিত্র নির্মাণ, পরিচালনা, চিন্তা সর্বোপরি ব্যবসার সাথে আপোষে অবিরাম অনমনীয়তা ঋত্বিক ঘটককে তাঁর নিজের আসনেই অধিষ্ঠিত করে রেখেছে।

বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির মাধ্যমে এক নতুন ধারার সংযোজন করে দিয়ে গেলেন।

সেই সঙ্গে এটাও বলতে হয়, মূল উপন্যাসের যথাযথ রূপায়ণও কেবলমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল।



রাজার জি বাসন্তীর মাঝে মা-কেই যেন খুঁজে পায়

A Human Document: Titas Ekti Nadir Nam

Aey Eu Em Ef*

Ritwik Kumar Ghatak has put in the film 'Titas Ekti Nadir Nam' the versification of the poetry of life, moistened with tears, of an impoverished people living on the bank of the river named Titas. Although the story encircles the life of a few fishermen living in the village around the Titas, nevertheless, its approach being introspective and sociological, is capable of creating universal impact. The pathos in the struggle for life and living of the poor creatures, in a sense, embodies that of larger communities and societies throughout the world over who are labouring under the protracted process of exploitation by their dominant classes as well as their class enemies. As such these few characters, portrayed in this film, one conceivably discernible and identifiable by their counterparts elsewhere in the wide world.



Ritwik directing in the waist deep water of the Titas.

A.U.M. Fakhruddin

No attempt, deliberate or unintentional, has been made to complicate and compound the story. It is as plain and simple as the life of the havenots.

The matrimonial function of Kishore and Rajluxmi is solemnised without the least eclat. The marriage is made binding on both of them, specially on Kishore, by the primitive and predominantly conservative community of the fishermen (the malo caste). Earlier Kishore, a young man from a different village, saved a Rajluxmi and at the same time committed a sin, beyond his knowledge, by touching a virgin, who had fallen unconscious during a commotion. The social taboo ordains them to be married. Kishore has to surrender to the verdict of the ritualistic society, foregoing his sweet-heart Basanti, a girl from his own village, to whom he was to be married.

Kishore and Rajluxmi enjoy their first (as also the last) conjugal union in the bride-chamber.

On his way back to his village, with his wife and mates by boat, Rajluxmi is abducted by pirates. After much effort she frees herself from their hands, jumps into the river, manages to escape, and takes refuge to a terraincognito.

Year after, possibly for subsistence or for a newer struggle for life, Rajluxmi, along with her son Ananta, makes her journey, sheer coincidentally, to such a village as belongs to her husband, the Malo caste, provides her with accommodation. Kishore is now mentally unbalanced. Basanti, left widowed by the deceased Shukla Malo, becomes highly sympathetic to Rajluxmi and Ananta.

On the occasion of Dol, a religious festival, Rajluxmi somewhat recognises her husband and accompanies him on to the river wharf. Suddenly Kishore takes her in his arms and runs away from the spot. In seclusion he kisses her tenderly, whereupon the chasing village-folks beat him unto his falling down unconscious on the ground for his commission of (yet another) sin by touching an unrelated woman.

The gasping Kishore, in his dying state, cries for water to quench his mortal thirst. Rajluxmi, hitherto unable to sit due to fear and exhaustion, rolls her body down to the river soaks the fagend of her apparel, rolls herself up again to her husband, wrings out little drops of water into his mouth and looks on earnestly. Kishore opens his eyes for a while, fixes his look on his wife's face, recognises her.

Then he ardently pronounces the words 'my wife' and expires. Unbearable as the shock of Kishore's death is, she cannot restrain herself. The death of her husband brings about in her psychological composition a sense of fulfilment and satiety, and at the sametime a sense of resignation from life arising out of dejection throughout her lifetime.

Mother wells up in Basanti to rear up the orphan Ananta after Rajluxmi's death. But to her parents living from hand to mouth, this affection of hers for the lad is not palatable. Consequently Ananta is warded off from their house. Basanti is left alone thirsty for Ananta, › her a substitute for her own offspring, for ever. Ananta is adopted ›y Udayatara, a women from the same village.

Waves of time roll on. But the flow of the waters of the Titas diminishes due to the deposit of silt on her bed. How formidable can the cosmic relationship be is seen in the utter destitution of the people who from time immemorial depend on her for their living. Coupled with it comes the persecution of the exploiter money-lenders on the helpless folks. The money-lenders, preparing fraudlent bonds of loan and indulging in other malicious designs and finally proving the poor fishermen defaulters and guilty, set fire to their dwelling houses.

Some of them take to begging, some set out for migration to elsewhere. Basanti, rejected and ailing, goes to fetch some water by the sapped up Titas and falls almost unconscious. Suddenly she hears the resonance of a horn played by someone. She opens her eyes, and finds a bonny babe on the move in the alluvian paddy field blowing his horn of the glowing days of fruition to come.

The proper understanding of a work of art generally calls for a creative and sensitive participation of a connoisseur, or at least his sympathetic and analytical approach to it, but that the entire purport of the work is likely to remain in conceivably enigmatic.

In the treatment of the plot, based on the only voluminous immortal novel by Adwaita Mallabarman, Ritwik Ghatak's creativity in the method of doing it into a film has travelled wide a far from the confines of that particular literary form. The literary elements of the novel have transcended to a large dimension upon assumption of a kind of transubstantiation, a noble entity in his hand. Ritwik's can-

dour in portraiture, range in context, wit in handling human relations, immense knowledge of a community, conception of economic status, cosmic relation, struggle and profound sense of artistic distance, restraint and balance have made 'Titas Ekti Nadir Nam' a classic.

Anthropologically there is no denying of the fact that from time immemorial rivers like the Valga, Rhine, Nile, Ganga. Missippi, Amazon, Thames or the Yanktze Kiang have played an important role in the evolution of human civilization. In cultivation, navigation and in various other ways they have proved their utility to be a countable factor. Out in agrarian and riverine Bangladesh, this truth is all the more pronounced. A great many of her people depend largely upon the rivers for their bread and livelyhood. So is, presicely was, the case with the river Titas, a tributary of the river Meghna, in Comilla. In parts of Comilla it still does flow ; but at Brahmonbaria it is only a name now because deposit of silt reduced it to a narrow canal some half a century ago from today. How seriously overwhelming could be its adverse consequences on the life and living of the fishermen of the local Gokorna Ghat of Brahmanbaria on the bank of the Titas 'but a few drops of which even their death too is not complete to them?' Narration of this tragic tale by Adwaita Mallabarman has been translated into cinema by Ritwik Ghatak.

Although water earns them their bread yet the fishermen are not nomadic Gipsies like the Badiyas who live in boats. They are very much terrestrial.

The Malo caste is one bound by too many stack notions, superstitions and prejudices. This predominantly conservative community have their own values and attitudes towards life as other primitive social groups do. Pangs of life, to them are their destined and prearranged fate, codifite or not. Hence Kishore's touching of an unrelated woman brings about his impromptu marriage to Rajar Jhee or Raja Malo's daughter. Another touch, juxtaposed to this context, causes his death. To skip to another sequence of a sub plot, Kader Mia is persistently apathetic to give his grandson education because, to him, education makes an animal out of man. In the same sub plot Kader, ready to kill the money-lender being defrauded by him, withdraws only to honour the latter's got up assurance, even though the former will have to pay a costly price by that. Deep sense of morali-

ty of one squarely react upon the other who ultimately commits suicide. Impoverished, skinny, dreaty, threadbare people on the Titas ,whose eyeball have gone deep into their sockets and whose skeletons are palpably exposed due to starvation and consequent malnutrition can discriminate between good and evil when in the arbitration Mungli reflects the charges of suspicion by Kestachandra on Rajar Jhee saying— 'these are the headmen of our community who govern the mother's-in-low and allow their same by going to bed with their daughters to lie with their friends'.



Kishore Malo (Prabu Mitra) and Rajar Jhee or Rajluxmi (Kabori).
He, expired. She, towords resignation from life.

Conservatism of the community can again be seen in the scenes where Basanti and her female neighbours, and in one case Basanti herself, gustly rushes on Aswini and Bairagi who attempted to entice and tease her.

To be effective in bringing home the purport of a given plot or that of a theme, the cinema, a visual art form demands of a director to be in possession of the quality of visual sense. Ritwik demonstrates his impecable sense of this quality in this respect. Exploitation of montage in his hand has attained a virturo appeal. The basic aim and function of montage, to qoute Eisenstein, is that 'two film pieces of any kind, placed together, inevitably combine into a new concept, a new quality, arising out of that Justaposition.'

After the abduction of Kishore's wife we perceive a dark river on which pass boats, with lantern, and hert only lantern's light is visible alluding to the agony of her future. Her rescue by unacquainted boatmen to a terra incognita follows the drifting away a series of boats under torn and heterogenously patched sails connoting lapse of increase time. Visual details are present in the scences of the bathing of Kishore when his father expressed sighs of sorrow the frustrations of his life. The festive occasion of dol has been made vivid with details of the river wharf, a wave of merriment and two frolicking kids on the move. Gossiping season of the women, expecially Udayatara's reference to sexual humour. Ananta's playing with toy boat by the side of a pond, the following morning nocturnal storm, Basanti's mother's strewing of rice, the rural market place, Basanti's thread making— all these are fine examples of the director's keen sense of cinematographic details.

In the planning of some shots Ritwik has shown a balance sense of restraint as may be called the artistic distance. For a director who seldom maintains any shaved and soaped screenplay and keeps scenario in his memory only in fact very much out of the convention it sounds really incredible.

The death sequence of Rajar Jhee depicted of the director's subjective and lyrical approach to a ragged reality is one such specimen. The grim intensity of melodrama of the two consecutive deaths— Kishore's followed by Rajar Jhee's— has got a delicately suave

touch. The lingering storm of despair that was hovering within Rajar Jhee's bosom as long is now unleashed by the demise of Kishore which prompts her to self-extinction. As her total entity is void and meaningless to her so she relinquishes her life in the river. Unlike jumping into it she suspends her body right on the edge her hair waving with the ripples and thus reducing the rudeness of melodrama to a serene lyricism. Some of our papers have objected to this treatment because in the novel it is wholly dissimilar. Film making being a creative art should not necessarily dog the author always.

Ananta now an orphan finds a nest of solace in Basanti. This sequence has been shown in a symbolic method. The camera follows the lone Ananta to the whraf of Titas where his eyes are in constant search for a shelter. Within the range of his vision came shady waters the wide river and finally he discovers a patch of sky from beneath the shade of trees.

After a considerable lapse of time Ananta is warded off and he is adopted by Udayatara. In his parting sequence he jumps upon the deck of her boat. 'Its bad to jump like a ponn,' scolds Udayatara. Basanti beholds this with an eyeful of wrath and jealousy while her heart tends to break into pieces. The psychological condition of Basanti has been expressed with the effective sound of flinging cloths. Against the background of the river she is left alone. Camera makes her come closer. An unfocused boat at a far distance crosses her body suggesting a discretion of her entity— because her Ananta is not a separate entity from her.

The director's imaginative and dexterous treatment of situations is also sustained in the sequence of boat race. From start to finish it is superb. During the race begins a feminal dual fought between Basanti and Udayatara centering round their right of guardianship over Ananta. The physical confrontation of the two is shown in fusion with the climax of the race in medium shot significantly a montage and thereby it achieves a surrealistic elevation. All quit in the river bank : Basanti. Udayatara and Ananta are mum and motionless after the quarrel. The venue of the race in juxtaposition, is seen lying disarranged and disorderly.

"I think I cease to have the right to practice fine art if I fail in my duty to project the problem of my country in some way or other" said Mr. Ghatak sometime back. This is the key-note of his philosophy which has been exemplified in his earlierworks such as Subarna Rekha, Ajantrik and Meghey Dhaka Tara. Ritwik does not atleast morally give in to the conditions presented by the society. Rather he concludes with a note of optimism. In Meghey Dhaka Tara his optimism arrives at the point of a road in the process of being constructed afresh. Likewise in the final scene of the Titas he herals through a bonny baby playing his leaf-made horn on a paddy field the message of glowing future. And in the stop frame is composed the smiling face of the dead Basanti. Her efforts to fetch water from under the thick layer of sand (in the former shot) meets with success and although she does not live longer to see the happy days to come yet she relishes to enjoy that flashed forward symbolic vision.

But as the film is not altogether flowless so all its treatments are not wholly sunshiny.

The insane Kishor's behaviour in the sequence of cooking cakes is identical to that of a peeping Tom. The concluding shot of the scene of insult on Basanti's father by money-lenders could be more impressive rather than being expressive had the lone figure of the insulted person been left alone to dissolve. Appearance of another character has only over simplified it.

Again, the scene wherein Rajar Jhee falls unconscious for the first time suffers from hazy abstruction.

The profession of the Malo caste, that is fishing, is shown by a few shots of fishing boats and nets and a dialogue of Basanti's father (Ananta let us go a fish-catch). Often or not, at least once a year— in and around the month of November—the fishermen all over Bangladesh enjoy a happy season of fish-catch. Exploitation of this could be a rich addition to this film. Compared to this, Rajen Tarafder's Ganga, a tale about the same community depicts their profession in both, speech and action while in Titas the same undergoes understatement.

The sequence of arson, undoubtedly a store of high drama and a formidable factor to the fate of the community, has been done in an amaturishly prosaic way. More divisions of shots and a few optic shots could also save the sequence.

Dramatics personal of the film have potrayed their respective characters faithfully. The director has been successful in getting them to act proportionately. From among the central characters Rosy as Basanti stands out as a singular figure. Kabori as Rajar Jhee, Roushan Jamil as Basanti's mother, Sufia Rustam as Munglee and Khair as Basanti's father have given a balanced performance. Mustafa as Kader Mia and Ramprasad needs a little mention. Irrespective of caste and creed, the face of Kader's and Ramprasad's are same and similar. They repressent the traditional 'good angel'. Master Shafiqul Islam in the role of Ananta is commendable.



Basanti with a capsized pitcher, symbolic of the drying of the river in Ritwik's 'Titas Ekti Nadir Nam.'

Remarkably no western musical instrument has been used in the musical part of Titas. The theme music of which has been composed in a pathos-alluding note of Sarod by Ustad Bahadur Khan.

Traditional folk tunes have supported the emotionally significant sequences approximately. Repeatition of the tune, of 'Lila Bali Lila Bali ... Ki Diya Sajaimu Torey' has been used skilfully in a number of sequences.

But, equally the quality of sound recording has been much below the average standard. During the first meeting of Kishore and his wife in the nuptial chamber, the duration of sound effect of Rajar Jhee's respiration should have lesser.

In composition of frames and in controlling light, Baby Islam has proved his worth. The following shots of abduction, shower, Ananta's aloneness, Basanti's skirmish and above all the drying spectacle of Titas bear the propriety of this remark.

It would be more resonable of Baby to choose a single river to harmonise its impact. Of course in wharf scenes he has aptly done it. In the scenes of rain, spherical aberration and curvature of field have resulted in the photography.

Editorial treatment of the film, with exceptions of course, is not upto the expectations. Compilation of the shots at the beginning are rather incohesive. The suicide episode of Magan Sardar seemed 'incredibly hasty'. Editing of the last shot may be debated because most of the viewers desired that the duration of the noding pose of Basanti should have been a little longer. As regards this it may be argued that had it been a little longer it would have suggested that Basanti was alive. Kishore's lustful grab of Rajar Jhee has been misunderstood by some people as Pakistani style. But this action has a purpose. It alludes to the copullation of the two which further establishes her conception of Ananta. And again, the drying up of Titas and its consequent effect has not been convincing enough. As a result the impact, in totality, remained sort of incomplete.

Ritwik Ghatak, in `Titas Ekti Nadir Nam', has set forth his conception and visualisation thereof as an artist ; and in so doing he has set aside his dialectical belief and motivations. In fact, this a pure film.

This secularism is not really secular

Special Correspondent

How much secular is Bangladesh? What could be a reliable measure? If you have been to see that great film Titas in any of the local cinema houses, you possibly know that you have across the final and the most reliable yardstick. I dare Sheikh Mujib[1] and Moulana Bashani[2], Major Jalil[3] and Ataur Rahman[4] to go and see for themselves at first hand what they have done to the society only in one and a half years.

The story, taken from a famous novel read over and over by Bangladesh intellectuals worth the term, is set in a Hindu fishermen's village some sixty years back. And the dramatis personae most becomingly come out in dhotis. That is the first crime. The film has by one opening stroke fallen foul of the viewers' empathetic viewing. The huludhuani gracing a nuptial scene in the fourth sequence sets the entire house ululating in jeer and contempt. The tone has been set for maniacal two-and-a-half-hour communal outburst couched in the filthiest of parlance for which the home dialect of the city is so widely known. Kabori Chowdhury, otherwise the heart-throb of the millions, gets her share of psycho-pathological flings fashioned on pungent, references to genitalia and the act of procreation. Titas has gone dry and as the first thrust of a shot of the sand dunes it has yielded is place to come on the screen— a host of voices cry out Farakka, Farakka. And after the greatest end that Bangladesh screen has ever seen—viewers file out crying "Fuck up your art and culture."

Does it all mean anything to you, my dear Moulana ? Or to you Messrs Zafar[5]. and Menon[6] who flaunt your communistship as if that

1. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the then Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh.
2. Moulana Abdul Hamid Khan Bashani, the then Head of the National Awami Party (NAP-Bashani).
3. Major M. A. Jalil, Leader of the then Jatio Samajtantric Dal (JSD).
4. Ataur Rahman Khan. President of the then Jatio League (JL).
5. Kazi Abu Zafar, General Secretary of the then National Awami Party (NAP-Bashani).
6. Rashed Khan Menon, Publicity Secretary of the then National Awami Party (NAP Bashani).

was the purest thing in the world. Perhaps not. Because it is you who have first of all given currency to that apparantly harmless observation : Everything in Bangladesh must reflect the fact that 80 per cent of its population is Muslim. Moulana's politics of Allaho Akbar in other words says that nothing in Bangladesh should reflect that 20 per cent of its population is non-Muslim. Or that 100 per cent of its population was composed of human beings who had stubbornly refused to be netted by the same argument advanced by Muslim League and Jamaat. Or the Muslim politicians of secular Bangladesh, are you pleased with your performance, the sterling performance that has eclipsed the humanity of this wonderful people?

If you are happy I can give you some more gratifying information. At every stage of its processing at the government set-up known as FDC[7] frantic attempts were mounted to sabotage this *malaun* thing. Of the ten prints out —nine speak of utter recklessness of the lab— there is no touch of any attempt at grading the shots. With the best of ears you cannot follow the dialogue, not to say anything of the effect sounds and incidental musi .

So now you can safely depend on the Bangladeshi people for communilism and anti-Indianism. Your life's work is done, Moulana, and now you can join JSD[8] leaders in decrying communalism to your heart's content.

From February 1972 WAVE have been persistently warning the government,the parties and the society that , the strange politics of the time developing unhindered, this was what was going to happen to the society. No one heeded. Not even BCP[9] — the goody sapless commies or the cultural party of the Professor[10] . All the rest from the Sheikh to Oli Ahad —the loud non-entity— had indeed nothing to be worried over. This, in fact, was all fitting the course charted for the society like a glove.

It is a pert little game Bangladesh people are being used as pawns in. The government goes with a gusto in failing the people and betraying the greatest sacrifice any people has ever made anywhere— in the process writing off everything that the sacrifice stood for—and

7. Film Development Corporation.
8. Jatio Samajtantric Dal.
9. Bangladesher Communist Party.
10. Muzaffar Ahmed, President of the then National Awami Party (NAP-Muzaffar).

capitally succeeds in aggravating present problems and giving birth to new ones.The opposition blames it all—not on the government—but on India,or in other words, the Hindus. The government joins the bandwagon and starts taking diserect measures in consonnance with the bogey —measures that slowly but steadily takes the new-born state out of the sub-continent.The material and cultural condition of the people continues to worsen but, don't you worry, the opium adminstered to them has started working. Safe is the tenure of the Sheikh, safe is the image of the Moulana as the greatest patriot. Bangladesh has been secured for safe angling by all kinds of hirelings and political and economic adventurers. Bangladesh is safe at least for a decade or two from falling in to the hands of godless commies.

March-December 1971 posed a danger that perhaps Bangalees have come out of their endless circular journey centring on communalism. That danger is no more. Bangalees are safely back in the rotational motion of the blinkered 'kolur bolad'. The society must be kept divided— toiling man against toiling man. And what ever fight it puts up out of desperation must be against an imaginary foe. Meanwhile,the privileges are consolidated and the global imperialist line-up consecrated.

Can anyone tell me what the society is heading for ? Obviously these political quacks can not. They are always up to some game the end of which is never for them to determine. Independence of Bsngladesh came that way. Now all that the politicians have already harvested is the society furnishing a best study in worst ungratefulness, meanness and smallness, stupidity and irresponsibility. But what will it yield in the end — it is not for the Sheikh or the Moulana to determine.

And I won't have an answer from any one of those revolutionary quakers gurgling out their faith in the triumph of the masses in fits resembling those of an apoplectic. More than men of action, the country and the nation need at this hour men who can envision the future—who can decipher all that the present drift means—who can see what ought to have been done and what still can be done in order that the whole people is emancipated economically, socially and culturally. Where are these men? The nation is not only moving entirely without a direction but also without a significant number groping for a direction.

One naturally thought that the millions murdered in 1971 did more than settle the wages of the sins of the sub-continental politics

of communalism. But no, we are not yet finished with sinning. And fresh wages will have to be paid somehow some time. Has the society gone only communal ? Or is this degeneration part of a bigger whole ? Deprivation and misery, and history's worst betrayal of the people by their so-called leaders, have indeed wrought more than mere communalism on the society. A creeping virus of utter irresponsibility and inhumanity has been infecting the society. Civic sense, social sense, political consciousness, a plain simple traditional urge of being just good to one's own self and to immediate neighbours, a sense of tolerance and accommodation, of kindness and humility, gentleness and character, are all taking leave of the society.



Rajar Jhee, Kishore and Tilak Chand

If the drift continues, soon the Bangladeshi will forfeit the right of calling themselves Bangalees—inheritors and the progeny of Chaitanya and Chandidas, Mohsin and Madhusudan, Vidyasagar and Tagore. The nation will no more be a nation. Strands of human beings not organised into nationhood through civilising and unifying common values and legacies and a sense of belonging and pride all due to those, cannot emancipate itself, for, such masses reduce itself to being hordes and mobs and never can attain the lofty level called revolutionary force.

But the pendulum must sooner or later start on a counter-journey. The independence of Bangladesh has been used to kill all that was good in the Bangalee. It has been reduced into being solely and thoroughly counter-productive. The culprits are all too easily identifiable. Their reasons : myopic greed for temporary power and money.Not one of them are bothered about what will happen to the nation. For two more basic reasons : their agrarian rural background hadn't taught them to comprehend the abstraction that is a nation and instead gave them the only wisdom that all that matters is climbing out of the rustic morass in to a life of material success. Two : their Muslim League background disorienting them from any chance of looking at the whole society as their own.

How much more misery and blood will our present course need to set the pendulum on the other-way journey ? Couldn't the society be saved from paying all such unnecessary inhuman toll ? Till this very moment, no one seems to really care. Will the other-way journey start before the Bangalees have been stripped of everything that sustains a people as a free positive- acting creative nation ? There's no telling unless before long all the usurpers and looters, political, social and cultural thugs are eliminited wholesale and for good. Who will do that ? The masses ? They are now busy calling very dearly the names everything under the sun excepting their real enemies. Who will educate them ? The middle class ? The class that doesn't want to be itself ?

The rape of Bangladesh that started with Clive of Palassey and hit its peak in 1971, didn't end in December that year. It continues if only more devilishly. Bangalees will have to pay dearly to buy a way out. A way out of the consequences of each of the insults they hurled at their own way of living and their own people while engaged in a veritable horse-play inside cinama houses this week .

Bad Name : Titas Ekti Nadir Nam

Alamgir Kabir

Believe it or not . The inevitable has happened . The creator of "Komolgandhar," "Subranarekha" and "Ajantrik " the genius that had arrived like a dynamic fireball on the horizon of the sub-continental screen has dropped and sun in the waters of the Titas, tragically and ignominiously, probably never to rise again.

"Titas Ekti Nadir Nam" (based on a powerful, grim novel by Adwaita Mallabarman—a plebeian who lived the life of a fishing community of Titas area and died tragically in the early fifties in Calcutta—homeless, penniless, hungry and with both lungs shot through with tuberculosis, his masterpiece and only work still remaining unrecognised by the pundits) has been Mr. Ghatak's last attempt at a full length feature after a gap of nearly a decade. A compulsive alcoholic and endowed with a supertalent for making enemies he has very few friends left in India who would concede that he is still a cinematic force to be reckoned with. Some (like myself,) however, were inclined to believe that Mr. Ghatak was being made a victim of vicious propaganda and that, given chance, he could still show his mettle. A documentary that he had made during the liberation war of Bangladesh had ofcourse, displayed ominous laxities. But the blame was quickly and easily passed on the producer a wellknown Bangali star of Bombay-style screen by his left over admirers.

When the producers of " Titas" engaged Mr. Ghatak to direct the film, the news was received with great enthusiasm in Bangladesh mainly because of his popular "Meghey Dhaka Tara" (his only film ever released in this country) and also because he had no opportunity until then to make personal enemies here. Another story had been going round to tell that Mr. Ghatak had done a screenplay of "Titas" years ago after it became a collosal success as a stage play in Calcutta (produced by Utpal Dutt) and that he was waiting patiently for the great day when he would be allowed to film it on original location.

His producers in Bangladesh and the Government of Bangladesh displayed supreme confidence in him. After "Ajantrik" (when pro-

ducer Promod Lahiri spent his family fortune to foot his lavish production and liquor bill) Mr. Ghatak never had it so good financially—as the rumours go. The Film Development Corporation (FDC) provided him with newest and best filming equipment . It even went so far as to specially import special raw-stock for poor-light shooting conditions . Baby Islam, regarded by most men in Bangladesh film industry as the best cameraman, was engaged. Bashir Hussain, undoubtedly the seniormost editor, was hired. Most the actors and actresses (including some of television) were literally falling head over heels for their first ever chance to bag a prize at Berlin or Moscow . A long queue formed in no time for a chance to assist him even if as tea-boys. Unfortunately, these things left no other option for Mr. Ghatak but to deliver the masterpiece that everybody wanted and the novel that he chose deserved.

One important factor, however escaped everybody's notice. He was physically unfit . As the finished film shows now, this has affected his mental faculty. Years of self-torture left his once handsome-and-tall figure thoroughly fragile. At the fag-end it was also discovered that he has two tubercular lungs and he had to be removed to Calcutta for treatment. Before his removal he had completed most of the editing and the recording of back-ground music. The final sound-track of the film was, however, completed by Baby Islam. Thus, except for sound effects and some editing, the entire credit (?) for "Titas" must go to Mr. Ghatak.

The impression that "Titas" leaves in a conscious spectator's mind after its long, long, long 120-odd minutes is one of bewildering incomprehension. More than eighty percent of the disjointed film is uncinematic (with the great scope the situation offerred wasted) and almost slavishly follows the written style of the novel. Technically speaking, it is one of the most unfinished films ever made, even by Bangladeshi standards. In places, even ordinary continuity lapses prevail. The intellectual that almost anhinilates the film pertains to Mr. Ghatak's total inability to control the sense of time and rhythm. He did not seem to know just how long a particular shot or scene should last on the screen. Either it is glaringly of ten boringly lengthy or puzzlingly too short . The story revolves round the day to day tribulations of the fishing community that depends almost entirely on the fish of

Titas for its survival. Mr. Ghatak has established the fact simply by refusing to shoot a single catch of fish.

It is said that Mr. Ghatak prefers to keep the screenplay in his memory. Well, this time the memory has betrayed him badly. In one scene he establishes Khalil as the village stud who's going to win the forthcoming boat-race. Well, in the race everybody is present except Khalil in his anticipated role. Moreover, never before in our cinema a boat-race festival was filmed so insipidly and edited so listlessly. This one example shows that Bashir Hussain was too ill to handle the editing and that entire joining -up of the scenes—I hesitate to call it editing — was done by Mr. Ghatak himself .



Ritwik Ghatak

Acting, ofcourse; was never a strong point with Mr. Ghatak who has a natural inclination for the melodrama. "Titas" is no exception: In some scenes, it appears that he was trying to reintroduce about half a century later Russian theorist kuleshov's experiments with actor Moszhukin's "ambiguous " acting. This meant that artists need not be told what really they are to convey but would be asked to produce ambiguous expressions that the director would later treat with other shots (in editing) to produce the desired effect. As there has been little editing what " Titas " has been left with are a series of ambiguous, meaningless expressions. Why must Kabori die and why must she die letting herself roll down the not-too-steep slope of shallow Titas ? These are some of the questions that Mr. Ghatak may not have answers to.

That scene where Prabir rams Kabori on their first night of their shot-gun wedding carries with it touches of ridiculous comedy. When the two are locked in the nuptial chamber we hear a pecullar sound effect that somehow resembles the heaving of a blacksmith's busy bellow . We presume that the sound intends to convey the excitenent in the hearts of two virgins prior to their first sexual encounter. So far so good. But then, suddenly, Prabir grabs Kabori like a Pakistani soldier, throws her on the bed and dives on her. The camera quickly changes direction and we hear the same blacksmith's bellows much more louder now. The scene immediately reminded me of a scene from Eisenstein's "The General Line " where the Ox jumps on a cow-to-be-fertilised. Eisenstein brings home the humour by cutting immediately to a shot of surging sea-waves.

Alas, Mr. Ghatak forgets to follow up either with surging tides or with a cyclone to emphasise the animalism of Prabir. Obviously, he wanted to potray a simple, hot-blooded fisherman's animalistic desire for his first woman. True that rural studs are unaware of sophisticated love making. True that in such a situation he may not recite poems to her beauty or to that of the moon. He would certainly think of the only thing that he never tasted. But would he really go about it the way Mr. Ghatak has done ? After all, let us concede, the village people are not perfect animals.

Of course, no film is all bad—neither is "Titas". There are moments of cinematic beauty. Those shots of the monsoon rain are

good. But their charm is greatly robbed by overuse. The last scene has the kind of brilliance that one expected of Ritwik Ghatak, Rosy, about to die in the sand from hunger and thirst . Suddenly she has a vision. A little boy, playing his little flute, comes running toward her through the paddy field. A young widow without children but always yearned to be another, Rosy brightens up momentarily. Just then the boy turns and runs away from her and vanishes. The mirage ends and Rosy drops dead (like most deaths in the film— suddenly, swifty, and unnaturaly). The illusion idea seems to have a striking similarity with the little boy playing piccolo in the last scene of Fellini's 'Eight and Half' (1965). I do hope it was independently conceived by Mr. Ghatak.

It is a great pity that Baby Islam also has failed to hit the target. Some of his shots are good, but most are generally mundane. In one shot, he takes time to centre the characters in the frame : Even the editor fails to notice it : And, that boat-race sequence. It hardly does justice to his reputation.

Sound recording, too, rarely lifts itself above the general mess. Whoever was responsible for re-recording must have fallen in love with that barking dog—that kept coming on in season, out season.

In acting—if one must swallow the protean melodramatics—Rosy and Mustafa made things a little more tolerable. Raushan Jamil and Abul Khair also supported them well. Kabori was not only a misfit but was also the worst victim of Mr. Ghatak's "ambiguity" technique. And, Who advised him to introduce those silly "comic reliefs" in a film about struggle, hunger and death? What made the producers think that "Titas", even if it could turn out to be a masterpiece would have proved a commercial success in this polluted atmosphere?

It is tragic that such a superb subject had to receive such protrayal. Mr. Ghatak is seriously ill. He may never make another film anyway. Let us assume that the whole thing has been a night mare. Let us forget "Titas" and remember him as the dynamic film-maker that he used to be.

তিতাস : ঋত্বিক ঘটক

শেখ নিয়ামত আলী

মানবিক মূল্যবোধের একটা চরম দলিল —'তিতাস একটি নদীর নাম'। অমর সাহিত্যিক শ্রী অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত একটা ছোট গ্রামের বাসিন্দা — মল্লদের জীবন আলেখ্য এঁকেছেন। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফানের ভয়-ডর নেই এদের। মাছ ধরা ও জাল বোনা এদের একান্ত জীবিকা। তিতাস নদীই যেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের ভাগী। তিতাসের জলে এদের জীবন জুড়ায়। এহেন মল্লদের সমাজ ব্যবস্থায় যারা অবহেলিত, অপাংক্তেয়— মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মূল্যায়ণ করা কি কঠিন নয় ?

প্রখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রকার শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক, যিনি আবেগপ্রবণ বলে চলচ্চিত্র মহলে সুপরিচিত, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সংবেদনশীল মন নিয়ে মরমী কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি সাহিত্যাশ্রয়ী ছবি। দৃশ্যধর্মিতার গুণে এত বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে যে, মূল সাহিত্যের মৌলিক রূপ ও রস আস্বাদনে এর আবির্ভাব অনস্বীকার্য। গুটিকয়েক অপরিণামদর্শী বিদগ্ধ-ব্যর্থ জীবনের খণ্ডখণ্ড ঘটনার সংমিশ্রণ 'তিতাস একটি নদীর নাম'। চিত্রনাট্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাসন্তীর ঘূর্ণায়মান ব্যর্থ জীবন ও যৌবন (শুরুতে যার সূচনা দেখা গেছে), রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যহত অপূর্ণ জীবন, বাপ-মা মরা শিশু অনন্তের ভাসমান জীবন, রামপ্রসাদ কাকার নিঃসঙ্গ থাকা, কাদের মিয়ার উদার হৃদয় ও বাসন্তীর সইয়ের অতৃপ্ত মাতৃত্বের হাহাকার।

ব্রাখটীয় শিল্পতত্ত্বকে সামনে রেখে ঋত্বিক বাবু বায়লজিস্টের মত সমাজ জীবনের অন্তর সলিলে প্রবেশ করে মল্লদের সমাজ-দেহে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তার ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন। মনস্তত্ত্ব বা বিহেবিজম এ ছবিতে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল এবং সে দিকে গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় যেসব জায়গায় মোটেই ভুল হবার কথা নয়— সেসব জায়গায় সামান্য ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন— (১) বাসন্তী ও লক্ষ্মীর পিঠা তৈরি করার সময় তাদের জীবনেতিহাস বলছে, বিনয় পাগল সুস্থ ব্যক্তির মত বেড়ার আড়াল থেকে তা মনোযোগে শুনছে। লক্ষ্মী যখন পিঠা নিয়ে এলো তখন সে আবার পাগল হয়ে মাটি খোঁড়া শুরু করলো। (২) স্বামীগৃহে যাত্রাকালে ডাকাত দল কর্তৃক নববধূ অপহরণের সময় নববধূ লক্ষ্মীর চিৎকার সত্ত্বেও একই নৌকায় বর ও অন্যদের ঘুম ভাঙলো না ; ডাকাতরা লক্ষ্মীর গয়না কেড়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিল। (৩) উদ্ধারকারীরা তার পিতামাতার কাছে ফেরত না পাঠিয়ে ৮-১০ বছর পর রাজলক্ষ্মীকে স্বামীর গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। ৮-১০ বছরের মধ্যে কি মা ও বাবার মেয়ের খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো না ? এ ব্যাপারে চিন্তার সামান্য অবকাশ রাখে।

চিত্রনাট্যের ঘটনাবিন্যাস খুব দ্রুত পরিবর্তনের জন্য বোদ্ধা দর্শক ছাড়া হয়তো সাধারণ দর্শকের বোধগম্যের অসুবিধা হয়েছে। পরিচালক জাম্প কাট শট ও সংলাপের সাহায্যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিখুঁতভাবে ঠিকই কিন্তু সেই সাথে যদি 'ইনসার্ট অব এ কার্ড' তুলে ধরতেন তা হলে তাঁরই সৃষ্ট 'সুবর্ণরেখা' ছবির মত দর্শকের অন্তর আরও পরিষ্কার হয়ে যেতো।



অপুরুষস্পর্শী বিধবা বাসন্তী

সাহিত্যের মূল্যবোধ ও বক্তব্যের বিচারে পরিচালক হিসেবে ঋত্বিক বাবু যে কত বড় সে সম্বন্ধে আমি স্বল্প পরিসরে কয়েকটি দৃশ্যের উপস্থাপনা করছি। সেগুলো বোদ্ধা দর্শককে অভিভূত করেছে। প্রথমত: ছবির শুরুতে কিশোরী বাসন্তী মেখলার মত বাঁশের তৈরি একটা ঘূর্ণি বন বন করে ঘুরাচ্ছে। ঘুর্ণির ওপর নিক্ষিপ্ত সদ্য ভাজা খৈ খোসা ছড়িয়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে। পরিচালক বাসন্তীর জীবন যে জটিলতম তা ঘূর্ণায়মান মেখলার প্রতীকের প্রয়োগ দ্বারা সূচিত করেছেন। দ্বিতীয়ত: তিতাস পাড়ে পড়ে থাকা নৌকার ওপর বসে কিশোরী বাসন্তী সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি হেনে চেয়ে থাকে কিনারাবিহীন তিতাসের প্রবহমান জলধারার পানে। তার কিশোরী মন হয়তো বুঝতে পেরেছিল এই তিতাসই একদিন তার জীবনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে। হঠাৎ রাম প্রসাদ কাকার আগমন ও বকাবকি—' বড় হয়েছিস— বাড়ীতে যা, নদীর পাড়ে একা বসে কি দেখছিস ?' মল্লদের জীবনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে এই তিতাস যার জলে এদের প্রাণ তৃপ্ত হয়, এ তিতাস একদিন হয়তো থাকবে না, একথা ভেবে বাসন্তী তাই নদীবক্ষে ভাসমান পাল তোলা নৌকাগুলো দেখতে থাকে প্রাণ ভরে। তিতাসের প্রতি গভীর

মমতাবোধের জন্যে হয়তো তাকে তিতাসের বক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হয়েছে। ঋত্বিক বাবু ছাড়া এই ইমেজের প্রকাশ অসম্ভব বলে মনে করি। তৃতীয়ত: বাপ-মা মরা ছেলে অনন্তকে স্নেহ মমতা দিয়ে ব্যর্থযৌবনা বিধবা বাসন্তী প্রতিপালন করে। তার জীবনের একমাত্র ভরসা যেন অনন্ত। এই অনন্তকে শেষে ত্যাগ করতে হয়েছে মায়ের গঞ্জনায়। অন্তরের বেদনা নিংড়ে অনন্তকে নিয়ে চলে যাবে একদিন বনমালীর বোন। শেষ দেখার আশায় নদীর হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে বাসন্তী তাকিয়ে আছে নৌকার পানে। বনমালীর বোন পা ঝুলিয়ে নদীর জল ছিটাচ্ছে। অনন্ত এক পলক মাসীকে দেখে নৌকার ছাউনীর নীচে চলে গেল। নৌকা ছেড়ে বাসন্তীর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তখনও সে চলার পথ পানে তাকিয়ে রয়েছে। সুসাহিত্যিকের চেতনা ছাড়া কোন পরিচালক এত গভীর অনুভূতির তলদেশে প্রবেশ করতে পারতেন না। চতুর্থত: সুন্দরী বাসন্তীকে না পাওয়ার অপরাধে অত্যাচারী মহাজন বাসন্তীর বাবার ওপর একটা মিথ্যে দেনা চাপিয়ে দেয়। সেই দেনা শোধ না দেয়ার অজুহাতে ঘর বাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। বাসন্তীর চোখের সামনে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এদিকে তিতাস নদী মজে আসছে। বাসন্তীর জীবন ও যৌবন মজে আসা তিতাস নদীর মত ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে। নদীতে আর মাছ ধরা যায় না। গ্রামের চারদিকে হাহাকার। অভাবের তাড়নায় গ্রামের লোক অনাহারে মারা পড়ছে ক্ষুণ্নিবৃত্তি হাতে নিয়ে। সবাই ভিক্ষার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অসুস্থ বাসন্তী ছিন্ন কাঁথা গায় দিয়ে বাপের পোড়া ভিটে আঁকড়িয়ে বসে থাকে। তার মুখমণ্ডল পাংশু ও বিবর্ণ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চায়। এক বিন্দু জল নেই। চারদিকে ধূ ধূ বালুরাশি। শূন্য ঘটি হাতে সে এগিয়ে চলে মরা তিতাসের বুকে। তিতাসের বুক চিরে সে সামান্য জল বের করে। সে জল এক ঢোক খেয়ে বাসন্তী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ভেঁপুর তীব্র শব্দ ভেসে আসে। মুমূর্ষু বাসন্তী ঘার ফিরিয়ে দেখতে থাকে একটা ছেলে বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের মধ্যে ভেঁপু বাজিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাসন্তী ভাবে, হয়তো তার অনন্ত হবে। কিন্তু না, অনন্ত নয়— অন্য ছেলে। অবাক বিস্ময়ে তিতাসের বক্ষে ধান ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে মরে থাকে। বিশ মিনিটের এই মোনটেজ (montage) দৃশ্যটিতে কোন কথা ছিল না, শুধু ছিল মনে অভিব্যক্তির প্রকাশ। এই নিঃশব্দ ফ্রেমগুলোর মধ্যে এমন আবেগ ফুটে উঠেছে যা চিরদিন মনে থাকবে। মোনটেজের অদ্ভূত প্রয়োগে পুডভকিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। চিত্রগ্রহণে সুন্দর কম্পোজিশন এবং নিঁখুত ফ্রেমিং বোধের জন্যে ছবিটি এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে যে. ছবি দেখলে মনে হবে আমরা যেন জেলেদের দাওয়ায় বসে স্বচক্ষে এ সকল ঘটনা দেখছি। পঞ্চমত: সদ্য সম্বিৎ ফিরে পাওয়া পাগলা বিনয়ের মৃত্যুতে অপূর্ণ যৌবনা স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রাণ ফেটে তিতাসের জলে মৃত্যুবরণ দৃশ্য কেউ কি ভুলতে পারে? ষষ্ঠত: অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা বাসন্তীর স্টিলের মৃত্যুদৃশ্য কার না মনে গভীর বেদনার উদ্রেক করে?

আরো অনেক দৃশ্য আছে, যেগুলো চিরদিন ঋত্বিক ঘটককে স্মরণ করিয়ে দেবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ছবির আবেদন থাকবে।

তিতাস একটি নদীর নাম : অসার্থক চিত্ররূপ

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' পাঠকদের আলোড়িত করে। ঋত্বিক কুমার ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কোন আলোড়ন তুলতে পারেনি। মানবিক আবেদনের ছবি নতুন কোন ঘটনা নয়। তাছাড়া মানবিক আবেদন বিষয়টাও প্রাচীন। শুধু এই শ্লোগানই সুষ্ঠু ছবি সৃষ্টি করতে পারে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' যেভাবে জীবনের সাথে পাঠকদের ইনভলভ করে ঋত্বিক কুমারের 'তিতাস একটি নদীর নাম' দর্শকদেব সেই পরিমাণ বিরক্ত করে— কিছু বিক্ষিপ্ত শট ছাড়া। এ ছবির সম্পদ চিত্রগ্রহণ এবং ইতস্তত ছড়ানো কিছু অপূর্ব শট। কিন্তু সামগ্রিক ইমেজ গতানুগতিকতার উর্ধে নয়। আগাগোড়া ছবিতে অবহেলা স্পষ্ট।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', কিংবা শঙ্করের সাধারণ উপন্যাস 'সীমাবদ্ধ'-এর (তিনটিই সত্যজিৎ রায় কৃত) চিত্ররূপ নতুনভাবে কথা বলে এবং উপন্যাসের ঘটনাবলী ও বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের দুঃখ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মত উপন্যাসের চিত্ররূপ তারাশঙ্করের 'ফরিয়াদ'-এর চিত্ররূপের মত ফ্লপ করলো।

এ ছবি সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন : উপন্যাসের হুবহু চিত্ররূপ দেয়া হয়নি। এ প্রশ্ন অবান্তর।কোন উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ মানে পরিচ্ছেদের হুবহু চিত্ররূপ নয়। উপন্যাসের মূল বক্তব্য এবং সামগ্রিক চিত্র দর্শকদের নিকট সুস্পষ্ট করে তোলাই পরিচালকের কর্তব্য। ঋত্বিক বাবু 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তা পারেন নি। এবং এ জন্যেই এ ছবি আমার কাছে মনে হয়েছে মল্লবর্মণের অসার্থক চিত্ররূপ।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর এই করুণ পরিণতি আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়নি, কেন না গত কয়েক বছর থেকেই ঋত্বিক বাবু ভারসাম্যহীন এবং ১৯৭১ সালে তাঁর পরিচালিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'দুর্বার গতি পদ্মা' (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত) তার প্রমাণ। 'দুর্বার গতি পদ্মা'-র অবস্থাও অনেকটা 'তিতাস'-এর মতই। সে ছবিতেও ঋত্বিককে পাওয়া গেছে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত শট-এ।

'দুর্বার গতি পদ্মা' বা 'তিতাস' দিয়ে ঋত্বিককে আমি বিচার করবো না। বাংলাদেশের দর্শকদেরও আমি অনুরোধ করবো তারা যেন শুধু 'তিতাস' দেখে ঋত্বিক বাবুর ওপর ঢালাও মন্তব্য না করেন। কারণ এই ঋত্বিক কুমার ঘটক 'কোমল গান্ধার', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রভৃতি ছবিরও স্রষ্টা।

ঋত্বিক বাবু শিল্পসৃষ্টির খাতিরে কোন আপোষ করেন নি

জানে আলম চৌধুরী

'মেঘে ঢাকা তারা' খ্যাত প্রখ্যাত ভারতীয় পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং সুদীর্ঘকাল তৃষিত থাকার পর সুকুমার চিত্ত আমার যেন অবগাহন করলো মহৎ কালজয়ী এক শিল্পস্নিগ্ধ জলধারায়।

কিন্তু বিস্মিত হয়েছি সাধারণ (অধিকাংশ) দর্শকদের হৃদয়দ্বারে এ ছবির আবেদনের বাণী পৌঁছাতে পারেনি বলে। কেননা, ছবি চলাকালে হলের মধ্যে বিরূপ ও অতৃপ্ত দর্শকদের সারাক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পেয়েছি। প্রমাণ পেয়েছি ছবি শেষ হলে দর্শক সাধারণের কথাবার্তায়। কিন্তু এতে আমি এতখানি বিচলিত হইনি। কেননা অব্যবহৃত আয়নায় দীর্ঘ সময় ধুলোবালি জমলে যেমন কোন বস্তুর অবিকল প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়না— এখানেও ঘটেছে তাই। আমাদের দর্শক সাধারণ অশিল্পের বড়ি গিলতে গিলতে শিল্পের সঠিক স্বাদ ভুলে গেছে। জংপড়া হৃদয়দ্বারে সূক্ষ্ম শিল্পের মহিমা আবেদন পৌঁছাতে হয়েছে অপারগ। এটা সুন্দর ললিতকলার দোষ নয়। দোষ ললিতকলা গ্রহীতার বিকৃত রুচির।

'তিতাস একটি নদীর নাম' কে আমাদের বাংলাদেশের চিরাচরিত রীতিতে তৈরি স্থুল ছবির আলোকেই বিচার করলে তা হবে আহাম্মকি, এ হলো ব্যতিক্রম ধর্মী চিন্তাধারার একটি উৎকৃষ্ট ফসল। এখানে গতানুগতিক ছবির ভাবধারায় চোঙ্গা প্যান্ট, কোঁকড়ানো চুলসদৃশ নায়ককে আমরা পার্কের মধ্যে নায়িকার সঙ্গে ঢলাঢলি করে ন্যাক্কারজনক তোতা পাখির মত কয়েকটি শিখানো বুলিতে সীমাবদ্ধ দেখিনি। দেখেছি প্রসঙ্গহীন অকস্মাৎ এক ভিলেনকে আর সর্বশেষে নায়ক নায়িকার মিলনকে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ পাচ্ছি আমরা জীবনকে। এবং বিশেষ করে বলতে গেলে আবহমানকালের নদীবক্ষ আর নদীতীরের মাছ ধরা এক শ্রেণীর মানুষের সত্যিকারের জীবন-সংগ্রামের সঠিক সমাজ চিত্রকে।

চিরকালের দেখা জিনিস কিন্তু এমন করে তো কোনদিন দেখি নাই। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পরিচালক আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা-ই দেখিয়ে দিয়েছেন। নদীকেন্দ্রিক অনেক ছবি আমরা দেখেছি, কিন্তু জীবন এবং নদীর আলোকে জীবনকে এমন তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে এমনভাবে আর দেখিনি। এখানে পরিচালক আর দশটা চিত্র ভাবধারার কোন সঠিক কাহিনীতে আবদ্ধ না থেকে বরঞ্চ তিতাস পারের মাছ

ধরা মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনা আর সংস্কারের কথা নানাভাবে পর্যায়ক্রমে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন প্রবাহিত তিতাসকে সামনে রেখে। দেখিয়েছেন বিশ্বময় নিয়তির নিষ্ঠুর খেলা।

তিতাসের চির প্রবহমান ঢেউয়ের তালের সাথে তাল রেখে প্রেম আসে আবার ঢেউয়ের তালে তাল মিলিয়ে বিচ্ছেদ আসে। যে জলস্রোতকে মুহূর্ত-চিন্তায় পরম সত্য বলে মনে হয়, পর মুহূর্তে সেখানে অন্য জল অন্য স্রোত। যদিও আপাত দৃষ্টিতে তিতাসের জলধারাকে একই জলের খেলা মনে হয়। তেমনি এ ছবিতে প্রেমের খেলা চলছে ট্রান্সফরমেশনের ভিত্তিতে।

এ ছবিতে কবরীর জীবনে অকস্মাৎ প্রবীরের আবির্ভাব। কিন্তু সামান্য সুখমধুর প্রণয়ের পর কবরী আর প্রবীরের জীবনে নিয়তি নিষ্ঠুর ছোবল হানে। হয় বিচ্ছেদ। আবার বার বছর পর যদিও কবরী আর প্রবীর পরস্পরের সাক্ষাৎ পায় কিন্তু সেখানে তিতাসের প্রবাহিত জলধারার বুক চিরে নতুন বালিয়ারিময় চরের সর্বনাশা ইঙ্গিত। পরস্পর পরস্পরকে দ্বিতীয়বার চিনে নেওয়ার সন্ধিক্ষণে নিয়তির অমোঘ কঠিন হাত তাদের উভয়ের টুঁটি চেপে ধরে, দেখতে না দেখতে, বুঝতে না বুঝতে তিতাসের সুন্দর পরিবেশ থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় দুটি সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ। কিন্তু তিতাসের স্রোতে তো অনেক ঢেউ পরস্পরের গলাগলি করে এগিয়ে চলেছে মহাসমুদ্রের মহাপ্রস্থানের পথে। তাই কবরী আর প্রবীরের প্রেম শেষ হলেও তাদের দৈহিক প্রেমের ফসল পুত্র অনন্ত অনাথ। কিন্তু তাকে নিয়েও আদিম খেলা চলেছে এক মাতৃত্বহীনা হৃদয়ের জ্বালা মেটানোর প্রেমের খেলা। বাল্য বিধবা বাসন্তী তার প্রাণের অবরুদ্ধ মাতৃত্বের স্বাভাবিক প্রেরণায় গভীর করে বুকে আঁকড়ে ধরে অনন্তকে। অনন্তের মাঝে শাণিয়ে তোলে গভীর এক মায়ের ভালোবাসাকে। কিন্তু তা-কি রোজীর জীবনকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে? না, পারে নাই। তিতাসের গভীর জলধারায়ও একদিন সুকঠিন মাটির চর জাগলো তিতাসকে রিক্ত করে। রোজীর প্রেমেও চর জাগলো তিতাসের তালে তাল মিলিয়ে। এই হলো মোটামুটি তিতাস পারের ইতিবৃত্ত।

'তিতাস একটি নদীর নাম' চিত্রে সব চাইতে ভালো লেগেছে, সাধারণ দর্শকদের রুচি সম্পর্কে সচেতন থেকেও ঋত্বিক বাবু আপোষ করেন নাই শিল্পের সঙ্গে অশিল্পের। তাই আমি মনে করি বাংলাদেশের বস্তাপচা পরিচালকদের এ ছবি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। সুন্দরী নায়িকাদেরকে মেকআপ করে রাজরানী সাজিয়ে উৎকট নাচের দৃশ্য সেলুলয়েডের ফিতায় ধরার নাম শিল্প নয়। শিল্প নয় নায়ক-নায়িকা গলায় হাত দিয়ে কতগুলি তোতাপাখির মত শিখানো বুলি বলছে, তাতে সীমাবদ্ধ থাকা। শিল্প তাই, সত্যিকার জীবনের রক্ত মাংসের মানুষের সুখ দুঃখের কথা সঠিকভাবে রিপ্রেজেন্ট করার মধ্যে।

তিতাস তার জলধারাকে হারিয়ে একদিন সম্পূর্ণভাবে হয়ে পড়লো রিক্ত। সঙ্গে সঙ্গে তিতাসপারের মাছধরা মানুষের জীবনেও নেমে এলো অর্থনৈতিক ঘোর অন্ধকার। তাই

স্বাভাবিক নিয়মে তিতাসপারের মানুষেরা জীবনের মৌল চাহিদার অন্বেষণে ছিটকে যায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে। এক কালের যৌবনদীপ্ত বাসন্তীও (রোজী) জীবনের সব ঐশ্বর্য হারিয়ে তিতাসের বালিয়ারিতে ধুঁকতে থাকে জীবন প্রদীপ সাঙ্গ হবার প্রহরের দিকে তাকিয়ে। মৃত্যুবীজ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে তার দেহের কোষে কোষে। কিন্তু মৃত্যুর আগে তো এক পেয়ালা জল চাই সুপেয়। কিন্তু তিতাস বন্ধ্যা, তাই সে কঠিন হাতে বালিয়ারির স্তরে স্তরে জল খোঁজে। অবশেষে জল সে পেলো, কিন্তু তা পান করার মতো নয়, কাঁকড় আর বালিতে মেশানো— অন্য স্বাদ, অন্য রঙ। তবু মৃত্যুর শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে আধবোঁজা চোখে নতুন স্বপ্নময় এক সম্ভাবনাকে দেখলো— একটি নিষ্পাপ শিশু তিতাসের বুকে নতুন মাটিতে নতুন গজিয়ে উঠা কচি ফসলের প্রান্তরে দৌড়ে ফিরছে নতুন আগমনীর সুর বাজিয়ে।



মা-হীন ঘর-হীন অনন্ত নিরুদ্দেশ হতে চায়

Titas : A Raw Masterpiece

Sanjib Datta

Director Ritwik Ghatak nursed for years the fond idea of filming Titas. The long gestation while developing in his mind the details of the sequences must have wearied him at the same time not a least of the mile of images. The two cancelling trends could make the forms, frames and phases of motions composing the basic elements of a film clash headlong and confuse. Such conflict is indeed implicit in too long contemplation and in anything too ambitious. With another, this would have certainly spelled danger. Single outstanding strips of images distinctly over-pampared and going under their own power might have jostled their neighbours out to destroy the macroscopic effects supporting the film's integrity.

With Ritwik the prognosis should be reasonably reversed. what might have meant danger for others, could well proud him a most welcome blessing. This is not at all to imply Ritwik suffered from a mistrust of thought or from a lack of requisite contemplation. As a matter of fact, his rare engagement in films with long intervals for reasons hardly to do anything with opportunities, must perforce have made him run perpetually inside with his projects as a familiar piece. His past performances have all fairly withstood the pressure that the vacuum had imposed.

Perhaps, it would not be wrong to think that Ritwik had really needed the recess. The innate puissance and instantaneousness of his temperament drives him to rely on action with an accent. The bias does not stop at the virile alone lapsing occassionally to the point of violence is in the shocking scene of self-slaughter in his film 'Subarnarekha' where the ill-fated sister slits her own throat with a crude household fishchopper on revelation of incestuous sin while the camera concentrates avidly on the dying flutter. Nor does the active orientation rest only in the special choice of his subject matter spilling outwardly on to elemental clash and social concern. The basic earth and grassroot struggle for life found in the classic of Adwaita Malla Barman's ' Titas Ekti Nadir Nam' held for the reason

a nostalgic pull for Ritwik, but that is not all of the story. The performance for lusty action informs on top of every other thing the very special scheme, technigue, method and style of his film making to mark his agressive individuality. This is evident in his primary concern with dialectics and complete mastery over montage joining shots of situations at varience with time and place. His dexterity in the use of contrast, synchronism, and leitmotiv though with lesser storess on the analytical features of parallelism, similarity, and change of image range would have wholly satisfied a Timoshenko or Pudovkin who would stake for montage as the foundation of film art. This is no overstatement Both in the principle of cutting and within an individual scene Ritwik is a master of the montage An analytical investigation of Titas in its single frames together with the dialectical cutting will amply prove the point despite the extremely smooth flow of the film moving in perfect sympathy with the river motif. However, a perceptible mark is cousciously left to ticle the scene. This is felt in the presense of an even splash of rhythm running continuously through the length of the film again in tune with the rivers rocking waves. And this, too, is achieved by the subtle use of montage for no surprise. For what in the real sense of the word is montage but a requirement that the spectator should observe even so subtly the discrepancy among the shots that are joined together through the slices of reality are grouped in an integrated whole and the element of dialectic can be carried, if so wanted, like a verse rhythm ? The perfeetion of rhythmic composition with extremely clever use of montage in which Ritwik has excelled even his earlier achievements makes Titas live with ripples and pulses for one of the most notable contributions to the film world.

And yet Ritwik has reportedly expressed himself against his own product, for a reason. The denouncement was aimed in the main against what he considered a premature exhibition and a few internal sequences and not the over all product, as it is. With his knowledge and eye he could by no means have missed the exceptional merit of his strenuous labour and possible friction of his life's dream. Nor with his much talked of skill in doing magic with virile editing, could h spare the last touch to realise the goal and chop the film in one chancy sweep.

By and large, the film as recently exhibited in some raw fourteen reels is only a loose line-up of causality cut strips except at places where high montage is used, like the breath taking sequence of the boat race to parallel the rivalry of the two yearning young women, Basanti and Udayatara over the orphan child Ananta , or the slow rotatary movement of the boats poised against the rivers drift for a monetary fixing effect to symbolize the pity of man's intellectual efforts to scoop out a magic circle and hold to amid the passing stream of life.

In truth, the presented stuff was clearly meant to be some crude matter, as in fact it is, from which the director wanted to finally shape the just essential and perfectly measured film. For another thing, there are evidences of some juxtaposition of sequences totally unrelated with the main scheme of the film like the entire episode of Kader Sardar lapsing in to a show of sheer sentimentally in Magan's suicide which was better kept out. I would Ritwik had chucked the whole lot out for the greater integrity of his classic present. The sad accident of Ritwik's physical collapse at the last stage and forced absense from the scene have combined to deny him the most important part of finally editting the film and presenting in its intrinsic worth. What remains is now a mere stock of raw matter waiting to be welded in to its real form which for one with a capacity to see by a process of elimination would make for one of the best film done in the whole of the subcontinent.

তিতাস একটি নদীর নাম :
নদী বয়ে যায়—সভ্যতা গড়ে কখনো ভাঙ্গে

রফিকুজ্জামান

চায়ের আসরে ঝড় তোলার মতই বাংলাদেশে নির্মিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিকে ঘিরে ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনার ঝড় উঠেছে। ছবিটিকে যেমন কেউ জঘন্য বলছেন আবার কেউ একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আবার কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। ছবি ছেড়ে ছবির পরিচালককে ধরে টানাটানি করেছেন। কেউ তাঁকে পাগল বলেছেন আবার কেউ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পাগলের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। একটি ছবি বিভিন্ন দিক থেকেই খারাপ হতে পারে। সেই খারাপ দিকগুলো তুলে ধরে ছবির সমালোচনা করা কোন দোষের নয়। সেই সঙ্গে ভাল দিকটাকেও উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। তা না হলে কখনো সৎ সমালোচনা হয় না এবং সমালোচকও নিরপেক্ষ বলে বিবেচিত হননা। কিন্তু তিতাস ছবির বেলায় কোনটাই খাটে না। এখানে সমালোচকগণ ছবির সমালোচনা ছেড়ে আলোচনা করেছেন। তাও আবার আলোচনার বিষয়বস্তু ছবি নয়, পরিচালক স্বয়ং। সেটা হলো পরিচালকের ব্যক্তিগত জীবন। আলোচনার ধারা দেখে একজন সাধারণ পাঠকের এটা মনে হওয়া বিচিত্র নয়, যেন পরিচালকের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে, আর নয় তো নিজেদের মুর্খতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন অথবা গুণীর কদর দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিরচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিয়েছেন কলকাতার স্বনামখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর পারের জেলে সমাজকে ঘিরে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সে কাহিনীকে ভিত্তি করে জেলে সমাজের জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলোকে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি তাঁর ছবির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু সে ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই আবার নতুন আরেকটি সভ্যতা গড়ে উঠে। এবং এটাই ছবির মূল বক্তব্য অথবা মূল উদ্দেশ্য। অথচ কোন সমালোচক তাঁদের আলোচনায় একথাটা উল্লেখ করেননি। এমনকি ধারে কাছেও যাননি। তাই বলছিলাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির আলোচনা চায়ের আসরে ঝড় তোলা ছাড়া আর কিছু না। আসর শেষ হলে আলোচনাও শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যার কোন মূল্যই থাকে না।

সব ছবিরই কিছু না কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিও সে দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। তবে যে সব ছবি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের সপক্ষে নির্মিত হয়, যে ছবিতে মানুষের জীবনের কথা বলা হয় এবং সার্বজনীন আবেদন থাকে-- সে সব ছবির কারিগরি ক্রটি-বিচ্যুতি বড় কথা নয় বরং উদ্দেশ্যের সার্থক

রূপায়ণই মূল কথা। তাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির কারিগরি দিকগুলো বিচার না করে এর উদ্দেশ্যের সার্থকতা বিচার করলেই হবে এ ছবির সঠিক মূল্যায়ন।

তিতাসকে ঘিরে গড়ে ওঠা জেলে সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, সংস্কার, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামের কাহিনী খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পরিচালক। তাই এখানে ধারাবাহিক গল্প বলার আমেজটুকু পাওয়া যায় না। চলচ্চিত্রে গ্লামার অনুপস্থিত। এমন কি জেলেদের সাথে, ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যহীন কৃষক সমাজকে (কাদের মিয়া) টেনে আনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু এটুকুর যে প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যায়, ছবির শেষ পর্যায়ে জেলে ও কৃষকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির দৃশ্য থেকে। এসব কারণে ছবির গতি খাপছাড়া হলেও বক্তব্য কিন্তু ঠিকই তার পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। ছবির শেষ পর্যায়ে দেখা যায়, তিতাস শুকিয়ে যাচ্ছে। এটা জেলে সম্প্রদায়ের (বিপর্যয়ের) পূর্বাভাস। নদীতে চর পড়ে যায়। জেলেদের জীবনে ধ্বংস নেমে আসে। তাদের সমস্ত অহঙ্কার প্রতিপত্তি বিলীন হয়ে যায়। তারা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে নামে আর সে চরায় কৃষকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি সমাজ, জাতি তথা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় আর এরই মাঝে গড়ে উঠে নতুন আর একটি সভ্যতা।

পরিচালক এ কথাটি ছবির শেষ দৃশ্যে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। জেলে সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও অহঙ্কারের মূর্ত প্রতীক মৃত্যুপথযাত্রী ও তৃষ্ণার্ত বাসন্তী পানির খোঁজে চরার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এক সময় যখন পানি পেল কিন্তু তৃষ্ণা মেটাতে পারল না। মুখ থেকে গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই বালিতে মিশে গেল। তখন ছোট অথচ স্বাস্থ্যবান একটি কৃষকের ছেলে ফসলের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে চলে যায় আর বাসন্তীর মুখে স্মিত হাসি। বহু দূরে নদী তখনও বয়ে চলেছে আপন গতিতে।

তিতাস একটি নদীর নাম/ জীবন যে-রকম

আহমেদ জামান চৌধুরী

'এই মুহূর্তে অন্যান্য সব জিনিসের মতো চলচ্চিত্রও মনে হয়, আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে'। কট্টর মার্কিন চলচ্চিত্র সমালোচক পলিন কায়েল একদা এই উক্তি রেখেছিলেন। ভদ্র-মহিলা সমালোচকের এহেন উক্তির লক্ষ্য বস্তু অবশ্য ছিলো মার্কিন দেশীয় বাজারী ছবির স্বেচ্ছাচারিতা। মাদাম কায়েল লক্ষ্য করেছেন বাজারের নামে চলচ্চিত্র কতখানি কদাকাররূপে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। অতএব ওই উক্তি।

কিন্তু ধন্যবাদ মাদাম। কারণ তাঁর উক্তিটি আমার কাছে আপেক্ষিক মনে হয়। তাই এদেশে মন্টু পরদেশী নামক এক পরিচালক-অভিলাষীর ছবি 'মন নিয়ে খেলা' যখন দেখি তখন মনে পড়ে ওই উক্তি—আবার ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখতে বসেও মনে পড়লো ওই একই উক্তি।

পরদেশী সাহেব চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দেশছাড়া করার সব কসরতই করেছেন ; আবার কি আশ্চর্য তিতাসে ঋত্বিক ঘটক, চলচ্চিত্র-মাধ্যমের অমিত সম্ভাবনার খাতিরে চলচ্চিত্রকে প্রথাসিদ্ধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে কত সুন্দর ও কারুময়তার মধ্য দিয়ে নিয়ে গেছেন, রূপকার, বিদ্রোহী শিল্পী হিসেবে তাঁর ছবিকে তিনি অংশত কত মোহময় স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছেন। এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর এটাই এক বড় বৈশিষ্ট্য মনে হলো আমার কাছে।

ইতালীয় নিওরিয়ালিস্টিক চলচ্চিত্রকার ভিক্টোরিও ডি সিকা নাকি মনে করেন যে, তিন ধরনের চলচ্চিত্র পরিচালক রয়েছেন: প্রথমত, যাঁরা শীতল ও নিরস মননশীল ; দ্বিতীয়ত, যাঁরা ভঙ্গীময় এবং যাঁরা শুধু নতুনত্বের খাতিরেই নতুনত্বে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, যাঁরা মানুষ ভালোবাসেন, যাঁরা শুধু মানবিক সমস্যায় উৎসাহী, যাঁরা দুঃখ কি জানেন, যাঁরা সুখ কি জানেন এবং যাঁরা এ কারণে কখনো বিব্রত নন। তবে ডি সিকা চতুর্থ একটি শ্রেণীর পরিচালকও চিহ্নিত করেছেন— যাঁদের নিজের বৈশিষ্ট্যেই নিজেরা একটি শ্রেণী গড়েন।

ঋত্বিক কুমার ঘটককে আমার কাছে ওই চতুর্থ গোত্রের পরিচালক মনে হয়। তিনি মননশীল, তিনি বুদ্ধিজীবী, তিনি কখনো ভঙ্গিময়, তিনি মানবপ্রেমী— সবই খাটে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে। কিন্তু তবু সামগ্রিকভাবে তিনি যেন অন্য কিছু। এবং এই অন্য কিছু তাঁর ধমনীতে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে বলেই এগারো বছরের নিস্ক্রীয়তা আর স্বেচ্ছানির্বাসনের পর একমাত্র ঋত্বিক ঘটকের পক্ষেই তিতাসের মত একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে এদেশের ধারণা 'মেঘে ঢাকা তারা'র বৃত্তেই এখনো বৃত্তায়িত। কিন্তু ঘটকের কাছে এ ছবি যতই নিকৃষ্টমানের বলে মনে

হোক— ওখানেও ঘটক-স্ফুলিঙ্গ মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকেনি। শুনেছি এরপর তিনি নির্মাণ করেছেন 'সুবর্ণ রেখা' এবং 'কোমল গান্ধার'-এর মত নিয়ন্ত্রণ অবাধ্য ছবি। তারপর এগারো বছরের নীরবতা–– যার সুযোগে প্রচারিত নানাবিধ গুজব : ঋত্বিক ঘটক নাকি মানসিক ভারসাম্যহীন—ঋত্বিক ঘটক নিঃশেষিত ইত্যাদি। এবং অতঃপর 'তিতাস একটি নদীর নাম'—অদ্বৈত মল্লবর্মণের মহাকাব্যিক উপন্যাসের চলচ্চিত্রিক ব্যাখ্যা।

'তিতাস একটি নদীর নাম' দেখার পর আমার প্রাথমিক অনুভূতি হলো : ঘটক সম্পর্কে যাঁরা একদা গুজব ছড়িয়েছেন তাঁরা কত ভ্রান্ত একজন স্রষ্টার চিত্তের মূল্যায়নে। মনে হয়েছে, ঋত্বিক যে একজন শিল্পী একথা ভুলে তাঁকে তাঁরা সাধারণ বৈষয়িক গণ্ডির মানুষ হিসেবে বিচার করেছেন। আগেই বলেছি, ঘটক শিল্পী হিসেবে এক আলাদা বলয়ের বাসিন্দা— যে বলয়ের স্রষ্টা তিনি নিজেই। তাই তাঁর সৃষ্টিকে বুঝতে হলে আগে তাঁকে বুঝতে হবে। আর তাঁকে বোঝার সূত্র তাঁর ছবিতেই লভ্য।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ হিসেবে আমি তিতাস দেখিনি। তিতাস আমার কাছে একান্তভাবেই ঋত্বিক কুমার ঘটকের চলচ্চিত্র হিসেবে প্রমূর্ত। এবং তাই মনে হয়েছে এ-ছবি অংশত নৃতত্ত্ব—যেখানে তিতাস পারের জেলে সম্প্রদায়ের জীবনাচার বিধৃত ; অংশত চলচ্চিত্র মাধ্যমের দুঃসাহসিক নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত নীরিক্ষা, যেখানে তিনি ক্যামেরার চোখে একেকটি আশ্চর্য ছন্দময় মুহূর্ত রচনা করেছেন ; অংশত দর্শন যেখানে তিনি শেষ দৃশ্যে মজা তিতাসের গভীর থেকে জলের উৎস তথা আবার জীবনী-উৎস আবিষ্কার করেন ; অংশত কাবিতা যেখানে তিনি তিতাস বক্ষের রূপময়তা তুলে ধরেন ; অংশত মনস্তত্ত্ব, যেখানে তিনি মানব চরিত্রের আগ্রাসনী মনোভাবের একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য রচনা করেন মা আর মেয়ের মারামারির মাধ্যম ; অংশত আরো অনেক কিছু কিন্তু সম্পূর্ণ তিতাসের পরিচয় : তিতাস জীবন—জীবন যে রকম। ঋত্বিক ঘটক আশ্চর্য জীবনবাদী শিল্পী, জীবনকে নানা মাত্রায় দেখার প্রয়াস তাই এ ছবির বহু অংশে বিধৃত। একটা দৃশ্যের কথা বলি : বাসন্তী সামাজিক অনুশাসনের কারণে রাঢ়ী। অথচ সে যৌবনা। অন্তর জুড়ে তার বাঁচার নেশা। একদা গ্রামের একটি অথর্ব তরুণের মনে সে যৌবনের ভঙ্গিমা দিয়ে কাঁপন তোলে। বাসন্তীর মা আর বাবা সেটা দেখে। মেয়ের অসামাজিক আচরণে আতঙ্কিত হয়ে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—আর তখন বাসন্তীও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে : শরীরডারে বিলাইয়া দিমু— কন্যার উচ্চারণে বাবা মা বিমূঢ়। কিন্তু বাসন্তীর আচরণ ও উচ্চারণে জীবনের যে প্রতিবাদী রূপ তা অনুভূতিকে আঘাত করে যায় প্রচণ্ডভাবে। তিতাসে জীবন এত সৌকর্যময় হয়ে ওঠার কারণ—জীবন আর প্রকৃতির আন্ত:সম্পর্ক বড় গতিময়তা নিয়ে এ ছবিতে সুস্পষ্ট। এ কারণেই পরিচালক ঘটকের দৃশ্য নির্মাণে ওয়াইড এ্যাঙ্গেলের প্রাধান্য— যে কারণে মনে হয়েছে কখনো প্রকৃতি আর মানুষের সহাবস্থান কখনো বা প্রকৃতির বিরাটত্বের তুলনায় মানুষের অসহায়ত্ব।

তবে তিতাসের সবচে' বড় জীবন তিতাস নদীই। যে নদী বেঁচে থাকলে কতগুলো জীবন বেঁচে থাকে— যে নদী মরে গেলে কতগুলো জীবনও নিঃশেষ হয়ে যায়। নদী

তা আর জীবনাচারের সূত্র— এই ঐতিহাসিক সত্যই তিতাসের মাধ্যমে পরিচালক আবার মূর্ত করলেন।

তবু আমার একটি অনুযোগ ঋত্বিক ঘটকের কাছে, যে তিতাস তিতাসপারের জনগোষ্ঠির কাছে এত শক্তিময়, সে তিতাসের বুকে একটি মাছ ধরার ম্যাসিভ দৃশ্য কেন তিনি এড়িয়ে গেলেন ? আরেকটি অনুযোগ তিতাস কুমিল্লা জেলার নদী। কিন্তু ছবির তিতাসের মানুষগুলোর সংলাপে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ধ্বনি কেন বেজে উঠলো। অনুযোগ আরেকটি, তিতাস নদীর ভাবকল্পের ধারাবাহিকতা নেই কেন ? কখনো এ নদীকে পদ্মা-মেঘনা বলেই বা মনে হয় কেন ? অসম্পূর্ণতা তিতাসে আরো আছে। কিন্তু জীবনের উষ্ণতা এখানে এত বেশি— অসম্পূর্ণতা যে জন্যে বড় নয়। তা ছাড়া অসম্পূর্ণতা কোন সৃষ্টিতে নেই ?

বাজারী ছবির অভ্যস্ত চোখে তিতাস সম্পর্কে অনুযোগ করবার একশ আঠারো কারণই হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলাদেশের চিত্রনির্মাতা ও দর্শকদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ এ ছবিটি দেখুন। আর ভাবুন। নিন্দা করে একে হিমাগারে এক মুহূর্তে ফেলে দিতে পারবেন অবশ্যই— কিন্তু তাতে আপনারাই হারাবেন অনেক কিছু ; আর যদি একে একাডেমিক ছবি হিসেবে বিচারের চেষ্টা করেন তা হলে অন্তত একটি জিনিস পাবেন আর তা হচ্ছে বোধ। সে বোধ : আমারা কোথায় আছি ?

পুনশ্চ: তিতাস প্রথামাফিক অভিনয়ের ছবি নয়। তবু এ ছবির কবরী, রাণী সরকার, রওশন জামিলকে ভোলা যায় না। আর ভোলা যায় না উদয়তারার চরিত্রে শিল্পী সুফিয়াকে। সুফিয়া আনকোরা নতুন শিল্পী— অবিশ্বাস্য লাগে কথাটা তিতাস দেখে।

Still 'One' Cheer for Titas

Special Correspondent

This week saw the last hesitant flickers of *Titas* die out. I don't mean the gas— Goodness forbid it. But the film. Opening on July 27 at eight Dacca cinema houses, it went off at all of them the week next. Little Naz picked it up perhaps out of a sort of kind condescension to its makers' S.O.S. And Naz too said good bye on Thursday. The most discussed film of the 20-year old Dacca cinema industry went out most ignominiously.

Week before last[1] I had tried to pin-point one of the reasons for Titas's apparent failure to hook what editor pralay Shoor of Movie Montage, Calcutta calls— Shalar public— abar whimsical— o botey. Plain unadulterated communalism— nothing very much really to do with the public's aweful immaturi.y as cine-goers—caused the most damage.

How I wish Pralay Shoor was in Dacca after the release of Titas. For in that case he would have exclaimed Shalar critic— abar whimsical— o botey. *Chitrali* and *Bichitra*, the too most sought— after entertainment weeklies simply dared not join the fray at least till Thursday last. The heat already generated was too much. One week *Dainik Bangla* extolled the great qualities of the film and in the very next dismissed it as little better than nothing.

Banglar Bani wouldn't commit itself either excepting a passing reference aimed at a critic of the film who they felt had gone mad. But such inexplicable reservation provided only conspicuous exceptions to the general ovation given to the film by all other critics and journals—excepting one—and there lies the greatness of Alamgir Kabir the big.

One fine morning Alamgir Kabir came into print to proclaim his greatness as the master of spiteful. When this critic turned film-maker, one thought the journals would be the poorer by the loss of a

1. 4th August, The Wave Weekly, 1973 : This secularism is not really secular.

master of the land and the garish and a supreme artist in self - publicity. He is even credited by some as having observed that now that he had embarked on film-making, he wouldn't anymore dabble in film criticism for that would be neither fair nor fitting. Titas's will be the unenviable distinction of drawing Alamgir out in all his cultivated ignorance of the medium. Let alone the whole film— there are patches which should have or indeed could have made him exclaim to himself " Boy, that will take me twenty years to comprehend and copy"— only if he were honest to himself and knew a bit or two about things he has written most of life on. But that was not to be. For he sees himself as a *Bangladeshi Satyajit* in the making. He perhaps knows that more than making everyone his enemy, Ritwik Ghatak has come to be admired and championed by the better part of Indian intellectual stalwarts, his alcoholism notwithstanding. And he has been and continues to be a supreme source of discomfiture to Satyajit who nevertheless nurses a great fund of respect and admiration for this erratic wayward artist. Alamgir is no artist and he hasn't the making of ever growing into one. So the cat must be killed on the very first night.

It doesn't need a great mind to take Alamgir on point by point— anyone one of those crazy film society boys can do that. And some of them can even excel him in his own art—spite. But a film is altogether a different matter— specially if it happens to be such a creation as Ritwik Ghatak's *Titas*. *Titas* may not come to be the greatest money spinner Bangladesh has ever know— but has been decidedly one thing— a film of consequence. And life-long endeavours of the ones such as Alamgir would be gruelling exercises in the inconsequentical, if his *Holiday* review is any true indicator.

If films have anything to do with art (which is quite debatable if one hasn't seen better things than the rubbish churned out by Holywood, Bombay and Dacca), *Titas* has been the first significantly artistic creation made in Dacca. If a film can be an important cultural event— *Titas* has been the first of such things this side of the Ganges. If films can inspire and can endow men with greater insight into their own society— *Titas* is the very first that will do so in Bangladesh. *Titas* documents the humanity of the toilling people of Bengal. If not their drudgery which is only demeaning— and does it in the best of film languages.

Titas is not really a paragon of technical flawlessness. But that should not have been excuse for a government-owned cinema-house to get it off the screen even while the turnover was fair to good. The fact is *Titas* has run into a motley array of forces working up to murderous resolvs. Even if it means certain ruin to those financing it—it is welcome. For, from now on truly creative forces in film and those that have been prospering by prostituting the medium will perhaps start polarising. *Titas* has already done this good turn to the strange world of Bangladesh films.

And why should the makers of the film come to ruin. It was the government's supreme duty to do something to develop a healthy and meaningful trend in the industry. And to discourage what is at its best a nuisance and at its worst positively harmful joy-ride, both socially and culturally. The government has failed in that illustriously. Now that some other people had taken it upon themselves to do the need of the hour—will the government let it be punished for their folly thus allowing itself to become indirect accomplices of the forces of prostitution?

No. The government has been offered a golden chance of showing that it is an uncultured ungrateful wretch— as is supposed by many. By a flick of pen they can do wonders at least in this case. *Titas* is the strongest case that was ever for being allowed exemption from the amusement tax. My appeal to the government is : Give back to the producers of this momentous film whatever accrues by way taxes collected on it and you will see rush for making good films. Keep it up, institutionalise it as India has done. When the honest and the creative will know that however challenging a film may it is not going to lose money, the greatest will have been done to this domain, till now of the least worth.

Meanwhile, I would appeal to the exhibitors, specially Mr. Awal, their spokesman, to realise that their performance has been shameful. *Balaka* and *Gulistan* were doing fine business with *Titas*, in spite of the communal possibly hired, barracking. We, the more conscientious of the cine-goers, call upon you to see that *Titas* is not condemned to accompany potato to some Dacca cold storage. It won't be a bad idea to try to justify once in a while the fleecing of the people, done in wonderful concert by the government, the producer-distributors and the exhibitors.

তিতাস একটি নদীর নাম : দর্শকদের প্রতিক্রিয়া

(দৈনিক বাংলা : ২৩/৩০ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ২/৪, পৃ. ৪/৬)

গত ২৪ শ্রাবণ তারিখে চিন্ময় মুৎসুদ্দী লিখিত 'তিতাস একটি নদীর নাম : অসার্থক চিত্ররূপ' শীর্ষক আলোচনায় মতদ্বৈততা সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের লেখার জন্য লেখক পাঠক সমাজে পরিচিত। কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এর অসার্থকতার পক্ষে তিনি কোন বাস্তবধর্মী যুক্তি প্রদর্শন করেন নি। (তাঁর একমাত্র যুক্তি হলো তিতাস-এ উপন্যাসের মূল বক্তব্য এবং সামগ্রিক চিত্র নাকি দর্শকদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি)। বরং তিতাস-এর চিত্ররূপকে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে সত্যজিৎ রায় কৃত 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' এবং 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসত্রয়ের চিত্ররূপের সাথে তুলনা করেছেন। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে তারাশঙ্করের 'ফরিয়াদ'-এর চিত্ররূপের ফ্লপের সাথে 'তিতাস'-এর চিত্ররূপের ফ্লপকে তুলনা করেছেন। যা আমাদের নিকট অন্ধকে হাইকোর্ট দেখানোর মতো মনে হয়েছে। কারণ যেসব ছবির সাথে তিনি 'তিতাস'-এর তুলনা করেছেন বাংলাদেশের খুব কম সংখ্যক দর্শকই সেসব ছবির সাথে পরিচিত। তাই মুৎসুদ্দী মহাশয়কে অনুরোধ করবো ভারতীয় ছবির প্রসঙ্গ না এনে নিজস্ব যুক্তির মাধ্যমে তিনি যেন 'তিতাস'-এর অসার্থকতা প্রমাণে ব্রতী হন।

চিন্ময় মুৎসুদ্দী মন্তব্য করেছেন 'তিতাস' দর্শকদের বিরক্ত করে। আমি জানি না তিনি ক'জন বিদগ্ধ দর্শকের মতানুসারে 'দর্শকদের বিরক্ত করে' এমন একটি সার্বজনীন মন্তব্য করেছেন ? তবে কি তারাই মুৎসুদ্দী মহাশয়ের নির্বাচিত দর্শক, যারা ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অশ্লীল উক্তি করতে থাকে বা ছবির শেষ হবার অনেক পূর্বে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে বা যারা ছবিটি দেখে অপরকে না দেখার অনুরোধ করে ?

চিন্ময় মুৎসুদ্দী তিতাস-এর মাঝে খুঁজে পেয়েছেন মাত্র কিছু বিক্ষিপ্ত শট্, অন্য সবকিছু গতানুগতিকতার ছকে বাঁধা। আমি হয়তো তাঁর মতো অসাধারণ দর্শক নই বলে তিতাস-এর প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৈচিত্রের সন্ধান পেয়েছি।

ঋত্বিক ঘটকের গভীর আন্তরিকতা তিতাসকে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকসমষ্টির জীবন-কাব্যের রূপ দিয়েছে ; সে জীবনবোধের গভীরতা তিতাস-এর মাধ্যমে আবহমান বাংলা-বাঙালির জীবনধর্মের সুর বাজিয়েছে— চিন্ময় মুৎসুদ্দী সেই তিতাসের মাঝেই অনুভব করেছেন 'আগাগোড়া ছবিতে অবহেলা—'। এখানেই বিস্মিত হবার উৎস। প্রত্যেকটি দৃশ্যকে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা আমরা চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রত্যক্ষ করেছি তার মাঝে অবহেলার কোন প্রমাণ আমি পাইনি। তবে কি চিন্ময় মুৎসুদ্দী তিতাস-এর উপর একটি ব্যতিক্রম মন্তব্য করে দর্শক সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন ?

তিতাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুৎসুদ্দী মহাশয় মন্তব্য করেছেন 'ঋত্বিক ঘটক কয়েক বছর থেকেই ভারসাম্যহীন।' ঋত্বিক ঘটক বিষয়ক এই তথ্যটি চলচ্চিত্র উৎসুক প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর জানেন। কিন্তু তিতাস-এর অসার্থকতা সেই ভারসাম্যহীনতারই ফসল, তিতাস সম্পর্কে এটা মুৎসুদ্দী মহাশয়ের সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। তবে যে তিতাস-এর করুণ পরিণতি তাঁর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে, সে তিতাস-এর মহান উৎকর্ষতা আমার কাছে মুগ্ধকর মনে হয়েছে। চিন্ময় মুৎসুদ্দী বাংলাদেশের দর্শকদের অনুরোধ করেছেন তিতাস দিয়ে যেন ঋত্বিক ঘটককে বিচার করা না হয়। কিন্তু আমরা যারা অযান্ত্রিক, কোমল গান্ধার, বাড়ী থেকে পালিয়ে দেখিনি, তারা তিতাস দিয়েই ঋত্বিক ঘটককে বিচার করেছি এবং এতদিন যে শুনেছি তিনি প্রখ্যাত সৃজনশীল পরিচালক, সে আসনেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

[সুদীপ দেওয়ানজী]

দুই

৯ই আগস্টের 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার ছায়ামঞ্চ বিভাগে 'তিতাস একটি নদীর নাম : অসার্থক চিত্ররূপ' প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রবন্ধের নাম থেকেই প্রবন্ধের মূল সুরটা বোঝা যাচ্ছে।

প্রবন্ধে ঋত্বিক কুমার ঘটকের চিত্ররূপ 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ভালো দিকের মধ্যে শুধু উল্লেখ করে বলা হয়েছে— 'এ ছবির সম্পদ চিত্রগ্রহণ এবং ইতস্তত ছড়ানো কিছু অপূর্ব শট।' আর সবদিক দিয়ে ছবিটাকে অসার্থক দেখানো হয়েছে। এই ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'বড়দের বলতে হয় ঢেকে, আর ছোটদের বলতে হয় খুলে।' বড়দের বুঝবার শক্তি বেশি থাকে তাই তারা না বলা অনেক কথাই বুঝে নিতে পারেন। বইটির চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রায়ণ দু'টিই ঋত্বিক কুমার করেছেন। সাধারণ দর্শকের জন্য দু'টিই একটু শক্ত হয়ে গেছে। বইটির জন্য পাকা বা জ্ঞানী দর্শক দরকার, সারা দৃশ্যের মধ্যে না দেখানো জিনিসগুলো এবং সংলাপের মধ্যে না বলা কথাগুলো যারা বুঝে নিতে পারেন অথবা আকার-ইঙ্গিতে যা দেখানো বা বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেন। বইটির দৃশ্য এবং সংলাপ খুবই জীবন্ত হয়েছে অনুভূতিশীল দর্শকের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন— 'তিনি লিখেন আমাদের জন্য, আর আমরা লিখি তোমাদের জন্য।' তাই বলছিলাম, ঋত্বিক কুমার ঘটক যদি আরো দশজন নাট্যকার বা পরিচালককে এড়িয়ে তাঁর নিজস্ব পথে নিজস্ব প্রতিভার নতুন স্বাক্ষর রেখে যান, সেইটে তার অসার্থকতা নয়, সেইটেই তাঁর সার্থকতা। প্রত্যেক কবি বা শিল্পী জন্মের সময় এ' জগতে নিজস্ব একটা মন্ত্র নিয়ে আসেন, তাঁর উচিত সারা জীবনই সেই নিজস্ব মন্ত্র জপ করে যাওয়া।

এই সকল দিক বিবেচনা করে আমার মতে— 'তিতাস একটি নদীর নাম ঃ সার্থক চিত্ররূপ'। তবে বিভিন্ন দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হতে পারে।

[মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ]

তিন

'তিতাস একটি নদীর নাম' বাস্তবিকই এদেশের প্রচলিত ছবিগুলোর মধ্যে একটি অনন্য ব্যতিক্রম, শুধু ব্যতিক্রম বললে ভুল হবে— জীবনবোধে সমৃদ্ধ এমন ছবি আর দেখিনি। শৈল্পিক গুণ ও জীবন চেতনায় (উদ্বুদ্ধ) জাতীয় ছবিতে বিপ্লব আনার চেষ্টা করেছেন জহির রায়হান, আলমগীর কবীর ও সুভাষ দত্ত— এর মধ্যে জহিরের ছবিতেই জীবনকে তুলে ধরার সুস্পষ্ট দক্ষতার একটি ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল— কিন্তু আমাদের দুঃখের শেষ নেই, জহির ভাই হারিয়ে গেলেন।

যাক— কতকগুলি অপূর্ব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে মানুষের গভীর একাত্মবোধ ও নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি যে অপূর্ব দক্ষতার সাথে পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক উপস্থাপিত করেছেন, সেজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। বাসন্তী (রোজী) একটি জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র। অভিনয়ে প্রবীর মিত্র অপূর্ব। গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ পরিচালক মানুষের মনের বিচিত্রতার যে স্বাভাবিক ছবি এঁকেছেন (বিশেষত বাসন্তী ও অনন্তের চরিত্রে) তা আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

বইটি না পড়লেও এখন বলতে পারি কাহিনীকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ আমাদের সবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

[আনোয়ারুল মামুন]

চার

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছায়াছবির সমালোচনার প্রেক্ষিতে কিছু বলছি। সমালোচক জনাব মুৎসুদ্দী যা বলেছেন সে বক্তব্যের যথার্থতা তার নিজেরই সংশয়ে ক্ষিণ্ন। তিনি বলেছেন, উপন্যাসটি পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছে কিন্তু ছবিটি নয়। এ বক্তব্য মোটেই ঠিক নয়। কারণ, উক্ত উপন্যাসের পাঠকসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত এবং সে জন্যেই ব্যাপক অর্থে পাঠক সমাজে কখনোই সস্তা আলোড়ন তোলেনি। কিন্তু ক্ষুদ্রসংখ্যক পাঠক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে অনন্য সৃষ্টি হিসেবে। চলচ্চিত্রের বেলায়ও সেই একই কথা। জনাব ঋত্বিক ঘটকের তিতাসও ব্যাপক অর্থে কোন আলোড়ন তোলেনি, তুলতে পারে না। কিন্তু সীমিতদর্শক (বুদ্ধিদীপ্ত) মহলে একটি অপূর্ব শিল্প হিসেবে ঠিকই আলোড়ন তুলেছে। জনাব মুৎসুদ্দী জানেন এবং বলেছেন উপন্যাস আর চলচ্চিত্র এক নয়। তাই যদি হয়, তাহলে তিনি চলচ্চিত্রের বিচারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন কেন? আসলে বিচার করতে হবে, উপন্যাসের মূল সুর এবং মূল্যবোধ ঠিক রেখে তার চলচ্চিত্রায়ণ কতটুকু সার্থক হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে জনাব ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি অনুপম সৃষ্টি।

জনাব মুৎসুদ্দী সারা ছবিতে কয়েকটি শট ছাড়া কিছুই পেলেন না ভাবতেই খারাপ লাগে। অথচ কোন ছবির সামগ্রিক বিচারে কিছু বিচ্ছিন্ন শট বা কম্পোজিশনের তেমন কোন মূল্য নেই। কিন্তু আসলেই কি তাই?

তিতাস দেখার পরে জনাব মুৎসুদ্দীর পরিচালকের ভারসাম্যহীনতার প্রসঙ্গ টেনে আনা নিজের অক্ষমতার পরিচায়ক, কারণ যে কোন দিক থেকেই বা যে কোন ভাবেই দেখা হোক না কেন— তিতাস একজন সম্পূর্ণ দীপ্ত পরিচালকের উজ্জ্বল সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ বিন্দুমাত্র নেই। জনাব মুৎসুদ্দী সৃষ্টিশীল পরিচালক হিসেবে জনাব ঘটককে বিচার করতে গিয়ে 'মেঘে ঢাকা তারা'র কথা বলেছেন। অথচ আশ্চর্য এই, যার কাছে 'মেঘে ঢাকা তারা' ভাস্বর হয়ে আছে সেই দর্শকের কাছেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এটা জনাব মুৎসুদ্দীর নিজেরই লজ্জাকর অক্ষমতা।

পরিশেষে, জনাব মুৎসুদ্দীকে আরও সচেতন হতে বলবো, কারণ আর্ট ফিল্মের ওপর মন্তব্য করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। তদুপরি তিনি একটি প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকায় কথা বলছেন।

[আমজাদ হোসেন]

পাঁচ

গত ২৩ আগস্ট ছায়ামঞ্চ বিভাগে 'তিতাস একটি নদীর নাম : দর্শকদের প্রতিক্রিয়া' শিরোনামে যে আলোচনাত্রয় প্রকাশিত হয়েছে,[১] তাতে শিরোনামটি হওয়া উচিত ছিল 'অসাধারণ দর্শকদের প্রতিক্রিয়া'। কারণ, দুই নম্বর আলোচনার লেখক মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সাহেবের মতে বইটির চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্রায়ণ দুই-ই সাধারণ দর্শকদের জন্য কঠিন হয়েছে। অতএব ছবিটি বুঝতে পাকা এবং জ্ঞানী দর্শক দরকার। যেহেতু মজিদ সাহেব অসাধারণ দর্শক তাই বইটি চমৎকারভাবে উপভোগ করেছেন। এবং আমি এ অধম বহু দেশ-বিদেশ ঘুরে এবং চলচ্চিত্রের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য দেশি-বিদেশি বহু পুরস্কৃত ছবি দেখা সত্ত্বেও জনাব আব্দুল মজিদের মতানুসারে নিজেকে একজন অতি সাধারণ দর্শক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। কাজেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দেখার পর আমার মত সাধারণ দর্শকের প্রতিক্রিয়াটুকু জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমি যেহেতু সাধারণ দর্শক, সমালোচনা দেখে এবং পরিচালককে তার উপর ভিত্তি করে কোন ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করি না। এবং ছবি দেখবার সময় বইটির কাহিনী কি ছিল এবং সেটা যথাযথভাবে মান্য হল কিনা তাও দেখি না। আমি একটা ছবি দেখি, আমার মতামতটুকু প্রকাশ করি এবং এরপর দেখি সমালোচকের সাথে আমার মতটুকু মিলেছে কিনা। ছবিটি ভাল হলে এরপর নাম দেখি পরিচালক কে ছিল এবং ছবিটি যদি কোন নামকরা কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ হয় তাহলে তারপরে বিচার করি ছবিটির আবেদন আমার কাছে মূল কাহিনীর আবেদনকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে কিনা, মূল কাহিনীতে যে মানবিকতাবোধের পরিচয় ছিল—চলচ্চিত্রায়ণে সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিনা এবং ছবিটির শৈল্পিক কারুকার্য কতখানি। কোন ছবি ভালো অথবা মন্দ সেটা বিচারের

১. প্রথম তিনটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় ২৩ আগস্ট, ১৯৭৩-এ এবং চার ও পাঁচ নম্বর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় ২৭ আগস্ট, ১৯৭৩-এ 'দৈনিক বাংলা'-য়।

নিতান্তই ব্যক্তিগত ফর্মূলা আমার এটা। এবং এই সূত্রে বিচার করে আমাদের দেশের ভাল ছবি আমার মতে যেগুলো, সেসব ছবি বাইরেও মর্যাদা পেয়েছে, যেমন 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'নবাব সিরাজদ্দৌলা', 'জীবন থেকে নেয়া', 'ধীরে বহে মেঘনা', 'প্রতিশোধ' ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে মন্দের ভাল ছবি— যে বনে বাঘ নেই সে বনে শিয়াল রাজার মত। অত্যন্ত ভাল ছবি— আমার মতে— 'মহানগর', 'পথের পাঁচালী', 'গঙ্গা', 'স্ত্রীর পত্র' ইত্যাদি। ভাল উপরোক্ত ছবিগুলো সুধীসমাজের কাছেও ভাল লেগেছিল, সমালোচকরাও ভাল বলেছেন জেনে আমি চেয়েছি এই রকম ভাল ছবি আমাদের দেশেও তৈরি হোক।

কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম' যদি ভাল ছবি হয় তাহলে আমি চাইনা, আমাদের দেশে ভাল ছবি তৈরি হোক। 'দুর্বোধ্য' মানেই ভাল এমন কোন ধারণা আমার নেই। সোজা বাংলা 'হাত'-এর কঠিন বাংলা 'কর'— কিন্তু হযবরল কোন শব্দই নয়। চাঁদকে শশী বললে অনেকেই বুঝবে না হয়তো—কিন্তু হযবরল কেউই বুঝবে না। আমি নিজে পোলিশ, রাশান, জার্মান বহু ভাষার ছবি দেখেছি যে ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু অভিনয় এবং পরিচালনা আমার কাছে ছবিটিকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। কিন্তু আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এ পরিচালক কি বোঝাতে চেয়েছেন অনেক চেষ্টার পরও আমি তা বুঝতে পারিনি। অথচ ছবি দেখবার পর 'তিতাস একটি নদীর নাম'— মূল কাহিনীটি আমি পড়েছি যা আমার মতে 'অপূর্ব'।

অতএব, চিন্ময় মুৎসুদ্দীর মত আমাকেও বলতে হচ্ছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের একটি অসার্থক চিত্ররূপ।

পুনশ্চ : নবাগত সুফিয়া এবং অনন্তের ভূমিকায় রূপদানকারী ছেলেটিকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ— তাদের অভিনয়ের জন্য।

[ড: সিরাজুল ইসলাম]
সাধারণ দর্শক

একটি বিতর্কিত চলচ্চিত্র : তিতাস একটি নদীর নাম

সালাউদ্দিন চৌধুরী

ঢাকায় কিছুদিন আগে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন চলচ্চিত্র সমালোচক গোষ্ঠি, স্বাভাবিকভাবে যাদের অভিমত এ দেশের দর্শক সমাজের একটি অংশের কাছে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও গ্রাহ্য বলে মনে হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দর্শক সমাজের ঐ অংশটি তেমন বিজ্ঞ অভিমত পাচ্ছেন না। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে যে, একই চিত্রের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের সমালোচকদের এক একজন ভিন্ন ভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। ফলে দর্শকদের মধ্যেকার যে অংশটি সমালোচনা-সচেতন, তাঁরাও আর এখন চিত্র সমালোচকদের অভিমত-মন্তব্যের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। আমার এ নিবন্ধ কোনো বিজ্ঞ সমালোচক মনের উপলব্ধি নয়, এবং আমি বলবো যে, একজন সাধারণ কিন্তু সচেতন দর্শক হিসেবেই আমি উল্লিখিত বিতর্কিত চিত্রটি সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছি। মনের তাগিদেই এ চেষ্টা, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা কাউকে আকাশে তুলে ধরার জন্যে নয়।

বিতর্কিত চিত্রটির নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম'। পরিচালনা করেছেন ঋত্বিক কুমার ঘটক।

বাংলা ভাষায় নির্মিত ছায়াছবির ভুবনে ঋত্বিক ঘটক অতি পরিচিত নাম। তিনি এদেশি চিত্র পরিচালক না হলেও বাংলাদেশের সচেতন চিত্র দর্শক ও চিত্র রসিকেরা তাঁকে জানেন। আলোচ্য চিত্রটি ছাড়া ঋত্বিক ঘটকের আর একটি মাত্র ছবি বাংলাদেশে প্রদর্শিত হয়েছিলো বেশ কয়েক বছর আগে। সে ছবিটির নাম 'মেঘে ঢাকা তারা'। আলোচ্য চিত্রটির সাথে পূর্বে প্রদর্শিত চিত্রটির মূল পার্থক্য হল এই যে, পূর্বের চিত্রটি নির্মিত হয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গের কলা-কুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা আর 'তিতাস একটি নদীর নাম' চিত্রায়িত হয়েছে বাংলাদেশের কলা-কুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা। 'তিতাস একটি নদীর নাম' আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অধিকাংশ সমালোচক ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'-র উল্লেখ প্রয়োজন বোধ করছেন। আমিও করবো, কিন্তু তার আগে আলোচ্য চিত্রটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলো কেন এবং তার আদৌ প্রয়োজন ছিলো কিনা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর আলোচনা করতে গিয়ে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকার নির্দিষ্ট পাতায় সমালোচক প্রথমেই ঘোষণা করেছেন অদ্বৈত মল্ল বর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম পাঠকদের আলোড়িত করে, ঋত্বিক কুমার ঘটকের তিতাস

একটি নদীর নাম কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কোনো আলোড়ন তুলতে পারেনি। প্রসঙ্গত তিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' অসার্থক চিত্ররূপ বলে ঘোষণা করেছেন।

অপর একটি পত্রিকায় জনৈক চিত্র সমালোচক বলেছেন : মানবিক মূল্যবোধের একটি চরম দলিল— তিতাস একটি নদীর নাম... তিনি (ঋত্বিক ঘটক) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সংবেদনশীল মন নিয়ে মরমী কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। আর একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মতো ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে হয় আমরা অতিরিক্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছি নয়তো আমরা পরিচালক শ্রী ঘটকের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ফেলেছি। ঋত্বিক ঘটকের চরিত্র সমালোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি কেলেঙ্কারী করে ফেলেছেন জনৈক অতি উন্নাসিক (না কি কমপ্লেক্সের শিকার?) চিত্র সমালোচক[১]। বাংলাদেশে নির্মিত প্রায় প্রতিটি চিত্রের (তার নিজের পরিচালিত চিত্রটি ছাড়া) আলোচনার ব্যাপারেই আমরা তার জেদী একপেশে, অশালীন মনোভাব বা গোয়ার্তুমির পরিচয় পেয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই ঋত্বিক ঘটকও তার অমার্জিত লেখনীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। কিন্তু আমার কাছে এ কথা ভেবে অবাক লাগছে যে ঋত্বিক ঘটকের চিত্র তার কাছে অন্য কোনো বিশেষ কারণে অন্তর্দাহের কারণ বলে পরিগণিত হলেও অন্যান্য চিত্র সমালোচকের অন্তর্দাহের কারণ হলো কেন ?

যিনি 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে অসার্থক চিত্ররূপ বলে ঘোষণা করেছেন, চলচ্চিত্র শিল্পের সংজ্ঞানুযায়ী আমার মনে হয়, তিনি একট মৌল বিষয়ে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছেন। চলচ্চিত্রের কলা-কুশলী না হলেও একজন সচেতন দর্শক হিসেবে আমার ধারণা, চলচ্চিত্র সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও চলচ্চিত্র কখনোই মূল সাহিত্য হতে পারেনা। একটি সার্থক সাহিত্যকীর্তির দেহসৌষ্ঠব যেভাবে গঠিত হয়, চলচ্চিত্রে তা অন্যরকম হতে বাধ্য। তা না হলে তা চলচ্চিত্র না হয়ে নাটকে পর্যবসিত হবে। প্রকৃতপক্ষে নাট্যচিত্রের হাত থেকে বাংলা চলচ্চিত্র এখনও মুক্তি পায়নি। কোন সৎ পরিচালক পরিত্রাণের হাত বাড়াতে চাইলে হয় পাগলরূপে আখ্যায়িত হচ্ছেন নয়তো কেউ কেউ আরো খারাপ বিশ্লেষণে বিভূষিত হচ্ছেন।

আমাদের এখানে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো চিত্রনাট্যের দুর্বলতা। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হলে একটা চিত্রনাট্যের দরকার। তাই প্রথাসিদ্ধভাবে এখানে চিত্রনাট্য রচিত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই দায়সারাভাবে ও অবহেলাভরে। অথচ বলিষ্ঠ চিত্রনাট্য ব্যতীত কোনো চিত্রই সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হতে পারে না। সত্য কথা বলতে কি চলচ্চিত্র যে একটি শিল্পকীর্তি চিত্রনাট্যই তার প্রমাণ এবং নতুন শিল্পমাধ্যম হিসেবে চিত্রনাট্যই হলো চলচ্চিত্রের যথাযথ শিল্পরীতি। চলচ্চিত্রকে যদি দৃশ্যমান গতিশীলতা বলা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, চিত্রনাট্য এবং একমাত্র চিত্রনাট্যই পারে তাকে অর্থবহ করে তুলতে। ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য তাঁর একটি নিবন্ধে বলেছেন, শুধু অর্থবহ

১. আলমগীর কবীর

অক্ষরধ্বনিতে ধরে রাখার জন্যে নয়, সেই অক্ষর ধ্বনিকে নিয়ে আসা যায় ক্যামেরার মাধ্যমে স্পন্দিত চিত্রমালায়, যে চিত্রকে পুনশ্চ প্রক্ষেপ করা হয় প্রলম্বিত সাদা পটভূমিতে। সে জন্যেই মঞ্চরূপ ও চিত্ররূপ ভিন্ন হতে বাধ্য। চিত্রনাট্যও অক্ষরশিল্প কিন্তু সাহিত্য নয়। নাটকে সাহিত্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হয়, চিত্রনাট্যে সেই সতর্কতার প্রয়োজন নেই। খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার পরিচালক ইংমার বার্গম্যান বলেছেন: "Film has nothing to do with literature ; the character and the substance of the two art form are usually in conflict.... ."

এতসব কথা বলতে হতো না, যদি না জনৈক সমালোচক আলোচ্য চিত্রটিকে 'অসার্থক চিত্ররূপ' বলে ঘোষণা করতেন। যেহেতু চিত্রনাট্য একটি পৃথক শিল্পকীর্তি সেহেতু 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে আমার অসার্থক চিত্ররূপ বলে মনে হয়নি। একই সমালোচক বালখিল্যসুলভ আচরণের প্রমাণও দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটকের ব্যক্তিগত দুঃখময় অনুভূতির কথা উল্লেখ করে। ঋত্বিক ঘটক এ্যাসাইলামে ছিলেন, আমরা জানি। কিন্তু এখনো তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন সে কথা তো আমার তাঁর ছবি দেখে মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে, অসংখ্য অনুদৃশ্য বা শটের মাধ্যমে এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিশীল চিত্রনাট্যের মাধ্যমে তিনি বিস্তৃত সময়কে আমাদের মুঠোর মধ্যে এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। বলা যায়, তিনি সময়কে অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন। আর সে জন্যই কালাতিক্রমের ক্ষেত্রে তিনি কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা রীতির অনুসরণ করেননি। তিনি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে দর্শকদের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিতে চেয়েছিলেন। তাদের মনে প্রশ্নের ঝড় তুলতে চেয়েছিলেন এবং ঋত্বিক ঘটক যে এখানে সফল হয়েছেন তা নিন্দা-সমালোচনার বন্যা থেকেই বোঝা যায়।

একই সমালোচক বলেছেন গ্রন্থ 'তিতাস একটি নদীর নাম' পাঠক মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' দর্শক মনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। এখানে আমার হাসি পাচ্ছে এ কথা চিন্তা করে যে, সমালোচক যে পাঠকদের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই একই মন ও মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই কি আমাদের দেশে চলচ্চিত্র-দর্শক: আমাদের দর্শক সমাজ তো এখন পর্যন্ত রূপবানের[২] যুগে রয়েছেন। এখনো যদি এ দেশে 'নাদিয়া-জনকেভাসে'র রদ্দি মার্কা অবাস্তব চিত্র প্রদর্শিত হয় তা হলেও যে তা সুপারহিট করবে সে কথাতো নিশ্চিত। আজকের যে দর্শক সমাজে 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর চিত্ররূপ দেখে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, সেই দর্শকদের যদি অদ্বৈত মল্লবর্মণের গ্রন্থটি পড়তে দেয়া হয় তা হলে তাদের মধ্যে ক'জন গ্রন্থটির দু'তিন পৃষ্ঠার বেশি পড়বেন? আসলে আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা দর্শকদের অন্যভাবে তৈরি করেছেন, নিজেদের অক্ষমতা বা অর্থলোলুপতার তামসিক আকাঙ্ক্ষার দোষটুকু নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দিচ্ছেন দর্শকদের ওপরে।

২. ষাট-এর দশকে নির্মিত লোকগাথাধর্মী একটি চলচ্চিত্র

অনেক সমালোচকই বলেছেন, ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখার পরে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টি বলে ভাবতে কষ্ট হয়। আমি এ মন্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। 'মেঘে ঢাকা তারা'ও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। অত্যন্ত জোলো একটি কাহিনী অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক যে ছবি তৈরি করেছিলেন তা শুধু পরিচালনার প্রসাদ গুণেই উৎরে গিয়েছিল। ... এই ছবিটাই ঋত্বিক ঘটকের একমাত্র কমার্শিয়াল ছবি। কাহিনী নির্বাচিত করেছিলেন তিনি সাধারণ দর্শকদের কথা মনে রেখে আর সচেতন দর্শকদের কথা মনে রেখেই তিনি উক্ত কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে আঙ্গিকগত কলা-কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখেছিলেন। মনে পড়ছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র আলোচনা প্রসঙ্গেও সে সময় কোন একটি পত্রিকায় জনৈক সমালোচক ক্যামেরার কাজের কথা বলতে গিয়ে এই বলে বিজ্ঞ অভিমত রেখেছিলেন যে, চিত্র গ্রহণ অস্পষ্ট, আলোর স্বল্পতার জন্যে কোন দৃশ্যই সুপরিস্ফুট হয়নি। অথচ কাহিনীর মেজাজ ঠিক রাখার জন্যেই যে পরিচালক স্বল্প আলো ব্যবহার করেছিলেন, একটা বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তা সেই সমালোচক মহাশয়ের বোধমগ্য হয়নি। 'মেঘে ঢাকা তারা' উৎরে যাওয়ার একমাত্র কারণ, শস্তা অনুভূতি ও জোলো কাহিনী। তাই ঋত্বিক ঘটকের সেখানে জয়-জয়কার। আর 'তিতাস একটি নদীর নাম' কাহিনীর দিক থেকে অন্য কিছু যা সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে না। তাই তার চলচ্চিত্রায়ণে ঋত্বিক ঘটকের নিন্দা।

আর একটি অভিযোগ :

ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ নাকি নদী তিতাসের সত্তাকে অস্বীকার করেছেন। এখানেও আমার মনে হয় তাঁর সম্পর্কে ভুল ধারণা করা হয়েছে। তিতাসকে ঘিরে একটি জনসমষ্টির আবর্তন, তিতাস শুকিয়ে যাওয়ায় তাদের বিপর্যয়, আবার শেষ দৃশ্যে চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসন্তীর ভিজে বালি পাওয়ার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত সুখ-সম্ভাবনার স্বপ্নদর্শন (ফসল সমৃদ্ধ মাঠে বালকের আনন্দোল্লাস)—এ সমস্তই তো তিতাসের সত্তা। অবশ্য বাবু সমাজের অত্যাচারের একটি খণ্ড কাহিনীও ছবিতে আছে। কিন্তু তা সঙ্গতিহীন নয়।

তবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' সর্বাঙ্গীন কুশলতায় সমৃদ্ধ সে কথা আমি বলবো না। আমার মনে হয় সম্পাদনার সময় অনভিপ্রেতভাবে কিছু বাতিল শট চিত্রটিতে সংযোজিত হয়েছে। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও একটা অন্যমনস্কতা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু আমাদের এখানে অর্বাচীন বিশ্বাসে অক্ষম হাতে নির্মিত নাট্যচিত্রের (দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) চেয়ে সামান্য ভুল ভ্রান্তিপূর্ণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্র হিসেবে আমাকে অনেক বেশি আনন্দ দিয়েছে।

দর্শক ছবিটা নেয়নি— এ প্রশ্ন যারা রাখছেন, তাঁদের অবগতির জন্য জনৈক তরুণের অভিমত এখানে ব্যক্ত করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তরুণটি এই ছবি বার পাঁচেক দেখেছে। কারণ সে শুধু একটি দৃশ্যই দেখতে যায় এবং তা হলো যে দৃশ্যে

বাসন্তী পায়ের গোড়ালী থেকে শাড়ি টানতে টানতে জংঘা পর্যন্ত উন্মুক্ত করে। সুতোয় পাক দেয়। এটা যে একটি প্রতীক সে বোধ তার নেই। এই তো দর্শক। কাজেই তারা যে ছবিটা নেবে না, তাতো সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞ সমালোচকরা কেন যে এমন ক্ষেপে গেলেন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ঋত্বিক ঘটককে যা তা বলা শুরু করলেন, (পাগল- ছাগল পর্যন্ত) তা বোঝা দুঃসাধ্য।

সমালোচকদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' কি সত্যিই এমন একটি সৃষ্টি, যা দেখে বমনোদ্রেক হয়? পত্রিকার পাতায় তো তাদের বিবমিষার ফলই দেখা গেছে।



কিশোর চরিত্রে প্রবীর মিত্র

সেই এক নদীর কাছে

রঞ্জিৎ রায় চৌধুরী

একথা সত্যি, কুবের বা হোসেন মিঞা (পদ্মা নদীর মাঝি), কাশেম আলী (চর কাশেম) কিম্বা বিকাশ (গঙ্গা) এদের মতো কোন প্রাণবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁর চরিত্র কিশোর বা কালোবরণ এদের কেউই উপন্যাসে সচরাচর আমরা যে ধরনের নায়ক বা উপনায়ক দেখতে অভ্যস্ত, সে রকম নয়। মালো পাড়ার ইতিহাসে কালোবরণের যে ভূমিকা সেই ভুমিকা গ্রহণের ক্ষমতা কিশোরের মত যুবকের নেই এবং এখানেই অপর তিনজন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,অমরেন্দ্র ঘোষ ও সমরেশ বসুর চাইতে অনেক বেশি সার্থক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। কারণ তিনিই সেই লেখক, যিনি উপন্যাসের নায়কের ভূমিকাটি একটি নদীকে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। পদ্মা-মেঘনার পাশে নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন একটি নদী তিতাস।

তারও চাইতে অখ্যাত মানুষজন মালোরা। তবু এই দুই অকিঞ্চিৎকরকে নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়ার সময় আমরা সেই এক বিচিত্র অনুভবের মুখোমুখি হই— যে অনুভব, আমাদেরকে 'আরণ্যক' উপন্যাসের জগতে নিয়ে যায়। লবটুলিয়ার কিছু মানুষজনের হাসি কান্নার বকলমে বিভূতি ভূষণ যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের অনন্যলোকের রহস্যময়তার সঙ্গেই পরিচিত করে তুলতে বদ্ধপরিকর, আমরা যখন সেটা বুঝে উঠতে আরম্ভ করি— তখনই সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সেই অরণ্য আমাদের কাছে নায়ক হয়ে যায়। এক সময় কোলকাতার মির্নার্ভা মঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের নাট্যরূপটি নিয়মিত অভিনীত হতো। বহু বিতর্কিত লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'ই হলো একমাত্র নাটক যে নাটক অভিনয়ের জন্য আঙ্গিক তথা আলোক সম্পাতের যথেচ্ছ ব্যবহারে কোন অভিযোগ তোলার আদৌ সুযোগ ছিল না। লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই নাটকে বরাবরই তাঁদের খ্যাতি অনুযায়ী অভিনয় করতেন। মালো পাড়ার জীবনযাত্রা, কুচক্রী মহাজন কালোবরণ, এবং অসহায় কিশোর, এসবই দর্শকের কাছে যথাযথ তাৎপর্য নিয়ে সত্য হয়ে উঠতো। সংলাপ ও সঙ্গীত অংশের অনেক স্থানেই মাটির কাছাকাছি মানুষদের ভাষা ও গানের আভাষ পাওয়া যেতো।

উৎপল দত্ত কৃত নাট্যরূপের ভিত্তিতে অভিনীত সেই নাটকে দর্শক একবারও মঞ্চের কাছাকাছি কোথাও যে নদী নেই, এই অভাবটুকু অনুভব করতেন না। কথায়, গানে এবং নাটকীয় গতিবেগের ভেতর দিয়ে প্রতি মুহূর্তেই একটি নদীর অস্তিত্ব টের পাওয়া যেতো। তাই বর্ধিত মঞ্চের ওপর দিয়ে যখন কলসি কাখে কোন নারী চরিত্র, মূল মঞ্চের দিকে উঠতে উঠতে বলতো, ঘাটে যাই-— তখন সেটা যে নদীর ঘাটই তা বিশ্বাস করতে দ্বিধা

দেখা দিত না। সে অভাব দূর করার সাধ্য না ছিল তাপস সেনের, না ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস মশায়ের। খোদ উৎপল দত্ত পর্যন্ত সেখানে অসহায়। কাজেই ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম' সম্পর্কে উৎসাহ দান না করার কোন কারণ নেই। কোলকাতায় সে ছবি আদৌ কোনকালে দেখা সম্ভব হবে কি না যেহেতু বলা সম্ভব নয়, তাই আজ যখন বাংলাদেশে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে, সেই সময় চলচ্চিত্রকার মূলত নদীকেই তার এ ছবির নায়ক হিসেবে দেখেছেন কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। কারণ এখানটিতেই সমগ্র উপন্যাসখানার চলচ্চিত্রায়ণের যা কিছু উপাদান রয়েছে।

ছবি না দেখেও একথা বলা সম্ভব, যেহেতু এর পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক তাই উৎপল দত্ত ব্যাখ্যাত চরিত্র 'কিশোর' — ছবিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থিত। নাটকের প্রয়োজনে শ্রীযুক্ত দত্ত কিশোর চরিত্রটিকে প্রথম থেকেই বদ্ধ উন্মাদ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন। তাতে মঞ্চে কিশোরকে ঘিরে এক ধরনের ট্রাজিক সুর আগাগোড়াই ধ্বনিত হয়েছে। নিজের স্ত্রী এবং পিতা এদের কাউকেই আর চিনতে পারে না কিশোর। সারাক্ষণ যে কোন এক কাল্পনিক কিছুকে 'যা' 'যা' শব্দে তাড়িয়ে বেড়ায়। মালো পাড়ার নতুন কালের প্রতিনিধি যুবক কিশোরকে আর যাই করুন ঋত্বিক কুমার ঘটক কোন অবস্থাতেই পাগল হিসেবে বিকৃত করবেন না। কিম্বা ধরা যাক কালোবরণ। কুচক্রী কালোবরণকে নিয়ে নাটকে যে ঘনঘটার সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই শ্রীযুক্ত ঘটক তাঁর ছবিকে আবর্তিত হতে দেবেন না। অন্তত ইতিপূর্বে যে কটি ছবি তৈরি করেছেন ঋত্বিক বাবু সেই ছবিগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয়। 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' কিম্বা 'সুবর্ণ রেখা'—এর যে কোন একটির চরিত্র বিশ্লেষণে প্রস্তুত হলে আমরা দেখতে পাবো সব সময়ই শ্রীযুক্ত ঘটক চরিত্রগুলোকে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রথমে ঐতিহাসিক, তারপর পরিচালক।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের যে ভূমিকা নদী তিতাসকে দিয়ে গেছেন, সেই চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক কুমার ঘটক অবশ্যই সেই সমস্ত চরিত্রগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যাদের কথা স্পষ্ট করে বলার মতো হাতে সময় ছিল না লেখকের। ক্যামেরার চোখের ভেতর দিয়ে, একই সঙ্গে ধরা দেবে নদী ও মানুষ এবং বাঙালি। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের অপরাপর প্রতিভাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ঘটকের তফাৎ এই যে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বা বামপন্থী রাজনীতির ধারকবাহক হওয়ার দাবির অপেক্ষা তিনি যে একজন বাঙালি এই অধিকারটুকু অর্জনে বেশি আগ্রহী।

কিছুকাল আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য শ্রীযুক্ত ঋত্বিক কুমার ঘটককে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে— এই সংবাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁর একটি ছবি দেখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম।

কোলকাতার সংবাদপত্রগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় একবারই মাত্র সে ছবি প্রকাশিত হবে। সেদিন সংবাদপত্রের পঞ্চম বা সপ্তম পৃষ্ঠায়, শ্রীযুক্ত ঋত্বিক কুমার ঘটক কতবড় প্রতিভা

ছিলেন তার ফিরিস্তি দিয়ে কোন এক লেখা লিখে পঞ্চাশ বা একশ টাকা উপার্জন করে ফেলবেন কোন লেখক। কিছু কিছু সভা-সমিতিও হবে এখানে ওখানে। এবং সেখানে প্রায় কেউই স্মরণ করতে পারবেন না — ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত ষষ্ঠ ছবির নাম কি।

নানা সূত্রে শুনেছি সম্পাদনার ফাইনাল কাট দেখার মতো শেষের দিকে সুস্থ ছিলেন না শ্রী ঘটক। প্রচলিত কাটিং-এর নিয়ম কানুন কোন কালেও অনুসরণ করেন নি তিনি। অনেকেই তাঁর সম্পাদনার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকেন। তাঁদের মতে এই একটি দোষে তাঁর ছবিগুলো দুষ্ট। তাই ভয় হয়— হয়তো যে দৃশ্য বা যে টেকগুলো তাঁর সবচাইতে প্রিয় ছিল— সেগুলোর কোন কোনটি পড়ে থাকবে সম্পাদনার টেবিলের নিচের অন্ধকারে। এই গ্রহণ-বর্জনের অধিকার নিশ্চয় সম্পাদকের আছে।

বাদ দেয়া সেই অংশগুলো যাতে হাজার টুকরোর ভিড়ে হারিয়ে না যায়, এই মুহূর্তে শুধু সেটুকু অনুরোধ করব। কারণ ঋত্বিক কুমার ঘটকই একমাত্র চলচ্চিত্র স্রষ্টা, যাঁকে নিয়ে এখনো কোলকাতার কোন পত্রপত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতা নিয়ে কোন সঠিক আলোচনা এখনও হয়নি। একদিন কখনো সেই সময় হলে ঐ বাতিল টুকরোগুলো থেকেও একজন চলচ্চিত্র শিল্পের ছাত্র তাঁকে চিনে উঠতে পারবে।

খাঁটি বাংলা ছবি কি করে তৈরি করতে হয়— কোন দিন এমন প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর দেবে যে চলচ্চিত্র সেই 'তিতাস একটি নদীর নাম'— আশা করবো বাংলাদেশের মানুষজনেরা চিনে উঠতে ভুল করবেন না।

এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা না করে পারছি না। সেই ঈর্ষারই ফলশ্রুতি এই পত্র। এবং এ পত্র যদি দীর্ঘ হয়ে থাকে, তবে তাঁর দায় সেই অখ্যাত অজ্ঞাতপ্রায় একটি ছোট্ট নদীর, যে নদীর (তিতাস) কাছাকাছি কোন এক গণ্ড গ্রামে শেষ পৌষের মধ্য দুপুরে আমি জন্ম গ্রহণ করেছিলাম।

আমি তিতাসের সম্পাদক নই : চিত্রগ্রাহক বশীর হোসেন বললেন

চিত্রালী রিপোর্ট

(চিত্রালী, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৬)

সম্পাদক বশীর হোসেন ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত বিতর্কিত ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর সম্পাদনা করেন নি বলে আমাদের জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিতে সম্পাদক হিসেবে বশীর হোসেনের নাম ঘোষণা করা হয়।

'তিতাস'-এর সম্পাদনা নিয়ে আজ যে বিতর্ক চলছে এ প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে চিত্রালীর প্রতিবেদক চিত্র সম্পাদক বশীর হোসেনের কাছে প্রশ্ন রাখলে তিনি জানান, 'আমি এ ছবির সম্পাদনা করিনি। ছবিতে নাম আমার গেছে ঠিকই এবং তিতাসের সম্পাদনার জন্যে আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম সত্যি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি শেষ পর্যন্ত এ ছবির সম্পাদনা করতে পারিনি'।

তিতাস একটি নদীর নাম

বশীর হোসেন

(চিত্রালী, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৪)

গত শুক্রবারের চিত্রালীতে 'আমি তিতাসের সম্পাদক নই' শিরোনামায় পরিবেশিত সংবাদটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংবাদটির উপস্থাপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে জানাতে চাই যে সংবাদটি একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ আর একদিকে তেমনি ভ্রান্ত।

বহু বিতর্কিত ছবি তিতাসের চিত্রগ্রহণ থেকে শুরু করে রূপালী পর্দায় পৌঁছানোর মুহূর্ত পর্যন্ত অনেক ঘটনা নেপথ্যে হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস অনেকেই হয়তো জানেন না। আর জানেন না বলেই হয়ত সমালোচক ভাইদের কলমও পরিপূর্ণতা খুঁজে পায় না। বিতর্কিত তিতাসের যে পর্বে আমিও আজ টানা হেঁচড়ার শিকার সেই পর্বকে লক্ষ্য করেই শুধু নয় বরং আসল সত্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার তাগিদ উপলব্ধি করছি বলেই আজ আমার মুখ খুললাম।

চিত্রজগতে নিজেকে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িয়ে তুলতে পারার পর থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' একদিন ছবি হবে এবং আমি হব তার সম্পাদক। সে সুযোগও আমি পেয়েছিলাম কিন্তু সে স্বপ্ন আমার সফল হয়নি। আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সেদিন যেদিন ঋত্বিক ঘটক আমায় ডাক দিলেন। বললেন— 'বশীর তোকে নিয়ে এডিটিং টেবিলে বসে আমি এ ছবি তৈরি করবো'। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম।

একদিন সত্যি সত্যি তিতাসেব সম্পাদনার কাজ শুরু হল। ঋত্বিকদার সৃষ্টির চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তিতাসের বুকে কাঁচি চালানোর দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করার অল্প কয়েকদিন পরই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কোলকাতা চলে যাই।

অসুস্থ আমার দেহে অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতাম তিতাসের কথা।

তারপর দেশে ফিরে এসে অসুস্থ শরীব নিয়েও আমি সম্পাদনা কক্ষে ছুটে যাই এবং আমার সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতায় ঋত্বিকদাকে নিয়ে তিতাসের প্রথম পর্যায়ের সম্পাদনার কাজ শেষ করে আনলাম। এ সময়ে চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

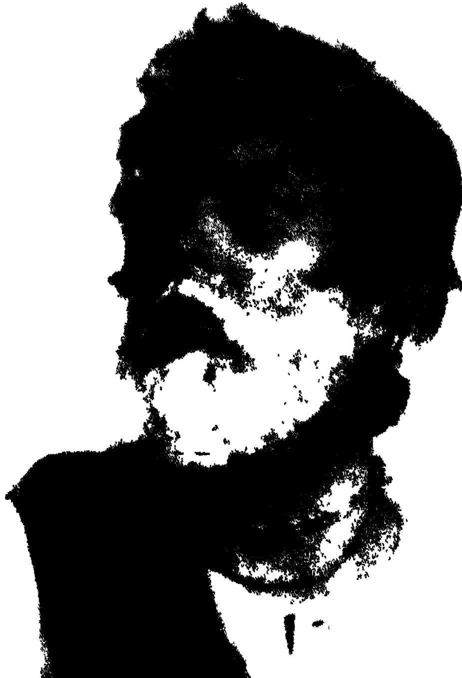
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার পিছু ছাড়লো না। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঋত্বিক ঘটক চলে গেলেন কালকাতায়। দূর থেকে ঋত্বিকদা এ ছবির সম্পাদনার পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিতে

চাইলেও তাঁর অনুপস্থিতিতে তিতাসের বুকে কাঁচি চালানোর সাহস আমি হারিয়ে ফেললাম।

তবুও তিতাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু কিভাবে হয়েছে সেই ইতিহাস আজ জানা নেই।

রূপালী পর্দার তিতাসও আমি দেখিনি। এ আমার দায়িত্ব এড়ানোর যুক্তি নয়, আসল সত্যটি উপস্থাপনার প্রয়াস মাত্র।

আজও আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি কালো কালির আঁচড় কেটে কাগজের বুকে তিতাসের রূপকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর যুগান্তর সৃষ্টিকারী পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটকের জীবনালেখ্যের সাথে কোথায় যেন একটা মিল। একই সাথে আমি বশীর হোসেন সমালোচকদের হাতে নাজেহাল— তবু আমি সুখী। সুখী এই ভেবে যে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক আর তিতাস একটি নদীর নাম, আমার চিন্তার জগতে চির সমুজ্জ্বল।



গোলাম মুস্তাফা : রামপ্রসাদ ও কাদির মিয়ার চরিত্র রূপদানকারী

তিতাস একটি নদীর নাম

সুকদেব বসু*

'তিতাস আমি দেখিনি'— চীৎকার করে যদি কোন ঐতিহাসিক জনসভায় কিংবা নেহায়েৎ একটা গণজমায়েতে এমন কিছু বলা যেত, তবে আর কিছু না হোক অন্তত তিতাসের অগাধ আলোচনায় নির্বোধের মত নাক-জলা হতে হোতনা। আর নয়তো তিতাস নিয়ে কিছু লেখার এমন সুস্বাদু সাহস কোন কাগজের প্রায় মসৃন পৃষ্ঠাগুলোর সতীত্ব নষ্ট করতো না।

তবু যাহোক,ঋত্বিক ঘটককে দেড় হাতের মধ্যে পাইনি, পেলে নিশ্চয় করে জিজ্ঞেস করতাম 'মহাশয়, একি অকল্যাণ করিলেন! ইহারা রংবাজ[১] হইতে পারে কিন্তু অবুঝ মন[২] ইহাদের। কোথায় দুই চারিটি প্রেম ভালবাসার কথা শুনাইয়া সান্তনা দিবেন— মন কেমন করা গীত শুনাইবেন, আড়ি-ভাব দেখাইয়া অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস দেখাইবেন, তাহা নয় মাতালের মত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করিয়া তুমুল কাণ্ড বাঁধাইয়া বিকট একটা চড় কষাইয়া দিলেন, এখনো যাহার জ্বালা আপনাকে অপবাদ দিতেছে।' কিন্তু তাঁর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ছবিটি সামগ্রিক ভাবে 'শেষ' করার পূর্বেই তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় কোলকাতায় চলে যেতে হয়েছে। আপাতত কিছুটা সুস্থ হলেও অচিরেই তাঁর ঢাকায় আসার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই এবং ভবিষ্যতেও যে আসবেনই, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কিঞ্চিৎ সুখের সঙ্গে বলছি ঋত্বিক ঘটককে দেখিনি, কিন্ত তাঁর তিতাস আমি দেখেছি। এবং ভয়ে ভয়ে বলছি, একবার নয় ক্রমাগত সাতবার। অতঃপর যাঁরা ঋত্বিক ঘটককে ভারসাম্যহীন মাতাল বলার স্পর্ধা রাখেন তাঁরা নিঃসন্দেহে আমাকে আস্ত একটা পাগল ঠাউরালেও বিস্মিত হব না। কেননা 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর স্রষ্টা যদি ভারসাম্যহীন মাতাল বলে বিবেচিত হন তবে কেবল আমি কেন আমার পূর্ব পুরুষ মহাপুরুষ, আত্মীয়-পরিজন, শত্রু-বন্ধু, চোরাকারবারী-মজুতদার, শিল্পী-কেরানী, বুদ্ধিজীবি-বেশ্যা এবং বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্রপ্রধান-প্রধানমন্ত্রী আর তাদের আপ্লুত জনগণও তাই।

'চালিয়াতি আমার আসে না'— একথা যিনি নিজের বিশ্বাস থেকে উচ্চারণ করতে পারেন তিনি এবং বিশ্বস্তভাবে কেবল তিনিই তিতাস সৃষ্টি করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। তিনি একতন্ত্রী বাঙালি ঋত্বিক কুমার ঘটক এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ যার মুদ্রিত সমর্থন। আর তাই তিনি দশ বার বছর পরও যে ছবি করেন তা সাম্প্রদায়িক দর্শক নেয়

---

* লেখকের ছদ্মনাম—প্রকৃত নাম মাহবুব আলম

১. চলচ্চিত্রের নাম

২. চলচ্চিত্রের নাম

না। কারণ তাঁর ঐ পাঁচিল, যে পাঁচিলের কথা তিনি একবার লিখেছিলেন তাঁর একটা প্রবন্ধে— "এই যে একটা ঢাকনার মত মানুষের সব শুভকে ঢেকে রেখেছে শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, সেটা হঠাৎ যেদিন উঠে যাবে, সেদিন হাইড্রোজেন শক্তির পরিব্যাপনের মত মানুষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা ব্যাপ্ত হবে, সেদিন আমরা আর কাঁদুনি গাইতে আসবনা। সেদিন যে আসবেই তার প্রমাণ আদিম সাম্যেই রয়ে গেছে। সেদিন সবাই খেতে পেত। তবু, এত খেটে নতুনতার নতুন জন্ম হল, তাইনা সভ্যতা জন্মাল, তাইনা আজ চাঁদের পিঠের আগ্নেয় ধুলিতে মানুষের গুলতীর গুলি গিয়ে ঠেকতে পারল। সেদিন রাস্তায় এত গুলিও চলবেনা, এত মাও কাঁদবেনা। আর আমরা চুটিয়ে ছবি করবই"। তাই করেছেন ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু ধ্বসে যায়নি সবগুলো পাঁচিল।

মহৎ সাহিত্যকর্মের চলচ্চিত্রায়ণে অবশ্যই মাত্রিক সুঃসাহসের প্রয়োজন এবং তার চাইতে প্রয়োজন চলচ্চিত্রকার মূল অর্থে চিত্রনাট্যকারের গভীর জীবনানুভূতি, চলচ্চিত্রবোধ এবং একটা দিগদর্শন যা ছবির বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী লিয়েফ লান্দাউ-এর একটি ক্ষুদ্র বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলতে চেয়েছেন— "সাহিত্য কর্মকে পর্দায় রূপান্তরের প্রশ্নে যা অবশ্য প্রয়োজন তা হচ্ছে মূল রচনার কেন্দ্রস্থ ভাবের প্রতি চিত্রনাট্যকারের বিশ্বস্ততা।" সেদিক থেকে পথের পাঁচালী কিংবা ওয়ার এ্যান্ড পীস যেমন তিতাসও তেমনি, জীবন মৃত্যু এবং সমাজ ভাবনার পরিণত শিল্পরূপ। যার content : দার্শনিক ধর্মনৈতিক মনোভঙ্গী, শ্রেণীসম্পর্ক, ব্যক্তি সম্পর্ক এবং জীবন সম্পর্ক।

যোশেফ ফন স্টার্ন বার্গের যুগ যদিও অতিক্রান্ত তথাপি ঋত্বিক ঘটক সাহিত্য রীতির আধিপত্যকে বিলোপ করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর দৃশ্যধর্মিতার উঠোনে তিতাসের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। যেখানে ছবির বক্তব্য অঙ্কন-গ্রহণ-সমর্থ। কোমল গান্ধারের বেলায়ও পরিচালক এই একই ভাবনায় আক্রান্ত ..."বক্তব্য কথাটিই সাহিত্য গন্ধী।'রূপক'ও তাই। আধুনিক কাব্যে এমনকি নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট ধারাতেও তাদের প্রয়োগ তার উদাহরণ স্বরূপ। চলচ্চিত্র শিল্প তথাকথিত 'সাহিত্য' উপায় অবলম্বনে নিঃসঙ্কোচ, সে উপায় তির্যক কিংবা সরল যাই হোক।"

অথচ 'এরই' মধ্যে ঋত্বিক অবরুদ্ধ বিপরীত। বিরুদ্ধের বিরুদ্ধে। সুষ্টার্থ বিদ্রোহ। সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটকের যে নিজস্বতা, আত্ম-সংস্কৃতি সেটা তাঁর প্রকাশভঙ্গিতে বিরোধালঙ্কারের মত। এবং এই যে একভাবত্ব কিংবা অদ্বিতীয়ত্ব এটা তাঁর দর্শনের অনিবার্যতার কারণে। তাই তাঁর প্রতিটি ছবিতেই সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সমান্তরাল। তথ্যগত নয় সত্যগত কারণে তিনি তাঁর সিনেমাটিক লাইনআপ-এ অনেক ক্ষেত্রে সংযতচারী নন্। হতে চান্ না। হতে পারেন না। কেননা তিনি মনে করেন জ্যামিতিক অর্থে 'ছবির প্রাথমিক স্তরে টানা গল্প, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের মাঝে একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলো খেলা করছে। এবং আরও গভীরে দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিগনির্দেশগত সংকেতগুলো।' এই emotional effect কিংবা sentiment-এর কারণে তাঁর সৃষ্ট

চলচ্চিত্রেও realism এবং romanticism নাটকের এ দু'টো গুণই আছে। সমষ্টি এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধি আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করতে যেয়ে তাঁর শিল্প সৃষ্টি— classical concentration নয়।

"শিল্পকে committed হতেই হবে। সর্বশিল্পের শেষকথা মানুষ। বর্তমান মানুষ, যারা শোষিত তাদের স্বার্থের বাইরে কোন শিল্প করা আমি পাপ মনে করি। committed মানে সংগ্রামী দুঃখী মানুষদের সঙ্গী হওয়া যাতে ভালবাসা এবং ঘৃণা দু'টোই তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে।"ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি ছবিতে তাই পরিচিত সংগ্রামী মানুষের মুখ। সমকালীনতার প্রেক্ষিতে তিনি একটি অখণ্ড জনসমষ্টির সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনবোধের বিশ্লেষণের গভীর থেকে একটি বক্তব্যকে তুলে ধরেন। মৃত্যু-অবক্ষয়-দারিদ্র বৃত্তায়িত অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণ রেখা, কোমলগান্ধার এবং তিতাসে। নাগরিকেও মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণার শিল্পরূপ প্রকাশ পেত। পায়নি। মানুষের কথা, জীবনের কথা বললে অবক্ষয় কিংবা নৈরাশ্য-বাদের কথা বলা হয় না— এটা ঋত্বিক-ছবির মূল সুর। তাই তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে একবার, দু'বার, প্রতিবার এবং আবার প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা। এ বাংলা ঋত্বিক ঘটকের বাংলা। তাঁর প্রায় ছবিতে তাই শহর উহ্য। বাংলার প্রতি জরাজীর্ণ মমত্ববোধ সম্ভবত এর কারণ। তাঁর সব ছবিতেই এই ভাঙ্গা বাংলার মানুষের সমস্যা, জীবন সংস্কৃতি নিয়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টির জীবনে আন্ত-ভ্রমণ করেছেন। সাহিত্য-মঞ্চ-চলচ্চিত্রে তাঁর এই একই বিশ্বাস শ্লোগানে উচ্চারিত— "চারিপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙ্গন, আমি জানি, তার মূল হচ্ছে ভাঙ্গা বাংলা। পূর্ব-বাংলার লোক বলে এ কথা মনে করিনা। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলে একথা জানি যে, দুই বাংলার মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসেব করার কথা নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত।" দশ বার বছর পূর্বে তিনি যে মূল্যবোধ নিয়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে নিবেদিত ছিলেন তিতাসেও তা অপরিবর্তিত থেকেছে। আবারও আমাদের বিচলিত চিত্তকে স্পর্শ করেছে তাঁর দিগদর্শন চিহ্নিত প্রায় বিশ্রুত লোকসঙ্গীত এবং দ্রুপদী, কীর্তন, বাউল, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের জলবতী প্রয়োগ। যাকে তিনি ভাবেন এ দেশের অতীত বর্তমান সমাজ সংস্কৃতির সেতু-রূপ। এ ক্ষেত্রে তিনি আইজেনস্টাইন, ডি সিকা, প্রকিয়েভ কিংবা সত্যজিতের চাইতে ভীষণ ভিন্ন। একক।

ছবির শুরুতে টাইটেলেই তিতাসের উপস্থিতি— দেরাজউদ্দিন ফকিরের উদাত্ত কণ্ঠে লালনের গান 'তোমার আজব লীলা নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই' মুহূর্তে একটি সাঙ্গীতিক উপলব্ধিকে আমন্ত্রিত করে। চলচ্চিত্রে আবহ সঙ্গীতের আত্মীয়তা অনুভবের মাচাঙে দোল খায়। এ সঙ্গীত ছবির শেষ ফ্রিজ শটটির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সমাহৃত। তিতাসে সঙ্গীতকে ধ্বস্তাধস্তি করে আনা হয়নি। প্রয়োজনে, অত্যন্ত নিরুপদ্রবে তা এসেছে ছবির শরীরে। ছবিতে তাই যতক্ষণ গান আছে জীবন আছে, গান নেই জীবনের ক্রমক্ষয়িষ্ণুতা সমস্যা বিপর্যয় আন্তরিত। (ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানের প্রযোজনা এবং ওয়াহিদুল হকের গ্রন্থনায়) সঙ্গীত ব্যবহারে এমন নিষ্ঠা বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোন ছবিতে

নেই। এই অর্থে যে আঞ্চলিক লোকগীতি, কীর্তন কিংবা লালন শাহের গান ব্যবহারের অনিবার্যতা এবং অন্তরাল সঙ্গীত রচনায় এ পরিমিতিবোধ এই প্রথম। এ প্রসঙ্গে চার্লি চ্যাপলিন এবং নোয়েল কাওয়ার্ডের ছবি কিংবা ভিন্নার্থে মার্কিন ছবি 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'র কথা উল্লেখ করতে হয় যে ছবিটি সঙ্গীতমুখর হয়েও যথেচ্ছ ব্যবহারে সঙ্গীত ভারাক্রান্ত নয়।

ঋত্বিকের ছবিতে আর যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিতে একই চিত্রকল্প, শব্দ, সঙ্গীত এবং প্রত্যেকের আচরিক ব্যবহার। রেনোয়াঁ, ফ্লাহার্টি, ডনস্কয় এবং সত্যজিতের মত কেবল অনেকক্ষেত্রে নদী জলেই তাঁর প্রকৃতি প্রতীককে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আরও বিস্তৃত। ভিন্ন। তাঁর ছবির মূল প্রতীকেরা— নদী-গাছ-পাহাড় আকাশ-বৃষ্টি বারংবার একই মন্দিরার অন্তর্জীবনে সুর তুলেছে। তাই 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বর জীবনের সংগ্রাম থেকে পালিয়ে সুন্দর একটি নদীর কাছে এসে দাঁড়ায় ; 'কোমলগান্ধার'-এর অনসূয়া পাহাড়ের নৈসর্গিকতায় জীবনের মূল্যবোধকে খুঁজে বেড়ায় ; 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা বাঁচার আশায় পাহাড়ের সামনে পরিচিত ঢাকের শব্দে মহাপ্রয়াণে যাত্রা করে ; 'অযান্ত্রিক'-এর নববিবাহিতা রমণী পাহাড়ে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে এসে আদিবাসী গানের ছন্দে জীবন হঠকারিতাকে উপলব্ধি করে আর 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ বাসন্তীর সমস্ত দুঃখ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে যখন তার মাতৃহৃদয়ের অনন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

"আমরা নব মনস্তাত্ত্বিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা থেকে শিল্পবিচারের কতকগুলো মূলসূত্র পাই, যাকে comparative mythology আমাদের সামনে illustrate করে। ... মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার আগের থেকেই বিধৃত হয়ে আছে social collective unconscious অর্থাৎ মানবজাতির যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভাণ্ডার। মানুষের যা কিছু গভীরতম অনুভূতি সবেরই উৎস এইখানে। এবং কিছু কিছু মৌল প্রতীক (archetype) মানুষের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি যে প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। স্বতস্ফূর্ত মানুষের যে প্রতিক্রিয়া তার বেশির ভাগেরই মূল এইখানে। এবং এই archetype সব সময়ই image-এর মধ্য দিয়ে symbol হয়ে দেখা দেয়"। ... ঋত্বিক ঘটকের লেখা বিশ্লেষণ দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ থেকে এটুকু উদ্ধৃত করতে হোল এ কারণে যে তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রে এই archetypal image অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন 'অযান্ত্রিক'-এর বিমল-জগদ্দল, 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, 'কোমল গান্ধার'-এর ভৃগু-অনসূয়া কিংবা 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বর-গীতা-হরপ্রসাদ এই প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদের সামাজকি মৌল প্রতীক (archetype)। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুণ সিকোয়েন্স-এ দু' একটি জায়গায় যেমন বুড়ি গ্রামবাংলার আত্মারূপে প্রতিভাত হতে পেরেছিল। অবশ্য অপুর সংসারে গোচারণরত সহায় সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্র ত্রিজটের ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিতাসের রাজার ঝি এবং বাসন্তী চরিত্র দু'টি archetype,—রামপ্রসাদও তাই। 'সুবর্ণরেখা'র কালীমূর্তি যেমন পূরাকল্পীয় চিত্রকল্পের ভাবরূপ নিয়ে এসেছে তেমনি তিতাসেও মা ভগবতী। অপরাজিতের কালপুরুষ, বুনুয়েল

এর 'নাজারিন'-এ যীশু খৃষ্টের ব্যাপারটি কিংবা ব্রায়ান ফরব-এর 'হুইসল ডাউন দি উইন্ড' এবং রোডে ব্রেসোর ও হ্যাজার্ড বালথাজায় পরিচালকদের একই চিন্তার কারুকাজ মুদ্রিত।

মৃত্যু—ঋত্বিক ছবির প্রধান শর্ত। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ধারণা পুনরুজ্জীবনের অন্তহীন প্রবাহের শর্তে আরোপিত। ঋত্বিক ঘটকের প্রায় সব ছবির শেষ চিত্রকল্পে এই মৃত্যুচেতনা জীবনের প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণের চিত্রণবোধক। তাই নীতা, অনসূয়া, গীতা, রাজার ঝি এরা একইভাবে মৃত্যুকে আমন্ত্রিত করেছে। গদারের ছবিতে যেমন মৃত্যু পবিত্রতায় ভরে ওঠে তেমনি ঋত্বিকের ছবির মৃত্যুর চিত্রার্থ—মৃত্যুর জন্যে বেঁচে থাকা।

তিতাসের অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে অন্তর্নাটকের যে বিক্ষিপ্ততা তা 'নবতরঙ্গের' ধারাকে অনুসরণ করে নয়। কিংবা 'নিও রিয়ালিজম' কে উপেক্ষা করেও নয়। তুচ্ছ ঘটনাকে নাটকীয়তার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে চিত্রকল্প-পরম্পরা-স্পন্দন (rhythm) এর সৃষ্টি করে। দৃশ্য চিত্রায়ণে তাঁর এ নাট্যভঙ্গি একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতি (system) হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিরিশ দশকের ফরাসি 'আঁভা গার্দ' চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা লুই বুনুয়েল একবার বলেছিলেন— "নিও রিয়ালিজম চলচ্চিত্রের প্রকাশরীতিতে কিছুটা নতুনত্ব এনেছে, তার বেশী নয়। নিও রিয়ালিষ্ট বাস্তব অসম্পূর্ণ, নগণ্য এবং সর্বোপরি বুদ্ধি সর্বস্ব। কাব্যবোধ ও বিস্ময়বোধ যার দ্বারা ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য বাস্তবের সম্পূরণ ও প্রসারণ হয়, তার স্পর্শ নিও রিয়ালিষ্ট ছবিতে পাওয়া যায় না। নিও রিয়ালিষ্ট ছবিতে বাস্তববোধে গোলমাল করে ফেলা হয় অলৌকিক (fantstic) আর শ্লেষাত্মক আজগুবির (ironic fantasy) মধ্যে।" ঋত্বিকের ছবিতে এ মন্তব্যের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন-সান্নিধ্য প্রন্যাসিত।

সত্যজিতের সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের আপাত বিরোধ এইখানে। সত্যজিৎ রায় নবতরঙ্গ ভাবিত সম্ভবত কিন্তু ঋত্বিক নবতরঙ্গ শাসিন নন ; সত্যজিতের ছবিতে কেমন একটা পরিশীলিত অভিনয়, 'ধোপদুরস্ত' ভাব— মাপা মাপা কথা, শব্দ-সঙ্গীত-মুভমেন্ট ইত্যাদি ঋত্বিকের ছবিতে যা অনুপস্থিত। সত্যজিৎ বিভিন্ন চিত্রকল্পের মধ্যে একটি পারম্পর্য রক্ষার অন্তিম চেষ্টা করেন, ঋত্বিক যা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। সত্যজিৎ তাঁর ইচ্ছাগুলোকে গুছিয়ে- গাছিয়ে যত্নতার সঙ্গে পরিবেশন করেন কিন্তু ঋত্বিক ঘটক যা ইচ্ছে তাই করেন। এ জন্যই তিনি ঋত্বিক ঘটক এবং একমাত্র ঋত্বিক ঘটকই বলতে পারেন "সত্যজিৎ রায় এবং সত্যজিৎ রায়ই তাঁর শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে আমাদের সত্যনিঃশ্বাস কেড়ে নেওয়ার মত সত্য —ব্যক্তিগত স্বকীয় সত্য সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেন। পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকুরন দৃশ্যাবলী আমার ব্যক্তিগত মতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে মহৎ ও প্রকৃত শিল্পের নিদর্শন। যেমন করেই হোক সত্যজিৎ সমসাময়িক বাস্তবতার সাথে সংযোগ স্থাপন করেছেন ঐ মুহূর্তে।" এরও অনেক পরে সত্যজিৎ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন— "বাংলাদেশে চলচ্চিত্র মাধ্যমটাকে যদি কেউ বুঝে থাকে তবে সে একমাত্র সত্যজিৎ রায়।" আমরা জানিনা আর একটা ঋত্বিক ঘটক জন্মালে

আজকের পৃথিবীর এ 'ঋত্বিক ঘটক' সম্পর্কে তিনি কী মন্তব্য উচ্চারণ করতেন।

কেননা অনেকে এবং প্রায় প্রত্যেকেই ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা-তর্কে সত্যজিৎ রায়কে টেনে আনেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে। বিজ্ঞের মত বলেন — লেখেন— ও হলে এই হোত ; এ হলে ওই হোত ; এমন না— তেমন, ফলনা দক্না ইত্যাদি। কিন্তু তাঁরা বোঝেন না কিংবা বুঝতে চান না যে সত্যজিৎ সত্যজিৎ। ঋত্বিক ঋত্বিকই।

সত্যজিৎ-ঋত্বিক অথবা ঋত্বিক-সত্যজিৎ প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়ল তখন ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের 'মুভি মন্তাজের' (প্রলয় শুরের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে) একটি নিবন্ধের কিছু মন্তব্যাংশের উল্লেখ না করে পারছি না। উপাদেয় ব্যাপার নিঃসন্দেহে। প্রলয় শুর এভাবে লিখছেন—

" ... যেদিন পৃথিবীর এগারজন পরিচালককে নিয়ে একটি 'বিশ্ব মানচিত্র' তৈরি হয় তাতে এগারজন পরিচালকের নাম এবং ফটো ছিল তাতে ঋত্বিক ছিলেন না, ছিলেন ক্রফো। তখন পর্যন্ত ক্রফোর ছবির সংখ্যা ঋত্বিকের ছবির সংখ্যার চেয়ে বেশি নয়। আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে অযান্ত্রিক, কোমল গান্ধারের চেয়ে 'ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ', 'জুল এন্ড জিম' Better film! ক্রফো যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের 'অন্যতম' হতে পারেন, ঋত্বিক কেন সেই শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের আসরে প্রবেশাধিকার পাবেন না, এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয়।

বিদেশী ছবি সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত সব মন্তব্য, যা আর কারো সঙ্গে মেলেনা সেখানেও আমাদের ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই। তাঁর নানা উদ্ভট মন্তব্য, তাঁর জীবনধারণ, তাঁর চলচ্চিত্র, সমস্ত কিছু মিলে তাঁর চরিত্র। তাঁর ছবিতেই কেবল সত্যজিৎ বিরোধী, বিপরীত রায় একটা শিল্পব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ ক্যামেরার যে জাতীয় ব্যবহার পছন্দ করেন ঋত্বিক তা করেন না। দু'জনের হাতে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্যামেরা, ভিউ ফাইন্ডারে সত্যজিৎ যা দেখেন, ঋত্বিকের চোখে তা পড়ে না, ঋত্বিক যা দেখতে দেখতে অস্থির হয়ে ওঠেন, সত্যজিৎ তা দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে যান। সত্যজিৎ পরিমিত, সংযত। প্রয়োজনের বেশি একটি সংলাপ ব্যবহার করেন না, একটা বাড়তি দৃশ্য রাখেন না, ঋত্বিকের ছবিতে সংযম নেই। ঋত্বিক চলচ্চিত্রের পরিমিতি সম্পর্কে সচেতনতায় বেশী সময় অকারণে ব্যয় করতে চান না। তাঁর ছবিতে অনেক দৃশ্য বাড়তি বলে মনে হয়। দু'জনের গল্পকথনের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। সত্যজিতে ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহার ঠিক যতখানি তার প্রয়োজন তার বেশি তিনি ব্যবহার করেন না। ঋত্বিকের ছবিতে সঙ্গীতের বিচিত্র ব্যবহার ঠিক এর বিপরীত। ঋত্বিক মনে করেন সঙ্গীত অত্যন্ত সংকেতবহ, সেই সংকেত তাঁর কাজেই তা ব্যবহৃত হয়— তার পেছনে একটা সচেতন নকশা থাকে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অপর একটা স্তরে সমান্তরালভাবে ছবির বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সত্যজিৎ co-incidence পছন্দ করেন না, ঋত্বিক সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে বলেছেন co- incident টাকেই

একটা form হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। সত্যজিৎ কোন রকম ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেন না, 'মেঘে ঢাকা তারা'তে শুধু নয় ঋত্বিকের সব ছবিতেই ওটা মারাত্মক, হয়তো ইচ্ছে করেই রাখেন— আবেগপ্রবণ বাঙালি জীবনে যেহেতু ওটা খুব বেশি।

সত্যজিতের শিল্পবোধ, জীবনবোধ, কল্পনাশক্তি, vision, সত্যজিতের style, তাঁর রীতি, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর ডিসিপ্লিন, ঋত্বিকের সঙ্গে এ-সবের মিল নেই— ঋত্বিক শিল্প বলতে যা বোঝেন, যেমন করে বোঝেন, সত্যজিৎ নিশ্চয়ই সেভাবে বুঝতে চান না, ঋত্বিকের কল্পনাশক্তি, ঋত্বিকের শিল্পবোধ সত্যজিৎ থেকে ভিন্ন বলেই তা আমাদের হৃদয়ে এসে ধাক্কা মারে অন্য কোনভাবে। ..."

কানাল, মিরাক্‌ল ওয়ার্কার, মসিয়েঁ ভার্দু, হ্যাপিনেস অব আস এলোন, বাইসাইকেল থীফ, হিরোসিমা মন আমুর, ব্যাট্‌ল্‌শিপ পোটেমকিন, অপুর সংসার ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় ছবির পরিচালকরা যেমন তাঁদের চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে ডি-ড্রামাটাইজেশন-এর আশ্রয় নিয়েছেন তেমনি ঋত্বিক ঘটকও তাঁর তিতাসে। তবে আঁদ্রে ওয়াইদা, চ্যাপলিন, আইজেনস্টাইন, রেনে, ফেলিনি, ক্রুফো, ভিসকন্তি এবং সত্যজিৎ এদের চাইতে ঋত্বিক ঘটক কিছুটা বেশি ভিন্ন, জেঁকো এবং অপরিচিত। পার্থপ্রতিম চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর এক চিত্রালোচনায় বলেছেন "... কিন্তু ডি-ড্রামাটাইজেশন-এ গতির মাধ্যমই সব সময় অপরিহার্য নয়, অপরিহার্য হয়েছে ইঙ্গিত, ইঙ্গিতের তীব্রতা, এবং তারপরেই এক নিদারুন প্রচণ্ড অব্যক্ত অনুভূতি, সিনেমার ভাষায় ডেড মোমেনটাম সৃষ্টি করার প্রাখর্যে। এই ডেড্‌ মোমেনটাম বা জিরো ফিলিংস-এর ইনফিনিট সেন্স ছায়াছবিতে সর্বাধুনিকতার লক্ষণ, ফেলিনি বা রেনে, ক্রুফো, ভিসকন্তি এবং ভারতের সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটকের মধ্যে বর্তমান। বস্তুত ঋত্বিক ঘটকের এই শূন্য মুহূর্ত গঠনের চিন্তা এবং প্রতিচিন্তা তুলনায় বহুলদৃষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত এবং বলিষ্ঠ। ঋত্বিক প্রতিভার মহৎ উন্মেষ অযান্ত্রিকে। 'অযান্ত্রিক' ছবির শিল্পচিন্তার প্রায় সর্বত্রই সিনেমার এক নতুন ভাষা কাজ করেছে যা 'পথের পাঁচালী'র বিস্ময়কর সাফল্যে চিহ্নিত না হয়েও স্বতন্ত্র। অযান্ত্রিকের সিনেমার ভাষা রোম্যান্টিক নয়; তথাকথিত সিনেম্যাটিক নয়, লিরিক্যাল নয়, অ্যানালজিক্যাল নয়, এসব থেকে আলাদা হয়েও বিশিষ্ট। এই অর্থে বিশিষ্ট যে এ ছবি আগাগোড়া জাতের ছবি, চিত্র স্রষ্টার ট্রিটমেন্ট লাইন এ ছবিতে গভীর সুতীক্ষ্ণ এবং শিল্পসন্ধানী। এ ছবির ভাষা পজিটিভ—অসম্ভব ধার ছিল 'অযান্ত্রিক' স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত রুক্ষতায় এবং লাবণ্যে।" যার এতটুকু নিরুদ্দিষ্ট হয়নি তিতাসে। বরঞ্চ ভিজুয়াল ইমেজ এবং সাউণ্ড ইমেজের কমপেয়ার এন্ড কনট্রাস্ট এ ছবির পাঙ্কচ্যুয়েশনগুলোকে এসটাবলিশ করতে সহায়ক হয়েছে অতিমাত্রিক।

আদি-মধ্য-অন্ত নীতিকে ঋত্বিক তিতাসে কেন সব ছবিতেই পরিহার করেছেন। তাঁর ছবির ইলাসট্রেশন, আইডেনটিফিকেশন, প্রিপারেশন, ক্ল্যাইমেক্স, কমপ্রিহেনশন, এগুলো চিত্র সম্পাদনার ধারাবাহিকতায় অনুপস্থিত থেকেছে। তিনি চিত্র সম্পাদনার যথা প্রচলিত harmony-কে উপেক্ষা করে স্ব-সৃষ্ট চিত্রকল্পের এসটাবলিশিং মুড তৈরি

করেছেন। গদারের ছবির চরিত্রসমূহের ক্ষণস্থিতি-দীর্ঘস্থিতি এবং তাদের আগমন প্রস্থান ও আচরণ যেমন চলিত নিয়মকে অবজ্ঞা করে তেমনি ঋত্বিকের চিত্রাঙ্গিকও প্রথানুগ নয়— বাস্তবানুসরণ, জীবনদর্শন, দেশকালের উপস্থাপনা। উপাদেয় গল্প নেই — পুনরাবৃত্তি আছে—প্রচলিত অর্থে ভারসাম্যহীন এবং গল্পের মেজাজে যা হাস্যকর। প্রতীক বিরোধ এবং প্রতীক সমর্থনে তাঁর আঙ্গিকের অনিবার্য লক্ষ্য হচ্ছে গূঢ় মনোবিশ্লেষণাত্মক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। ফেদেরিকো ফেলিনির 'এইট এন্ড হাফ' এবং 'জুলিয়েট অব দি স্পিরিটস্' কিংবা ভিন্নার্থে রেনের মনোলগধর্মী ছবি 'লাস্ট ইয়ার ইন ম্যারিয়েনবাদ'-এর মত শিল্পস্নাত 'তিতাস একটি নদীর নাম' আপাত দুর্বোধ্য বিরক্তিকর বলে আখ্যায়িত হলে টাস্‌কী খাবার কিছু নেই। কেননা চলচ্চিত্রের দুর্বৃত্তরা যদি তাদের অপরিশোধিত মন্তব্যের দুর্ভাষণে একে ব্যর্থতা বলেও উল্লেখ করেন তবু সেক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটকের বক্তব্য থেকে যায়— "আমাদের জাতীয় culture complex যেভাবে constellate করেছে তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি, যার ফলে হয়তো সব সময় সহজবোধ্য থাকতে পারিনি, শুধু ওদেশে নয়, এদেশেও। তার কারণ আমার অক্ষমতা ছাড়াও আর একটা আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ—বিশেষ করে তার মুখর অংশ—খুব সহজেই এই যুগে শেকড় হারিয়েছে। এটা একটা অত্যন্ত তিক্ত বাস্তব ঘটনা। এবং এই শেকড়হীন ভদ্রশ্রেণী কোন অবলম্বনই এখনও ধরে উঠতে পারেনি। আর অনেক মারাত্মক ঘটনাই ঘটছে, তার মধ্যে আমার ব্যর্থতা অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা মাত্র।"

তিতাসের পাড়ের মানুষ, গোকর্ণঘাটের সেই জীবন—ঝড় রৌদ্রে যারা জলে নৌকো ভাসায়, নদীতে জাল ফেলে, উঠোনে গাবের খাদা চরকী-টেকো-তকলী নিয়ে সুতো কাটে, প্রকৃতি পরিবেশে যাদের জীবনে আসে সুখ-আনন্দ-গান-পূজা-পার্বণ-দারিদ্র-অভাব-অসুন্দর-ঈর্ষা-ঝগড়া-বিবাদ-মৃত্যু—এগুলোর মুখোমুখি ঋত্বিক ঘটক তাঁর ক্যামেরার চোখকে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর প্রত্যেকটা এপিসোড জীবনের টুকরো টুকরো ছবি—সমগ্রতায় 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

মাঘ মণ্ডলের ব্রত। বাসন্তী-সুবল-কিশোরের ছেলেবেলা। সঙ্গীতমুখর চৌয়ারী-ভেউরা ভাসানো জীবন। রামপ্রসাদ তিতাসের জলের সমান্তরালতায় দৃষ্টি রেখে বলছে 'মরণকালে যেই জল মুখে না দিলে পরানডাতো আর বাইর অয়না, একদিন হয়ত দেখুম তিতাসে সেই জলটুকুও নাই। শুকাইয়া খটখইট্টা অইয়া গ্যাছে— ড্যাংগা (যে রামপ্রসাদ সত্যি একদিন তিতাসের চর দখল নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে লাঠালাঠি করে মারা যায়, তিতাসে যখন সত্যি জল নেই— শুকনো। জল গেছে, মালোরাও গেছে— এটা সে মানতে চায়নি)। কিন্তু ক্যামেরা ততক্ষণে রামপ্রসাদ বাসন্তীকে ছাড়িয়ে তিতাসের জলে। নৌকো—নৌকোর পাল। একটা। দুটো। ক্রমশ অনেক।

সময় অতিক্রান্তের দু'টো শটই নেয়া হয়েছে তিতাসের জল-আকাশ-নদী-নৌকোর পাল ছুঁয়ে। টাইম ল্যাপস-এর প্রচলিত রীতিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এ ক্ষেত্রেও তিনি

অপরিচিত রাস্তার ধুলো কঙ্করে পা রেখেছেন।

যেমন নদীর পাড়ে অল্প পানিতে ধীরস্বভাব ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে। রাজার ঝি বালু-জলে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। রাত্রি শেষ। সূর্য ওঠার আলোময় সংকেত। ছপ্ ছপ্ শব্দ করে একটা নৌকো এগিয়ে আসছে। তাতে পাল নেই। নৌকা থেকে গৌরাঙ্গ-নিতানন্দ নেমে এসে রাজার ঝিকে তুলে নিল। পুরো ফ্রেম জুড়ে একটা পাল এসে ঘুরে গেল। তারপর আরও। নদী-জল-আকাশ। পাল তোলা নৌকা। একটা, দু'টো, অনেক। বর্তমানে প্রবাহিত অতীতমুখী সময়—ক্রমাগত ভবিষ্যৎ। জীবন যে রকম।

ঋত্বিক ঘটকের নিজস্ব একটা evocation অর্থাৎ চাক্ষুষ দৃশ্যবস্তুর অতীত অবস্থা সৃষ্টির বিন্যস্ত ক্ষমতা আছে। অযান্ত্রিকে যেমন নির্জন দীঘির পাড়ে রাস্তার ওপর ভাঙা গাড়ি থামিয়ে বিমল 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গান গায় তেমনি তিতাসেও 'লীলাবালি' গানটির রিপিটেশন এবং সরোদের সুসম ব্যবহার ঐ একই কারণে। তিতাসে ঋত্বিকের দৃশ্যগঠনশৈলীর অনন্যতা এবং বলিষ্ঠতা ছবির প্রতিটি স্তর এবং তন্নিষ্ট ভাব-বিশ্লেষণে দুর্ধর্ষ। বিশেষত কিশোর এবং রাজার ঝি'র যন্ত্রণাময় মানসিকতার অস্থিরতম নির্জনতায়। ক্রমবদলের গভীরতা নির্দেশে যার চূড়ান্ত পরিণতি। উপলব্ধির উচ্ছ্বন্নতা। উজানীনগরের খলাতে দোল পূর্ণিমার উৎসবে রাজার ঝি অজ্ঞান হয়ে পড়ল—কিশোর তাকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়েছে—সরোদ নিঃসৃত সুরে তার অস্থির দৃষ্টি রাজার ঝি'র শান্ত মুখে, এই একই দৃশ্য পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে আর একটি দোল উৎসবে, পাগল কিশোর যখন স্মৃতির মন্দিরে অনুপ্রবিষ্ট।

রাজার ঝি—সে তখন অনন্তর মা। কালোর মা'র ভিটেয় মুংলীর সঙ্গে চার ঘর হয়ে। বাসন্তী তখন সুবলার বিধবা বৌ, রাড়ি, অনন্তর মাসী। এ দু'টি চরিত্রকে চিত্রনাট্যকার কিংবা পরিচালক কখনো এক হতে দেননি। তাই 'পরসতাব' বলতে গিয়ে অনন্তর মা যখন বলছে— জানিনা, বাসন্তী তখন বলছে— জানি, কিন্তু কমুনা। এবং আলন্তির দিনে পিঠে বানানোর আনন্দময়তার মধ্যেও দু'টি ভিন্নমুখী চরিত্রের সমান্তরাল দুঃখ আলোকিত।

যেমন বাসন্তী যখন মা-বাবাকে বলছে 'শিশুকালে বিয়া দিছলা। মইরা গ্যাছে। জানলাম না কিছু, বুজলাম না কিছু, সেই অবুঝকালে ধম্মে কাঁচা রাড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অব্দি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে ঘুরি। তোমরাত সুখে আছ, তোমরা কি বুঝবা আমাব দুঃখের গাঙ কত গহীন।' আবার অনন্তর মাকে এবং প্রকারান্তরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এই বলে যে 'আমারও দিদি সময় সময় মনডা অচল হইয়া পড়ে। কিন্তুক আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখছি এইভাবেই চালামু।' সে প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত—যখন বিপর্যস্ত মালো পরিবারের ক'টা নারী অসম্ভব নীচে নেমে গিয়ে জীবনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে, তখন বাসন্তীর প্রত্যয়াংকিত চোখ-মুখের বিগ ক্লোজআপে সমূহ চরিত্রগুলোকে অনুপস্থিত করে দেয়া।

অন্যদিকে অনন্তর মা যখন মাত্রিক বিশ্বাসে ধুচনীতে পিঠে নিয়ে পাগলের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন কিশোর তাকে দা উঁচিয়ে মারতে গেল। কিন্তু অনন্তর মা'র অবিশ্বাস্য-আবেগ-স্থির চোখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল। সাউন্ডট্রাকে কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ নেই। তারপর সেই বিয়ের গানের রিপিটেশন—'লীলাবালি লীলাবালি বর ও যুবতী সই গো কি দিয়া সাজাইমু তোরে'— সঙ্গীত ক্রমে উঁচুতে। কিন্তু ক্যামেরা যখন আপতিক অর্থে কিশোরের চোখে এল গান তখন উল্টো ট্রাকে। বিস্মরণ। বিস্মৃতি। মনে থাকা না থাকা। নির্জনতার মধ্য দিয়ে কিশোরের প্রস্থান ক্রমশ অন্ধকারে। সেই অনন্তর মা'র কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞা নেই বাসন্তীর মত। সে তার বিশ্বাসের অসহায়তায় নিজকে সমর্পিত করছে এই বলে যে 'আমি কেবল জানি একলা জীবন চলেনা, পাগলেরে পাইলে তারে লখ্ কইরা জীবন কাটাই।' এখানেই চরিত্র দু'টির ভিন্নতা।

ছবির পাঁচটি (নাকি ছ'টি) মৃত্যুর একটি অনুপস্থিত, সেটি সুবলের। কিশোর এবং অনন্তর মা'র মৃত্যু দৃশ্য রচনায় ঋত্বিক ঘটক যে সমৃদ্ধ চিত্রভাষার প্রয়োগ করেছেন তা ওয়াইদার 'কানাল'-এর একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনও মনে হতে পারে ঋত্বিক ঘটক বুঝিবা তাঁদেরই সমগোত্র যাঁরা চলচ্চিত্র সৃষ্টির পূর্বে প্রথম জীবনে অঙ্কনশিল্পী ছিলেন।

অনন্তর মা'র অজ্ঞান দেহটাকে তুলে নিয়ে কিশোর নদীর পাড়ে উঠে আসছে— যখন সে বিশ্বাসের কণ্ঠদেশে এবং অনুভবের বুকে মুখ রেখেছে— কীর্তনের সুর ক্রমে উঁচুতে 'একি অপরূপ শোভা মনোহর, রাধা-কৃষ্ণের মিলন হোল দেখিতে সুন্দর ...।' আবার গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ কোলাহল। লাঠি হাতে একদল লোকের প্রবেশ। প্রহার। দু'টো অচেতন দেহ পড়ে আছে তিতাসের বালুতে। শেষের শটটি নেয়া হয়েছে তিতাসের পাড়ে রাখা একটা অকেজো নৌকোর মধ্য দিয়ে। তারপর কিশোরের 'বউ' শব্দোচ্চারণ অনন্তর মা'র আকাশ দেখা—গড়িয়ে যেয়ে তিতাসের জল ছুঁয়ে মৃত্যু—প্রশান্তি— একটা পাখীর বিশ্রী ডাক— অনন্তর 'মাসী' বলে চীৎকার —বাসন্তীর কান্না-বৃষ্টি। সুবর্ণরেখায় সীতার মৃত্যু দৃশ্যে যেমন সঙ্গীত ছিল না তেমনি তিতাসেও।

শ্রাদ্ধের দিন। রাত্তিরে অনন্তর মাসী ধীর গলায় বলছে—অনন্ত শুনছে, নতুন লাগছে কথাগুলো— "মা যদি মইরা যায় সেই মা আর মা থাহে না, শত্তুর অইয়া যায়। মইরা যেইহানে যায় পোলাডারেও হেইহানে লইয়া যাইতে চায়। তার আত্মাডা পোলাডার চাইর পাশে ঘুইরা বেড়ায়। একলা পাইলে কিংবা আন্ধারে, বট, তেতুল গাছের তলায় কিংবা নদীর ঘাটে পাইলে কাছে কেউ না থাকলে লইয়া যায়। নিয়া মাইররা ফালায়।" সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠে অনন্ত— "না, আমার মায় অমন না। মায় আমারে দেখা দেয়, চোখে বড় ব্যথা, কান্দে। কী জানি কয়, ঠাহরও পাইনা।" অতঃপর অনন্তর মা'র ভগবতী বেশ—বাসন্তীর কোলে অনন্ত শুয়ে আছে— কাঁসর ঘন্টা বাজছে—ধূপ ধোঁয়া—এ দৃশ্যকল্প রচনার সম্পূর্ণতা একটা ঝড়ে। এর আগে টুকরো টুকরো দু'তিনটে শট-এ অনন্তর অবচেতন মনে তার মায়ের ভগবতী রূপ কল্পনার ইমেজটাকে যত্নতার

সঙ্গে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

তিতাসে ঋত্বিক ঘটকের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্ম যেটুকু তা হচ্ছে নৌকা বাইচের আরম্ভটা এবং এর শেষ। চিত্রালোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই হয়ত এর শিল্পকৃতি নিয়ে দুর্বল ধিক্কার উচ্চারণ করবেন এবং তর্কের সিঁড়িতে অসংখ্য গ্রাম্যতাপূর্ণ উদাহারণ-মন্তব্য এনে দাঁড় করাবেন। কিন্তু যুক্তি তক্কের ধার ধারেন না ঋত্বিক ঘটক। তাই তিতাসের পরিণতির কথা ভেবেই তিনি কখনো পিকাসোর 'নন-কম্পোজিশন'-এর আশ্রয় নিয়েছেন আবার কখনো আইজেনস্টাইনের 'দি জেনারেল লাইন' কিংবা দভ্‌ঝেঙ্কোর 'আর্থ'-এর মত চলচ্ছিত্রশিল্প মাধ্যমকে অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে চিত্র-সম্পাদনার নতুনতর পরীক্ষা নিরীক্ষার সান্নিধ্যে চিত্রল ভাষায় একটি সমাজের অনেকগুলো জীবনের ধংসোন্মুখীনতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

নৌকা বাইচের ঐ একটি শ্বাসরুদ্ধকর-ভয়ঙ্কর-সুন্দর দৃশ্যময়তার জন্য তিনি অনেকগুলো টুকরো টুকরো দৃশ্য নির্মাণ করেছেন। যেমন উদয়তারার সঙ্গে অনন্তর চলে যাবার দৃশ্য—অনন্তর দৃষ্টিতে তার মাসীর জলভেজা পা থেকে মুখ পর্যন্ত তুলে আনা—ঘাটে কাপড় আছড়ানোর শব্দ— যেখান থেকে অনন্তকে নিয়ে নৌকোটা চলে গেল সেই অস্থির জলটুকুতে দৃষ্টি রেখে বাসন্তীর 'কুত্তা' শব্দোচ্চারণে স্নেহকে বিতাড়িত করে ক্ষোভকে আমন্ত্রিত করা —কান্নার সঙ্গে প্রকৃতি-নিয়তির একাত্মতা একটা বৃষ্টিতে, যখন ফ্রেমে রোজীকে প্রলম্বিত রেখে একটা খালি নৌকো চলে যাচ্ছে।

তারপর নৌকা বাইচের প্রস্তুতি। এক একটা নৌকো, ভিন্ন ভিন্ন গান। জীবনময়তা। সংগ্রামী মানুষের পরিচিত মুখ। জলের জীবন। মুখর তিতাস। এরই মাঝে অনন্তর সঙ্গে অনন্তর মাসীর সাক্ষাৎ। দু'টি প্রবল মাতৃস্নেহ মনের অন্তর্প্রতিযোগিতা চূড়ান্ত রূপ নিল যখন একটি কলহে—সেখান থেকে কাট করে নৌকা বাইচের শুরু। আবার প্রচণ্ড উত্তেজনাকর নৌকা বাইচের শেষে ভীষণ রকমের নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দ ফ্রেমে তিনটি মুখ— বাসন্তী-অনন্ত-উদয়তারা। দৃষ্টি প্রসারিত তিতাসের আবির জলে। একটি দিনের শেষ—বেলা ডুবছে ক্রমশ। কর্মোৎসব ক্লান্ত ছায়া ছায়া ঘরমুখো মানুষগুলো তিতাসের ধীরস্থির জলে অল্প শব্দে বৈঠা ফেলে সে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

অনন্ত যেমন একদিন বনমালীর সঙ্গে নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতে যেতে চেয়েছিল : জালের নক্‌শী জল ফোঁটার ফাঁকে ফাঁকে অনন্তর গলার ধড়ার সূতোয় হাত রাখা আদুল গা, উজ্জ্বল চোখ, দুর্বল দু'টি হাত দিয়ে জোর করে নৌকোর গলুই ধরে রাখার অন্তিম চেষ্টা। এবং অতঃপর জলের ওপর দিয়ে ক্যামেরায় অনন্তর পেছন থেকে নৌকোর চলে যাওয়া—ক্রমশ দূরে—একটা কচুরী পানা ভেসে যাওয়া—এ দৃশ্যের সঙ্গে বাসন্তীর নিরুত্তাপ খেদ "অনন্ত যেমন আমার কাছে একটা নাম, তিতাসও তেমন একটা নাম অইয়া রইল। নামডা আছে নদীডা মরছে"— এর যে সুসংবদ্ধতা এটা ঋত্বিক ঘটকের চিন্তা-সৃষ্ট।

আবার যেমন ছবির শেষ অংশটুকু। ঋত্বিক ঘটকের কাব্যিক সৌন্দর্য অলংকরণ—মরুময়করণ। বাসন্তী কাঁথা জড়িয়ে উঠে আসছে—তিতাসের উঁচু নীচু বালু পাড় ছেড়ে, নদীর গভীরে—এ দৃশ্য বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতম চিত্রকর্মের সঙ্গে তুলনীয়। শুকিয়ে যাওয়া তিতাসের বালু খুঁড়ে জল তুললো বাসন্তী— অলস দু'হাতে ঘটিটাকে জাপটে মুখের কাছাকাছি তুলতেই প্রায় সবটুকু জল গড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তে শুষে নিল তা তিতাসের বালু, ঠিক তখন যখন ক্লোজ-আপে বাসন্তীর পিপাসার্ত চোখ মুখ, সেই দৃষ্টির অবাকতায় ভেসে এল নারকেল পাতা বাঁশির এলোমেলা সুর। মালোদের সম্ভাবিত শত্রু কৃষকের দখল করা চরে ফসলের মাথা দোলা—তার মাঝ দিয়ে উঠে এল একটা জীবন। সেই ফসলের ক্ষেত ধরে গামছা কাছা দেয়া আদুল গায়ের শিশুটি ছুটে গেল কোমরের ঘন্টি বাজিয়ে। বাঁশিতে সুর তুলে। পাতার বাঁশি। ভেঁপু। তিতাসে আবার জীবন। হাসি-গান-আনন্দ। আবার সেই নতুন ভবিষ্যৎ। সেই স্বপ্ন। সংগ্রাম। জীবনের-মৃত্যুর। অতঃপর পুরো ফ্রেমে বাসন্তীর আনন্দময় বেদনাঙ্কিত মুখের শটটি ফ্রিজ হয়ে যায়। ঋত্বিক ঘটকের এই মার্কসীয় ভঙ্গি তাঁর সব ছবিতে জীবনের সত্যে স্পর্শায়িত।

তিতাসের সমাজ বিশ্লেষণে চলচ্চিত্রকারের একটা চেতন মন কাজ করেছে গভীর অনুভবে। যে কারণে সমবায় ঋণদান সমিতির ফিসারী শাখার ম্যানেজার বিধুভূষণ পাল মালোদের যাত্রা দিয়ে অন্তরে মেরে এবং ট্যাংরা দিয়ে প্রাণে মেরে ব্যাং নাচান নাচানোর দুঃসাহস দেখায়। রজনী পাল যদিও জানে মালোরা তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে কয়না কিন্তু আশ্বস্ত হয় এই ভেবে যে রাধাচরণের দুঃস্বপ্ন সত্যি হলে তিতাসই এদের পাক খাওয়াবে। মালোদের সামাজিক নীতির বন্ধনও শ্লথ হয় তামসীর বাপের মত বামুন কায়েত ঘেঁষা স্বার্থান্বেষী মালোদের কারণে। "পান-তামাক খাবা দশজনের দশ কতা হুনবা" এবং ভরতের বাড়ির উঠোনচালার বিচার দৃশ্য (যা প্রায়শ লং শট এবং মিড শট এ দেখানো হয়েছে) যত না বাস্তব তার চাইতে সত্য কেষ্টচন্দ্রের মত নৈতিক দুর্নীতিবোধসম্পন্ন বিশ্বাসহন্তার প্রতি রাম প্রসাদের আক্ষেপ "শাস্ত্র এগোরে ভেড়া বানাইয়া থুইছে। আমি তো ধর্মের শত্তুর।"কিন্তু এর বিপরীতও আছে— প্রতিবাদ। বিপর্যয় হতাশা মৃত্যু যখন গ্রাস করছে মালো সমাজকে তখন বাসন্তীর পুরুষ্ট কণ্ঠের সতেজ চীৎকার—"মালো সমাজের গায়ের রক্ত কি তিতাসের জল অইয়া গ্যাছে!"

আবার এই সমাজ বিশ্লেষণের কারণেই কাদির মিয়াকে আনা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্নতায়ও সমাজে রাম প্রসাদ এবং কাদির মিয়াদের মত সমান্তরাল চরিত্রের মানুষ বিদ্যমান। যদিও সে বাস্তববোধের বিশ্বাস থেকে রমুকে বই হাতে মক্তবে না পাঠিয়ে পাঁজন হাতে গরুর পিছে মাঠে পাঠাতে বেশি আগ্রহী।

এ ছবির ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে যে কথাটি অবশ্য বলবার তা হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের যথাপ্রচলিত সুসজ্জিত সেটের বিরুদ্ধে একটি স্বধর্মী প্রতিবাদ। যদিও

কাহিনী বিস্তারের স্বাভাবিকতায় তাঁকে এটি করতেই হোত, যেমন করতে হয়েছিল ইতালীয় নব্য বাস্তববাদী ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ রেনোয়ার সুযোগ্য সহকারী ভিসকন্তিকে তাঁর 'ওসেসিওনের' বেলায়। তাতেও প্রকৃতি পরিবেশের একাগ্রতা লক্ষণীয়। বিশেষত তিতাসের কিছু শট নির্মাণে বিশ্বাসযোগ্য স্থান-কাল-সময়-মুহূর্ত-পরিবেশ নির্বাচন। যেমন মাগন সর্দারের চরিত্রটি বোঝাতে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে নদী পাড়ের শিকড় প্রায় উপড়ানো একটা উঁচু নারকেল গাছের তলায়। এমন আরও অসংখ্য টুকরো টুকরো দৃশ্য আমাদের জীবনানুভবকে স্পর্শ করে। যেমন শুকদেব পুরের 'রাই জাগো' গানের সকাল, কালোর মা'র উঠোনে উদয়তারার শ্বশুরের তুমরী খেলার বেত্তান্ত, আলন্তির দিনের পিঠে বানানোর রাত, শ্রাদ্ধের দিন অনন্তর ভগবতী রূপ কল্পনার পর বৃষ্টিজলে দু'টো হাঁসের নিঃশব্দ ভেসে যাওয়া, বৌ নিয়ে ফেরার পথে কিশোর সুবলের কথাবার্তা, টিমটিমে আলোর নৌকোর 'আল্লাজীর লীলা কে বুঝিতে পারে' গান, কাদের মিয়ার সঙ্গে ছেলের বৌ খুশীর কথা কাটাকাটি, বাসন্তীর মা'র সঙ্গে বাসন্তীর চুলোচুলি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও আছে, যেমন— রাজার ঝি'র rescue নদীর পাড়ে এবং মৃত্যুও তাই, বাসন্তীর অন্তর্জিজ্ঞাসার সঙ্গে ঢেঁকির শব্দ, মালোদের গৃহে যখন আগুন লাগানো হচ্ছে তার মধ্যে হঠাৎ করে একটা মাচাঙ-লাউয়ের মুহূর্ত উপস্থিতি, রাজার ঝি'র 'পরসতাব' বলার সময় 'পাগল অইল'—কথার সঙ্গে সঙ্গে পিঠার ছেঁকা শব্দ ধোঁয়া; মালা বদল, এবং আবির মাখানোর সময় কিশোরের দ্রুত অস্থিরতা এবং রাজার ঝি'র স্থির যত্নতা, বাসন্তী যখন অনন্তকে তাড়িয়ে দিচ্ছে তখন অনন্তর কেমন একটা মুখভঙ্গি, ছড়ানো ভাতে কাকের মিছিল, 'কাউয়ার বাচ্চা' বলে অনন্তকে চড় মারা, অনন্তকে নিয়ে চলে যাবার সময় উদয়তারার অসম্ভব স্থির মুখে ক্রমশ কঠিন একটা হাসির আভাস— এমন সব চিত্রকল্প।

ঋত্বিক ঘটকের ডিটেলের কাজকে কেবল চমৎকার-চমৎকার শব্দ মেখে বললে সত্য-সুন্দর-শিল্পকে উপেক্ষা করা হয়। ঝড়ের পর নিকানো দাওয়া, বাসন্তীর তেলের শিশি রাখা, কাদের মিয়ার ট্যাঁক থেকে পয়সা দেয়া, বাসন্তীকে মারতে গিয়ে পিঁড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার শব্দ, গোকর্ণ ঘাটের দু'একটা ডাক, গেরাপী দেয়া নৌকোয় অনন্তর উঠে আসা এবং বৃষ্টি ভেজা আম গাছের নিচে জমা জলে পাতায় ধরে থাকা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া, এগুলোর জন্য নিশ্চয়ই ঋত্বিক ঘটককে ভাবতে হয়েছে— সেইখানেই তাঁর শৈল্পিক অসার্থকতা (?) কিংবা মানসিক সুস্থতার প্রশ্ন। এবং এর উত্তর।

তারপর যেমন তাঁর great mother— এটাকেও তিনি established করেছেন তিতাসের শরীরে। বাসন্তী তাই ঘরের দাওয়ায় শুয়ে মাকে বলে 'মা, একটা জিনিসই বুঝলাম—এই দুনিয়াতে মা-ই সব, মা ছাড়া আর কিছু নাই।" এই মা কখনো বাসন্তী নিজে, কখনো রাজার ঝি আবার কখনো উদয়তারা। 'জ্যানটিপে' নয় কেউ।

ফেদেরিকো ফেলিনি ইতালীয় চলচ্চিত্রবিদ তুলিয়ো কেজিচ-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ক্যামেরাম্যান মটেলী এবং ভেনানজো প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন যে 'ক্যামেরাম্যান পরিচালকেরই একটা হাত যা কিছু নির্দিষ্ট ফল পেতে সাহায্য করে। যে আমাকে অনুসরণ করে ও কথামত কাজ করে, সেই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান। সে যদি বুদ্ধিমান হয় তবে ভালই, কেননা, বুদ্ধি তো আর ক্ষয়ে যায় না। নির্দিষ্ট রুচিবান ক্যামেরাম্যান অপেক্ষা মনোনয়নকারীকে আমি পছন্দ করি। এমন একজনকে দরকার যে আমার ইচ্ছেটা ধরতে পারবে এবং সেই ইচ্ছাকে রূপায়িত করার জন্য নিখুঁত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে।" অবিশ্বাস্যভাবে যেমন করেছেন বেবী ইসলাম। তিতাসে। নিরুত্তাপ নিষ্ঠাবান এই চিত্র গ্রাহকের ক্যামেরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সহায়তা করেছে তিতাসে। তাঁর কৃতিত্ব ছবির পা-মাথায় বিতরিত। তাঁর wide angle-এর depth যেমন দৃশ্যমুক্তি ঘটিয়েছে তেমনি ক্রিয়েটিভ কিছু মিড শটও এক একটি চিত্রকল্পকে করেছে গর্ভবতী।

ক্লাসিক কিংবা আর্ট ফিল্মের স্বপক্ষে যে দু'টো ব্যাপার অবশ্য ক্রিয়াশীল এবং অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় তা হচ্ছে সম্পাদনা এবং এফেকট সাউন্ড। কিন্তু এ দু'টোই পরিপূর্ণতা পায়নি ছবিটিতে। চেষ্টার অন্তিমে যদিও তা আন্তরিক। এর ভিন্ন কারণ হতে পারে ছবির অ-আ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটকের উপস্থিত না থাকা। কিন্তু আরও একটা প্রকান্ড কারণ হচ্ছে, এফ.ডি.সি.র অসুস্থ যন্ত্রপাতি এবং এর অব্যবস্থা। আর নয়ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'এর চাইতেও বিশুদ্ধ ছবি হতে পারত।

তারপর আরও যে কথা তা হচ্ছে তিতাস যখন একটা শিল্প ছবি— ঋত্বিক ঘটক যেটা নির্মাণ (make) করেননি, সৃষ্টি (create) করেছেন, যে চলচ্চিত্র সৃষ্টি কিংবা ছবির কিছু ত্রুটি স্বাভাবিক ভাবেই অনেক জিজ্ঞাসা এবং প্রশ্নের মুখোমুখি হবে। ঋত্বিক ঘটকের individualismও যেখানে প্রায় অপারগ অসমর্থ এ ত্রুটিগুলো ডিঙ্গিয়ে তিতাসকে একটি সার্থক শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যেতে। যেমন রাজার ঝি'র মৃত্যুদৃশ্যের elongation, রামপ্রসাদ এবং কাদির মিয়ার একভাবত্ব, মালো পাড়ায় আগুন লাগানোর দৃশ্যটির অবাস্তবতা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজার ঝি'র আধুনিকত্ব, সংলাপ উচ্চারণে প্রায় সকলের অশুদ্ধতা, আলন্তির দিনে পিঠা বানানোর সময় পাগল কিশোরের হঠাৎ স্বাভাবিক আচরণ, ঘরের খিল এঁটে বাবুকে ওভাবে হেনস্থা করে জলে ফেলে দেয়া। অস্পষ্ট এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় লিপি ইত্যাদি।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে তিতাস শিল্পোত্তীর্ণ ছবি নয়। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের পোষা সাংবাদিকদের দ্বারা তিতাস সমাদৃত হবে—এমন কোন কথা নেই। তিতাস যে সপ্তাহখানেকের বেশি চলেছে এই তো ঢের। এজন্যে প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকের মত দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে প্রযোজক পরিচালককে সান্ত্বনা দিতে বলেনি কেউ। বাংলাদেশে নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনে তিতাস যে ধারাকে প্রবাহিত করেছে তা ক্রমশ ঢেউ তুলবে—ডুবে যাবে ভেসে যাবে আর সব।

রুগ্ন-রুচি গণদর্শকের কথা না-ইবা তুললাম। কেননা বংশ পরম্পরায় এরা জ্ঞানপাপী নয় আদৌ। মূলত তিতাসেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের দ্বিধাবিভক্তি—এদের একদল দায়িত্বশীল সৎ এবং চলচ্চিত্র শিক্ষিত। অন্যদল বলতে কি, থু-থু চাটা অতি হীন চাটুকার এবং মহামুর্খ। এরা চট করে চীৎকার ধ্বনি সহযোগে কাউকে অপমানিত করতে না পারলে কিংবা ব্যর্থ হলে কখনো 'বাজে' কখনো 'দুর্বোধ্য' শব্দের আশ্রয় নেয়। রেসকোর্সমার্কা জনগণ দু'হাত তুলে তাকেই সমর্থন জানায়। কিন্তু এজন্যে আমাদের এখানে কোন প্রতিবাদের শামিয়ানা টাঙানো হয় না, যেমন হয় ওদেশে, পশ্চিম বাংলায়—ধ্রুব গুপ্তের মাথার 'পর—'মহৎ সাহিত্য, শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, সুগভীর সঙ্গীতের রসাস্বাদনের জন্য বিদ্যাবুদ্ধিগত প্রস্তুতিতে আমাদের কোন ক্লান্তি থাকবে না অথচ চলচ্চিত্র শিল্পের বেলায় তার আবেদনকে তাৎক্ষণিক এবং মুখের কাছে পাকা ফলটির মত সহজলভ্য হতেই হবে—এমন দাবির মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাশীলতাব পবিচয় নেই'।[৩]



লেখাটির এখানেই শেষ নয়। এরপর লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ওপর কয়েকটি সমালোচনা থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন 'মালোচনাগুলো এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বলে বাদ দেয়া হয়েছে।

'তিতাস' : একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে

মসিহউদ্দিন শাকের

মূল চরিত্র তিতাস ও বাসন্তী। কিন্তু ছবিটা কি শুধুই নদী ও নারীর রোমান্টিক উপমাচ্ছন্ন? নাকি এর অন্য কোন তাৎপর্য আছে ? তিতাস কী ? বাসন্তী কে ? দেখা যাক।

পৃথিবী মনুষ্যভোগ্যা। মানুষ প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত হলেও জীবন ধারণের জন্যে সে প্রকৃতির ওপর লাঙল চালায়, জাল ফেলে, কুড়াল মারে, দাঁড় বায়। আর এসব করার মধ্য দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারলে কিংবা না পারলে সমাজে আইন বানায়, আইন ভাঙে, নামাজ পড়ে, গান গায়। এই সত্যটিকে তুলে ধরার সুবিধার্থে প্রকৃতির এমন একটা অঙ্গকে বেছে নেয়া হয়েছে যা কোন একটি জনবসতির মধ্যে ধমনীর ন্যায় প্রবাহিত, যার নীরে মাছেরা সাঁতার কাটে, তীরে গাছেরা দাঁড়িয়ে থাকে, লোকজন যার জল পান থেকে প্রক্ষালণ এমনকি নৌযানে চড়ে আক্রমণের জন্যে ব্যবহার করে থাকে। 'তিতাস' সেই নদীর নাম।

প্রথম দৃশ্যে দেখা গেল চক্রাকারে কিছু একটা ঘুরছে। খানিক পরে বোঝা যায় ওপর থেকে নেয়া শটে এটা একটা ছাতা। কাহিনীর শুরুতেই যে এটাকে ঘূর্ণায়মান বিমূর্ত বৃত্ত হিসেবে দেখানো হল এর একটা গভীর অর্থ হয়তো আছে। যেমন চক্রাকারে জীবনের যাত্রা। শেষ দৃশ্যে ঋত্বিক দেখিয়েছেন মৃত্যুর পাশাপাশি উপস্থিত নতুন জীবন। 'তিতাস'-এর জীবনের এই চক্রগতি নির্মাতার দোষে গুণে মিলে প্রতিভাত ! কারণ ছবিটি দেখে অতৃপ্ত হওয়ার অনেক যুক্তি থাকে। প্রধানত সেগুলো বিষয়বস্তুর দুর্বলতা ; আর কিছু আঙ্গিকের যা ঋত্বিকের অসংযমের ফল। শিল্পকলা জীবনের নির্যাস, যেমন আতর, ফুলের। এতে অসংযম আকাঙ্ক্ষিত স্বাদকে পানসে করে দেয়।

'তিতাস'-এ বিভিন্ন দৃশ্যে নাটকের ন্যায় প্রকাশ ভঙ্গি (ঋত্বিক একদা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম সংগঠক ছিলেন!), কাহিনীর সামাজিক বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন ঘটনার চেয়ে প্রায়ই ব্যক্তির অকিঞ্চিৎ আবেগের ওপর দর্শকের মূল্যবান মনোযোগকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা, আলোর অবিশ্বস্ত ব্যবহার ও সঙ্গীতের কিছু অতিপ্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে ঋত্বিক শিল্পের পরিমিতি লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য কাহিনীর ব্যাপক পরিসরকে উপন্যাসের চেয়ে চলচ্চিত্রে সাজানো এমনিতেই কঠিন, যেহেতু চলচ্চিত্রে দৃশ্যবহির্ভূত বর্ণনা পরিহার্য। তথাপি ঋত্বিক সাহসের সাথে তিতাস পারের মানবগোষ্ঠির জীবনের জটিলতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন এটাই বড় কথা। এই জটিল প্রক্রিয়ায় প্রধানত কী কী উপাদান আছে সরলভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক।

১। জীবিকার জন্যে কাজ : মাছ ধরা, আলুর ব্যবসা, সুতো কাটা, চাষাবাদ।

২। উৎপাদনের উপকরণ : বৈঠাচালিত পালখাটানো গুনটানা কাঠের নৌকো, চরকা কিংবা তকলিতে কাটা সুতো, ঘরে বানানো জাল, কৃষিকাজে চিরাচরিত কাঠের লাঙল-ঢেঁকি, দুধের জন্যে গৃহপালিত পশু ও শবজীর জন্যে উঠোনে পোঁতা লাউ-কুমড়ো, যাতায়াতে নৌকো ও ঘোড়ায় টানা গাড়ির ব্যবহার—এক কথায় অনুন্নত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন বৈশিষ্ট্য।

৩। জৈব উপাদান : রাজার ঝি (কবরী) ও কিশোরের (প্রবীর মিত্র) মধ্যে বিয়ের লগ্ন থেকে শুরু হওয়া নানা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত জৈব আকর্ষণ, বিধবা তরুণী বাসন্তীর (রোজী) অনন্তকে ঘিরে মাতৃক্ষুধা, বাসন্তীকে কেন্দ্র করে জমিদার (হায়াত) ও তার যুবা সঙ্গীর (ফখরুল) কামলিপ্সা।

৪। অর্থনৈতিক সম্পর্ক : রাজার ঝিকে চাল ডাল দিয়ে বাসন্তীর সাহায্য (অর্থনৈতিকভাবে বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ) থেকে শুরু করে জমিদার কর্তৃক মালোপাড়ার ঘরে ঘরে অগ্নিসংযোগ—এ সবই এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক। যদিও শেষোক্ত কাজের জন্যে অচরিতার্থ লিপ্সাকেই প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তবু বল প্রয়োগের পশ্চাতে যে অর্থশক্তি কাজ করেছে তা বোঝা যায়।

বাসন্তীর যৌবন সমাজের বেদবাক্যের কাছে ব্যর্থ হয়ে যায় বলে সমাজের সাথে তার দ্বন্দ্ব। কিন্তু এ সমাজের মূলে রয়েছে শ্রেণীবিভেদ ও তজ্জনিত অনুন্নত উৎপাদন প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল এমন এক অর্থনীতি যাতে নারীর ভূমিকা গৌণ অথবা নেই। বাসন্তীর মুক্তি তথা সম্মানের সাথে বাঁচার একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে এই রকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুরোপুরি ধ্বংসসাধন— ঋত্বিকের অভীষ্ট বক্তব্য যদি এটাই হয় তাহলে তা বলতে পারায় তিনি দ্বান্দ্বিক (dialectic) বিচারে যতটা সফল হয়েছেন— 'তিতাস'-এর সাফল্য ততটাই।

দ্বান্দ্বিক বিচার বস্তুবাদী পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত। "যে রকম জটিলই হোক না কেন সব সামাজিক সংগঠনেই—বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ তার লেনদেনের সময় ইচ্ছেমত একটা সামাজিক সম্পর্কের ধরন বেছে নেয় না... ইত্যাদি।' (Lenin. Collected Works, Vol. 14, p. 323) বরং তার লেনদেনের ধারণাটাই ঠিক করে দেয় সামাজিক সম্পর্ক কী হবে।

'তিতাস' দেখলে মনে হয় ঋত্বিক এ বিষয়ে মোটামুটি সচেতন ছিলেন। 'মোটামুটি' এ কারণে যে লেনদেনের ব্যাপারটা তিনি অনেক জায়গায় আনলেও ব্যক্তির জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখালেও সে সব প্রতিক্রিয়া বাস্তবে রূপান্তরের জন্যে খুব একটা অর্থবহ তো হয়ে ওঠেই না, উল্টো চরিত্রগুলোর মনে বিষয়ীগত (subjective) আবেগের জন্ম দেয়। যেমন, অনন্তর মা মরে গেলে সে যখন বস্তুত তার জীবনধারণের লড়াইয়ে ছিন্নমূল তখন সে চোখের সামনে তার মৃত মাকে পূজোর দেবীর ন্যায় দেখতে পায়। একে archetypal image কিংবা যাই বলা হোক এতে অনন্ত এবং দর্শক—

উভয়েরই একটা ভাববাদী জগতে স্থানান্তর ঘটে। বাস্তব তলিয়ে যায় অবাস্তব রূপকল্পের নীচে।

"I do not in the least justify reality, but on the contrary, indicate in this reality itself the deepest sources *(though they are invisible at first sight)* and the forces that can transform it". (Lenin, Coll. Works, Vol. 18, p. 330), বিশেষ জোর প্রদানটি লক্ষণীয়।

লেনিন তাঁর তাত্ত্বিক কার্যোপলক্ষে উক্তিটি করেছিলেন। মনে হয় আজকের চলচ্চিত্রশিল্পীরও দায়িত্ব এরকম। কিংবা আরও বেশি। কারণ চলচ্চিত্র আপাত অদৃশ্য বিষয়কেও দৃশ্যগোচর করার ক্ষমতা রাখে।

শিল্পীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করা উচিত। ইতিপূর্বে ঋত্বিকের বিষয়ীগত চিন্তায় ত্রুটির নজির দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ীগত চিন্তা পরিহার করাও ভুল হবে। কেননা বিষয়গত (objective) জগৎ যেমন চেতনার জন্ম দেয় তেমনি চেতনা আবার বিষয়গত পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলে। মানুষের অবস্থা এ দু'য়েরই বিভিন্ন মাত্রার সংমিশ্রণের ফল। চেতনার ভূমিকাকে গৌণ করে দেখলেই ববং অন্য ধরনের ত্রুটি সংঘটিত হয়, যা fatalism.

Fatalist-এর যান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমাজ সচেতন হওয়া বলতে কী বোঝায়? গর্কীর 'ওকুরভ শহর' উপন্যাসে ডাঃ রিয়াখিন এক যুবককে বলছেন, 'দর্শনের আলোতে দেখলে বুঝবে একটা মানুষ কোন সময় তার চারপাশের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যেমন পারে না সে পৃথিবীর ঘোরাটাকে বন্ধ করতে কিংবা পক্ষাঘাত রোগের লক্ষণ দেখার পর সেটাকে রোধ করতে। বা ধর এখন এই যে বিচ্ছিরি বৃষ্টিটা পড়ছে এটাকে পর্যন্ত সে থামিয়ে দিতে পারে না। কাজেই যা হবার তা হবেই, যা না হবার তা হবে না। তুমি যত চেষ্টাই কর না কেন। এটা হল গিয়ে মার্কসের কথা, মাই ফ্রেন্ড, এর ওপর আর কথা চলে না।" তারপর যুবকটি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু আলেক্সেই স্তেপানোভিচ.. মানুষকে তো কিছু একটা করতে হবে, না কি হবে না?" তখন ডাঃ রিয়াখিন জবাব দেন, "তাকে তো বলাই হয়েছে, ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়াও, নিজেদের পথ ওরা নিজেরাই করে নেবে।" (M. Gorky, Coll. Wks. Vol. 9, p. 67)

এখানে দেখা যাচ্ছে ডাঃ রিয়াখিন, যিনি 'দর্শনের আলোয়' জগতকে দেখার ব্যাপারে উৎসাহী, তিনি বড়জোর স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবের (!) একজন প্রবক্তা হ'তে পারেন, তার বেশি নয়। কারণ তিনি চেতনার ভূমিকায় বিশ্বাসী নন। তাঁর কোন কল্পনা নেই যা বাস্তবে রূপ দিতে যেয়ে তিনি পরিকল্পনায় হাত দেবেন।

সুতরাং সঠিক কল্পনা বা বিষয়ীগত উপাদান গভীর শিল্পবোধের বরং সহায়ক। এমনকি তা ফুটিয়ে তুলতে যদি শিল্পে বাস্তবের অতিরঞ্জন করতে হয় তাও দোষণীয় নয়। "... an artist whose imagination is properly directed and relies on a broad knowledge of reality and an intuitive wish to give his mater-

ial the most perfect possible form and supplement data with what is possible and desirable, is also able to "foresee" ; in other words, Socialist realist art has the right to exaggerate, to "fill out". "Intuitive" should not be understood as meaning something ahead of knowledge, something "prophetic" (M. Gorky, from a letter to A.S. Shcherbakov, 1935).

ঋত্বিক তিতাসপারের বাস্তবের সাথে সাথে তার দুঃসহ উপাদানগুলো দূর করার জন্যে সেখানকার মানুষের চেতনা কিংবা কর্মের কোন অভিব্যক্তি কি তুলে ধরেছেন ? কিছু কিছু জায়গায় ধরেছেন বই কি। যেমন জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর সামনে জনগণের প্রতিরোধ—যদিও তা দ্বিধাবিভক্তির জন্যে ব্যর্থ হয়ে যায় ; কিংবা জমিদার ও তার লম্পট স্যাঙাতের অপদস্থ হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এসব ঘটনার তাৎপর্য লঘুতর অনেক দৃশ্যের ভীড়ে হারিয়ে যেতে চায়। যেমন উন্মাদ কিশোর মালোর নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রণয়ভঙ্গী ও বালুচরে হরপার্বতীর কায়দায় রাজার ঝি'র সাথে মিলন প্রহারপর্বের পর পর্বতে প্রযোজ্য ঢঙে রাজার ঝি'র বালিতে গড়াগড়ির দৃশ্য।

ঋত্বিক তিতাসপারের মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিও দেখিয়েছেন। কিন্তু তা যেন কেবল জুম লেন্সের মাধ্যমে নৌকা বাইচের ন্যায় উত্তেজক দৃশ্যের অবতারণা করার জন্যে। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ঋত্বিক শট কম্পোজ করতে পারতেন চমৎকার। অথচ অর্থহীনভাবে অনেক সুন্দর শটের আমদানী অথবা দীর্ঘস্থায়িত্ব অলঙ্কারের পর্যায়ে গিয়ে ছবি ঘোলাটে করেছে বলে মনে হয়। প্রশস্ত কোন লেন্সের ব্যবহারও যত্রতত্র হওয়ায় এর বিশেষ আবেদন কমে গেছে।

শেষ দৃশ্যে আসা যাক। বাসন্তী এখানে তার সমস্ত দুঃসহ ব্যঞ্জনায় উপস্থিত। বাসন্তী যেন তিতাসের লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠির মূর্ত রূপ। কিংবা তার চেয়ে বেশি। কেননা শোষিত সমাজে নারী যে 'দ্বিগুণ শোষিত' (লেনিন) তার প্রমাণ এখানে মেলে। সমগ্র সমাজে যে অর্থনৈতিক শোষণ চালু আছে বাসন্তী তারই ফলে অবমাননাকর যৌনপ্রস্তাবের শিকার। পাইকারী গৃহদাহে তার সমাপ্তি। সরকারী পরিকল্পনায় অবহেলিত থেকে তিতাস শুকিয়ে গেছে। বাসন্তী এই খাঁ খাঁ করা প্রকৃতিরও প্রতীক। মৃত্যুপথযাত্রিনী বাসন্তীকে আপাতত কেউ বাঁচাতে পারে না। কাদের মিয়ার নিরস্ত্র মমত্ব এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎ। বাসন্তী মরে যায়। তার মৃত্যুর মুহূর্তে ফসলের খেতে ভেঁপু বাজিয়ে দুরন্ত শিশুর পদচারণা এক নিঃসন্তান রমণীর আযৌবন স্বপ্নই শুধু নয়, চর পড়ে যাওয়া সমাজগর্ভে লুক্কায়িত সম্ভাবনাও বটে। দৃশ্যটি কাব্যিক দিক থেকে Cranes Are Flying- এ বরিসের মৃত্যুদৃশ্যের সাথে কিংবা Shop On The Main Street-এর শেষ দৃশ্যের সাথে তুলনীয়। আঙ্গিকের দিক থেকে তিতাস-এর এ দৃশ্যটি মনে হয়েছে বিষয়বস্তুর সাথে সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ঋত্বিকের শৈল্পিক ধারণার পরিণততম রূপ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন

তপন জ্যোতি বড়ুয়া

নদীর গল্পের মত গল্প হয় না আর। এই নদী, আকাশ, বন, মাটি, মাটির সরল সোজা শিশু-প্রকৃতির মানুষ নিয়ে গল্প— মজাদার মহাভারত— কেউ প'ড়ে শুনে সায়[১] করতে পারে না। পুরো একখানা আখ্যানে আরো আরো আখ্যান। নদীর তীরে তীরে লোকালয়। স্রোত চলেছে রূপোলি ফিতের আকারে কুল কুল শব্দে। দূরে যতদূর চোখ চলে নদী ও আকাশ এক। কেবলই নৌকোর গায়ে সারারাত সারাদিন ছলাৎ ছলাৎ একটানা। রাত্তিরে ফকিরের আঁধার চিরে ফেলা গানে মাত হয়ে থাকে নদী। গান থেমে যেতে ক্রমে ছায়াচ্ছন্ন হতে হতে আবার আঁধারে ডুবে যায়। যেখানে নদী সেখানে মানুষ এবং জীবনমৃত্যুর নাট্যও সেখানে। ওরা তিতাসপারের গেরস্থরা আছে বেশ। নদীরই তো সন্তানসন্ততি ওরা! নদী ওদের মা। নদীর একূল-ওকূল জোড়া পটে তুচ্ছ ধুলির মতো ওদের অস্তিত্ব যেন বা মায়ের কোলে নিজ শিশু। বহু কষ্টে কালঘাম ছুটিয়ে ওরা সংগ্রহ করে রোজকার অন্ন। ওদের উপায় ক'রে যেতে হয় গতর মাটি ক'রে। জীবন নিংড়ানো হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে। দেহের ক্ষুধার এই সৈনিকদের বাঁচতে হলে তাপ আহরণ করতে হবে নদী থেকেই। বরাবর বাসন্তী এ গ্রামের একজন। পরে কিছুদিনের জন্য অনন্তর মা ওরফে রাজার ঝি। ঐ দুজনের চোখে যেন স্নিগ্ধ মঙ্গল প্রদীপ। গ্রামের গৃহবধূরা ভক্তিপ্লুত মনে সন্ধ্যায় শাঁখ বাজায়। তুলসী-তলায় আলো দেখিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে গড় করে। বছরের বিশেষ মৌসুমে পিঠের পার্বণ হ'য় ঘরে ঘরে। বছরে একবার হয়েই থাকে নৌকো বাইচ। মাত্র একদিনের নানারঙা মেলা। চারদিকে থেকে এসে জড়ো হয় লোকজন-নৌকো। মেলা তখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। নৌকো দৌড় শেষে শ্রান্ত সূর্য পাটে নামলে ভিড় পাতলা হয়ে আসে। এ এক চমকপ্রদ তীর্থ—যার আবহের প্রধান সম্বাদী স্বর বিভেদ বা বৈষম্যের নয়, সনাতন, অকৃত্রিম ত্রিকালজয়ী হৃদ্যতার। মানুষ মানুষের কী দারুণ কাছাকাছি এখানে।

কিন্তু নদী বড় বিচিত্র। কেউ তার ভিতরের কথা, সব কথা জানে না। যে নদী এত লোকের ভাত-ভিত, রোজগার পাতির উৎস সে কিনা একদিন বিনা বাক্যব্যয়ে আগাম জানান না দিয়ে সটকান মেরে দিলে। নদী, এ তোমার কেমন ধারা ব্যবহার গো? খুব যে একবারো পিছুপানে না তাকিয়ে গেলে চলে অচিন দেশের সদাগরীতে, ভুলো-মন তুমি ভুল করে বসোনি তো? নাও না কেন তোমার সন্তানদেরও সঙ্গের সাথী ক'রে?

---

১. বিণ. সমাপ্ত

কিন্তু না। কোন রকম কৈফিয়ৎ কি জবাবদিহির তোয়াক্কা করে চলা কবে কোন নদীর ধাতে ছিলো?

নদী সরে যেতে, আস্তে আস্তে মাটিও ওদের পায়ের তলা থেকে সরে যায়। বাঁচবার কোন রকম সুরাহা রাখলো না নদী যখন আর ওদের জন্য— ছাদহীন উন্মুক্ত আকাশের তলায় ওদের জাতব্যবসা খুইয়ে ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়া থাকলো কি?

আঘাত আসে অধিকন্তু মানুষের কাছে থেকেও। খাঁড়ার ঘা পড়ে মড়ার ওপর। ক্ষমতাবান ধনাঢ্য বাবুসমাজ—সমাজের যারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা— নিরীহের প্রতি কারণে অকারণে খুন জখম দাঙ্গা কি মামলা মোকদ্দমা বাঁধিয়ে দুর্বল নিপীড়িত প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার অর্থ ও লোকবলের যারা অধিকারী— আঘাত ওরা তো হানবেই অভাবে দুর্দিনে ম্রিয়মান হা ভাতে হা ঘরের ওপর। মহাজনের ক্রুর চোখে ছাড়া কেউটে আর খেলবে কোন্ খানে? প্রতিরোধ কিন্তু আসে ছেঁড়া হাঁড়িকালি-ন্যাকড়াতুল্য কাপড় জড়ানো আপাতদুর্বল একা এক রমণীর। নম্র-সজল-সদাসহাস্য অতল কালো চোখের কোটর থেকে। দপ ক'রে এক ফুলকি আগুন ঝলকে ওঠে। দ্বন্দ্বের দু'টি স্বরূপ খুব স্পষ্ট—ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ। মানুষের বিরুদ্ধে যুগপৎ মানুষ ও প্রকৃতি। কিন্তু অন্তহীন সংখ্যা-গনণাতীত অভিযাত্রায় শাশ্বত মানবাত্মা অপরাজেয়।

'তিতাস'-এর শেষ দৃশ্যে ক্লান্ত রুগ্ন নৈরাশ্যভারাতুর বাসন্তী চারপাশে দৃষ্টি চালিয়ে কোনোই আশ্বাস পায় না এক ফোঁটা অমৃতের—প্রাণান্তকর চেষ্টায় প্রায় বুকে হেঁটে নিজেকে টেনে নিয়ে চলে আদিগন্ত ধুসর পাংশু পাণ্ডুর বালির চড়ায়—দূরে বহু দূরে হঠাৎ দেখতে পায় ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ তুলে পোঁ বাজিয়ে দৌড়ে চলা, কোমরে একটুকু আচ্ছাদান জড়ানো, সপ্রাণ আনন্দিত অপার সম্ভাবনাময় শিশু, ফলন্ত শস্যের প্রাচুর্যের বুকে।

ঘাস-লতা-গাছ-পালা-মাটি-জল আকাশ-মানুষের নিখুঁত অবিনশ্বর বর্ণনা ঋত্বিকের 'তিতাস', তিতাসপারের গ্রাম তার প্রকৃতি ও মানব সংসার, তার যাবতীয় ভয়ঙ্করতা-মালিন্য দৈন্য সঙ্কট, যা কিছু সুন্দর মহৎ মানসিক ঐশ্বরিক সবসমেত পল্লীবাংলার একটি প্রজন্মের প্রতিনিধি, কিন্তু চির সাম্প্রতিক আবহমান বাংলার লোকজীবন ও লোক সংস্কৃতির মাত্র আক্ষরিক, নিষ্প্রাণ, জড় দলিল নয় এ। এ ছবির প্রতিটি পরিসর সৎ বিবেকী ও মহৎ শিল্পীর অনুভূতির সূক্ষ্ম কম্পনে, তীব্রতায় আলোড়িত, স্পন্দিত।

শুষ্ক কঠিনতম পাথরও বিদীর্ণ হয়ে বুকের ঝর্ণা নেমে চলে আসতে বাধ্য— ছবির সরল নিঃসম্বল অপাপবিদ্ধ দু'জনের মৃত্যুতে; ধিকিধিকি লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে থাকা গ্রামের প্রেক্ষিতে, ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া শুকনো খরখরে মাটিতে আকাশ ফাটানো দীর্ণ হাহাকারে। কিছু মুহূর্ত আছে যা শিল্পের সারাৎসার, কবিতার যা অন্তর্গত—যেমন— বটের তলায় বা দূরের নৌকায় ভগবতীরূপিণী মা ছেলে অনন্তর দিব্য কল্পনায়; তীর ছেড়ে চলে যাওয়া নৌকোর দিকে আকুল, উন্মন তাকিয়ে থাকা বুক জলে ভাসমান অনন্ত ও পানা'র ব্যঞ্জনাঘন সন্নিহিতি; গানের সর্বপ্লাবী আবহে রাজার

ঝি ও পাগলের মুখোমুখি আবেগ তীব্র নবপ্রেমোন্মীলিত গাঢ় কিছু মুহূর্তে, পিঠে খাওয়ানো কিম্বা দোল উৎসবে নদীতে স্নানের সময় আবীর মাখানো উপলক্ষে।

'তিতাস'-এ প্রায় একটি মহাকাব্যের জনয়িতা ঋত্বিক ঘটক, সেলুলয়েডে যিনি ধরে রেখেছেন শত দুঃখ ভয়-সঙ্কটে, অযুত করাল নখদন্তময় ঘটনার ঘূর্ণিস্রোতে কোনমতে বেঁচে থাকা বাংলার লোকমানসের সুন্দর, সজীব ও মহৎ দিক। স্বাতন্ত্র্যের শিখরে আসীন তিনি উপলব্ধির এমন এক স্তরে, উচ্চতম নৈতিকতা ও শিল্প বিবেকের এমন বিন্দুতে উপনীত— যেখান থেকে জনচিত্ত আকর্ষক অসার চাকচিক্যময় ছবি নির্মাণের স্থূল জীবনাদর্শে এবং ঈষদোত্তম আপোষ নীতিতে পশ্চাদপসারণ অসম্ভব। ব্যক্তিগত সিদ্ধির স্থূল আর্থিক প্রলোভনে আকৃষ্ট হবেন না শিল্পী যেখানে পৌঁছুলে।

ঋত্বিকের চিত্রকর্ম বস্তুত তীব্র ও সপ্রশ্ন বিবেকের ইতিহাস। আগ্নেয়গিরির সাথে তুলনা চলে ঋত্বিকের। মাঝে মাঝেই যার প্রকাশ মুখ খুলে গিয়ে আবেগের, ক্ষোভের, বিদ্রোহের সুন্দর ও ভয়ঙ্কর লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়।

প্রচলিত আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক যে সুদৃঢ় অচলায়তনের প্রশ্রয়ে কিম্বা অবহেলায় নিগৃহীত নিঃসহায় মনুষ্যত্বের পদে পদে ঘটে অপমান, বারবার ঘটনার নানা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় মানুষ হয়ে পড়ে পূর্বাপর বিবেচনাহীন, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বোবা—তার বিরুদ্ধে তাঁর ছবি ছিল হাতিয়ার, সরোষ, ভ্রূকুটিময়, দৃঢ়মুষ্ঠি ও ইস্পাতকঠিন ছিলেন তিনি নিজে।

ঋত্বিক প্রসঙ্গে অনিবার্যত মনে পড়ে Luis Bunuelকে—যাঁর ছবি Penelope Houston-এর ভাষায়, 'Like raw spirit poured straight on to an open wound, a stinging cauterizing therapy of shock'—এবং যিনি, Henry Miller এর বিবেচনায় '... like Lawrence only an inverted idealist. Perhaps it is his great tenderness, the great purity and poetry of his vision, which forces him to reveal the abominable, the malicious, the ugly and the hypocritical falsities of man ...'.

অনীহার সর্বচোষক কাদায় নিরুদ্যম, নিদ্রালু, মন্থরগতি, ভীরু, মৃদু ও জীবনবিমুখ আমাদের জীবন্ত ও সচেতন করে ঋত্বিকের ছবি, হতে দেয়না নৈতিক সুক্ষ্মবিচারের অন্তহীন বিকল্পে দ্বিধান্বিত, উদ্বোধিত করে সুস্পষ্ট দায়িত্ববোধে, Bunuel এর মত সমাজশরীরের পচন ও ক্ষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ কলকাতার সরলা মেমোরিয়াল হলে Federation of Film Societies of India-র উদ্যোগে আয়োজিত শোক ও স্মৃতি সভায় ঋত্বিক ঘটকের ছবি বিষয়ে সত্যজিত রায় :

'অযান্ত্রিক', 'নাগরিক'-এর চেয়ে অনেক বেশি পরিণত। চলচ্চিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞান চর্চা ও বোধ ছাড়া এক লাফে কারো পক্ষে এতটা এগোনো সম্ভব নয়। ঐ রকম

একটা গল্প নিয়ে ছবি করা দুঃসাহসের কাজ। গল্প বলতে কিছুই নেই। সে তৈরি ক'রেছিল অনেকগুলো মুহূর্ত। ছবির নায়ক বিমল। নায়িকা বলতে গেলে ঐ গাড়ি। কিন্তু ঐ গাড়িটার মধ্যে সে সঞ্চারিত করতে পেরেছিল মানবিক গুণাবলী। মানবিকতা মানুষের জন্য বেদনা নিয়ে অনেকেই ছবি করে। ঋত্বিকের ছবিতে সেগুলো শিল্প হয়ে উঠতো, তার ছবির যেটা বড় গুণ সেটা বাঙালি ছবি। ঋত্বিক আমার চেয়ে ঢের বেশি বাঙালি পরিচালক। তার ছবি দেখতে ব'সে আমি বুঝতে পারতুম, এ যে আমি চিনি। এ আমার চেনা লোক।

একই সভায় স্মৃতিচারণরত মৃণাল সেন :

মনে পড়ছে ভবানীপুরের চায়ের দোকানে আমাদের নিয়মিত আড্ডা। সবাই বেকার ... কারোর পকেটে পয়সা নেই। কিন্তু প্রত্যেকের পকেটে একটা করে ছবির বাজেট। আমাদের সেই আড্ডায় যে মানুষটি ছিল সবচেয়ে দুর্দান্ত, অস্থির, উগ্র, বদরাগী ও বেপরোয়া তার নামই 'ঋত্বিক ঘটক।

আমার স্মৃতিতে ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং ছবির অন্তিম দৃশ্যের শিলীভূত বাসন্তীর মুখের রেখায় নৈরাশ্যের কালোমেঘ ও সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে -আশায় ক্ষীণ হাসির মিশ্র কারুকাজ।

আমার চোখের সামনে রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের 'পৃথিবী' কবিতা। একটি সৃষ্টির আবহে আরেক সৃষ্ট কর্মকে দেখা যাক।

'পৃথিবী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বিশ্ববীক্ষা, মনে হয় 'তিতাস'-এর ঋত্বিকের সাথে প্রায় অভিন্ন।

জীবন কি পৃথিবীর প্রতি ঋত্বিকের সম্বোধনও কবিতায় হয়তো হতে পারতো—

'মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ করে সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র।

... ...

অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা
একদিকে অপক্ক ধান্যভার নম্র তোমার শষ্যক্ষেত্র—
যেখানে প্রসন্ন প্রভাত সূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে ...
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।'

তিনি কি আজ নামগ্রাসী আকারগ্রাসী সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে যেখানে 'অগণিত যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের লুপ্তদেহ পুঞ্জিত'? নাকি মেঘলোকে উধাও অনন্ত নক্ষত্রবীথির ধ্যানমগ্ন অন্ধকারে, পরম অচিনের মধ্যে?

আমরা তো জানি তাঁর বিধ্বস্ত ক্ষত লাঞ্ছিত 'জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের শেষ পরিণাম'— দুঃখে, বীর্যে, সত্যমূল্যে অর্জিত জীবনের ফলবান খণ্ড— তাঁর চলচ্চিত্রকর্ম অমরত্বের দাবীদার।



বিধবা বাসন্তী : ঘরে-পরে সকলে যাকে ভেবেছে আলাদা

‘তিতাস’-এর চলচ্চিত্রায়ণ

শান্তনু কায়সার

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ চলচ্চিত্রায়িত হয় ১৯৭৩-এ। তারপর দুই দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময় ঋত্বিক কুমার ঘটক যেমন পুনর্জীবন লাভ করেছেন তেমনি তাঁর সৃষ্ট ‘তিতাস’ও। ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ১৯৮৩-র জাতীয় চলচ্চিত্র আয়োজনের ঋত্বিক রেটরাসপেকটিভ এতটা সাড়া জাগায় যে দর্শকদের অনুরোধে তা দ্বিতীয়বার আয়োজন করতে হয়। প্রথমবার ‘তিতাস’ অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার তা প্রদর্শিত হয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করে। ঋত্বিকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর স্ত্রী সুরমা ঘটক স্মৃতিকথা ‘ঋত্বিক’ গ্রন্থে ভারতে ‘তিতাস’ না যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখন ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় ছবিটি পূর্বোক্ত প্রদর্শনীতে দেখাবার ব্যবস্থা হয়। বিখ্যাত ফরাসি চলচ্চিত্রপত্র ‘কাইয়ে দ্যু সিনেমা’ ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে ‘তিতাস’-এর সশ্রদ্ধ উল্লেখ ও মূল্যায়ন করে। এ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জর্জেস শার্দুল অবশ্য বরাবরই ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর কাজের বিষয়ে শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন।

ঋত্বিক ঘটক আইপিটিএ-এর সেন্ট্রাল স্কোয়াড-এর নেতা ছিলেন। তাঁরা ঐ সময় ‘অঙ্গার’-এর পরপরই ‘তিতাস একটি নদীর নাম’-এর নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চস্থ করেন। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আরেক কৃতি সন্তান উৎপল দত্ত উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন ও তাতে অভিনয় করেন। নাটকটি মিনার্ভা মঞ্চে অভিনীত হয়। ‘তিতাস’-এর শুটিং চলার সময় ‘পালঙ্ক’ ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত চলচ্চিত্রকর্মী মুহম্মদ খসরু হোটেল পূর্বরাগে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সময় তিনি জানান, তখন থেকেই তিনি ‘তিতাস’-কে চলচ্চিত্রায়ণ করার কথা ভাবছেন। অবশ্য জীবনের প্রথম চলচ্চিত্র ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে অনেক মহৎ চলচ্চিত্র স্রষ্টারই দীর্ঘ সময় লেগেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্র-জীবনের শুরুতেই ‘ঘরে বাইরে’-র চিত্রায়ণ করতে চেয়েছেন, অথচ তা বাস্তবায়িত হয়েছে কিছুকাল আগে দীর্ঘ তিরিশ বছর পর। ফেদেরিকো ফেলিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের শুরুতে যে স্যাটায়ারিক্যাল ফিল্মটি তৈরি করতে চেয়েছেন তা বাস্তবায়িত করতে তাঁকে অন্তত চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

‘চিত্রবীক্ষণ’-এর প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক ঘটক বলেছেন, কৈশোর ও যৌবনের তাঁর ‘সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই নস্টালজিয়া উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে। তিতাস উপন্যাসের সেই পিরিয়ড হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমাদের চেনা, ভীষণভাবে চেনা। তিতাস উপন্যাসের অন্য

সব মহত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের সেই ফেলে আসা জীবনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এ ছবিতে রাজনীতির কচকচি নেই, উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী। এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢঙটা ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার শৈশবের সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ঐ যে বললাম এই তিরিশ বছর মাঝখানে ব্ল্যাঙ্ক। আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ব বাংলার তিতাসে ফিরে যাচ্ছি।' ছবির শুটিং চলাকালে মুহম্মদ খসরুকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেছেন, 'তিতাস পরে হতে পারত না। এখনো তিতাস একটা স্টাডি আর আমার একটা ওয়ারশিপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। দিস রিভার, দিস ল্যাণ্ড, দিস পিপল এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর সঙ্গে নিজেকে রি-এস্টাবলিশ করা।' তাই 'তিতাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ভেতরে ছোট প্রেক্ষাগৃহে ঋত্বিক ঘটকের ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে তাঁর পাশে বসে ছবিটি দেখার পর তিনি বাঁধন সেনগুপ্তকে বলেছিলেন, 'কেমন দেখলি ? তোর বাড়ি তো কুমিল্লা। তিতাসের মাটির গন্ধ পেলি ছবিতে ? ... যদি ছবি দেখে বুঝিস তিতাসের মাটির গন্ধ অন্তত তোরা পাচ্ছিস তবেই বুঝবি ব্যাপারটা উতরেছে, নইলে সবটাই বোগাস, নাথিং ... ।'



কিশোর ও তিলক : মাছের সন্ধানে

উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের বিষয়ে আইজেনস্টাইনের মন্তব্যের উল্লেখ করে ঋত্বিক ঘটক তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন : ১. সম্পূর্ণ গ্রহণ ; ২. আংশিক গ্রহণ ও ৩. পয়সার জন্যে ছবি করা। শেষোক্ত পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আংশিক গ্রহণের উদাহরণ ঋত্বিক তাঁর এ প্রবন্ধেই উল্লেখ করেছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র বক্তব্যকে তিনি বদলে দেবার চেষ্টা করেছেন। আর 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'মেঘে ঢাকা তারা আমার চিন্তাশক্তিকে প্রকাশ করেছে। এখানে লেখকের কোনো ভূমিকা নেই। কথাটা কষ্টকর হলেও সত্যি।' আর সম্পূর্ণ গ্রহণের একটি উদাহরণ 'অযান্ত্রিক'। 'সুবোধবাবুর মূল বক্তব্যের প্রতি আমি চেষ্টা করেছি বিশ্বস্ত থাকতে।' প্রবন্ধটি ১৯৬৭-তে প্রকাশিত। 'তিতাস' নির্মাণকালে বা তার পরে এটি লিখিত হলে এই উপন্যাসটি নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণ গ্রহণের একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে তাঁর লেখায় উল্লিখিত হতো। কারণ, এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ গ্রহণের যে দু'টি মৌল বৈশিষ্ট্য— 'লেখকের বক্তব্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকা' ও 'বক্তব্যের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া'র উল্লেখ করেছেন সে দু'টিই 'তিতাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণে অনুসৃত হয়েছে। ঔপন্যাসিকের বক্তব্যকে স্পষ্টতা দান ও গভীরতর করবার জন্যে ঋত্বিক ঘটক তাঁর দু'টি নীতিরও প্রয়োগ করেছেন 'তিতাস'-এর চলচ্চিত্রায়ণে। ১. শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় একথা সত্যি ; কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয় না। ২."আইজেনস্টাইন বললেন, এভরি শট ইজ ইন কনফ্লিক্ট উইথ দি আদার, দ্বন্দ্বের সাহায্যে তৈরি হয়। একটা শট, তার নিজস্ব মানে নেই, পরের শটটারও নিজস্ব কোনো মানে নেই ; কিন্তু দু'টো মিলে একটা তৃতীয় মানে তৈরি হয়। সোজা কথায় থিসিস, এ্যান্টিথিসিস, সিন্থেসিস। এখানেই আসে ডায়লেকটিক্স, এইখানে আসে কার্ল মার্কসের 'এ্যাপ্রোচ টু রিয়ালিটি'। একটা এদিকে একটা ওদিকে দু'টো মিলিয়ে একটা তৃতীয় মানে তৈরি করে।"

'তিতাস' চলচ্চিত্রায়ণের এক দশক পরে ১৯৮৩ সালের মে মাসে আমি চরিত্র রূপায়ণকারী কয়েকজন শিল্পী, আলোকচিত্রী, অন্যতম সঙ্গীত পরিচালকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও তাঁদের বক্তব্য ফিতেবন্দী করি। প্রথমেই আমি 'তিতাস'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র বাসন্তী-র রূপদানকারী রোজী সামাদের সঙ্গে দেখা করি। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন আলোকচিত্রী আবদুস সামাদ ও নাট্যকার মামুনুর রশীদ। জনাব সামাদ তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জানান, ডেল্টা রিজিয়ন বিষয়ে ঋত্বিক ঘটকের আগ্রহ দীর্ঘকালের, জনাব মামুন বলেন, ভাটি অঞ্চলের জীবনধারাই শুধু নয় একজন কমিটেড চলচ্চিত্রকার হিসেবে পুরো হাইড্রোলিক মোড অব প্রোডাকশন বিষয়েই তিনি ছিলেন সচেতন ও আগ্রহী। তাঁরা দুজনেই বললেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশে ঋত্বিক জীবনের প্রবহমানতার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। ঋত্বিকের নিজের লেখাতেও তার সমর্থন মেলে। চলচ্চিত্র-বিষয়ক তাঁর পূর্বোক্ত লেখাটিতে ঋত্বিক বলেছেন, নদীতীরে তিনি পেয়েছিলেন 'একটা জীবন-প্রণালী, মানুষের এক বিচিত্র জীবন প্রবাহ'। নদী তাঁকে শিখিয়েছিল 'জীবন দুঃখ নহে, জীবন বীরত্ব'। রোজী সামাদের কথাতেও তার

প্রমাণ পাই। অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে মালোদের সংস্কৃতিও অবক্ষয়িত রূপ লাভ করে। এ সুযোগে বহিরাগতরা মালো মেয়েদের নষ্ট করবার চেষ্টা করে। এরকম এক বহিরাগতর উদ্দেশে তীব্র ঘৃণা মিশিয়ে বাসন্তী উচ্চারণ করে 'কুত্তা'। এই অংশটি চলচ্চিত্রায়িত করার সময় ঋত্বিক ঘটক চরিত্র রূপায়ণকারী শিল্পী রোজী সামাদকে বলেন, 'তুমি এমনভাবে এগিয়ে এসে ভেঙ্গে পড়ে এই শব্দটা উচ্চারণ করবে যাতে তোমার জেদ ও ক্ষোভের সঙ্গে সমস্ত দেশের তলিয়ে যাওয়া ও তার প্রতিবাদের ভাবটি মূর্ত হয়।'

উপন্যাসটির প্রতিই শুধু নয় ভাটি অঞ্চলের প্রবহমান জীবনধারার প্রতিও ঋত্বিক ঘটক বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছেন। গোলাম মুস্তাফাকে তাই তিনি বলেছিলেন, 'যাঁদের নিয়েই তিনি এ ছবি করতেন তার শুটিং করতেন উপন্যাসটি যে পটভূমিতে লিখিত সেই অঞ্চল ও জীবনকে নিয়েই'। এজন্যে তিতাস নদীর ওপরই তিনি এক নাগাড়ে পনেরো দিনের বেশি শুটিং করেছেন। স্টুডিওর কোনো কৃত্রিমতাকে স্থান দিতে চান নি বলে তিনি এ ছবির কোনো ইনডোর শুটিং করেন নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, আরিচাঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যেরবাজার এসব অঞ্চলে তিনি এই ছবির শুটিং করেছিলেন। রওশন জামিল বলেছেন, শুটিং-এ সংলাপ বলার সময় ঋত্বিক ঘটক তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি এই দেশের বলার ধরন ও ঢঙ মিশিয়ে বলুন, স্ক্রীপ্টের তোয়াক্কা করবেন না। আমার ভুল হতে পারে, দীর্ঘদিন এখানে ছিলাম না, এইভাষা এখন আমি অনেকটাই ভুলে গেছি।'

চলচ্চিত্রকার অবশ্য ঔপন্যাসিকের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও তাঁর ইঙ্গিতকে কোথাও কোথাও বিস্তৃত বা ব্যাখ্যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন। উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়িত অংশ : 'পরের দিন দুপুরে বুড়ির মনে পড়িয়া গেল, অনন্তকে ত পোড়া কাঠ মারা হয় নাই। উনানের ধারে গিয়া দেখে সেখানে পোড়া কাঠ নাই, তার উনুনমুখী মেয়ে খড় দিয়া রান্না করিতেছে। অনন্ত কাছে বসিয়া কি যেন গিলিতেছে। বুড়ি খপ করিয়া এক মুঠা পোড়া খড় উনুন হইতে তুলিয়া লইল। একদিকে তখনো জ্বলিতেছে। কিন্তু এ দিয়া তো পিঠে মারা যায় না। মুখে গুজিয়া দেওয়া যায়। বুড়ি এক হাতে অনন্তর হাত ধরিয়া হাতে জ্বলন্ত খড় তার মুখে গুঁজিতে গেল। মেয়ে হেঁচকা টানে খড়গুলি বুড়ির আরেক হাত হইতে কাড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। আচমকা খড়ের আগুনে হাত লাগিয়া বুড়ির হাতের খানিকটা পুড়িয়া গেল। বন্য রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বুড়ি মেয়ের গলা চাপিয়া ধরিল। তারপর মায়েতে মেয়েতে শুরু হইল তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি। মেয়ে শেষে কায়দা করিয়া মাকে মাটিতে ফেলিয়া বুকের উপর বসিল। তারপর চুলের মুঠি ধরিয়া মাথাটা ঘন ঘন মাটিতে ঠুকিয়া শেষে ছাড়িয়া দিল। বুড়ি ছাড়া পাইয়া কোনো রকমে উঠিয়া গিয়া ভাতের হাঁড়িটা বড় ঘরে তুলিয়া খিল আঁটিয়া দিল।' বাসন্তীর মা-র চরিত্রটি রূপায়ণ করেন রওশন জামিল। শেষাংশটি ঋত্বিক ঘটক যেভাবে চিত্রায়ণের পরিকল্পনা করেছিলেন তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তাঁর পরিকল্পনা ছিল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি ভাতের হাঁড়ি আগলে বসে থাকবো। কিন্তু অতঃপর ক্যামেরা প্যান করে আসবে সেই দৃশ্যের দিকে যেখানে দেখা যাবে ঘরের তিনটি দিকই সম্পূর্ণ খোলা,

তিনদিকেই কোনো বেড়া নেই।' সামগ্রিকভাবে দূষিত ও লুণ্ঠিত সমাজ কাঠামোর মধ্যেও স্বল্পবিত্ত মানুষের নিরাপত্তাবোধ ও নিজের সম্পত্তি রক্ষার হাস্যকর দিকটিকে এভাবে আরও নগ্ন করে তুলতে চেয়েছেন ঋত্বিক। 'অযান্ত্রিক' বিষয়ে সত্যজিৎ রায় যা বলেছেন 'তিতাস'-এর পরিকল্পনার বিষয়েও তা সমান সত্য, 'তার দৃষ্টিকোণ, তার composition এমন আশ্চর্য, সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট কথা বলছে।' শেষে অবশ্য বিষয়টি আর গৃহীত হতে পারে নি, কিন্তু রওশন জামিল বলেন, ব্যাপারটি তাঁকে এখনো ভাবায় ও পরিচালকের অন্তর্দৃষ্টির কথা মনে করায়।

এর ইঙ্গিত অবশ্য উপন্যাসেও ছিল। তিতাস শুকিয়ে গেলে তার ওপর জেগে ওঠা চরের দখল নিয়ে মালোরা প্রথম কৃষকদের শত্রু বিবেচনা করেছিল। কিন্তু দখল নিতে গিয়ে দেখলো, ওরা যেমন জমি পেল না, তেমনি পেল না করম আলী, বন্দে আলী প্রভৃতি ভূমিহীন চাষীরাও'। 'যারা অনেক জমির মালিক, যাদের জোর বেশি, তারাই হলো ঐ নতুন জমির মালিক'। বাস্তব ঘটনা এভাবে স্বল্পবিত্ত মানুষকে তার অবস্থান ও শত্রু-মিত্র শনাক্ত করতে সাহায্য করে। ঋত্বিক ঘটক চর দখলের এই দৃশ্যটি চিত্রায়ণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নানা কারণে তাও সম্ভব হয় নি বলে গোলাম মুস্তাফা জানিয়েছেন। গোলাম মুস্তাফা তিতাসের দু'টি চরিত্রে অভিনয় করেন ; মালোপাড়ার রামপ্রসাদ ও বিরামপুরের কাদির মিয়া। একজনকে দিয়ে দু'টি চরিত্র করানোয় সাশ্রয়ের কোনো ব্যাপার ছিল না, এটা ছিল ঋত্বিকের বিশ্বাস ও প্রক্রিয়ার অংশ। ঋত্বিক মুস্তাফাকে বলেছিলেন, তুমি করছো বলেই নয়, যে-ই অভিনয় করতো তাকে দিয়েই আমি এ দু'টি চরিত্র করাতাম। সাফারিং ও উইজডমে মানুষ এক হয়ে যায়। যারা উৎপীড়িত, শোষিত তাদের পরিচয় এক, তাদের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। এই একাত্মবোধকে চিহ্নিত করার জন্যেই তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। উপন্যাসেও বিষয়টির সমর্থন মেলে। কাদিরের আলুর নৌকাকে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে আসে বনমালী ও তার সঙ্গীরা। নৌকা রক্ষার পর ঔপন্যাসিকের বর্ণনার মধ্যে এই একাত্মতা স্পষ্ট রূপ লাভ করে : 'পাঁচ জনের ভিজা গা। সঙ্গে একাধিক কাপড় নাই যে বদলায়। ছোট্ট ছইখানার ভিতরে তারা গা ঠোকাঠুকি করিয়া বসিয়া রহিল। কাদিরের ভিজা চুল এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তার সাদা দাড় হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে বনমালীর কাঁধের উপর। কাদির এক সময় টের পাইয়া হাতের তালুতে বনমালীর কাঁধের জলবিন্দুগুলি মুছিয়া দিল। বনমালী ফিরিয়া চাহিল কাদিরের মুখের দিকে। বড় ভালো লাগিল দেখিতে। লোকটার চেহারায় যেন একটা সাদৃশ্য আছে যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদের সঙ্গে। তারও মুখময় এমনি সাদা গোলাপী দাড়ি। এমন শান্ত অথচ এমন কর্মময় মুখভাব'। বনমালীর আরো মনে হয়, 'বাস্তবিক যাত্রাবাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিযা—এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটাঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে, আবার দাড়িব নিচে প্রশান্ত বুকটায় মুখ গুঁজিয়া দুই হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিলেও ধমক দিবে না, কেবল অসহায়ের মতো পিঠে হাত বুলাইবে। বনমালীর চোখ সজল হইয়া উঠে। তার বাবাও

ছিল এমনি একজন। কিন্তু সে আজ নাই। একদিন রাতের মাছ ধরা শেষে ভিজা জাল কাঁধে করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। বনের মাঝে তুফানে গাছ চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।'

'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর আলোকচিত্রীর দায়িত্ব পালন করেন বেবী ইসলাম। তিনি বলেন, 'ঋত্বিকের কাছে ক্যামেরা কোনো যন্ত্র ছিল না, এটি ছিল সৃষ্টির হাতিয়ার। ক্যামেরার চোখকে তিনি স্রষ্টা ও শিল্পীর চোখে পরিণত করতে ও চলচ্চিত্রের ভাষায় তাকে কথা বলাতে তিনি জানতেন'। তাঁর সংস্পর্শে এসে বেবী ইসলামের লংকা-উত্তরণ ঘটেছিল। ফলে ঋত্বিকের আজীবনের স্বপ্ন একটি কাব্যিক সিকোয়েন্স বেবী ইসলাম ট্রাভেল ফোকাসের সাহায্যে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সিকোয়েন্সটি এই : ফোরগ্রাউন্ডে রোজী, নিচে দিয়ে একটা নৌকা পার হচ্ছে। চলচ্চিত্রের ঐ অংশটি সুষমা ও মাত্রাবোধে সংহত বলেই সুন্দর। পিঠা তৈরির দৃশ্যে ট্র্যাভেল ফোকাসের আরেকটি কাজের কথা বললেন বেবী ইসলাম। ঐ দৃশ্যে কবরী, রোজী সামাদ, রাণী সরকার প্রমুখ ছিলেন। ক্যামেরাকে ক্রল না করিয়ে শুধু ফোকাসের মাধ্যমে পুরো বিষয়টিকে যথাযথ প্রেক্ষিতে নিয়ে জীবন্ত করে তোলা গিয়েছিল। ঋত্বিকের অন্য ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ যে বলেছেন, 'একটা বিশেষ কনটেক্সট-এ এসে সেই শট এমন একটা কাব্যের পর্যায়ে উঠে গেছে, এমন শক্তিশালী চেহারা নিয়েছে, সেটা একমাত্র শক্তিশালী পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব' তা 'তিতাস'-এর ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য। বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'লৌকিক জীবনের... অসংখ্য ঘটনা ও প্রথা বিন্যাসের প্রতি আগ্রহ, জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ও প্রতিবাদই এই ছবির সম্পদ। ... এ বিস্ময় বা জিজ্ঞাসার পথে অনেক পরিমাণে সাহায্য করেছে বেবী ইসলামের ক্যামেরা ও বিশ্বস্ততা।'

'তিতাস'-এর অন্যতম সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন ওয়াহিদুল হক। তিনি বলেছেন, বাহাদুর হোসেন খান টাইটেল মিউজিকের জন্যে যে সঙ্গীত কম্পোজ করেছেন তা ছিল পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং ছবির থীম ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। ফলে তাঁদের এটা বর্জন করতে হয়েছিল। তাঁরা আরিচাঘাটের পঁচানব্বই বছরের এক বৃদ্ধকে দিয়ে দু'টি গান রেকর্ড করান, সঙ্গে ঢোল বাজান ঐ বৃদ্ধেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। বৃদ্ধের গাওয়া প্রথম গানটি তিতাসের বিশাল ফ্রেমে টাইটেল মিউজিক হিসেবেই শুধু ব্যবহৃত হয় নি, ছবির সঙ্গীত-কাঠামোকেও তা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। জনাব হক বলেছেন, সংগৃহীত সঙ্গীত থেকে ছবিটির জন্যে যে পরিমাণ সঙ্গীত নির্বাচন করতে পেরেছিলেন তা দিয়ে ছবির মাত্র অর্ধাংশ পর্যন্ত কাজ করা যেতে পারতো। সেজন্যে সঙ্গীতের পরিমিত ও সীমিত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একে বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহারের কথা তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। বিষয়টি শাপে বর হয়েছিল। যে বাড়িটি থেকে কিশোরের নববধূ অপহৃত হয়েছিল সেখানে রাত্রির দৃশ্যে আবছাভাবে সঙ্গীতের খণ্ডাংশ ভেসে আসছিল। ঐ বৃদ্ধ দ্বিতীয় যে গানটি গেয়েছিলেন তাকে ভেঙ্গেই এ রকম আবহ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে শুধু সঙ্গীতই ব্যবহৃত হয় নি, তার ফাঁকে ফাঁকে মাঝিদের অনুচ্চকণ্ঠের অস্পষ্ট সংলাপ, মৃদু কোলাহল, শান্ত জলরাশি, দূরে নৌকার সাজেশন, আবছা আলো ও ঢিলেঢালা জীবনযাত্রার ছবিও প্রতিফলিত হয়েছিল। ঐ রকম একটা শান্ত পরিবেশের মধ্য থেকে যখন নববধূর মুখ

চেপে ধরা হলো তখন সঙ্গীত ও শব্দের ব্যবহার এই নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অনন্ত একবার রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তখন সঙ্গীতের পরিবর্তে প্রথমে শুধু কাপড় কাচার শব্দ, বুকের শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করে একেবারে চূড়ান্ত মুহূর্তে সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছিল। কোথাও কোথাও নীরবতাও সঙ্গীতের চেয়ে অধিকতর বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল (প্রসঙ্গত স্মর্তব্য ঋত্বিকের নিজের উক্তি: 'নিস্তব্ধতা, কোনো তীব্রতম মুহূর্তের গতিশীলতা ধরতেও তেমনি নিস্তব্ধতা')। অনন্ত নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে যখন ছইয়ের ভেতর থেকে দিগন্তের দিকে তাকায় তখন কোনো শব্দ বা সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় নি, শুধু ক্যামেরা টিল্ট করে পুরো দিগন্তকে উন্মোচন করে দেয়। কীটস কথিত সাইটস (sights) এভাবে সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

অবশ্য 'তিতাস'-এর জন্য ওয়াহিদুল হককে সামান্য সঙ্গীত রচনাও করতে হয়েছিল। অনন্তর মা-র মৃত্যুর পর সে যে চিৎকার দেয় তা তীব্রতা লাভ করে আবদুর রহমানের বংশীবাদনে। সঙ্গীতাংশটি তখনকার মতো মুখে মুখে রচনা করে দিয়েছিলেন ওয়াহিদুল হক। এক্ষেত্রে তাঁকে নানারকম উদ্ভাবনও করতে হয়। দু'টি উদাহরণের উল্লেখ করা যায় : কিশোর ও তার স্ত্রী যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে দুলতে থাকে সে সময় তদের বিয়ের সময়ে গীত 'লীলাবালি লীলাবালি, বর ও যুবতী সইগো কি দিয়া সাজাইমু তোরে' গানটি ব্যবহার করে ঐ দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা যেহেতু পরস্পরকে ভালোভাবে চিনতে পারছিল না, আবছাভাবে মনে করবার চেষ্টাই শুধু করছিল সেজন্যে সঙ্গীতকেও ঐরকম অস্পষ্ট ও ভাঙ্গাভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এজন্য টেপ উল্টোভাবে চালানো হয়। মাগন মহাজনের নারকেল গাছ থেকে লাফ দিয়ে বীভৎসভাবে মৃত্যুবরণ করার দৃশ্য ক্লাইমেক্সে ওঠার সময়টুকুতে বাহাদুব হোসেন খানের বাজানো সরোদের ঝালা ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝখানেই তা শেষ হয়ে যাওয়ায় লুপিং করে তা চালিয়ে যাওয়া হয়।

'তিতাস'-এর শুটিং-এর সময়ই ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন, 'বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা, মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা। সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোনো কাজের কথা না। ও সমস্ত যারা aesthets তারা করুন গিয়ে। এজন্যেই কাল যদি একটা বেটার মিডিয়াম পাই তাহলে আমি সিনেমা ছেড়ে চলে যাব।' সিনেমা সে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না বলে তিনি তাঁর আত্মজৈবনিক ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে ক্যামেরার মুখে মদ ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঋত্বিক যেহেতু মানুষের অগ্রগতি ও জীবনের প্রবহমানতায় বিশ্বাস করেন সেহেতু তাঁর বক্তব্য তিনি 'তিতাস'-এ প্রকাশ করেছেন, 'সভ্যতার মৃত্যু নেই। সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। যেখানে তিতাসের ক্ষেতে ধান জন্মেছে সেখানে আর একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, ইনডিভিজুয়াল মানুষ মরণশীল। কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপে গিয়ে পৌঁছয়। সেই কথাটাই ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি'। উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণেরও অভিষ্ট ছিল তাই।

বিটিভিতে ঋত্বিকের ছবি এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শৈবাল চৌধুরী

চলচ্চিত্রামোদীদের জন্যে গত সপ্তাহে ঘটে গেছে এক আনন্দপ্রদ ঘটনা। ১৮ ডিসেম্বর (১৯৯৮) বিকেলে সাপ্তাহিক ছবির সিডিউলে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রদর্শন করলো বাংলা চলচ্চিত্রের দিকপাল ঋত্বিক কুমার ঘটকের কালজয়ী সৃষ্টি 'তিতাস একটি নদীর নাম'। ছবিটি অনেকটা হারিয়েই গিয়েছিলো। বেশ ক'বছর আগে অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর ছবিটির প্রিন্ট মোটামুটি প্রদর্শনযোগ্য করা গেছে। এবং খুব সম্ভবত এই প্রথম ছবিটি টেলিভিশনে দেখানো হলো।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ঋত্বিক ঘটক ঢাকায় আসেন তাঁর যমজ বোন প্রতীতি দত্তকে নিয়ে। প্রতীতি দত্ত ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সাংবাদিক ও অভিনেতা পুত্র সঞ্জীব দত্তের স্ত্রী। তাঁদের বাড়ি কুমিল্লাতে যাবার পর সেখানে ঋত্বিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি পড়েন এবং এক রাতের মধ্যেই ছবির চিত্রনাট্য লেখেন। রাতের বেলায় কাগজ যোগাড় করতে না পেরে তিনি বোন প্রতীতিরই একটি সাদা কাপড়ে চিত্রনাট্যটি লেখেন। পরে ঢাকায় আসার পর তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় শিল্পানুরাগী মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান খানের সাথে। হাবিব সাহেব চাইলেন সম্পূর্ণ বাংলাদেশের কলাকুশলী-অভিনয় শিল্পী নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতেই ঋত্বিক একটি ছবি করুক তাঁর প্রযোজনায়। ঋত্বিক তিতাসের কথা বললেন। হাবিব সাহেব রাজি হবার পর ঋত্বিক চাইলেন অন্তত ক্যামেরাম্যান ও সম্পাদক আসুক তাঁর অরিজিনাল টিম অর্থাৎ কলকাতা থেকে। কিন্তু হাবিব তাঁর শর্তে অটল থাকলেন। শেষে রফা হলো ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খানই কেবল কলকাতা থেকে আসবেন সঙ্গীত পরিচালনার জন্য। আর বাকি সব কিছু এখানকার। শুটিং শুরু হলো। ছবিতে অভিনয় করলেন এদেশের প্রায় সকল শিল্পী। শুধু এই কারণেও এই ছবি একটি ঐতিহাসিক চিত্রদলিল। ছবিটি তৈরিকালীন সময়ে ঋত্বিক অনেকবার অসুস্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত ছবিটি সম্পূর্ণ হলো। মুক্তি পেল ১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু ছবিটি চললো না। বেশ ক'টি হলে ছবিটি ২/৩ দিন পর নামিয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রামের লায়ন সিনেমা প্যালেস ও জলসা প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি সেদিন মুক্তি পেয়েছিলো। কেবল জলসাতে পুরো সপ্তাহটি চলেছিলো এই ছবি। বাকি দুই হল থেকে ২/৩দিন পর ছবিটি নেমে যায়। এরপর এদেশে আর কোনোদিন ছবিটি মুক্তি পায়নি সাধারণ্যে।[১] অনাদরে অবহেলায় ছবিটি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আশির দশকের

১. 'তিতাস একটি নদীর নাম' ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'রূপশ্রী' সিনেমা হলে ১৯৭৩ সালে কিছুদিন চালানো হয়েছিল।

শেষদিকে ঋত্বিক-পুত্র ঋতবান ঘটক ঢাকা এসে প্রযোজকের সাথে যোগাযোগ করে ছবির একটি প্রিন্ট দাঁড় করান এবং পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যান এক কপি। সেখানে ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই ছবি সংরক্ষণের ভার নেয়। ১৯৯১ সালের ১১ মে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কেন্দ্র নন্দনে (কলকাতা) ছবিটি মুক্তি পায় পুনরায়।

'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈত মল্লবর্মণের কালজয়ী উপন্যাস। ঋত্বিক কুমার ঘটক কৃত এর চলচ্চিত্ররূপে অনেক ত্রুটি দেখা যায়। ঋত্বিক নিজেও বলেছেন একথা। যদিও সম্পূর্ণ অবস্থায় ছবিটি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। কেননা ছবিটির চূড়ান্ত অবস্থায় ঋত্বিক মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে হেলিকপ্টারে করে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো অচৈতন্য অবস্থায়। প্রযোজক তড়িঘড়ি করে সম্পাদনা করে ছবিটি মুক্তি দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদেরও কিছু আর করার ছিলো না। তবে ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, সম্পাদনার ত্রুটির কারণে ছবিটির এই দূরবস্থা। ছবির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ দুর্দান্ত। অসুস্থ অবস্থাতেও সবকিছু যত্নের সাথে করেছেন ঋত্বিক। পাত্রপাত্রী সকলেই মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করেছেন। শুধু সম্পাদনার সুতোতে ঠিকমত গাঁথা হয়নি পুরোটা ছবি। এই কথা মৃত্যুশয্যায়ও বলে গেছেন ঋত্বিক। ছবির সম্পাদনার সময় ঋত্বিক ছিলেন না যা ছিল অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ঋত্বিকের বাঁধা সম্পাদক ছিলেন রমেশ যোশী। যেহেতু দু'জনার মধ্যে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া ছিলো, তাই ঋত্বিক ছাড়া রমেশ একাও সম্পাদনার কাজ সুসংহতভাবে করতে পারতেন। কিন্তু তিতাসের সম্পাদনা করেছেন বশীর হোসেন। তাঁর সাথে ঋত্বিকের পূর্ণ যোগাযোগ ছিলো না। সম্পাদনার সময়ও তিনি পরিচালককে পাননি। নিজ থেকেই পুরো ব্যাপারটি করে যেতে হয়েছে। ঋত্বিকের ছবির মেজাজ ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে ছবিটি ধাক্কা খেয়ে গেছে অনেক। ঋত্বিক পরে অনেকবার বলেছিলেন, সুস্থ হয়ে তিনি আবার ছবিটির সম্পাদনা করবেন। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। '৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন।

বিটিভিতে ছবিটি দেখানোর পর আমি তরুণ প্রজন্মের কয়েকজনের সাথে কথা বলে দেখলাম, তাদের কাছে তেমন একটা ভালো লাগেনি এই ছবি। তাঁদের মতো অনেকের কাছেই হয়তো এই ছবি প্রত্যাশামত সাড়া জাগাতে পারেনি। তার একটাই কারণ হতে পারে, ছবিটির নির্মাণ পর্যায়ে নানা অসংলগ্নতার কথা তারা জানে না। এক্ষেত্রে বিটিভি একটি ভূমিকা পালন করতে পারতো। ছবির শুরুর আগে যদি কিছুটা ব্রিফ দেয়া হতো তবে খুবই উপকৃত হতেন দর্শক। যেমনটি করা হয়েছিল বিটিভিতে 'পথের পাঁচালী' দেখানোর সময়। 'বিটিভি'র বর্তমান মহাপরিচালক জনাব সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী[২] একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব। ঋত্বিকের সান্নিধ্যেও তিনি এসেছেন, তিনি 'তিতাস' ছবির নির্মাণ অসংলগ্নতার বিষয়েও জানেন। ইচ্ছে করলে তিনি নিজেও পারতেন ব্রিফিং-এর কাজটি করতে।

---

২. সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী পুনার 'ফিল্ম এ্যান্ড টিভি ইন্সটিটিউট' থেকে সত্তর দশকের শুরুর দিকে নির্দেশনা-কোর্সে ডিপ্লোমা করেন। ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি ঋত্বিকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

মূ ল্যা য় ন



তিলক চাঁন-এর ভূমিকায় ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক : গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস

ড. গুরুদাস ভট্টাচার্য

ভূমিকা

সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, চলচ্চিত্রে তেমনি সত্যজিৎ রায়—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আগেই কথাটা মেনে নিয়েছিল বাঙালি দর্শক ও সমালোচক। ঋত্বিক ঘটকের কথা ভাবলেই আমার মনে পড়ে কবি নজরুল ইসলামকে। কাজীর মতোই বেহিসেবী জীবন, বেপরোয়া মেজাজ, টেনশন, জনতার জন্যে অসীম বেদনা ও মমতা : 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী।'

শ্রী ঘটকের ছবির বিষয়বস্তু, অতএব তাৎক্ষণিক, সমকালীন সঙ্কটের ও সংগ্রামের ; চলিষ্ণু সমাজকে-সময়কে ধরে রাখা স্থায়ী শিল্প দৃশ্যে। বছর দশেক আগে বোম্বের হামীদুদ্দীন মেহমুদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : "মানুষের অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার কারণ, এর মধ্যে দিয়ে আমি দেখি জীবনকে-গতিকে-স্বাস্থ্যকে। আমি বিশ্বাস করি জীবনের প্রবহমানতায়। আমার ছবিতে চরিত্ররা চিৎকার করে বলে : 'আমাকে বাঁচতে দাও'। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বাঁচতে চায়—এতো মৃত্যু নয় জীবনেরই জয় ঘোষণা।"

যে কোন মুহূর্তে পরমাণু বোমা পড়তে পারে ; একটি ঘরে আটক অনেকগুলি মানুষ সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর-নারী ; সময় এগিয়ে আসে, মুহূর্তটি হয় বিস্ফোরক, মানুষগুলি আতঙ্কিত, মৃত্যু ভয়ে ভীত তারা মনের কথা বলে ফেলে ; যা ছিল অন্তরে বেরিয়ে আসে বাইরে। ফুটে ওঠে আসল চরিত্রগুলি, অলক্লীয়ার, ছবিটির নাম 'ফীয়ার'। পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তুলেছিলেন উপাধ্যক্ষ ঋত্বিক ঘটক। ছোট্ট ছবি। তারই মধ্যে সমাজ-সঙ্কটের সমুদ্রোপম ব্যঞ্জনা, তার মুখোমুখি মানুষ, মানুষের আতঙ্ক। শ্রী ঘটকের ছবির পর ছবিতে এই এক বিষয়বস্তু নানা রূপে ও রসে। তিনি তাৎক্ষণিকের ছবিকর। বর্তমানের কবি।

কিন্তু এই তাৎক্ষণিকতাতেই যেমন নজরুলের শেষ পরিচয় নয়। তাঁর গানে কবিতায় আছে চিরকালের কথাও, তেমনি শ্রী ঘটকের সচিত্র বক্তব্যও সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত। সমকালকে ধারণ করে তারই মধ্যে সর্বকালের একটি মহত্তর-বৃহত্তর ব্যঞ্জনা। সত্যি কথা বলতে কি এই ব্যঞ্জনা ভারতের আর কোন পরিচালকের ছবিতে নেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও না।

ছবির জগতে

পঞ্চাশোর্ধ ঋত্বিক ঘটকের আদি বাড়ি পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ। ঘটক পরিবার এসে বাসা বাঁধে পশ্চিম বাংলার বহরমপুরে। সমগ্র পরিবারটিই সাহিত্য ও শিল্পমনস্ক। ১৯৪৮- এর স্নাতক শ্রী ঘটক যুক্ত হলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। নাটক- অভিনয়- কলাকুশলতার কাজ। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 'সাঁকো' মঞ্চে বহুবার অভিনীত, কলকাতা বেতারে প্রচারিত 'জ্বালা' চমকে দিয়েছে শ্রোতাদের। তার অনেক আগেই তিনি এসেছেন ছবির জগতে, অন্তরের তাগিদে।

সম্ভবত ১৯৫০। 'তথাপি'র পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য-র সহকারী। পরের বছর নিজেই করলেন 'বেদেনী'। তারপর বোম্বের ফিল্মিস্তান স্টুডিওর কাহিনী ও চিত্রনাট্য বিভাগে। অন্য পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এবং পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটে।

তাঁর প্রথম স্ব-অধীন কাজ 'নাগরিক' (১৯৫৩)। বেদেনীর মতো নাগরিকও মুক্তি পায়নি। তবে চিত্রনাট্য পড়েছি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের, তার দুঃখ দহনের নিরাপত্তাবোধহীনতার, আত্মার ও আত্মহননের বাস্তব চিত্রায়ণ। একের মাধ্যমে বহুর ব্যঞ্জনা---- শ্রীঘটকের জীবন চেতনার ও তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। হাওড়া ব্রীজ তার প্রতীক।

পরবর্তী ছবি পাঁচ বছর পরে 'অযান্ত্রিক' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এবং অন্যত্র দেখানো হয়েছিল 'ইটস নট এ মেশিন' নামে। ইউনেস্কো থেকে প্রকাশিত 'ইনডিয়ান ফিল্ম এ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অডিয়েনস' গ্রন্থে পোলিশ চলচ্চিত্রবিদ জার্জী তোপলিজ লিখেছেন: "আপাত দৃষ্টিতে 'অযান্ত্রিক'-এর কাহিনী এক ড্রাইভার ও তার ঝরঝরে ট্যাকসি নিয়ে। আসলে, এটিতে একটা বিরাট সমস্যা প্রতিফলিত ; তা হল যন্ত্রশিল্প ও কারুশিল্পীর সংঘাত যার অনিবার্য ফল—বিচ্ছিন্নতা'। সুবোধ ঘোষের কাহিনীকে অধিকতর ব্যথিত করে তুলেছেন পরিচালক শহুরে মানুষ ও গ্রাম্য আদিবাসীদের বিপরীত চিত্র দেখিয়ে। টেকনিকের ক্ষেত্রেও প্রতিভার স্বাক্ষর ছোটনাগপুরের উঁচু নীচু ল্যান্ডস্কেপে, শিল্পী নির্বাচনে, সঙ্গীতের (আলী আকবর) প্রয়োগে শব্দের যোজনায় : কারখানার অদৃশ্য শোক ক্রন্দন বা অচল গাড়ির চলার শব্দ।

বাঁশের পোল ও হাওড়া ব্রীজ গ্রামবাংলা ও শহর কলকাতার বৈপরীত্য তাঁর শিশু চিত্র 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' তেও। অবাধ প্রকৃতি, প্রায় সমান মাপের বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত গ্রামের ছেলে কাঞ্চন কলকাতায় এসে দেখে উঁচু-উঁচু বাড়ি : পাশেই নোংরা বস্তি, ভালো লাগার মতো লোক, মন্দ লাগারও। নানান অভিজ্ঞতা। বিপর্যস্ত চিত্ত নিহত কল্পনা। পথের ওপর পড়ে থাকে একটা মরা চিল। প্রত্যাবর্তন।

ত্রয়ী

পরবর্তী তিনটি ছবিই (যথাক্রমে শক্তিপদ রাজগুরু, স্বরচিত ও রাধেশ্যামের কাহিনী অবলম্বনে) উদ্বাস্তু জীবন ভিত্তিক। দরিদ্র সংসারটিকে কোনক্রমে দাঁড় করিয়ে রাখে

নীতা। বাবা-মাকে সাহস দেয়, ভাই ও বোনকে সহায় দেয়, উৎসাহ দেয় দাদাকে সঙ্গীত চর্চায়। কঠিন দুঃখেও মুখে হাসি। কিন্তু যেদিন তার প্রেমিক সনৎ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করল তারই ছোট বোন গীতাকে, অসহ্য হয়ে উঠল দিন-রাত্রি। যক্ষ্মা, সানাটোরিয়াম ; মৃত্যু। এ মৃত্যু সে চায়নি, এর জন্যে দায়ী সমাজেরই বহুতর পাপ, অপরাধ। মা-বাপ চায়, রোজগেরে মেয়ে আইবুড়ো থাকলেই ভালো, সনৎ চায় গ্লামার, গীতা চায় স্বাচ্ছন্দ্য। সবাই স্বার্থপর। সততা-ন্যায়-মমতা থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু বাইরে নয়, মনে মনেও সবাই উদ্বাস্তু। অন্ধকারের প্রাণী। যদিও আলোর আকাঙ্ক্ষা আছে।

ছবিটির দৃশ্য পরিকল্পনার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। আলো আঁধারী মাঠে বসে নীতা ও সনৎ হাতে হাত রাখে, সেই মুহূর্তেই অদূরে একটা ট্রেন হু হু করে চলে যায়। সনতের অফিস ঘরে গীতাকে আবিষ্কার করে শূন্য সিড়ি দিয়ে নেমে আসছে নীতা, চারপাশে তাঁর হুটিং কঁকিয়ে-কান্নার মতো। ঘরে দাদার গান, 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গল ঝড়ে' গান শেষ, অন্ধকার। উঁচু পাহাড়, তুমুল বর্ষণ, প্রচণ্ড শব্দ, দাদার মুখোমুখি নীতার আকুল জিজ্ঞাসা : 'আমি বাঁচবো দাদা'!

ছবি শেষ : ' মেঘে ঢাকা তারা'।

গহীনতব বেদনার একটি নিগুঢ় অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। এই বিমূর্ত বেদনাকে দেশ মাতার কণ্ঠে সঞ্চারিত করেছেন বিষ্ণু দে একই নামের কাব্য গ্রন্থে। তার পর ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' যার "মূল সুর ছিল দুই বাংলার মিলনের। তাই অবিরত বেজেছে প্রাচীন বিবাহের সুর" (ঋ. ঘ.)। দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু । ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তৈরি নাটকের দলেও ভাগাভাগি ; একদল বিখ্যাত ক্লাসিক নাটকের পক্ষে অন্যদল চায় বাস্তবের মঞ্চরূপ। ভৃগু পরিচালক ; অনসূয়া শিল্পী; দু'জনের মধ্যেও দ্বিধা দ্বন্দ্ব। দুই দেশ, দুই দল, দু'টি হৃদয়— যথাক্রমে রাজনৈতিক ব্যর্থতা, গণনাট্য সংঘের অস্থিরতা। স্বাধীন প্রেম—একই সঙ্গে, একইভাবে দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে, বারে বাবে মিশে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। অনসূয়ার দ্বিধা, সেতো নবনাট্যের দ্বিধা; ভৃগু অনসূয়া প্রেম-প্রত্যাখ্যান-পরিণয়। সেতো দুই বাংলার বিচ্ছেদ পুনর্মিলন, লালগোলার গঙ্গার তীরে এই ভাবনারই দৃশ্যরূপ ; নদীবক্ষে নৌকা, নৌকায় ছেলেরা, তীরে অনসূয়া, অনসূয়ার মুখ কঠিন, কঠিন রেললাইন, ক্যামেরা ট্রাক ক'রে লাইনের ওপর দিয়ে, ট্রেন চলার শব্দ ওঠে। গতি দ্রুত, অদৃশ্য কণ্ঠে চিৎকার—বাফার।

বাস্তুচ্যুত মানুষগুলি বাসা বেঁধেছে রিফিউজী কলোনীতে। ঈশ্বরের নেতৃত্বে সুখে-দুঃখে দিন কাটে। একদিন ঈশ্বর চলে যায় বাইরে কাজ পেয়ে সুবর্ণরেখার তীরে। সংসারে বোন সীতা, অন্তজ অভিরাম। এক সঙ্গে খেলা, গান গায়। খুশী হয় রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ খোয়াই, আশ্চর্য কোমল নদীর সান্নিধ্যে। ভয় পায় বহুরূপীকে দেখে কিংবা পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টের অদৃশ্য বিভীষিকায়। বড়ো হয়। সীতা-অভিরাম ভালবাসে পরস্পরকে। ঈশ্বর এখন উচ্চ পদস্থ, উন্নতি, তার মর্যাদায় বাধে। বাধা দেয়। ওরা চলে

আসে কলকাতায়, বিয়ে করে নতুন ঘর বাঁধে। কিন্তু ঘর আবার ভেঙ্গে যায়, অভিরাম দুর্ঘটনায় নিহত হয়। শিশুপুত্রকে বাঁচাতে সীতা হয় দেহ ব্যবসায়িনী। ওদিকে ঈশ্বরও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে ফূর্তি করতে শহরে আসে। বার থেকে বারবণিতালয়ে— সীতা! আর্ত কান্নায় কঁকিয়ে ওঠে ঈশ্বর। কাটারী দিয়ে আত্মহত্যা করে সীতা। মা-বাপ-হারা শিশুটির হাত ধরে সুবর্ণরেখার তীর ধরে দিগন্তের অভিমুখে হাঁটতে থাকে ঈশ্বর।

উদ্বাস্তু থেকে বসতি থেকে উদ্বাস্তু, বারে বারে এই চলতে থাকে বাইরের জীবনে, অন্তরে গহনে ; আমি যা তা থেকে কেবলই অন্য রকম হয়ে যাওয়া। আজকের প্রতিটি মানুষ এই রকম উদ্বাস্তু, ক্ষণে ক্ষণে ছবি বদলায়, চরিত্র বদলায়। সংকট এইটেই, এই খানেই। সুবর্ণরেখা নিছক একটি কাহিনী চিত্র নয়, একটি জীবন গাথা, ক্রনিকল পিকচার। তাই ক্রেডিট টাইটেল উন্মোচিত হয় পুরনো পুথির পাতায়-পাতায়। এ-ছবি একই সঙ্গে ‘ক্ষণকালের শিল্পদৃশ্য’ এবং ‘চিরকালের রূপশ্রী’। উদ্বাস্তু সমাজের এবং উদ্বাস্তু ব্যক্তিত্বের চিত্ররূপ মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত। সে বলে, “একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হল, এ ধরনের গল্পে আমার রুচি নেই। আমি আপনাদের ঘা দেব এবং বোঝাব যে, এ কাহিনী কাল্পনিক নয়। বলব : চোখের সামনে যা দেখছেন তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য, আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। যদি সচেতন হন, আমার উত্থাপিত প্রতিবাদটি উপলব্ধি করতে পারেন, বাইরে বেরিয়ে বাস্তবকে বদলে দেবার চেষ্টা করেন, তাহলেই সার্থক আমার ছবি করা” (ঋ. ঘ.)। —এ ছবির সামনে বসে দর্শককে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়।

মহাকাব্য-উপম

বাইরের দিক থেকে একটা কাহিনী, ভেতরের দিকে একটা বক্তব্য ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই দু'টি স্তর। এর পরেও একটি স্তর আছে। সব মিলিয়ে থ্রি-ডাইমেনশন।

জড় প্রাণের কল্পনা, প্রাণী ও জড়ের সঙ্গে মানুষের আত্মীযতাব ভাবনা, ঘরের শিশু ও মাঠেব শস্য, অরণ্যের শাবকের আবির্ভাব-তিরোভাবকে ঘিরে মৃত্যু-পুনর্জন্মের তত্ত্বরচনা ও তন্নিষ্ঠ আচার-অনুষ্ঠান-কৃত্য তথা উৎসবাদি : এসবই আদিম যুগের জীবন দর্শন। সে যুগকে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, কিন্তু সেই আদিম সংস্কার, বিশ্বাস-ভয় আজও আমাদের নিত্যসঙ্গী। ‘অযান্ত্রিক’-এর বিমলের কাছে ট্যাক্সি ‘জগদ্দল’ই তার মা। ঠিক যেমন. ধার্মিক হিন্দুদের কাছে গাভীমাত্রেই মাতা-ভগবতী, গো-মাতা থেকে এখন গাড়ি-মাতা। এই গাড়ি প্রীতি গো-ভক্তির মতোই একটি আদিম বিশ্বাস, তার নবরূপ, বিমল সেই আদিম মানবেরই অন্যতম রূপ। এই রহস্যটা বোঝাবার জন্যই ছবিতে আনা হয়েছে আদিবাসী ওরাওঁদের আচার-উৎসব, যার মূল তত্ত্ব মৃত্যু-পুনর্জন্ম। একদিকে সেই পুরনো ঐতিহ্য, অন্যদিকে তার আধুনিক রূপ।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় যে আগমনী বিজয়ার গান, তাও ওই মৃত্যু পুনর্জীবনের গান। শ্রীঘটক : "নীতা আজ পর্যন্ত আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালী ঘরের গৌরীদান দেওয়া মেয়ের প্রতীক রূপে"। আট বছরের মেয়ের বিয়েকে বলে ' গৌরীদান'। পুরাণের দেবী গৌরী বা উমার এই বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। তাদেরই আধুনিক রূপ নীতা ; তার জন্ম জগদ্ধাত্রী পূজোর দিনে। যখন খবর এল, তখন বিজয়ার গান হচ্ছে, জন্মের সঙ্গেই মৃত্যুর সঙ্কেত। তার স্বামী যেন পর্বতেশ্বর মহাকাল শিব, যে পাহাড়ের কোলে তার শেষ নিঃশ্বাস। 'কোমল গান্ধার'-এর অনসূয়া যেন একালের শকুন্তলা ; ভৃগু যেন দুষ্মন্ত ; উমা ও সীতার সঙ্গেও তার যোগ। এ-ছবিতেও বিয়ের গান, সেই সঙ্গে মৃত্যুব দেবী কালীও আছে সঙ্কটের প্রতীক রূপে।

নাম ও কাহিনী বিন্যাসে 'সুবর্ণরেখা'র প্রেক্ষাপটে রয়েছে রাম-সীতার কাহিনী— ওই রকমই পাওয়া ও হারান, ঘর-বাঁধা ও ঘর ভাঙ্গা বারবার। ঈশ্বর একই দেহে দশরথ ও রাবণ (এই যোগাযোগের কথা পুরনো গল্পেও আছে)। মৃত্যু ও পুনর্জন্মের তত্ত্ব উচ্চারিত হয়েছে সংলাপে— উপনিষদের শ্লোক রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ এলিঅটের কবিতার মাধ্যমে। এঁদের রচনাতেও আদিম উপকথার ওই এক তত্ত্ব যেমন পিকাসোর ছবি বা লুই বুনুয়েলের চলচ্চিত্রে। আধুনিক সৃষ্টিতে এই আদিমতা আরোপের অর্থ : আজকের জীবনে আদিম ভাবনার অস্তিত্ব দেখানো ; অন্য পক্ষে, এতদ্বারা সৃষ্ট শিল্পটি সর্বকালীন ব্যাপ্তি পায়, তার ডাইমেনশন বেড়ে যায়। স্রষ্টা তখন বলতে পারেন : আমার ছবিতে দ্যাখো সমগ্র মানব সভ্যতাকে। এক দিকে মার্কস ও কডওয়েল, অন্য দিকে ইয়ুং ও নিউম্যান, একদিকে শাসক ও শোষিত, অন্য দিকে অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাস, যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে রূপ বদলে-বদলে। সে যুগের সেই গৌরী-উমারাই আজ নীতা-সীতা-অনসূয়া।

'সুবর্ণরেখা'য় বালিকা সীতা হঠাৎ কালীরূপিণী এক বহুরূপীর সামনে পড়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। পরিচালকের বক্তব্য : "সমগ্র সভ্যতাই আজ এই ভয়ংকরী কালীর মুখোমুখী—সংকটের, মৃত্যুর মুখোমুখি জীবন, তারই ছবি, তারই চিৎকার"। অবক্ষয়ের পরিচালক পুনর্বাসনেও বিশ্বাসী। সে পথ তাঁর মতে : প্রেমে (নীতা) আর্টে (অনসূয়া) অথবা জীবনের প্রতিষ্ঠায় (সীতা)। সেই দিনই কালী হবে উমারূপী, অন্ধকার সরে গিয়ে নামবে সোনালী-আলো।

এইভাবে পারিবারিক ঘটনাচিত্র দেবভক্তি বা ধর্মবোধ নয়—আদিম উপকথার সংস্পর্শে মূহূর্তে পরিণত হয় বিশ্বভাবনায়। বাস্তবভিত্তিক বহু স্তরবিশিষ্ট জটিল বিন্যাস, তথা জীবনের মহাকাব্য। এই উদ্দেশ্যে শ্রী ঘটক একটি বিশেষ প্যাটার্ণের আশ্রয় নেন। এই প্যাটার্ণটি ধরতে না পারলে তাঁর চিত্র কাহিনী ও চিত্রনাট্য উপভোগ করা সম্ভব নয়।

'নাগরিক'-এর দৃশ্য সূচনা হয়েছিল গঙ্গার তীরে। 'অযান্ত্রিক'-এ পাহাড়তলী। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় পাহাড়। 'কোমল গান্ধার'-এ গঙ্গা-পদ্মা। উপকথাভিত্তিক জীবন মহাকাব্য বিকশিত হতে হতে একটি বিশেষ বৃত্তে পরিণত 'সুবর্ণরেখা'য়। এর পরেই তো 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অনিবার্য ভাবেই, নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরে নয়, অন্তরের ভেতর থেকেই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর ঘোষণা, সেই অমোঘ বাক্য তিনটি : "আমি ছাড়া তিতাস সৃষ্টি হতো না। তিতাস ছিল আমার স্বপ্ন। আমার মমতা নিয়ে এ কাহিনীকে কেউ তুলে ধরতে আগ্রহী হতেন না"। (চিত্রালী ২০ শ্রাবণ ১৩৮০)।

এতদিন শ্রী ঘটক যেসব কাহিনী নিয়ে ছবি করেছেন, তাদের কোনটাই মহাকাব্য-উপম নয়। তথ্যের তুলনায় তত্ত্ব ভারী, গল্পের চেয়ে দর্শন। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস আকারেই মহাকাব্য। একটা গোটা জাত এর বিষয়। বিশাল পটভূমিকা, চলমান জীবনই এর নায়ক। একদা উৎপল দত্ত গ্রীক মহানাট্যের আদলে ও ব্রেখটীয় রীতিতে একে উপস্থিত করেছিলেন, মঞ্চকে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রসারিত করে দিয়ে।

জানিনা, শ্রী ঘটকের ছবিতে এ কাহিনী কী রূপ পেয়েছে। তবে, তাঁর কাহিনী নির্বাচন ও তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত দিগদর্শন, এ কথা উচ্চ কণ্ঠেই বলা চলে— 'গঙ্গা'র পর 'সুবর্ণরেখা'র পরই তো 'তিতাস'। ক্রমাগত উত্তরণ সম্মুখপানে। দুই নদীর মাঝের ছবি 'দুর্বার গতি পদ্মা' এবং 'ইয়ে কিঁউ'। এদের জন্ম সৃষ্টির তাগিদে নয়, বাঁচবার তাগাদায়। তাছাড়া সুস্থিতিও তখন ছিল না। বস্তুত, এটিই, এই অস্থিরতাই তাঁর ক্রটি, শিল্প রচনার জন্যে প্রয়োজনীয় সংযম ও সংহতির অভাব। বিরাট ক্যানভাস, গভীর বক্তব্য, প্রচুর উপকরণ, তাঁর ছবিতে সব আছে, নেই শৃংখলা-বিন্যাস-পরিপাট্য।

আবার এও সত্য : তা যদি থাকত, তাহলে ঋত্বিক ঘটক ঋত্বিক হ'তে পারতেন না। সমকালে সর্বকালের স্পর্শ, স্বদেশানুগ ও বিশ্বানুগ জীবনদর্শন ; একাধিক স্তরবিশিষ্ট আর্ট চর্চা, সব ছড়ানো ছিটানো অগোছালো এলোমেলো বা অকারণে জটিলতর। দু'টো মিলিয়েই ঋত্বিক ঘটক : একক ও অনন্য, ভারতীয় চলচ্চিত্রের একমেব আফাঁ তেরিব্‌ল, টেরিব্‌ল্ ইনফ্যান্ট, দুরন্ত শিশু।

সুবর্ণরেখার ঘটক ও তৎপ্রসঙ্গ

অমিত কুমার ভট্টাচার্য

ছবি লোকে দেখে। ছবি দেখানোর সুযোগের পথ যতদিন খোলা থাকবে ততদিন আমি পেটের ভাতের জন্য ছবি করে যাবো। কালকে বা দশ বছর পরে যদি সিনেমার চেয়ে ভাল কোন মিডিয়াম বেরোয় আর দশ বছর আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি সেখানে চলে যাবো। সিনেমার প্রেমে-নেশায় আমি পড়িনি। আই ডু নট লাভ ফিল্ম।

ঋত্বিক ঘটক

বাংলাদেশ। ১৯৪৮। তখন সবেমাত্র দেশ ভাগ হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু পশ্চিম বঙ্গে চলে যাচ্ছে। কোলকাতা মহানগরীর আশে পাশে জমি জবর দখল করে মাথা গোঁজার কলোনি তৈরি করেছে। এরকম জবর দখল করা একটি কলোনীতে আশ্রয় নিয়েছে দু'টি উদ্বাস্তু, ঈশ্বর চক্রবর্তী ও হরপ্রসাদ। ঈশ্বরের সাথে আছে তার ছোট বোন সীতা। কৌশল্যা নামে এক বাগ্দী বৌ এসেছে তার একমাত্র ছেলে অভিরামকে নিয়ে। অতর্কিতে জমিদারের ট্রাক এসে নিয়ে গেল বাগ্দী বৌ-কে। আশ্রয়হীন অভিরাম ঈশ্বর চক্রবর্তীর আশ্রিত হল। একদিন হঠাৎ পথ চলতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর কলেজ সহপাঠী পুরনো মাড়োয়ারী বন্ধু রামবিলাসের দেখা হয়ে গেল। ঈশ্বরের দুরবস্থার কথা শুনে রাম বিলাস তাঁকে ছাতিমপুরের নিজের ব্যবসায় খাজাঞ্চীর দায়িত্ব অর্পণ করল।

ছাতিম পুর ছোট জায়গা। পরিবেশ শান্ত। ঈশ্বরের বাসার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ক্ষীণ নদী সুবর্ণরেখা। ঈশ্বরের সংসারে তিনটি প্রাণী। সীতা, অভিরাম আর ঈশ্বর নিজে। দিন কাটতে থাকে। সীতা মার্গ সঙ্গীত শিখতে লাগল। অভি হোস্টেলে থেকে পড়তে লাগল। ঈশ্বরের পদোন্নতি হল। এমনকি রামবিলাসের ব্যবসায়ের অংশীদার হবার সম্ভাবনাও দেখা দিল। ইতিমধ্যে অভি আর সীতা আবিষ্কার করল, তারা প্রেমে পড়েছে। ঈশ্বর এ ব্যাপারে কিছুই জানলেন না। অভি পাশ করল। একদিন ঘটনা চক্রে রামবিলাস জানতে পারল, অভি ঈশ্বরের কুড়িয়ে পাওয়া ভাই। তিনি অভিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন ঈশ্বরকে। অন্যথায় তাঁর উন্নতির সম্ভাবনা নেই, এমন আভাসও দিলেন। তাই অভি ও সীতা পালিয়ে গেল।

কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল। অভি ও সীতার একটি ছেলে হল। দুঃখ-কষ্টে তাদের দিন কাটে। অভি বাস ড্রাইভার হল। একদিন দুর্ঘটনায় অভি মারা গেল। সীতা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। এদিকে বোনকে হারিয়ে ঈশ্বর পাগল প্রায় হয়ে গেলেন। একদিন ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করতেও চাইলেন। হরপ্রসাদ তাঁকে নিয়ে শহরে এল। দু'জনে বিলাসের স্রোতে ভেসে গেলেন। এক রাত্রে ঈশ্বর দেহ-জীবনীর সন্ধানে গিয়ে সীতাকে আবিষ্কার করলেন। সীতা দাদাকে দেখে আত্মহত্যা করল। সীতার ছেলেকে নিয়ে আবার

নতুন জীবন-পথে অগ্রসর হলেন ঈশ্বর। সংক্ষেপে এই হচ্ছে ভয়ংকর সত্যের ছবি 'সুবর্ণরেখা'র কাহিনী।

জীবনসত্যের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি 'সুবর্ণরেখা' ষাট দশকের বাঙালি দর্শকদের চমকে দিয়েছিল ভয়ানকভাবে। চিরায়ত সত্যের সুনিপুণ চলচ্চিত্রায়ণ চিরকালের দর্শককেই চমকাবে এমন করে। জীবন ও মানুষ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, বাস্তবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করবে প্রতিটি সচেতন নাগরিককে। দেশ বিভাগের ফলে যে সব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি ছিল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। সমস্যাটি ছিল দ্বিপাক্ষিক। মানুষের মানবতাবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সংরক্ষণতাবোধ সবকিছু তখন অবলুপ্ত হয়েছিল। পুরনো মূল্যবোধগুলি তখন অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। দারিদ্র, বঞ্চনা, আশ্রয়হীনতা ও অনিশ্চয়তা উদ্বাস্তুদের নানা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অনেক পরিবার চিরকালের মত সবংশে নিঃশেষ হয়েছিল, কেউ কেউ বেঁচেছিল মরণাপন্ন হয়ে, ভোগ্যপণ্য হিসেবে। এত বাধা বিঘ্ন ও হতাশার কালো অন্ধকার পেরিয়ে সাফল্যের সোনালি সূর্যের চেহারাটা অন্তত দেখেছিল কেউ কেউ।

সুবর্ণরেখার হরপ্রসাদ চরিত্র এমনি একটি বিলীয়মান পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু ভগ্নাবশেষ। ঈশ্বর চরিত্র পরিশ্রম, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে টিকে থাকা, সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত চরিত্রগুলোরই প্রতীক। সীতা ও অভিরাম চরিত্র দু'টো উপরোক্ত চরিত্র দু'টোরই প্রতিনিধি যারা একে অন্যের ব্যথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। হরপ্রসাদ ও ঈশ্বরের মতো ব্যবধানে থেকে একজন টিকে থাকুক আর একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক এটা তারা চায়নি। দু'জনে একাত্ম হয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে চেয়েছিল এবং পরিণামে তাদের দু'জনকেই জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

'সুবর্ণরেখা' সম্পূর্ণ শিল্প কিনা সেই বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এই সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। তবে একে পরিণত শিল্পকর্ম হিসেবে চিহ্নিত করতে কেউ অস্বীকার করেন না। নিখুঁত শিল্পকর্ম হিসেবে সুবর্ণরেখা-র প্রতিষ্ঠার দাবি নেহাতই অযৌক্তিক। চিন্তার সুসামঞ্জস্যরূপ এ ছবিতে অনুপস্থিত অনেক ক্ষেত্রে। বিশেষ করে সঙ্গীতে ক্ষেত্র বিশেষে মারাত্মকভাবে উদ্দেশ্যহীনতা ও অচেতনতা প্রকাশিত অযৌক্তিকভাবে। দৃশ্য পরিকল্পনা মারাত্মকভাবে জীবনদীপ্ত ও বাস্তবানুগ হওয়া সত্ত্বেও সুসম পরিকল্পনার অভাবে এর সার্বক্ষণিক ও সম্পূর্ণ রস গ্রহণে জীবন সচেতন দর্শক বাধাপ্রাপ্ত হন। ছবির অনেকাংশের চিত্রগ্রহণ ও পরিকল্পনা পরিণত পর্যায়েরও উর্ধে উঠে একে চিরকালীন শিল্পের মর্যাদা দান করেছে।

জীবনসত্য এ ছবিতে উপস্থিত তার উলঙ্গ চেহারা নিয়ে। সত্যকে রেখে ঢেকে, একটু ধামাচাপা দিয়ে বা আড়াল করে তথাকথিত আর্টিস্টিক উপস্থাপন তিনি করেননি।

তাঁর আর্ট, তাঁর উপস্থাপনা ও প্রকাশভঙ্গি তাঁর নিজস্ব। সত্যজিৎ রায়ের সমসাময়িক উত্তরসূরী হয়েও অতি আশ্চর্যভাবে ঋত্বিক ঘটক তাঁর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বাংলা ছবির জগতে যে নতুন ফর্ম সত্যজিৎ বাবু এনে দিয়েছিলেন, চলচ্চিত্রে বাস্তবের চলচ্ছায়া যেভাবে তিনি ধরে রেখেছিলেন, সেই বাস্তবকেই ঋত্বিক বাবুও প্রকাশ করলেন তাঁর ছবিতে একেবারে অন্যভাবে, অন্য পদ্ধতিতে আরও প্রাণবন্ত ও জীবনসমৃদ্ধ করে। শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি না করে জীবনের জন্য শিল্প সৃষ্টি করলেন তিনি।

'সুবর্ণরেখা'য় মানবতার মুহূর্তগুলো চিত্রায়িত হয়েছে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে। তাই বলা যায় সমস্ত ছবিটিকে নিখুঁত বা সম্পূর্ণ শিল্পের আখ্যায় আখ্যায়িত করা না গেলেও এর কিছু কিছু অংশ চিরকালীন সত্য-সৌন্দর্যের প্রতীক। এতে একটা নির্মম সত্যকে, কঠোর বাস্তবকে প্রচণ্ডভাবে উপস্থাপনের যে সৎ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা বুদ্ধিদীপ্ত দর্শকের অন্তরে প্রোথিত থাকবে চিরকাল।

নিবন্ধকার অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়— "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের মত একটি প্রচণ্ড বাস্তবতাকে রূপদানের দুঃসাহস ও সৎপ্রচেষ্টা ছিল এই ছবি— যেখানে উদ্বাস্তু মানুষের পুরনো মূল্যবোধগুলি সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসহনীয়তার মধ্যে। ঈশ্বর যখন তার বোন সীতাকে আবিষ্কার করল জীবন যুদ্ধে পরাজিত এক দেহোপজীবিনীরূপে, সেই মুহূর্তটি কি অসামান্য প্রতীকি ব্যঞ্জনায় ভাস্বর নয় ? আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের আদি বসবাসী, এমন কি তারাও এক অর্থে উদ্বাস্তু নই! মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে উদ্বাস্তু। আমরাও কি জীবনের পথে এক একবার সেই ভয়ংকর সংকটের মুখে উপনীত হচ্ছি না, এবং আবিষ্কার করছি আমাদের সত্য-সত্য জীবনযুদ্ধে পরাজিত আত্মসমর্পিত একটা বিক্রিত সত্তা, এ ছবি ভয়ংকর সত্যের ছবি।"

'সুবর্ণরেখা'র স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক ১৯৫১ সনে তাঁর সর্বপ্রথম কাহিনীচিত্র 'বেদেনী'র শুটিং শুরু করেন। কিন্তু, ব্যবসায়িক নানা কারণে ছবিটি মুক্তি পায়নি। পরের ছবি 'নাগরিক' ১৯৫২ সনে। এ ছবিটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছে। এমনকি ছবিটির সেন্সরও হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যবসায়িক কারণে এক বদলোকের পাল্লায় পড়ে ছবিটি চিরকালের মতো মুক্তির আলো দেখার সৌভাগ্যবঞ্চিত হয়। চিরকালের জন্য বলছি এই কারণে যে, তৎকালীন ছবির প্রিন্টগুলো নাইট্রেড বেইসড ছিল। ভালভাবে সংরক্ষিত না হলে কিছুদিন পরই শক্ত হয়ে যেত। এখন শোনা যায় ফিল্মগুলো তাল পাকিয়ে গেছে।

এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি ছবি তৈরি থেকে নিবৃত্ত হননি। ১৯৫৮ সনে তাঁর ছবি 'অযান্ত্রিক' মুক্তি পায়। এটি তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরপর মুক্তি পায় 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ১৯৫৯ সনে। এর পরপরই আরেকটি ছবি 'কত অজানারে' (১৯৫৯) মুক্তি পায়নি। পরবর্তী ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১)। 'বগলার বঙ্গদর্শন' (১৯৬৪) পরিত্যক্ত হয়। ১৯৬৫ তে মুক্তিপায় 'সুবর্ণরেখা'।

এরপর সাত বছরের দীর্ঘ বিরতি। আর্থিক অনটন ও কমপ্লেক্স-এর শিকার ঋত্বিক ঘটককে আমরা দেখি এই সময়টাতে। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু শর্ট ফিল্ম তিনি তৈরি করেছিলেন পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে। 'উসকি রোটি'র বহুল আলোচিত পরিচালক মনি কাউল ঋত্বিক বাবুর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এই সময়কার পরিস্থিতি ঋত্বিক বাবু নিজেই বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— 'ড্রিঙ্কটা ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল, বারবার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবাই জানেন, পাগলা গারদের কথাও জানেন।' পয়সার জন্য তিনি ইম্পিরিয়াল ট্যোবাকো কোম্পানির হয়ে 'সিজর্স' সিগ্রেটের একটি বিজ্ঞাপনী ছবিও তৈরি করেছিলেন। পুনাতে তৈরি শট ফিল্ম 'ফিয়ার' বেশ প্রশংসা পেয়েছিল।

তাঁর তিনটি ছবি 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'কে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট একটা ট্রিলজী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের কথা তিনি 'কোমল গান্ধার'-এ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'র অন্তর্নির্হিত উদ্দেশ্যও তাই। 'সুবর্ণরেখা'তেও তিনি একই বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর প্রায় সব ছবিই ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যর্থ। কেবলমাত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটাই কিছুটা ব্যবসা করেছিল। আজকের ভারতের চলচ্চিত্র জগতের আলোচিত ব্যক্তিত্ব শত্রুঘ্ন সিনহা, রেহানা সুলতান মহাজন, ধ্রুবজ্যোতি, কে. টি. জন প্রভৃতি অনেকেই ঋত্বিক বাবুর ছাত্রছাত্রী।

ঋত্বিক বাবু চলচ্চিত্রকে বক্তব্য প্রকাশের হাতিয়ার মনে করেন। চলচ্চিত্রকে তিনি নাকি ভালবাসেন না। চলচ্চিত্রকে তিনি ভালবাসেন না, কারণ চলচ্চিত্র প্রেমের অনুভূতি তাঁর নেই। কিন্তু যা তাঁর রক্তের মধ্যে যা তাঁর মজ্জায় মিশে গেছে তা তিনি কি করে অনুভব করবেন; অনুভূতির সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে তা তখন তাঁর স্বয়ংক্রিয় সহজাত প্রবৃত্তিতে, অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

ঋত্বিক ঘটক*

খালেদ হায়দার

একটি প্রশ্ন : একজন চিত্রপরিচালক যিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন মানবতার পক্ষে, অন্যায়ের বিপক্ষে যিনি ছিলেন আপোষহীন, জীবনের শেষ দিনটিতেও যিনি কোন 'প্রিটেনশন'কে প্রশ্রয় দেননি তাকে কি বলে ডাকা যায় ?

প্রশ্নটির উত্তর : ঋত্বিক কুমার ঘটক। হ্যাঁ, তাঁকে ঋত্বিক কুমার ঘটক বলেই ডাকতে হয়। বাংলা ভাষায় আর কোন প্রতিশব্দ নেই যা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঋত্বিক কুমার ঘটক নামেই একমাত্র যে ব্যক্তিটিকে ডাকা যেতে পারতো, তিনি বলতেন, "শিল্পকে 'কমিটেড' হতেই হবে। সব শিল্পের শেষ কথা মানুষ। বর্তমান মানুষ। 'কমিটেড' মানে সংগ্রামী দুঃখী মানুষদের সঙ্গী হওয়া যাতে ভালোবাসা এবং ঘৃণা দু'টোই তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে"। হ্যাঁ, ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে ঘৃণা এবং ভালোবাসা দু'টোই তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। শুধু প্রকাশ পেত না, সঞ্চারিত হতো দর্শকের মাঝেও। তাই 'সুবর্ণরেখা' দেখার মুহূর্তে নিজের কাছেই নিজের দাবি উচ্চারিত হয়, 'আমার একটা অস্ত্রের প্রয়োজন এক্ষুণি প্রয়োজন— যা দিয়ে আমি সকল অন্যায় অনাচারকে বিতাড়িত করতে পারবো, যা দিয়ে আমি আমার বেশ্যা বোনকে স্নেহ মমতায় জড়িয়ে ধরতে পারবো।'

ঋত্বিক ঘটক নামের এই ব্যক্তিটি বলতেন, 'আই নেভার মেক ফিল্ম ফর মানি।' 'চালিয়াতি আমার আসে না'। এই একই কেন্দ্রবিন্দুতে বৃত্ত রচনা করে তিনি বলতেন, 'আমার দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখাটা ভীষণ প্রয়োজন— আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি কনভিন্স করা যায়। অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়।' নিরেট বাস্তবকে স্বীকার করে সত্যকে জয় করার জন্য তিনি ছবি বানাতেন। ছবি বানাতেন নয়— সৃষ্টি করতেন চলচ্চিত্র কর্ম। চলচ্চিত্রের সেই তথাকথিত সংজ্ঞা তিনি মানতেন না। 'প্রিটেনশন'করে হয়ত বাহ্‌বা পাওয়া যায়। দেশ-বিদেশ থেকে হাততালি পাওয়া যায় কিন্তু সত্যকে জয় করা যায় না—যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায় না। লড়তে হলে লড়াইক্ষেত্র সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকতে হয়—তা যতই বিপজ্জনক, যতই লজ্জাজনক হোক না কেন। তাই তিনি বলতেন, "ফিল্ম ফর্ম অর এ্যানী আদার আর্ট ফর্ম প্রাইমারিলী একটা 'মেক-বিলিভ'। যারা ছবি দেখতে হলে ঢোকে তারা কেউই বাস্তব দেখতে যায় না। তারা সাধারণভাবে যায় 'এন্টারটেইনড' হতে। তা 'এন্টারটেইন' করার চেষ্টা

লেখাটি সম্পাদকীয় হিসেবে মুদ্রিত।

খানিকটা করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা হলো এরকম পরিস্থিতিতেও দর্শকদের কাছে কিছু একটা 'কমিউনিকেট' করতে চাই। এবং এটা করার জন্য যদি 'লটস অব কো-ইন্সিডেন্স ইউজ' করতে হয় আমি করবো। ডকুমেন্টারী যখন করবো তখন পুরোপুরি ডকুমেন্টারী করবো। কিন্তু যখন বক্তব্য প্রকাশের জন্য একটা কাহিনীর বিন্যাস করবো তখন যদি 'কো-ইন্সিডেন্স ইউজ' করতে হয় আমি 'এ্যানি এ্যামাউন্ট অব কো-ইন্সিডেন্স ইউজ' করতে ভয় পাই না। বক্তব্য প্রকাশ করতে আমি যে কোন ফর্ম— লিরিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে প্রস্তুত। মেলোড্রামা হচ্ছে একটা ফর্ম। আমার বন্ধু-বান্ধব যারা নতুন ধরনের ছবি করেন তারা ছবিতে গানের ব্যবহারটা খুব এড়িয়ে চলেন, গান-টান ব্যবহার করেন না। আমি করি। এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে আমি গানও ব্যবহার করবো।"

ঋত্বিক ঘটক-এর ছবি দেখে তাই তথাকথিত বিদগ্ধজনেরা নাক ছিটকান। বলেন, বড় বেশী চেঁচামেচী হয়ে গ্যাছে, সিনেম্যাটিক এলিমেন্ট নেই, সেই যাত্রার মত চেঁচামেচী শুধু। অথচ ঋত্বিক ঘটক নির্বিকার। তিনি বিশ্বাস করেন প্রিটেনশন এবং অল্পবিদ্যাধারী ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর এসকল 'আঁতেলরা' তাঁর লক্ষ্যবস্তু নয়। তাঁর লক্ষ্যবস্তু দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাধারণ জনগণ, যারা পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষিত নন। তাদের 'ইনটেলেক্ট' সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় অনেক কম এবং একই কারণে তাদের 'পারসিভিং পাওয়ার'ও কম। সুতরাং এদেরকে 'রি-এ্যাক্ট' করাতে হলে তথাকথিত 'সফিসটিকেটেড' পথ ছেড়ে নাড়ীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এবং এই নাড়ীর সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি 'রিয়্যালিটি' ছেড়ে 'কো-ইন্সিডেন্স' ব্যবহার করতেন, তথাকথিত সিনেম্যাটিক ফর্ম ছেড়ে মেলোড্রামা ব্যবহার করতেন। দোর্দাণ্ড প্রতাপে তিনি প্রয়োজন বোধেই এগুলোর ব্যবহার করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, চলচ্চিত্রে ব্যাকরণ নেই। চলচ্চিত্র একটি আধুনিক মাধ্যম, যার মাধ্যমে শিল্প ও বক্তব্য এই দুই-ই 'কমিউনিকেট' করা উচিত। একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে তখনই তিনি স্বার্থক যখন তিনি তার বক্তব্য কমিউনিকেট করতে পারলেন তার দর্শকদের কাছে তার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। তাই প্রয়োজন বোধে এই কমিউনিকেশনের জন্য ঋত্বিক ঘটকের ছবির অনেক চরিত্রের সাথেই যাত্রাধর্মী চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য, "বাংলাদেশের সকলে, মা-বোনেরাও যাত্রা পালাপার্বন দেখতে অভ্যস্ত। তাই যাত্রার ফর্মটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের নাড়ী বুঝে চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। তাই অভ্যস্ত জীবনের ছবি আমি আমার সবগুলো ছবিতে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। আমি ছবি করেছি আমার মানুষের জন্য— যারা জীবনে শিক্ষার সুযোগলাভে বঞ্চিত, অত্যাচারিত, শোষিত।"

ঋত্বিক ঘটক-এর প্রতিটি ছবি কমিটেড। তাই বলে শিল্প বহির্ভূত নয়। ভীষণ রকম সচেতন ছিলেন তিনি এদিকটি সম্পর্কেও, এ প্রসঙ্গে তাঁর দর্শন হলো, "ছবির প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে— হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ দিয়ে বিচিত্র জীবনের

নকশা আঁকা থাকে। একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলি খেলা করছে। আরও গভীরে প্রবেশ করে যার মন, তিনি দেখেন দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিক নির্দেশগত সংকেতগুলি। তারও একেবারে গভীরে তলিয়ে যিনি যান, তিনি যে মুহূর্তগত অনুভূতির আস্বাদন লাভ করেন, তাকে কথা দিয়ে ধরা যায় না। সেই মুহূর্তগুলিতে তিনি অজ্ঞেয় কিছু একটার দোরগোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। এই সবকটি স্তরের রস আস্বাদন করা সকলের পক্ষে সমানভাবে সম্ভবপর নয়, এবং সেটা আশাও করা যায় না। যার যে স্তরে বিচরণ, তিনি সেই স্তরেই আনন্দ পাবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু সত্যিকারের মহৎ শিল্প এর সব কটা স্তরকেই ছুঁয়ে যায়, এটা হচ্ছে মহৎ শিল্পের প্রাথমিক শর্ত।" এবং ঋত্বিক ঘটক-এর ছবি এই সবকটা স্তরকেই ছুঁয়ে যায়।

ঋত্বিক কুমার ঘটক একই সাথে একজন শিল্পী এবং একই সথে একজন বিপ্লবী। লেবেল আঁটা কোন বিশেষ শিবিরের প্রচারে কমিটির দায়িত্ব পালন করে তিনি বিপ্লবী নন। তিনি বিপ্লবী নিজের চেতনায় তাড়িত হওয়ায়, নিজের মস্তিষ্কে পরিচালিত হওয়ায়। বিশেষ কোন শিবিরের প্রচার কর্মীর দায়িত্ব পালনে তিনি ভীষণভাবে অপারগ। "আমি 'স্ট্যাম্পিং' করতে রাজী নই ... আমি ঐ সব ইজম ফিজমের মধ্যে নেই। আমি কোন রকম ছবি আকার 'কোটারীর' মধ্যে নেই"। কোনো রাজনৈতিক পট পরিবর্তন তাঁকে আন্দোলিত করতো না, তাঁকে আন্দোলিত করতো মানুষের মুখ যে মুখে শুধুমাত্র অভাব অনটন নয় থাকতো জীবনের চিহ্ন। যখন প্রথমবার বাংলাদেশে এসেছিলেন তখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পট প্রসঙ্গের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "বিহারী, পাঞ্জাবিরা আগে ডমিনেট করেছিলো, বাঙ্গালিরা সেই শেকড় এবং শেকল ভেঙ্গেছে। কিন্তু আজো আমি ভিখারি দেখছি। ওরা হাত পাতে।"

ঋত্বিক ঘটক শত ব্যর্থতা ও বাধার মাঝেও কোনদিন হতাশ হননি— নৈরাশ্য ভর করতে পারেনি তাঁকে। একটি ছবি করার পর দীর্ঘ আট বছর বসে থেকেছেন তবু আপোষ করেননি— তবু আশা হারান নি। আট বছর পর যে সুযোগ তিনি পেয়েছেন সেখানেও সেই ঋত্বিক কুমার ঘটক— সেই শিল্পী ঋত্বিক কুমার ঘটক, বিপ্লবী ঋত্বিক কুমার ঘটক। লোকান্তরের আগ মুহূর্তেও যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এত বাধাবিপত্তির ও অর্থকষ্টের মাঝেও ভবিষ্যতে ছবি করবেন কিনা, শুনে অবাক হয়েছেন তিনি। উত্তর দিয়েছেন, "কেন করবো না? এদের মতো বছরে সাতটা আটটা নয়, দুতিন বছরে একটা। মাথা নীচু করবো কেন?"

ঋত্বিক তুমি দুঃখ করোনা। যেমন করেনি সক্রেটিস। এ শুধু সময়ের প্রশ্ন। এবং সময়কে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবোই। পৌঁছবোই তোমার লক্ষ্যে। হয়ত আজ নয়, আগামীকাল কিংবা পরশু।

ঋত্বিক ঘটক : উদ্বাস্তু সুরকার*

স্বদেশ পাল

অনু : বাকির আবদুল্লাহ

A-তে আন্তোনিওনি ! B-তে বুনুয়েল ! C-তে কাকোয়ান্নি ! D-তে ডি-সিকা ! E- তে আইজেনস্টাইন ! F-এ ফেলিনি। G-তে গদার। চলচ্চিত্রের এই বর্ণমালায় আরও একটা 'G' যোগ করা যাক। G-তে ঘটক, শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক! কিন্তু ঋত্বিক ঘটকের নাম বা তাঁর ছবি সম্পর্কে ক'জন চলচ্চিত্র দর্শক জানেন ? তাঁর নাম কি স্থান পাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে, অথবা শুধু সে সময়েই তাঁকে স্মরণ করা হবে, যখন দুর্ঘটনাক্রমে তাঁর কোন ছবি কোথাও প্রদর্শিত হবে ? অনেকদিন ধরে শ্রী ঘটক কোন ছবি তৈরি করছেন না। কেউ কেউ বলেন, তাঁর শিল্পী সত্ত্বা নাকি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এ সময়টুকু তাঁর জীবনের শুধুমাত্র সৃষ্টিবিমুখ একটা অংশও হতে পারে। কোন সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর সম্পূর্ণতাকে শুধুই তাঁর সৃষ্টিবিমুখ সময়টুকু দিয়ে বিচার করা যায় না। শিল্পী ঋত্বিক ঘটকের ভেতরে যে কী আছে, তা তাঁর নির্মিত পাঁচ-ছ'টি ছবিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। তাঁর এসব সৃষ্টিকে শুধুই উল্কার আলো বিচ্ছুরণের সাথে তুলনা করে, অথবা আকস্মিক প্রতিভা উদ্‌গীরণবলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এত বেশি মানবতাবোধ, এত সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতির প্রকাশ, মানবিক স্বভাবের এত গভীরতল বোঝবার ক্ষমতা, এ সব কিছু কেবল মাত্র আকস্মিক ঝলকানি হতে পারে না। এ সমস্ত গুণাবলী শুধু তাঁরই থাকে, যে এসব সাথে নিয়েই পৃথিবীতে আসে। ঋত্বিক ঘটক একজন বাস্তবের শিল্পী, আর কোন বাস্তবধর্মী শিল্পীই ক্ষয় হয়ে যেতে বা হারিয়ে যেতে পারেন না। বুনুয়েল যেমন বলেছেন, "আমাদের যদি ধর্ম না থাকে, আছে বাস্তব— আমাদের সত্যিকারের অবস্থার খোলামেলা রূপ।" ঋত্বিকের প্রতিটি ছবিতেই আছে বাস্তবের প্রতিরূপ। তাঁর প্রতিটি ছবির মৌলিক বিষয় হচ্ছে সামাজিক অবস্থার সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি এবং সামাজিক সচেতনতা। চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত তাঁর দর্শন, তাঁর সত্যবাদিতাকে শুধুমাত্র যুক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখে না। তিনি বিশ্বাস করেন, "চলচ্চিত্রকে মানবিক সত্যের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, যুক্তির সাথে নয়।" কৌশলগত নির্মাণের প্রতি তিনি আগ্রহী নন। কাব্যিক সত্যের সাথে সাহিত্যিক গভীরতা মিশিয়ে তিনি ছবি তৈরি করেন। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র নির্মাণের সামন্ত যুগ আব ঐতিহ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন।

---

* এই নিবন্ধটি শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' এবং 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি দুটির কাজে হাত দেবার আগে লেখা হয়েছিলো। সঙ্গত কারণেই তাঁর পরবর্তী শিল্পকর্ম এবং শিল্পী-জীবন সম্পর্কিত আলোচনা এ রচনায় অনুপস্থিত। 'ক্লোজ আপ'-এর সৌজন্যে সংগৃহীত এ নিবন্ধটি ইংরেজি থেকে ভাষান্তরিত।

তাঁর ছবিতে আছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আর অবক্ষয়ের প্রতিকৃতি, তা সত্ত্বেও তিনি নিজে থেকে গেছেন একজন সৃষ্টিবাদী শিল্পী, যাঁর আছে শক্তিশালী প্রত্যক্ষ ও সামাজিক মূল্যবোধ। শিল্পে বাস্তবতা আনবার জন্যে একটা প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানুষকে তার যথার্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা। ঋত্বিকের ছবিতেও ঠিক তাই। তাঁর ছবিতে তিনি সবসময়ই আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে বর্তমান সমাজের ঐতিহ্য আর তার অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে আভাস দিয়ে যান।

শ্রী ঘটকের ছবিগুলো বেদনার সুরে শেষ হলেও তাঁর এ বক্তব্য তিনি ঠিকই দাঁড় করান যে, শেষ হচ্ছে আর একটা শুরু, জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে যাবেই। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, মানুষের অবক্ষয় তাঁকে আগ্রহী করে কিনা। উত্তরে ঋত্বিক বললেন, "এক অর্থে তাই। ক্ষয়ের ভেতর দিয়ে আমি জীবনকে দেখতে পাই, দেখতে পাই সমৃদ্ধি আর সুস্থতাকে ... আমি জীবনের প্রবহমানতায় বিশ্বাস করি। আমার ছবির (মেঘে ঢাকা তারা) একটা চরিত্র চীৎকার করে বলে, 'আমাকে বাঁচতে দাও, আমাকে বাঁচতে দাও।' সে মারা যাবে, তবু সে জীবনকে চেয়েছিলো। এটা জীবনের দাবি, জীবনের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। মরতে কেউ চায় না।"

তাঁর ছবি নির্মাণের (বিশেষ করে মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা) প্রধান বৈশিষ্ট্য এসেছে বিশেষ একটা জনগোষ্ঠির একটা বিশেষ সময়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সার্বিক অধ্যয়ন থেকে। কিন্তু তবুও এতে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বকালের সার্বজনীন সামাজিক সমস্যাকে। ঋত্বিক ঘটক তাঁর 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি সম্পর্কে বলেছেন, "ছবিটিতে প্রথমত: উদ্বাস্তু বলতে শুধুমাত্র পূর্ববাংলা থেকে তাড়িয়ে দেয়া লোকজনকেই বোঝানো হয় নি ; আমার জন্যে সে শব্দটির আরও একটা অর্থ আছে। আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, আমরা সবাই কোন না কোনভাবে জীবন থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছি। এটা ভৌগোলিক অবস্থানের চেয়ে অনেক-ওপরকার সমস্যা। এ ছবিতে আদর্শবাদী হরপ্রসাদের সংলাপে এই ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়.— আমরা বায়ুভূত, নিরাবলম্ব—অথবা ছবির শুরুর দিকে প্রেস কর্মচারী যখন বলেন, 'উদ্বাস্তু ? কে উদ্বাস্তু নয়' ?"[১] তাঁর সমস্ত ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই হারানো সুখের যন্ত্রণা প্রতিটি চরিত্রকে দুলিয়ে যায়, প্রতিটি দৃশ্য দর্শককে মনে করিয়ে দেয় পেছনে ফেলে আসা কোনো কিছুর বেদনাকে। নস্টালজিয়াকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে তিনিই সত্যকারের শিল্পী। তাঁর ছবিতে সে ভুলে যাওয়া জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীঘটক তাঁর ছবির বিষয় বস্তুর ভেতরকার জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। তাঁর প্রতীকী নামের 'কোমল গান্ধার' ছবিটিতে যেমন, চরিত্র গুলো কেমন হারিয়ে যাওয়া,

১. 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' শীর্ষক নিবন্ধে ঋত্বিক ঘটক এই মন্তব্য করেছিলেন। স্বদেশ পাল তার ইংরেজি তরজমা করেছেন। সেই তরজমার বাংলা বাকির আবদুল্লাহ করেছেন। তাই ঋত্বিকের মূল লেখার সাথে এই উদ্ধৃতির বাংলা বাক্য গঠনের দিক থেকে মিল নেই।

যারা জীবনের সুর আর ছন্দ থেকে ছিটকে পড়ে আবার তা পেতে চাইছে। তাদের অতীত আর বর্তমানের দুই জগৎ পাশাপাশি এসেছে,— এসেছে তাদের হারানো জীবন আর নতুন করে জীবন শুরু করবার স্বপ্ন, হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা আর নতুন ভালোবাসার আগমনী। তাদের ভেতরকার সংগ্রাম তাদের আত্মত্যাগী আত্মার সত্যকে উন্মুক্ত করে যা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। তারা এমনি একতার গান গায়, যার ভেতরে কোনো একতা নেই। যখন তারা তাদের নাটকীয় কার্যকলাপ থেকে বেরিয়ে আসে, কেউ কেউ একে অপরের অতীত আর বর্তমান নিয়ে আলাপ করে— তারা নিজেদের বিভক্ত দেশের কথা বলে, বলে দূরে সরে যাওয়া বন্ধুদের কথা। জীবনের অতীত আর বর্তমানকে তারা যুক্ত করবার ইচ্ছে করে।

'মেঘে ঢাকা তারা'র কাহিনী এক মধ্য বিত্ত পরিবারের জীবনকে ঘিরে। এর প্রতিটি চরিত্র ভীত আর হারিয়ে যাওয়া। এরা ভীত পরিবার ভেঙে যাবার ভয়ে, আর হারিয়ে গেছে নতুন পারিপার্শ্বিকতায়। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকের সুখের জন্যে সংগ্রামে নামতে প্রস্তুত। তারা সবাই জানে, তাদের রক্তের লাল রঙের আড়ালে লুকিয়ে আছে দূর্ভাগ্য জড়ানো মৃত্যুর কালো ছায়া। স্কুল শিক্ষক পিতা, যে স্কুল থেকে পাওয়া বেতনের সামান্য টাকা ছাড়া সংসারে আর কিছুই দিতে পারে না, নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে শেলীর কবিতা আবৃত্তি করে, কারণ 'মরতে কেউ চায় না।' তার বড় মেয়ে সংসারকে বাঁচাবার সংগ্রামে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তার প্রেমকে সে বলি দেয় ছোট বোনের সুখের জন্যে। তার ভাই, খুব বড় গায়ক হবার ইচ্ছে যার, পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতির কারণেই এক বড় বোন ছাড়া পরিবারের আর সবার কাছে ভালো ব্যবহার পেতে ব্যর্থ হয়। সঙ্গীত চর্চায় বড় বোনের উৎসাহেই শেষ পর্যন্ত সে একজন সফল গায়ক হয়ে ওঠে।

'সুবর্ণরেখা'য় শ্রী ঘটক যেনো তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে চরিত্রগুলোকে জীবনের বাস্তবতা থেকে কিছুটা সরিয়ে রেখেছেন। অবশ্য সেটা সমগ্র ছবিটির বেলায় ঘটেনি। হরপ্রসাদ আর ঈশ্বর, এ দু'টো চরিত্রের জীবনের কোথাও এসে ছবির প্রবহমানতা বাধা পায়। তারা দু'জনেই জীবনের বিভিন্ন সময়ে দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় কাটিয়ে এসেছে। জীবনে যন্ত্রণা এত বেশি সইতে হয়েছে তাদেরকে যে, যখন ঈশ্বর কিছুটা ভালো না লাগার ভেতরে ছিলো, হরপ্রসাদ শহরে গিয়ে ফূর্তি করবার প্রস্তাব দিলো। এরপর দু'জনে কলকাতায় এসে কয়েকটা দিন কাটালো, তাদের হিসেবে লাগামহীন ফূর্তির মধ্যে.—ঘোড়ার রেস, রেস্তোরাঁ, বোতল আর মেয়ে নিয়ে। এখানে আমি 'ক্যামু' সম্পর্কে নাথান এ. স্কটের লেখা 'দ্য আউট সাইডার' বইটা থেকে একটা সংলাপ উদ্ধৃত করতে চাই,—এক জায়গায় এর প্রধান চরিত্র মেয়ারসন্ট বলছে, "আমার কাছে এ সবের কোনো তফাৎ নেই, সবই সমান ... আমি বললাম এতে কিছুই আসে যায় না, সে যদি খুব আগ্রহী হয়ে থাকে তবে আমরা বিয়ে করে ফেলতে পারি। তখন আবার সে জিজ্ঞেস করলো আমি তাকে ভালবাসি কিনা। উত্তরে আমি আগের মতোই বললাম, এ প্রশ্নটা

একেবারেই অর্থহীন— কিন্তু আমার মনে হয় আমিই তাই। সে জিজ্ঞেস করলো, তাই যদি হয়ে থাকে, তবে কেন আমাকে বিয়ে করতে চাও ? আমি বুঝিয়ে বললাম যে, এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বটে, কিন্তু এটা যদি তাকে আনন্দ দেয় তবে আমরা এখনই বিয়ে করতে পারি।" এই হচ্ছে সেই অপ্রতিরোধ্য বাকরুদ্ধতা, যা নিয়ে সে পৃথিবীর নীরবতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হয়ে ওঠে একজন 'আগন্তুক', একজন বহিরাগত। তবে একটা পার্থক্য এখানে আছে। ঋত্বিক ছবির শেষে একটা বুদ্ধিদীপ্ত চিত্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে চরিত্রগুলোকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছেন।

শ্রী ঘটকের প্রথম প্রেম হচ্ছে সাহিত্যের প্রতি, কারণ সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছাড়া কোন চলচ্চিত্র পরিচালকের পক্ষেই সত্যিকারের চলচ্চিত্রে এত গভীর ভাবনার প্রকাশ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাঁর ছবি 'অযান্ত্রিক' সম্পর্কে ঋত্বিক বলেন, "এর কাহিনীতে একটা নতুন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ককে আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে,—তা হচ্ছে মানুষ আর যন্ত্রের নিকট সম্পর্ক, যা আজ অর্থপূর্ণ এবং এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সাহিত্য, তথা আমাদের পুরো সংস্কৃতি যান্ত্রিক যুগকে কখনো খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। যন্ত্রকে আমরা সবসময়ই একটা দানবীয় রূপে দেখে এসেছি। এ যেন সমস্ত গভীর ভাবনাকে, সমস্ত শুভ আর আধ্যাত্মিকতাকে ধ্বংস করে দেয়। এটা আমাদের সংস্কৃতির মূল ধারার বিরোধী,—বিরোধী প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার। আমাদের কাছে এর অর্থ দাঁড়ায় সংঘর্ষ আর প্রচণ্ড শব্দ, দ্রুত ধ্বংস আর পরিবর্তন, প্রচণ্ড ক্ষোভ ... এবং অযান্ত্রিকের কাহিনী ঠিক তাই তুলে ধরতে পেরেছে—একটা অসাধারণ, এবং আমার দৃষ্টিতে, খাঁটি ভারতীয় কায়দায়। এর গাল্পিক কাঠামো, এর চরিত্রায়ণ, এর বর্ণনারীতি সবই এসেছে সেই পুরোনো দেশীয় রীতিতে।"[২] কেউ কেউ শ্রী ঘটকের ছবির কোনো চরিত্রে অতি অভিনয় দেখতে পান, যা আমার দৃষ্টিতে সঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, সুবর্ণরেখা-য় হরপ্রসাদ, মেঘে ঢাকা তারা-য় স্কুল শিক্ষক এবং কোমল গান্ধার-এ অভিনেতারূপী বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয় অনেকটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে আমার অভিমত হচ্ছে, মানুষ যখন জীবনে কোনোভাবে বিচ্যুত বা ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তখন তার পক্ষে বদলে যাওয়া আর এমনি অস্বাভাবিক আচরণ করা খুবই স্বাভাবিক। এটা সমস্ত মানব সমাজের ক্ষেত্রেই সত্যি। ঋত্বিক তাঁর বিভিন্ন ছবির চরিত্রগুলোকে বিভিন্নভাবে তৈরি করে থাকেন। তাঁর ছবির চরিত্রগুলো একক বা সমষ্টিগতভাবে বর্তমান সমাজব্যবস্থার রূঢ় বাস্তবতার ভেতরে বেঁচে থাকবার সংগ্রাম করে, তাঁর এ চরিত্রগুলো হচ্ছে সমগ্র সংগ্রামী মানব সমাজের প্রতীক, যারা সুখ আর সত্য-সুন্দর জীবনের প্রত্যাশী। এমনি করেই আমরা শুধু ঋত্বিক ঘটকের ছবির চরিত্রগুলোর ভঙ্গুর জীবনই দেখতে পাই না, শুনতে পাই আনন্দের সুরও— যা বেদনার সাথে মেশানো থাকে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আবার চেপেও রাখা যায় না।

২. এই উদ্ধৃতিটি ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক নিয়ে কিছু ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে ইংরেজীতে তরজমা করা হয়েছে, পরে বাংলায়। তাই, মূল বাঙলা নিবন্ধের সথে এই উদ্ধৃতির বাক্য-গঠনগত মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক

মহীউদ্দিন

অনেকেই বলেন একটি চলচ্চিত্র তার নির্মাতার ব্যক্তিগত রিপোর্ট। একটি ছবি দেখে, সেই ছবি যিনি বানিয়েছেন তাঁর মানসিকতা, তাঁর জীবনাদর্শ, তাঁর জীবনবোধ এবং জীবন বিশ্বাসের খবর পাওয়া যায়।

চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক সম্পর্কে আমার জানা শোনা শুধু তাঁর দু'টি ছবির মাধ্যমেই। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'সুবর্ণরেখা'— এই দু'টি ছবি দেখেই তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে।

আমার পরিষ্কার মনে আছে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবি ঢাকায় মুক্তি পাবার পর অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক তাঁর ছবির এবং কখনো ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অধিকন্তু প্রশংসায় যেমন লজ্জিত করেছেন তেমনি নিরম্বু আক্রোশে তাঁকে, তাঁর স্বভাব-চরিত্রকে হীন নিন্দায় কলঙ্কিত করেছেন। যাঁরা তাঁর ছবিকে অনেক প্রশংসা করেছেন এবং যাঁরা তাঁর স্বভাব-চরিত্রকে নিম্ন মানের ছবি তৈরির কারণ হিসেবে বিশ্লেষণ করে 'তিতাস' ছবিকে গালাগাল করেছেন, তারা উভয়ই, আমার সন্দেহ হয়, ছবিও বোঝেন না এবং মানুষের স্বভাব-চবিত্রও বোঝেন না।

শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটকের দু'টি ছবি দেখে আমার মনে হয়েছে মানুষ তার নিজের ক্ষমতা ও বিশ্বাসের ওপর থেকে যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যে বিশ্বাস ও ক্ষমতা মানুষকে দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য ; অলীক সুবর্ণরেখায় পৌছানোর জন্য জীবনকে সংগ্রামের জন্য মজবুত করে, শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক মানুষের জীবনে সেই বিশ্বাসকে জ্ঞানের পরিধিতে বিস্তৃত করতে পারেন নি ; তাই তাঁর ছবির চরিত্রেরা প্রায়শই পরাজিত, নিন্দিত এবং পতিত।

তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপকথার চরিত্র থেকে জীবন-বিশ্বাস আহরণ করেছেন কিনা জানি না কিন্তু তাঁর ছবিতে দেখেছি চরিত্রেরা মানবিক মূল্যবোধ এবং জীবন-বিশ্বাস আহরণ করেছে উপকথা ও ইতিকথার চরিত্রগুলো থেকে। প্রত্যন্ত আধুনিক যুগে অত্যন্ত প্রাচীন জীবনবোধের হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করে পরাজয় হয় ভাগ্যের নির্মম পরিণাম। উপকথার জীবনবোধের যে ফাঁকটুকু আজ অন্য জ্ঞান এবং বোধের সেতু দিয়ে বেঁধে দেওয়া দরকার শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর জীবন কালে তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি ? আমার মনে হয় তিনি তা পারেন নি। তাঁর ভাববাদী মন তাঁর বস্তুবাদী মনের সাথে সতত দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। রহস্য থেকে প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়ন তাঁর জীবনে তাই কোন দিন সম্ভব হয়নি। তিনি চেয়েছেন মানুষ উপকথার চরিত্র থেকে জীবন-

বিশ্বাসে বলবান হোক এবং সেই বলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হোক, মানুষের জয়ই ছিল তাঁর এক মাত্র কামনা, সত্য ও সুন্দরের জন্য মানুষের নিরবধি সংগ্রামের তিনি ছিলেন সাহসী সৈনিক কিন্তু কখনো পরিস্থিতির বিশ্লেষক, নেতা বা সেনাপতি ছিলেন না। শুধু তাই নয় তাঁর মনে সংস্কার ও বোধির দ্বন্দ্ব তাঁকে সংস্কারমুক্ত করে নিদারুণ ঘটনাকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করেনি।

উপকথার চিরদুঃখী, স্নেহ-ভালবাসা-দয়ায় কাতর চরিত্রগুলোই তাঁর ছবির চরিত্রের মানসিকতার উপকরণ হয়েছে। সংগ্রামে কঠোর, কখনো হিংস্র ক্ষমাহীন এবং নির্দয় চরিত্রগুলো কি উপকথায় অনুপস্থিত ? শ্রী ঘটক আত্মদহনে প্রস্তুত কিন্তু আত্মহননে অস্বীকৃত। মানবিক গুণের দুর্বলতার জন্য শত্রুর কাছে পরাজিত নায়ক অথবা নায়িকা আত্মদহনে মৃত্যু স্বীকার করছেন কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুরতায় শত্রুকে হত্যা করতে অস্বীকার করেছেন। আগেই বলেছি প্রত্যন্ত আধুনিক যুগের জীবনে অত্যন্ত প্রাচীন উপকথার জীবন বোধ এত শ্লথ যে সেই জীবনবোধের গতিতে জীবন সংগ্রামের মানসিকতাকে চালালে পরাজিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটকের জীবনে এই বোধ আর মানসিকতার নিরন্তর দ্বন্দ্বই তাঁকে যেমন জীবনে তেমনি কর্মে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল।

তবু তিনি নাগিনীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কোটি কোটি মানুষের আত্মীয়-বন্ধু। তাদের দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় সমব্যথী। চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁর প্রাণের মায়া-মমতা মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে রাখবে।

চলচ্চিত্রে নিবেদিত প্রাণ : ঋত্বিক কুমার ঘটক

ইকবাল আহসান চৌধুরী

"আমি শিল্পী হিসেবে involvement-এ বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে চারপাশের মানুষের জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করার কোন মানে হয় না। যে কোন সৎ শিল্পীকেই সমাজের অংশীদার হতে হবে। লক্ষ মানুষের জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সংগ্রামের অংশীদার হতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সাথে দিকে দিকে প্রসারিত আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ না রাখলে আমার দ্বারা, যে কোন শিল্পীর দ্বারা ভালো ছবি তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি শিল্পীর কর্তব্য এবং প্রয়োজন এই involvement-এর। সেই সাথে দর্শককে alienate করবো। এই দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। একটি শিল্পকর্মের প্রসঙ্গে দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। শিল্পী তার শিল্পকর্মে যে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার সাথে সে যদি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে না থাকে, যদি সে বিষয়টি তার পূর্বপরিচিতির গণ্ডীর ভেতর না হয় তবে তার প্রকাশ ভঙ্গিতে জড়তা থেকে যাবে— সে তার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। তা ছাড়াও কোন কিছুর সাথে deeply involved না হলে সেই বিষয় সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণা বা প্রেম জন্মাবে না। এইরূপ আবেগ সঞ্জাত কোন কিছু শিল্পীর হৃদয়ে develop করলেই তাকে সে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারবে— এবং প্রকাশ ভঙ্গির মধ্য দিয়ে দর্শককে সম্পূর্ণ alienate করতে পারবে। দর্শকদের alienate করা involve করার জন্যই। আমি কোন সময়েই একটা সাধারণ পুতপুতু মার্কা গল্প বলি না— যে একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে—প্রথমে মিলতে পারছে না তাই দুঃখ পাচ্ছে, পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুলল এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ঐ গল্পের মধ্যেও involve করিয়ে দিলাম— দু'মিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল। খুব খুশী হয়ে বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এর মধ্যে আমি নেই। আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব it is not an imaginary story, বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে hammer করে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিসটা বুঝুন— সেটা সম্পূর্ণ সত্যি— সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যই আমি আপনাকে alienate করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার protest কে যদি

আপনার মধ্যেই চাড়িয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার স্বার্থকতা। এই জন্যই বলছি involvement হচ্ছে শিল্পীর—alienation হচ্ছে audience এর। আমি যে কতগুলি কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র সাজিয়ে গল্প বলছি তার মধ্যে কিছু বক্তব্য রাখছি সেগুলো দেখে আপনারা আমার ভুল কি ঠিক, ভাল কি মন্দ তা বিচার করুন। যদি ভালো বোধ করেন তবে বাইরে গিয়ে বাস্তবকে বদলানোর কাজে নিযুক্ত হ'ন। এই alienation সকল আধুনিক চলচ্চিত্র বা অন্য শিল্পেরও লক্ষ্য"।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি তাঁর চলচ্চিত্র মানসকে যথেষ্ট প্রষ্ফুটিত করবে। শিল্প সৃষ্টির যে দু'টো মূল ধারা আমাদের কাছে পরিচিত ঋত্বিক ঘটক তাদের মধ্যে কোন্ গোত্রভুক্ত তা উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট। যে মূল দু'টো ধারার কথা বলছি তা হচ্ছে, এক : নেহায়েত শিল্প সৃষ্টির জন্য শিল্প। যা শিল্পী নানান ভাবে, নানান উপকরণে তাঁর সৃজনশীলতার চর্চ্চা করে তাঁর অভিব্যক্তি, কি তাঁর চিন্তাধারাকে ফুটিয়ে তুলতে চান। সে শিল্পকর্ম রসোত্তীর্ণ হলে জনগণকে তা আনন্দ দেবেই। নেহায়েত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্যই শিল্প। এদেরকে বলা যেতে পারে Aesthets, যেমন বার্তুলুচ্চির 'বার্থ অব ভেনাস' কিংবা মাইকেলেঞ্জেলোর 'ডেভিড'। শিল্পের অপরাপর মাধ্যম যেমন সঙ্গীতের কথাই ধরা যাক। সুবার্ট, শঁপা, কোর্সাকভ কিংবা চাইকোভস্কীর সঙ্গীত। কতকগুলো বিশেষ অনুভূতি কিংবা চেতনার বহিঃপ্রকাশ। দুই : কিন্তু এর পাশাপাশি বাখ্, স্ট্রাভিনস্কী, হবাগনার অথবা সস্তাকাভচের সঙ্গীতে আজকের যুগযন্ত্রণাকে কিংবা বিপ্লবের বাণীকে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। চিত্রকলায়ও তেমনি— পিকাসোর 'গোয়ের্নিকা' কিংবা 'লে জেমাসসেল', 'দা ভিগনোন', ভেরা মুথিনার 'ওয়াকার এন্ড ফার্মগাল' অথবা সালভাদর দালি-র 'প্রিমোনিশন টু সিভিল ওয়ার' শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কিংবা ভাবের প্রকাশই নয় এরা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়।

শিল্প সৃষ্টির এই দু'টো ধারার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর শিল্পী তাঁর চেতনায় তাঁর সমাজ, তাঁর পারিপার্শ্বিকতার প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার প্রতি সচেতন এবং এজন্যই তাঁর শিল্প প্রকাশে এদের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। ঋত্বিক ঘটক এই committed শিল্পীদের দলভুক্ত। তিনি বলেন, "শিল্পীকে committed হতেই হবে। সর্বশিল্পের শেষ কথা মানুষ। বর্তমান মানুষ, যারা শোষিত তাদের স্বার্থের বাইরে কোন শিল্প করা আমি পাপ মনে করি"।

তাই ঋত্বিক ঘটকের নাম উচ্চারিত হয় সেই সব চলচ্চিত্রকারদের সারিতে যাঁরা তাঁদের চলচ্চিত্রে ছবি তুলেছিলেন তাঁদের পারিপার্শ্বিকতার প্রকৃত চিত্রটার, তুলে ধরেছিলেন জীবনের চরমতম সত্যটিকে। গঁদার, প্যাসোলীনী, বুনুয়েল হচ্ছেন এই সারির শিল্পী। যাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের মধ্যে বোধ করেন যে, তাঁদের আশেপাশে এই যে যত অনাচার আর অন্যায়ের পাহাড় জমে উঠেছে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আর তাঁদের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হবে তাঁদের শিল্প কর্মে এর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা। এই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই সৃজিত হয়েছে 'গসপেল একর্ডিং টু সেন্ট ম্যাথু',

'ভিরিদিয়ানা' কিংবা 'ভিভা সা ভি'। ঋত্বিক ঘটক হচ্ছেন ঐ শিল্পীদের মধ্যে একজন যাঁরা এই অবক্ষয়ের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতেন একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার—যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না কোন বৈরীতা, থাকবে না শোষক কিংবা শোষিতের সম্পর্ক, জন্ম নেবে নতুন মূল্যবোধের— যার হাত ধরে বাস্তবায়িত হবে একটা সুন্দর পৃথিবীর। সুস্থ জীবনবোধে পরিপূর্ণ সে সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিশ্রুতি থাকবে প্রতিটি মানুষের সুন্দর আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোর বাস্তব রূপান্তরের। নাট্যকার বার্টল ব্রেখট তাঁর 'সেইন্ট জোয়ান অব দ্যা স্টকইয়ার্ড'-এর মুমূর্ষ নায়িকার কণ্ঠস্বরে যেমন উচ্চারিত করেছিলেন :

> Make sure when leaving the world not just that, you are good, but leave a good world.

তেমনি প্রত্যেক সচেতন শিল্পীই তাঁর অস্তিত্বে উপলব্ধি করেন এই কথাগুলো। আজকের পৃথিবীতে একমাত্র সমাজ বাস্তববাদী শিল্পীরাই বিশ্বাস করেন তাঁর পারিপার্শ্বিকতায় মানুষের এই দুঃখ দৈন্যের জন্য দায়ী এই সমাজব্যবস্থা। শুধু বাস্তবটাকে তুলে ধরলেই চলবে না, খুঁজে বের করতে হবে যে, কেন এমন হচ্ছে এবং কি কি পরস্পরবিরোধী বিধি ব্যবস্থা এই অবস্থার জন্যে মূলত দায়ী। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ বা সোসালিস্ট রিয়ালিজম সর্বপ্রথম সাহিত্যে ব্যবহার করলেন ম্যাক্সিম গোর্কী critical realism-এর বিপরীত বিন্দু হিসেবে। গোর্কীর 'মাদার', 'দি এনিমি', অস্ত্রভস্কির 'হাউ দা স্টিল ওয়াজ টেম্পারড' কিংবা সলঝেনিৎসিনের 'এ ডে ইন দা লাইফ অব ইভান দেনিসভিচ', ভিসনেভস্কির 'অপটিমিসটিক ট্রাজেডি' ইত্যাদি সমাজবাস্তবতার ফসল। আর্নস্ট ফিশারের কথায় :

> Critical realism and, even more widely, bourgeois literature and art as a whole imply criticism of the surrounding social reality—socialist realism and even more widely, socialist art and literature as a whole imply the artist's or writer's fundamental agreement with the aims of the working class and the emerging socialist world.

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধসম্পন্ন শিল্পীরা ইতিহাসের গতিনিয়ন্ত্রক শক্তিগুলোকে তুলে ধরেন, এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করে এই গতির পদ্ধতি, পরিপ্রেক্ষিত ও যৌক্তিক নিয়মানুবর্তিতাকে আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হন। বিশ্ব ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্ক ও শিল্পে রূপায়িত ঘটনার বস্তুগত অর্থ তাঁরা জানতে চান জীবনের সত্যটাকে গভীর ও স্পষ্টভাবে প্রকাশের তাগিদে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারায় এই যে আবিষ্কারধর্মী প্রয়াস, এর উৎস হচ্ছে ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের শৈল্পিক অবয়ব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্পকলার দিগন্তে যে আশ্চর্য প্রসার ঘটিয়েছে তা বাস্তবের উপর এক নতুন আলো ফেলতে এবং সুন্দরের মূল উদ্‌ঘাটনে সক্ষম।

সমাজবাস্তববাদী শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে এই পদ্ধতিটাকেই তুলে ধরতে চেষ্টা

করেন। এর বাইরে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কিংবা সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করার কাজকে তাঁরা পাপ মনে করেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতি কিংবা বুর্জোয়া আর্ট সম্বন্ধে এদের ধারণা ব্রেখটের ভাষায় :

> Art which adds nothing to the experience of the public, which leaves it as it found it, which wants to do no more than flatter rude instincts and confirm un-ripe or over-ripe opinions— such art is worth nothing so called pure entertainment. Just produces a hang over. There is just as little value in an art which has no purpose but to educate and thinks to do this by flagellation, abandoning all the varied methods available to the arts ; this will not educate the public, but simply bore it. The public have a right to be entertained. This helps to re-produce working strength, but it must not do only this. And the artist have a right to be allowed to entertain.

শিল্পী তাঁর সৃজনশীলতায় এমন এক সৃষ্টির জন্ম অবশ্যম্ভাবী মনে করেন যেখানে আমাদের মধ্যকার অনেক সুবিধাবাদী লেখকের আজকের আয়াস-প্রধান জীবন একটি পরিহাসে পরিণত হবে। সকল প্রকার সৃষ্টিতে তুলে ধরতে হবে লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য মানুষের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার মহান প্রতিচ্ছবি। সেই মানুষ যারা দারিদ্র, বেকারত্ব এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক নিষ্পেষনে নিপীড়িত। সুতরাং আজ এই জনগণের পট পরিবর্তন শুধু যে সেই দারিদ্র্যের বিশালতা ও গভীরতার উপশম ঘটানোর জন্যে প্রয়োজন তা নয়, এর প্রয়োজন আমাদের সমষ্টিগত সমাজ জীবনের আছে। মৌলিক মূল্যবোধ পরিবর্তনে এই মূল্যবোধ পরিবর্তন আমাদের জীবনকে আরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তুলবে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্যে নতুন করে উৎসাহ জোগাবে। তখন এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে যে, সকল মানুষ একান্তভাবে সকলের সমন্বিত কল্যাণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট হবে। ঋত্বিক ঘটক যে দেশের, তথা যে পারিপার্শ্বিকতার শিল্পী তার মোটামুটি চিত্রটা কি ? এখানকার বর্তমান জীবনের কোথাও চিন্তা বা কর্ম সংহত নয়, যে সংহতি থেকেই মুক্তি আসতে পারে। সে সংহতি না আছে এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির, না রয়েছে তথাকথিত সাম্যবাদীর চিন্তায় ও কর্মে। যে তাৎক্ষণিকতার আবর্তে পড়ে এ দেশের গণমানস বিভ্রান্ত, সে আবর্তেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক জীবনের পঙ্কিলতা, অর্থনৈতিক জীবনে পরিকল্পনার সুবিধাবাদ, শোষণ ও প্রতারণা, সাংস্কৃতিক জীবনে অর্থ ও খ্যাতি নিয়ে কাড়াকাড়ি। ঐ আবর্তেই বিশ্বাস ও বিবেককে শিকেয় তুলে রাখা হয়, মানুষ সংকীর্ণ বাস্তবতায় প্রয়োগবাদী হয়। প্রাক্ স্বাধীনতাকালীন এদেশের তুলনায় পঞ্চাশোত্তর এদেশ তাই এক অচিন্তনীয় পর্যায়ে এসেছে। শোসকশ্রেণীর উগ্র লালসা; প্রাদেশিক হানাহানি, সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা, বিভেদের এত ব্যাপক তোড়জোড়, এত ছাত্র

উচ্ছৃঙ্খলতা, সর্বব্যাপী এত অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা, দারিদ্র, অশিক্ষা ও বৈষম্যের মধ্যে দেশের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি মাত্র তাৎক্ষণিক তাগিদেই বেঁচে থাকে বা তাৎক্ষণিক তাগিদেই হামাগুড়ি দিয়ে চলে বা সময় বিশেষে স্ফুলিঙ্গ হয়, আর সমগ্র দেশ কিছু আদর্শবাদীর কল্পনায় মাত্র অবস্থান করে। অগ্রগতির পথ আচ্ছন্ন হয়ে যায় বিকাশের স্তরে স্তরে অদৃষ্টপূর্ব সমস্যার জটিলতায়, বিপর্যস্ত হয় মেহনতি আর ছিন্নমূল মানুষের জীবনযাত্রা। প্রত্যক্ষ করতে হয় দুঃখ, দারিদ্র, অনাহার, হতাশা আর মৃত্যু।

যে শিল্পীর পারিপার্শ্বিকতার প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই, আর শিল্পকর্মে এর প্রতিফলন ঘটবে না তা আশা করা অন্যায়। এ অব্যবস্থা শিল্পীর বিবেক তথা বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেবেই। এবং চলচ্চিত্রে এরই স্বরূপ উৎঘাটন করেছেন ভিসকন্তি, বুনুয়েল, সলোনাস, গঁদার এবং ঋত্বিক ঘটক।

ঘটক প্রথম জীবনে সাহিত্যকর্ম করতেন। এই পথ ধরেই একদিন জড়িয়ে পড়লেন গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে। পরবর্তী কালে IPTA-এর একজন সক্রিয় সদস্য হয়েছিলেন। নাটক করতে করতেই তাঁর চেতনা হলো শিল্পীর সাধনা হচ্ছে মানুষকে motivate করা— সবাইকে তার পরিবেশ এবং সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করা। শিল্পের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সবচেয়ে সোজা পথ হচ্ছে চলচ্চিত্রকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়া। কেননা গণ সংযোগ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে আজকে সবচেয়ে শক্তিশালী। একে একে ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রায়িত করলেন, 'নাগরিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং সবশেষে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। 'নাগরিক' ঘটকের সর্ব প্রথম চলচ্চিত্র সৃষ্টি। ছবিটি আজো মুক্তি পায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রণার এটিই প্রথম বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ। নিরাপত্তা এবং নিশ্চিন্ততার সন্ধানে এক দৃঢ় প্রত্যয় নাগরিকের জীবনপথ পরিক্রমা এর বিষয়বস্তু। ছবির নায়ক জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখতো। একটার পর একটা চাকরিতে ইন্টারভিউ দেয় আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তাতে সে দমে যায় না। সাময়িকভাবে দমে গেলেও উৎসাহটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কেন জানি তার একটা বিশ্বাস যে কোথাও না কোথাও সৌভাগ্য তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু ক্রমশই সে বুঝতে পারে যে সে সৌভাগ্যকে কোনদিনই আকঁড়ে ধরতে পারবে না। কেননা এই সামাজিক কাঠামোতে তা হওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা যারা মধ্যবিত্ত তাদের উত্তরণের পর্যায়ে কতকগুলো সীমা-পরিসীমা রয়েছে। তাই তারা চিরকালই অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পর্যায়ে থেকে যায়। চেষ্টা করলেও কোনদিন এর থেকে উপরে উঠতে পারে না। অপরাপর সকল কিছুর সাথে তার প্রেমও নিস্ফল পরিণতি লাভ করলো। এই হচ্ছে 'নাগরিক' এর কাহিনী। বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপের চিত্র।

স্বাধীনোত্তোর যুগের বিড়ম্বিত বাঙালি জীবনের যন্ত্রণা, হতাশা ও ব্যর্থতা ঋত্বিক ঘটকের প্রিয় বিষয়বস্তু। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার বা 'কোমল গান্ধার' এর ভৃগু-

অনসূয়া এবং 'সুবর্ণরেখা'র ঈশ্বর বা সীতা-অভিরামের জীবনের পটভূমি একই। নতুন পরিবেশে এরা পুনর্বাসনের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে চলেছে। নীতা তার যন্ত্রণার মুক্তি চেয়েছে প্রেম-ভালবাসার মধ্যে, ভৃগু-অনসূয়া খুঁজেছে শিল্পের মধ্যে, ঈশ্বরের আশা-আকাঙ্খা যেন জড়িয়ে ছিল সীতা ও অভিরামের জীবনের সার্থক প্রতিষ্ঠায়। এদের কেউই সাফল্য লাভ করতে পারে নি। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতা জীবন সংগ্রামে জর্জরিত হয়েও শুধু বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের সামনে জীবনের গভীর সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অস্তিত্বের প্রবল সংকট ও দ্বান্দ্বিক পরিবেশের নির্মম প্রহার। আমরা বুঝতে পেরেছি এ পথে বাঁচার কোন উপায় নেই। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্থির করতে হবে এমন এক সমাজ ব্যবস্থার যাতে সমস্ত বিকারকে অতিক্রম করে সমাজ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে, শ্বাসরোধকারী এই অবক্ষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সমাজ কলুষমুক্ত হবে। 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'তে দেখানো হয়েছে একটা ছোট শিশুর চোখে মহানগর; বিস্মিত ছেলেটির চোখে মহানগরীর জীবনের বিচিত্র সব উপকরণ। জীবনের শুরুতেই এর বিকাশের পথে সকল প্রকার বিরোধী শক্তিগুলোর উপস্থাপনা। দুঃসহ বাস্তবতার মর্ম মূলে জীবন হয় পরাভূত আর জন্ম নেয় জীবন-বিমুখতা। 'কোমল গান্ধার' এর পটভূমিও হচ্ছে সমসাময়িক বাংলাদেশ। দেশ বিভাগের দায়ভাগে ক্ষতবিক্ষত, অনিশ্চিত স্বাধীনতায় দ্বন্দ্বসঙ্কুল, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেবার ফলে অবদমিতচিত্ত আর সেই অবদমনের ফলস্বরূপ পশ্চিমী সভ্যতার রসে পরিপুষ্টচিত্ত জাতীয় নেতাদের চিন্তারাজ্যের দেউলেপনা—ইত্যাকার দেশজ ও আন্তর্জাতিক কারণের ফলশ্রুতিতে দেশের চরম দুর্গতি। দেশভাগের যন্ত্রণায় রক্তাক্ত মন নিয়ে ভৃগু শান্তি খোঁজে শিল্পের সাধনায়—অংশ নেয় নবনাট্য আন্দোলনে—আর সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীভৎসলীলায় মাকে হারানোর স্মৃতির দাহ বুকে নিয়ে দিন কাটায় অনসূয়া। এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানসিকতার চিত্ররূপ হলো 'কোমল গান্ধার'। শিল্পের আঙ্গিনায় ভৃগু-অনসূয়ার মিলন আর তাদেরকে কেন্দ্র করে আরও বহু পোড়-খাওয়া ছিন্নমূল অস্তিত্বের আবর্তন আর সমস্ত গ্লানির শেষে সবাইকার উত্তরণ এক সীমাহীন ভালবাসার উভয় দিগন্তে।

'অযান্ত্রিক' ছবির ঘটনাস্থল ছোট নাগপুরের আদিবাসী সমাজ। একটা নড়বড়ে ট্যাক্সির ড্রাইভার বিমল হচ্ছে ছবির নায়ক। আর ট্যাক্সিটা, আদর করে বিমল যার নাম দিয়েছে 'জগদ্দল' সে হচ্ছে ছবির নায়িকা। স্ত্রী, পুত্র, পরিজনহীন বিমলের নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী হচ্ছে জগদ্দল—তাই সে প্রাণভরে ভালবাসা দেয় জগদ্দলকে। যন্ত্রের সাথে জীবনের একাত্মতা দেখানোর এক দুরূহ প্রচেষ্টা।

ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা'র নায়ক—ঈশ্বর চক্রবর্তী। ঈশ্বর তার ছোট বোন সীতা ও একটি নিম্নবর্ণের পালক শিশু অভিরামকে নিয়ে নবজীবন কলোনীর তার ভাগ্যহীন সঙ্গীদের ছেড়ে চলে আসে ছাতিমপুরে, এক মাড়োয়ারী বন্ধুর চাকরির নিরাপদ আশ্রয়ে। উদ্বাস্তু ঈশ্বর হয় ম্যানেজার ঈশ্বর। কালক্রমে সীতা এবং অভিরাম পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট

হয়। কিন্তু মাড়োয়ারী বন্ধুর সংস্কারবোধের ভয়ে সীতা-অভিরামের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল ঈশ্বর। সীতা-অভিরাম কলকাতায় পালিয়ে এসে দুঃসহ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। শুরু হয় জীবন যন্ত্রণা। জীবিকার জন্য অভিরাম ড্রাইভারী করা শুরু করে এবং নিয়তির বিধানে সীতা এবং বিনুর আশ্রয় ছেড়ে দুর্ঘটনায় মারা যায়। পুরোনো বন্ধু হরপ্রসাদের সঙ্গে কলকাতায় এসে নারকীয় উচ্ছৃংক্ষলতায় গা ভাসায় ঈশ্বর। অবশেষে এক পতিতালয়ে আসে ঈশ্বর এবং ঘটনাক্রমে সেই মেয়েটিই হলো সীতা। এরপর সীতা আত্মহত্যা করে। সীতার ছেলে বিনুকে নিয়ে ঈশ্বর ছাতিমপুর ফিরে আসে। ঈশ্বরের জীবনের বিপর্যয়, সংঘাত এবং যন্ত্রণাই হচ্ছে এ ছবির উপজীব্য। ঈশ্বরের সমস্যার মূল তার জাতি পরিচয়ে নিহিত নেই, তা আছে তার অর্থনৈতিক সামাজিক শ্রেণী পরিচয়ে। উদ্বাস্তু জীবনের আধারে বিভক্ত বাংলাদেশের একটা বিশেষ কালের দুঃখের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানুষের ততোধিক দুঃখে অর্থাৎ প্রতারণায়, মিথ্যাচারে নষ্ট মূল্যবোধের আত্মসমর্পণের ছবি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে সুবর্ণরেখা-য়।

ভাঙ্গনের মুখে জরাজীর্ণ সব চেহারা আর সীতার মৃত্যুদৃশ্য অত্যন্ত নির্মম, নিষ্ঠুর, রূঢ় ও প্রতিবাদে সোচ্চার।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এসে ঘটক ছবি করলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। তিতাস সম্পর্কে ঋত্বিক বলেছেন যে, "এটা আমার একটা স্টাডি। ছবি করার মাধ্যমে মিশলাম এদেশের মানুষের সাথে, পরিচিত হলাম এদেশের জলবায়ু আর সমাজ ব্যবস্থার সাথে। উপলব্ধি করলাম এদেশের মানুষের নাড়ীর টানকে।" 'তিতাস' তিতাসের পারের একদল মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রা আর জীবন সংগ্রামের আলেখ্য। তিতাসের জলে মালোরা জাল ফেলে, নৌকা চালায় আবার তিতাসেই এরা নৌকা বাইচ করে পালা পার্বণ উদযাপন করে। এর পারের প্রকৃতির সন্তান বাসন্তী, অনন্তর মা, কিশোর, সুবল ও কাদের মিয়া। ছিন্নমূল আর ভাগ্যহত কতকগুলো মানুষের জীবন পরিক্রমা। স্বামীহারা রাজার ঝি পুত্র অনন্তকে নিয়ে আশ্রয় নিলো তিতাসের পারের বাসন্তী, উদয়তারা আর রামপ্রসাদ চাচাদের সাথে। ওরাও নিজেদের সুখ-দুঃখের অংশীদার করে নিলো ওকে। সামাজিক বিধিনিষেধ আর সংস্কারবোধেব নির্মম অনুশাসনের বলি হলো কিশোর আর রাজার ঝি। উন্মত্ত বর্বরতার সামনে মুখ থুবড়ে পড়লো মানবিকতাবোধ। প্রহৃত এবং নির্যাতিত কিশোর আর রাজার ঝির মৃত্যু হলো। অসীম শূন্যতা আর গ্লানি নিয়ে শুরু হলো অনন্তর জীবন। স্বামীহারা এবং পরিত্যক্তা বাসন্তীর অতৃপ্ত মাতৃত্ব প্রশান্তি লাভ করলো না অনন্তের কাছে। বাসন্তী শিকার হলো ধর্মান্ধতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার। সামন্ত প্রভুদের হীন চক্রান্তে আক্রান্ত হলো তিতাসের পারের এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। হিংসা আর ষড়যন্ত্রের জন্য শুধুমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাই দায় হলো। অর্থলোলুপতা আর চরম সুবিধাবাদের হাত ধরে আসলো মালো সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ। আর এই বিভেদের সূত্র ধরে ধ্বংস হয়ে গেল তিতাস পরের এই সভ্যতা। প্রকৃতির সন্তান— তিতাসের মেয়ে বাসন্তী সকল যন্ত্রণার সাক্ষী হয়ে eternal moth-

er এর মূর্তি নিয়ে তিতাসের পাড়ে পড়ে রইলো। সন্তানহারা পৃথিবী যেমন নির্বাক হয়ে শুধু চেয়ে থাকে আর হৃদয় নিংড়ানো সহনশীলতা দিয়ে শোকটাকে ভুলতে চেষ্টা করে তেমনি বাসন্তীও তিতাসের শুকনো চর পড়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। চরের বালি থেকে পানি তুলে তা পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর একদিকে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এক শিশু মহাকালে ক্রমবিবর্তনের বাজনা শুনিয়ে শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে চলে যায় এক নব দিগন্তের সূচনায়। এক সভ্যতার অবলুপ্তির সাথে জন্ম নেয় প্রগতির আরেক অধ্যায়।

ঋত্বিক ঘটকের সর্বশেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। ভারতে নক্সাল আন্দোলনের পটভূমিতে চলচ্চিত্রায়িত। নীলকণ্ঠ বাগচী নামের এক বুড়োকে নিয়ে ছবির শুরু। দেশে নানা রকম বিবর্তন চলছে। চলছে নির্যাতিত জনগণের উপর নানা রকম পরীক্ষা নীরিক্ষা। আর এই সব পরীক্ষা নীরিক্ষার চাপে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে জনজীবন। রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের উচ্ছিস্টভোগীরা দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে করে ঘুরে বেড়ায় আর বড় বড় আদর্শের কথা বলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাতে নীলকণ্ঠ বাগচীদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। পাড়ার এক তরুণ ছেলে নচিকেতার সাথে নীলকণ্ঠ তার স্ত্রী এবং শিশু পুত্রের কলকাতার গলিস্থ সংসার থেকে গৃহত্যাগী হয়। কলকাতার গলি থেকে রাজপথে চলতে চলতে নীলকণ্ঠ ঢক ঢক করে গলায় বাংলা মদ ঢালে। পথে এদের সঙ্গ নিল বঙ্গবালা নামে এক তরুণী গ্রাম্য মেয়ে—যার সম্বল শুধু মাত্র একটা পোটলা। মেয়েটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মিলিটারী বর্বরতার শিকার। বাংলাদেশ থেকে সে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। সঙ্গে এক টোলো পণ্ডিত অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। তিনিও শহরে এসেছেন রুটি রোজগারের আশায়। কলকাতার ফুটপাথে, রাস্তায় এদের দিন কাটে। তারপর শহর ছেড়ে এরা গ্রাম বাংলার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলে। এই পথ পরিক্রমাই হচ্ছে ছবির উপজীব্য। এক রাতে সবাই শালবনের মধ্যে রাত কাটায়। সেই বনেই রাতে এসে আশ্রয় নেয় কিছু নক্সাল কর্মী। পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় গুলি লেগে নীলকণ্ঠ বাগচী মারা যায়। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং অসুসংবদ্ধ প্রতিরোধের আন্দোলনে নীলকণ্ঠ বাগচীদের আত্মবিচ্ছিন্নতা ও বিভ্রান্তি হচ্ছে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'।

'নাগরিক' দিয়ে যে পথ পরিক্রমার শুরু—'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে তা শেষ, মাঝখানে যে দীর্ঘ পথ তার মধ্যে সূচিত হয়েছে এ দেশের চলচ্চিত্রের জগতে এক নতুন ধারার। মাঝখানে পুনাতে শিক্ষকতাকালীনও ঋত্বিক সার্থক করে গিয়েছেন মনি কাউল, কুমার সাহানী এবং কে. কে. মহাজনের মত সৃজনশীল শিল্পীদের উপহার দিয়ে। চলচ্চিত্রের জগতে ঋত্বিক যে গতিময় ঐতিহ্য দিয়ে গেলেন এর তীব্রতাকে রুখবে কে? এই চক্রাকার আবর্তের মধ্য থেকেই তো বের করে আনতে হবে জীবনের চরম সত্যটিকে।

জীবনের দুই রূপকার

জসীমুদ্দীন

ঋত্বিক ঘটক আর রাজেন তরফদার একই লক্ষ্যে বহমান দুই ধারা। জীবনের দুই সূক্ষ্ম কারিগর আর শিল্পী। যা দেখেন তাই তোলেন অবিকলভাবে গভীর মমত্ববোধ দিয়ে। তাতে ভেজাল নেই— নেই পাঁচমেশালী। তাঁরা মাটির অতি কাছাকাছি, অতি নিকটে। তাই তাঁদের ছবিতে এঁটেল মাটির সোঁদা গন্ধ, বস্তির আবর্জনা আব ভাঙ্গা ঘরের কর্দমাক্ত মেঝে।

আবহমান কাল ধরে মানুষ লড়ছে প্রকৃতির সঙ্গে, গড়ছে সভ্যতা, নির্মাণ করছে নগর আর বন্দর। সভ্যতার পিলসুজ এইসব জীবন সৈনিকেরা আজ ক্ষুধা-দারিদ্র, অশিক্ষা-কুশিক্ষার শিকার ; তাদের আশা- আকাঙ্ক্ষা পদদলিত, ভূলুণ্ঠিত।

রাজেন তরফদারের ছবিতে সামন্তবাদী সমাজের অবক্ষয়তার সত্যসুন্দর প্রকাশ। যে সমস্ত জীবন সৈনিকরা লড়ছে তাদের জীবন কথা।

ঋত্বিকের ছবিতে পাই বিক্ষোভ-বিদ্রূপ আর জ্বালাময়ী কথা। যে সভ্যতা আমাকে কিছু দেয়নি শুধু নিয়েছে— তাকে ভাঙ্গো, নতুন করে গড়ো, সকলের তরে। গ্যাগারিনের অগ্রযাত্রাকেও তিনি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন জীবনকে আরো অর্থবহ করে তোলার স্বার্থে (সুবর্ণরেখা)।

'পালঙ্ক' ছবিতে ধলাকর্তা আঁকড়িয়ে রাখতে চাইলেন তাঁর পালঙ্ককে। সামন্তবাদ তখন ক্ষয়িষ্ণু। একে একে সব মূল্যবোধগুলো ধসে পড়ছে। নতুন পুঁজির মোড়লরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ধলাকর্তার দাঁতের ধার কমে গেছে। তবুও ধলাকর্তা আঁকড়িয়ে রাখতে চাইলেন তাঁর মূল্যবোধকে। পারলেন না।

অবশেষে মকবুলের ঘরে রক্ষিত পালঙ্কে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত শিশুকে হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়ে আর্শীবাদ করলেন। তাঁর পরাজিত বিবেক নতুন সুখে পল্লবিত হয়ে উঠলো, নতুন সুখের সন্ধানে। এই সুখ কি চিরায়ত বা ক্ষণিকের— এটা প্রশ্ন নয়। ধলাকর্তার জীবনের এই অপরিজ্ঞাত রহস্যের কারিগরই রাজেন তরফদার।

অযান্ত্রিক' ছবিতে যন্ত্রও প্রাণ পায় গভীর মমত্ববোধে। যন্ত্র অচল— একে ভেঙ্গে ফেলো—একে দিয়ে আর চলবে না। মানুষ যা আছে তাতেই তুষ্ট, তাকে নিয়েই বাঁচতে হবে। গড়তে হবে নতুন সমাজ। এই সমস্ত প্রশ্নের উচ্চকিত সমাধান পাই আমরা ঋত্বিক কুমার ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিতে।

গঙ্গার ঘোলা জলে মাছ নেই, তাই ভাটিতে চলো ; কিন্তু সেখানে মৃত্যু ওৎ পেতে আছে (গঙ্গা)। তাই শংকা— তাই দ্বন্দ্ব। 'মৃত্যুকে জয় করবে কে' ? এই প্রশ্ন রাজেন

আর ঋত্বিকের। রাজেনের ভাষায়, 'সামনে ... কি হইবে জানিনা— আগামীই বলিতে পারে।' ঋত্বিকের কথায় সমাজ বিকাশের নিয়ম—'আগামী দিন মানেই আলো। মানবতার জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই এগিয়ে চলো, চলো শঙ্কাহীনভাবে।' তাই তিতাসের বাসন্তীর চোখে মৃত্যুর মুখে নতুন দিনের আলো। আগামী দিন শিঙ্গা ফুঁকিয়ে ঘোষণা করছে জীবনের জয়— জয় মানুষের জয়।



'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর লোকেশনে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক : হিরন্ময় প্রতিভা

কাজী স্যামুয়েল দিশু

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ইংল্যান্ডের একজন মহিলা শ্রমিক বলেছিলেন : It is sad to die when one is loved by so many people. ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুদিবসে সেই কথাই মনে পড়ে। শিল্পী যতক্ষণ সৃষ্টিক্ষম ততক্ষণ তাঁর মৃত্যু অকাল মৃত্যু।

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও 'অযান্ত্রিক' দিয়ে যাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু ('নাগরিক' ঋত্বিকের প্রথম ছবি যা আজও মুক্তি পায়নি) 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' যার পরিণতি। 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা', 'তিতাস একটি নদীর নাম'— বিস্ময়কর বিবর্তন।

চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে যাঁরা প্রত্যক্ষ জড়িত, তাঁরা জানেন, সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানো এই শিল্পে দারুণ কষ্টসাধ্য, কারণ চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে মনি-কাঞ্চনের প্রশ্ন। সে জন্যে অনেক প্রতিভাধর শিল্পীকে করতে হয়েছে আপোষ। কিন্তু সুখের কথা এবং অত্যন্ত অহঙ্কারের সাথে একথা বলা যায়, ঋত্বিক ঘটক প্রাচুর্য অথবা মোহের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেন নি। প্রতিকূলতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন বারবার, কিন্তু শিল্প... থেকে বিচ্যুত হননি— যে আদর্শ জীবনের শুরুতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন— 'প্রত্যেক শিল্পী সমাজের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং শিল্পীরা সমাজ প্রগতির হাতিয়ার।'

শিল্পী হিসেবে সেদিনকার তরুণ ঋত্বিক বেছে নিয়েছিলেন— শিল্পের সবচেয়ে আধুনিকরূপ—চলচ্চিত্র, অডিও-ভিজ্যুয়াল মিডিয়া, সেখানে বিজ্ঞান এবং সাহিত্য একাকার হয়ে সৃষ্টির নব নব উন্মাদনায় ইতিহাসের গতিধারায় জীবনের বাস্তব দ্বন্দ্বের সাথে মিলিয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

হাতের ক্যামেরাকে ...র করেছিলেন ক্ষুরধার কলমের মত — নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা-ঘৃ... ভালবাসা, হিংসা-প্রেম, বিদ্রোহীসত্তা-আপোষকামিতা— এ সবের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে ক্যামেরার ভাষায়। সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সাথে যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং তার করুণ পরিণতি নিয়ে যাত্রা শুরু (অযান্ত্রিক)। তারপর 'উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের ট্রিলজী'— 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা' এবং 'কোমল গান্ধার'—এক একটা আশ্চর্য বিস্ময় কী জীবন বোধে অথবা সঙ্গীতের মূর্ছনায় (তিনটি ছবিরই সঙ্গীত পরিচালক ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান)। শুধু মধ্যবিত্ত জীবনেই ক্যামেরা নিশ্চুপ থাকেনি। ঋত্বিক আমাদের নিয়ে গিয়েছেন তিতাসপারের খেটে খাওয়া সেই

মানুষগুলোর কাছে— সৃষ্টি করেছেন এক মহামূল্যবান দলিল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। নগর জীবনের যন্ত্রণা, রাজনীতি, আশা আর হতাশার নির্মম চিত্র 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। মোটামুটি এই হলো ঋত্বিকের ফসল। অবশ্য ছোটদের জন্য একটা ছবিও তিনি করেছিলেন— শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের মৃত্যুর এক বছর হয়ে গেল। এখনও বেঁচে থাকলে তিনি আমাদের কী দিতে পারতেন ? অথবা কী দিতেন ? সে প্রশ্ন এখন অবান্তর! কিন্তু আমরা এখনও তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনি, এই লজ্জা আমাদের সকলের।

'The great art shall not past'— মহৎ শিল্প কখনও পুরনো হয় না। একথা আমরা সকলেই জানি। এবং মহৎ শিল্পের কারিগর ঋত্বিক আমাদের কাছে চিরায়ত শিল্পীরূপেই আছেন— থাকবেন।



নীলকণ্ঠ সেই শিল্পী

শামসুর রাহমান

ঋত্বিক ঘটক একটি নিবন্ধে বলেছেন, "আমার শিল্পী জীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ ক'রে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোনো সংকট আচ্ছন্ন ক'রে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোষের পথে টেনে না নিয়ে যায়, অর্থাৎ সংকটের কাছে যেন আমরা বিবেক বুদ্ধি সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।" যাঁরা ঋত্বিক ঘটককে কাছ থেকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর ফিল্ম দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, এই অসামান্য সৃজনশীল মানুষটি বাস্তবিকই সংগ্রামকে শিল্পী জীবনের নিত্যসঙ্গী ক'রে তুলেছিলেন। তিনি কাজ ক'রে গেছেন নানা প্রতিকূল অবস্থা উজিয়ে, নতজানু হননি কোনো রকম সংকটের কাছে, বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত রেখে সৃষ্টি করেছেন মননশীল, গভীর, বহুমাত্রিক শিল্পকর্ম। স্থূল বাণিজ্যের সঙ্গে আপোষ করেন নি কখনো। বেশি ফিল্ম তিনি নির্মাণ করেন নি, কিন্তু যে ক'টি করেছেন সেগুলির প্রত্যেকটিতেই রয়েছে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর। তাঁর নিজস্ব যুক্তি, তক্কো ও গপ্পো দিয়ে তিনি সেলুলয়েডকে ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে। বাংলা চলচ্চিত্রকে যাঁরা বয়স্ক করেছেন, উন্নীত করেছেন আন্তর্জাতিক মানে, ঋত্বিক ঘটক নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম প্রধান। গুরুদাস ভট্টাচার্য যখন বলেন, "তিনি তাৎক্ষণিকের ছবিকর, বর্তমানের কবি। কিন্তু এই তাৎক্ষণিকতাতেই যেমন নজরুলের শেষ নয়, তাঁর গানে-কবিতায় আছে চিরকালের কথাও, তেমনি শ্রী ঘটকের সচিত্র বক্তব্যও সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত, সমকালকে ধারণ ক'রে তারই মধ্যে সর্বকালের একটি মহত্তর বৃহত্তর ব্যঞ্জনা। সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যঞ্জনা ভারতের আর- কোনো পরিচালকের ছবিতে নেই। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেও না"— তখন তাঁর বক্তব্যে সায় দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না।

শুধু গল্পের খাতিরে গল্প বলা ঋত্বিক ঘটকের ধাতে নেই। এক অন্তর্গত যুক্তি তক্কের টানাপোড়েনে গ'ড়ে ওঠে তাঁর গপ্পো, যা সেলুলয়েডে কখনো কবিতা, কখনো-বা ব্যাপক জীবনের পড়শি—উপকথা ; সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বিস্ময়, আতঙ্ক, ভালোবাসা, আদিমতা ও আধুনিকতার মোহন মিশেলে তৈরি এক জীবনবেদ। ফিল্ম নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি বাস্তবকে করতলগত করেছেন সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে, কিন্তু বাস্তব কখনো রাশি রাশি মৃত কঙ্কালের মতো হাজির হয়নি তাঁর ছবিতে ; ওদের তিনি প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলেছেন কল্পনার বিভায়, প্রকাশের গতিময় উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে। ঋত্বিক ঘটক বরাবরই ছিলেন রাজনীতিতে সমর্পিত ; কিন্তু যাকে বলে পার্টি-কর্মী তা' তিনি কখনো ছিলেন না।

মার্কসবাদে মনেপ্রাণে দীক্ষিত এই শিল্পী মানুষটি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের লেখাকে ছুঁতে দিয়েছেন সেলুলয়েডকে ; কিন্তু শ্লোগানের ক্যানেস্তারা পেটাননি কখনো। একজন জীবননিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে জীবনের নানা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে, সমস্যার সমাধান বাত্‌লে দেননি। বাতলে দেবার কথাও নয়। কারণ সমস্যাকে তুলে ধরাই একজন শিল্পীর কাজ, মানুষকে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর দায়িত্ব। এ সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটকের মনে কোনো সংশয় ছিলো না।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের রচনাবলী যেমন ঋত্বিক ঘটককে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনি ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রমুখের লেখার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও উপকৃত হয়েছেন তিনি। তাই তিনি মানব জাতির যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন বারবার। তিনি জেনেছেন, মানুষের মনের স্তরে স্তরে যেসব গভীরতম অনুভূতির বসবাস তারা উঠে আসে এই যৌথ স্মৃতি আলোড়িত হ'লেই। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ফিল্মে সেই জরাজীর্ণ ট্যাক্সি— নাম যার জগদ্দল—যখন মা রূপে জেগে থাকে বিমলের চেতনায় কিংবা অবচেতনে, তখন কি আমাদের মনে আদি মাতার স্মৃতি আলোড়িত হ'য়ে উঠে না! 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিতেও এই যৌথ অবচেতন স্মৃতি সেলুলয়েডে জাগ্রত হয়, যখন ছোট ছেলেটি কাশবনে তার মাকে দ্যাখে ভগবতীরূপে। মীথিক্যাল ভ্যালুজের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঋত্বিক ঘটক, তাই মীথোপিয়ার আশ্চর্য সুন্দর ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি তাঁর বিভিন্ন ফিল্মে। মীথের শৈল্পিক প্রয়োগ ঋত্বিক ঘটকের ফিল্মকে একটি ব্যাপকতা দিয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে মীথের মাছিমারা অনুসরণ তিনি কস্মিনকালেও করেন নি, আধুনিক জীবনের নানা জটিলতা সম্বলিত কাহিনীকে অর্থময় ও ব্যাপকভিত্তিক ক'রে নতুন ক'রে ব্যবহার করেছেন মীথকে, যে-মীথ হাজার হাজার বছর ধরে মানব সমাজে বেঁচে রয়েছে তাদের আচারে-অনুষ্ঠানে, সংস্কারে-কুসংস্কারে, স্বপ্নে-স্মৃতিতে। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ফিল্মে যে মহেশ্বর আর উমার মীথ ব্যবহৃত হয়েছে তা' স্পষ্ট হয় গভীর মনোযোগে ছবিটি দেখার পর, তার আগে নয়। এখানেই ঋত্বিক ঘটকের শৈল্পিক ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার অসাধারণত্ব।

দুঃখের বিষয়, এমন একজন সৃজনশীল ব্যক্তি অকালে লোকান্তরিত হলেন। এই অকাল মৃত্যুর জন্যে অনেকেই তাঁর বেহিসেবী, বেপরোয়া জীবনযাপনকে দায়ী করেছেন। সন্দেহ নেই, ঋত্বিক ঘটক দু'দিকে বাতি জ্বেলে দিয়ে জীবনযাপন করেছেন। তাই দ্রুত ফুরিয়ে গেছে সেই চোখ-ধাঁধানো আলো। এই দ্রুত ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাপারটি নিয়ে আক্ষেপ করার কোনো মানে হয় না। আমাদের এই চিরচেনা পৃথিবীতে মাঝে-মাঝে এমন কোনো কোনো মানুষ আসেন যাঁরা সব সময় চিতার মতোই জ্বলেন আর সেই চিতাগ্নি চতুষ্পার্শ্বের সবকিছুকেই অসামান্য শোভিত ও অর্থপূর্ণ করে তোলে। 'এমনটি তো আর দেখিনি', ব'লে থমকে দাঁড়ায় বিস্মিত পথচারীরা, তারপর আবার নিজেদের মিশিয়ে দেয় দৈনন্দিন নানা তুচ্ছতায়।

যাহোক, এই নীলকণ্ঠ শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'চিত্রবীক্ষণ'-এর একটি সংখ্যা নিবেদন ক'রে সম্পাদক অনিল সেন আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এমন একটি সংখ্যা প্রকাশের জন্যে যে কী পরিমাণ শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন যাঁরা করেন শুধু তাঁরাই জানেন। 'চিত্রবীক্ষণ'-এর ঋত্বিক সংখ্যা ঋত্বিকানুরাগীদের অবশ্যপাঠ্য। আর শিল্পের গভীরতা যাঁদের টানে তাঁদের পক্ষেও উপকারী এই বিশেষ সংখ্যাটি— কেননা. এর পাতায় পাতায় বিধৃত রয়েছে এমন এক তেজী পুরুষের পরিচয় যিনি শিল্পের গভীরে যাত্রা করেছিলেন, নিজের সত্তায় বীরের ক্ষতচিহ্ন ধারণ ক'রে উঠে গেছেন সিদ্ধির সুউচ্চ পাহাড়ে— যে পাহাড় বারংবার তাঁর ফিল্মে এসেছে প্রতীক হিসেবে, মীথের শক্তিশালী অংশ হিসেবে।

ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক তাঁর স্বামীর জীবনালেখ্য রচনা করেছেন খোলামেলা ভাবে. কোনো লুকোচুরি প্রশ্রয় পায়নি কোথাও। তাই তিনি যখন লেখেন, "ধীর ও স্থিরভাবে সমস্ত করেছি। ... ঋত্বিক ঘটক আমার জীবনে একটা সত্য। সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম এ কখনো করে না বঞ্চনা ! এ আমার জীবনের মন্ত্র।"— তখন তিনি অনেক কিছুই ব্যক্ত করেন. ঋত্বিকের মতোই ঝলসে ওঠে এক জীবনেতিহাস। আরো অনেকের স্মৃতিকথায় জীবন্ত হয়ে উঠেছেন ঋত্বিক ঘটক, কিন্তু সব চেয়ে বেশি তাঁর নিজের যুক্তি তক্কো আর গপ্পো যা জ্বলজ্বল করছে, তাঁর নানা রচনায় আর সাক্ষাৎকারে।

গুরুদাস ভট্টাচার্যের 'গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা ব'লে আমি মনে করি। বিশ্লেষণধর্মী এই নিবন্ধটি ঋত্বিক ঘটকের ফিল্ম বোঝার পক্ষে সহায়ক। একজন সৃজনশীল পরিচালক কী তাৎপর্যপূর্ণভাবে মীথ প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিভিন্ন ফিল্মে, তা' প্রবন্ধকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকদের কাছে। সত্যজিৎ রায়ের নাতিদীর্ঘ ভাষণটি অত্যন্ত আন্তরিক এবং একজন সহযাত্রীর মূল্যায়নে যত্নশীল।

বাংলাদেশের একজন লেখকের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'চিত্রবীক্ষণ'-এর ঋত্বিক সংখ্যায়। মাহবুব আলমের রাগী লেখাটি কিছু তিক্ত স্মৃতি জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে। মনে পড়ে, একজন আহত, অভিমানবিদ্ধ শিল্পীর কথা— যিনি বাংলাদেশের সেই ফিল্মটি নির্মাণ করতে এসেছিলেন যা, তাঁর মতে, অন্য কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। এটা কোনো দম্ভোক্তি নয়, 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর মতো ফিল্ম, তার কোনো কোনো ত্রুটি সত্ত্বেও, নির্মাণের জন্যে চাই ঋত্বিক ঘটকের মতো অভিজ্ঞ, গ্রাম-বাংলায় লালিত এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম রূপদক্ষ এক ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের আরো দু'-চারজন লেখকের প্রবন্ধ থাকলে সংখ্যাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো ব'লে মনে করি। এ-কথা ভুললে চলবে না, ঋত্বিক ঘটক তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ ছবি নির্মাণের জন্যে বেশ কিছুদিন বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সেসময় কারো কারো সঙ্গে তাঁর কিছু মানসিক সংযোগ হয়েছিলো। সেসব কথা লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার।

ঋত্বিক : অন্তিম দর্শন

পল্লব ভট্টাচার্য

সেই দুধে ভাতের বেলাতে দিন কাটিয়েছেন পদ্মার তীর ধরে বেড়িয়ে। প্রকৃতির নিকটতম হোয়েছিলেন ধীরে ধীরে। 'খালাসীর বাঁও মেলেনা আর্তনাদ', মাতাল নদীর উচ্ছ্বল আদরে হোয়েছিলেন বিহ্বল। সারেঙ্গের ঘণ্টি সুর তুলেছিল মনে—জল মাখানো নদীর হাওয়ায় হোয়েছিলেন প্রশান্ত— বড্ড প্রীতিময় ঋত্বিকের সেই কৈশোর—শৈশব! হতাশাগ্রস্ত ঋত্বিক, বেদনার্ত ঋত্বিক—'আমি যে ছবি তুলি। যাহা দেখিয়াছি তাহা দেখাইতে পারিতেছিনা।' এই বঙ্গের ঋত্বিক ওই বঙ্গের লোনা জলে মাথা ঠুকে বেড়িয়েছেন। পুকুরের মৃগেল লোনাজলের রুপচাদা হবার বাসনাকে এড়িয়ে চলেছিলেন কিন্তু কাছে পেলেন না সেই জীবনকে, যে জীবন 'দুঃখ নহে। বীরত্ব'। ফিরে পেলেন না সেই জীবনপ্রণালী, যে জীবন প্রণালী 'মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ।' এই প্রবাহ 'আর নাই যদি থাকিত।' কিন্তু রইলোনা। দুই বঙ্গের ঘোলা জলে ঋত্বিক কেবল ছটফটিয়েই রইলেন—অতীতের ন্যূনতম সংস্পর্শগুলোও বিচ্ছিন্ন হোয়ে রইলো চিরকালের জন্যে—'আমার অতীত আমাকে কে আনিয়া দিবে।' এই আর্তি ঋত্বিককে মানসিকভাবে দুর্বল রেখেছিলো। 'অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত কাজ কাজই নহে।'

কৈশোরে ঋত্বিক হোলেন বিবাগী—সম্ভবত পারিবারিক প্রভাব (জ্যেঠামশাই সন্ন্যাসী হোয়েছিলেন)। বিবাগী জীবনে অভ্যস্ত হবার আগেই আবার গৃহবন্দী হোলেন—প্রশান্ত কৈশোরে রাজশাহীর পাবলিক লাইব্রেরীতে শুরু নতুন জীবনের পদচারণা। পড়াশুনার ফাঁকে মানসিকভাবে জড়িয়ে গেলেন মার্কসবাদী রাজনীতিতে—তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশের অস্থির রাজনীতিতে ঋত্বিক প্রভাবিত হোলেন, তারই সঙ্গে শুরু হোল সাহিত্যের-কবিতার শিল্পচর্চা, গল্প প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে পরিণত হলো—টগবগে যৌবনের অধিকারী ঋত্বিক র‍্যাডিকেলিজম-এ আক্রান্ত হোলেন— চাই কি এক্ষুণিই পরিবর্তন প্রয়োজন। আবার সরে পড়লেন অস্থির জীবনে—দুরন্ত শৈশব এবং অস্থির যৌবনের মাঝে প্রশান্ত কৈশোর কেবল স্বল্প কালের মতো লাগাম হাতে রাখতে পেরেছিলো।

পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি নিয়ে এলেন নাটকে—গণনাট্য সংঘ—কিন্তু, ঋত্বিকের প্রয়োজন তাৎক্ষণিক যোগাযোগ—যাদের নিয়ে শিল্প তাদের আরো কাছে এগুনো প্রয়োজন। শৈশবের ঘরোয়া স্মৃতি ঋত্বিকের স্নায়ুতে কম্পন জাগালো। 'একটি ভাষা যাহা কম বলিবে। যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার allusion-এর ভার নাই, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়— কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি আর যে চিত্রকল্প তাহারা Archetypal। যে ভাষা সমস্ত mood কে একটি patriarchal ভঙ্গিতে ধরাইয়া দিবে। আপাত শুষ্ক, ভিতরে, মালদহের কালাচাঁদ ভোগ আমটি একেবারে টইটুম্বর। তেমন ভাষাটি কিন্তু

আছে। কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছিনা, কি সব আজে বাজে করিতেছি। বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপ পারিবে না এ যুগে। আমরা পারিব যদি খুঁজি'। চলে এলেন চলচ্চিত্রে—তাঁর চর্চিত সর্বশেষ শিল্প। কিন্তু মন পড়ে রইলো শৈশব স্মৃতিতে মনোহরী রূপকথায়—"কিন্তু আমি ছোট বেলার সেই রূপকথা চোখে দেখিতে পাইতেছিনা। সেটি হারাইয়াছি। যেটি না থাকিলে তো বাস্তব হইতে নতুন রূপকথা তৈরি করিতে পারা আমার সাধ্য নাই। এখন যুক্তি হইবে, ট্রাজেডী হইবে, বয়প্রাপ্তদের খণ্ডাংশ শিল্প হইবে, সৃষ্টি কর্মের গোড়ার ধাপে কাজ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের খোরাক যাহার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে সে কি করিবে ? আমি বলিতেছি দেশ ভাগের কথা।" তবুও ভাবলেন যোগ তো আছে। "ছোঁয়া আছে, গল্প আছে, টুকরা টুকরা ছবি আছে। তাহার অনেকটাই হয়তো ভুল, আমার মন গড়া। কিন্তু মন গড়িয়াই তো আমার শিল্প।" সঙ্গে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরীয় রচনা প্রীতি, আব্রাহাম লিঙ্কনের আদর্শবাদিতা, বাইবেলীয় সাহিত্যের ধ্যান-স্থিরতা, উপনিষদের মন্ত্র-দর্শন, ফ্ল্যাহার্টি, রাইট ও আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র শিল্প মন্ত্রণা। পরে সেই দুরন্ত ঋত্বিক টানা সাত বছর দূরে সরে রইলেন শিল্পচর্চা থেকে, মাঝে সময় গড়ালো পাগলা গারদে—এর আগে থেকেই ক্ষয়ী সুধায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখলেন নিজেকে। পথ পরিভ্রমণ কোরলেন অনেক টুকুই—কিন্তু সুস্থির হোলেন না কোথাও। দেশজ ঐতিহ্যের গোড়া থেকে শুরু কোরে সাম্প্রতিক শতাব্দির প্রলেতারিয়েত বিপ্লবকে নখদর্পণে এনে বিশ্বের কুটিলা চরিত্রের কাছে পরাজিত হোয়ে ফিরে গেলেন অনেক দূরে নিজস্ব আবাসে—যেখানে অস্থির জীবন হয়তো ঋত্বিককে আর স্পর্শ কোরবে না।

'নাগরিক' থেকে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এসে পৌছুলেন 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-তে। শুরু কিন্তু 'বেদেনী' থেকে, এই শুরু কখনোই শেষ হোলনা কিন্তু শেষটিতে নিজেকে অনন্তের পথেই এগিয়ে নিয়ে গেলেন। অন্তে ঋত্বিক দিশে হারা 'I am confused।'

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-এর প্রেক্ষাপট ১৯৭১। ঋত্বিক তিয়াত্তুরে বলেছিলেন এটি 'একটি completely political film, পচাত্তুরে বলেছিলেন ফিল্মের সঙ্গে পলিটিক্সের সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয়, যদিও as a social being I may have some feelings, some ideas—যা আছে ছবিতেই (য-ত-গ) আছে, এটা আমি কোন মতামত দিতে চাইনা। সততই রাজনীতি চাপিয়ে দেয়া যায় না যদিও এ দিয়ে বিভ্রান্ত করা যায় সরল ক্রিয়েচারদের'।

সবচাইতে মজার কথা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র প্রথমার্ধ প্রায় তাঁর নিজের জীবনের ঘটনা এমনকি খুঁটিনাটি ব্যাপার কিছুও যেমন স্ত্রী রেকর্ড, বই ইত্যাদি নিয়ে চলে গেলেন। উত্তর পুরুষের জন্যে শ্রীমতি ঘটক বা শ্রীমতি বাগচী বা ঋত্বিক এমন কিছুই তুলে রাখলেন না যা মূলত বাগচীকে বা ঋত্বিককে স্মরণে রাখারই উপকরণ। শুধু থাকলো ছাদে ঝোলানো পাখাটা, যে জড় পদার্থ বাগচী বা ঋত্বিকের হোয়ে কোনও কথাই কইবেনা— পরের অর্ধে ঋত্বিক নন নীলকণ্ঠ বাগচীই বাংলার মাটির ঘ্রাণ শুঁকলেন।

বঙ্গবালার আগমন একটু ভিন্নভাবে হোলেও তাঁর জীবনের ঘটনা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেলো বঙ্গবালারা (১৯৭১-এর রিফিউজীরা) কি এইভাবে নীলকণ্ঠ বাগচীদের আশ্রয়ে এসেছিলেন—নাকি সুযোগ মিলেছিলো ওদের। পরক্ষণেই যে বাংলায় নীলকণ্ঠ বাগচী পরিভ্রমণ করেন সেই বাংলায় হায়েনারা কি কখনো মুখের গ্রাস ছেড়ে দেয় ?

চমৎকার লাগে বঙ্গবালার প্রতি বাগচী, পণ্ডিত, জ্ঞানেশ এমনকি শ্রীমতি বাগচীরও পক্ষপাতিত্ব—কেবল বাগচীর গুণমুগ্ধ ভক্ত ছাড়া বঙ্গবালা পূর্বদের এবং ভক্ত পশ্চিম বঙ্গের প্রতিভূ ঋত্বিক দুই বঙ্গকে কাছাকাছি এনে বুঝতে চেয়েছিলেন পরস্পরের কাছাকাছি কতটুকু হওয়া যায়।

গভীরে দুই প্রতিভূর মিলানাকাঙ্ক্ষা কিন্তু পূর্ণ হোল না। কোলকাতার অসিত পাল (আনন্দমেলা, প্রথম আর শেষ ছবি, ১০।১২।৭৭) দৃশ্যটিকে ভুল বুঝেছেন— 'শালবনের যুদ্ধের সময় বঙ্গবাসীর(?) প্রেমের দৃশ্য, হঠাৎই আরোপিত, মনে হয় যেন চরিত্রের সমাপ্তি ঘটানো'— অসিত পাল বুঝলেন না এ বঙ্গবাসীর প্রেম নয়, বহু অর্থের দ্যোতনায় ভাস্বর এ দৃশ্য—একদিকে দুই বঙ্গের মিলনাকুতি, অপর দিকে পরিবেশিক অস্থিরতা, ডায়াল্যাকটিকেল-অর্থে বিরূপ পরিস্থিতি এবং মানসিক দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মিলনের মুহূর্ত উপস্থিত হবার ক্ষণেই রাজনৈতিক ভ্রান্তি সবকিছু মিসমার কোরে দিলো, এই তো দৃশ্যটির ব্যঞ্জনা, আমার ধারণায় অর্থহীন সংগ্রামের কারণে (you are misleaded) সেতু বন্ধনটিই (বাগচী স্বয়ং) গেল ভেঙে (বাগচীর মৃত্যু)। অন্তে সম্ভবত ঋত্বিক বাস্তবকেই মেনে নিতে চাইলেন।

শুরুতে বললেন The universe is burning আমরাও সবাই পুড়ছি— ধূ ধূ প্রান্তরে, মাঝে ছাপড়ার নীচে এক বৃদ্ধ ধুঁকছেন—যেন অনন্তকাল ধরে মানবতা বিলীনতার মুখোমুখি হোয়ে বসে আছে—আমার মনে হোচ্ছিলো, এ অপেক্ষা চূড়ান্ত সমাপ্তিতে ঋত্বিক আত্মহননের কারণে যে মৃত্যুকে বেছে নিলেন এ তারই প্রাক্-ইঙ্গিত—কেননা সুবিধভোগীরা নেচে-কুঁদে খায়—অভাগারা হা কোরে বসে থাকে, সংগ্রামবিমুখ এই অপেক্ষা তো ঋত্বিকের নয়—যদিও বাগচীর হোতে পারে (ঋত্বিক স্বয়ং অবশ্য তাই বলেছেন)। এ তো মৃত্যুর অপেক্ষায় যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার প্রতিচ্ছবি।

ঋত্বিকের গল্প সম্পূর্ণভাবে স্বীকারোক্তি— যে পথে এগুতে চেয়েছিলেন ঋত্বিক ভালো মন্দ না বুঝে, সেই পথে তাঁর কিছুই করা হোল না—এইতো বললেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের উলটপালটের সঙ্গে এক কোরে নিতে চেয়েছিলেন উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের coincidenceকে— উপলব্ধি করেছিলেন সুযোগ ছিল—কিন্তু অপারগতাও বলে নিলেন, 'এখন যখন সময় এসেছে তখন সে (বাগচী) lost in the fumes of alcohol, সম্ভবত হিসেবেই ভুল হয়ে গেলো ঋত্বিকের— এ হিসেব শেষ পর্যন্ত যে মেলাতে পারবেন না তাই তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন নিজেকে (বাগচী) পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে।

আগাগোড়াই রোমান্টিসিজমে ভুগছেন বাগচী— এ রোমান্টিসিজম বিপ্লবের নয় এসকেপিজমের—এককভাবে ডমিনেটিং হোয়ে জীবনের যা কিছু ভালোমন্দ দেখেছেন শুধু নিজেদের দৃষ্টিতে—মৃত্যু মুহূর্তে—'আমার কিছু কোরতে হবে, something is to be done for your mere existence' ইত্যাদি বলে নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন অক্ষমতা থেকে। পাথুরে শিলায় ভরা জীবনের শেষ দৃশ্যেও ক্ষণিকের জন্যেও মন্দাকিনীকে বইতে দেখেননি। আত্মকেন্দ্রিক ঋত্বিকের (বাগচী) জন্যে এইতো স্বাভাবিক।

প্রারম্ভ থেকেই বাগচী (ঋত্বিক) নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন দূরে, অনেক দূরে— নির্দেশহীন পথ পরিক্রমায় (পত্নীর কাছে যাওয়াটা একটা নিমিত্ত মাত্র) অজানা কোন আশ্রয়ে নিজেকে সরিয়ে নেয়ার পথ খুঁজছিলেন—হননের বিপরীতে কোন চূড়ান্ত পথ নেই তা তাঁর জানাই ছিল— তাইতো আত্মহননকেই তাঁর সীমানা চিহ্নিত কোরে দিলেন।

একটি মানুষ আর কতই বা পীড়িত হোতে পারেন— মাতৃগর্ভে তাঁর আশ্রয় সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

সহায়কপঞ্জি :

১. ঋত্বিক —সুরমা ঘটক
২. চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু— ঋত্বিক ঘটক
৩. ধ্রুপদী— চতুর্থ সংকলন ১৯৭৭
৪. চিত্রবীক্ষণ— ক) ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা ১৯৭৩
খ) ১০ম বর্ষ—১০ম-১২শ সংখ্যা ১৯৭৭
৫. চিত্রভাষ—১২শ বর্ষ শরৎ সংখ্যা ১৯৭৭
৬. চিত্রপট—১০ম সংখ্যা
৭. আনন্দমেলা—১০/১২/'৭৭ সংখ্যা

Ritwik Ghatak : A View From Bangladesh

Film Critic

Between 1951 and 1974 India's Ritwik Ghatak completed and released only eight full-length feature films. Yet with his first released film *Ajantrik* (1958) he had a niche curved out for himself in the history of the Indian cinema. Satyajit Ray, then already an internationally known film-maker of great expectation, had hailed Mr.Ghatak's emergence as "the appearance of a film-maker of extraordinary ability and originality," In his action, success, frustration and inaction Ritwik always appeared to command attention from both his admirers and critics mainly because his films generally depicted a kind of brutal realism that few of India's film-makers had previously dared to handle on screen. Impact of his themes had been so overwhelming that not many had time take note of his equally brutal slaughter of naturalism in treatment and in handling of actors in almost all his films.

Despite the widespread admiration that he commanded for so many years formal or official recognition of his works had been virtually insignificant. His uncompromising and vociferous condemnation of the powerful coterie of the establishment and the film moguls, and his fairly open identification with the Marxist political movement contributed toward his almost total non-exposure to the international film scene. Despite its sacrifice of naturalism *Ajantrik* certainly contained flashes of dynamic cinema. Yet it was refused a showing at 1957 Venice film festival by a veto at selection stage— there was none from the Indian side to plead its case persuasively enough. In later years also Ritwik Ghatak remained virtually unknown outside India.

Only a minute section of the intelligentsia in pre-liberation Bangladesh had heard of the emergence of Ritwik Ghatak through

Calcutta magazines and journals that used to find their way into this country by clandestine means. Later, the cine lovers had the opportunity of seeing probably one of his most satisfying films *Meghe Dhaka Tara* (1960) which was released here with considerable commercial success. In the wake of Indo-Pakistan war of 1965 all Indian films were banned and import of Indian films was stopped. So Ritwik was gradually receding into the alleyways of memory until the upheaval of 1971 Liberation War came, when the gate to Calcutta was thrown open. But Ritwik Ghatak had, by then, stopped making feature films since the completion of *Subernarekha* in 1962.

His watusi-tall handsome figure had already taken heavy toll from frustration and firmly-rooted alcoholism (ironically, it was this Ritwik Ghatak who had once led a crusade against drinking in Calcutta studios to the much dislike of movie tycoons of the period.). Nobody anymore seriously believed that he was in full control of his faculties to be able to direct and complete a full length feature film. However, a Bangladeshi financier[1] was keen enough to make his own spectacular debut as a producer by footing the entire bill for a full-length feature film if it is directed by Ritwik Ghatak. Some of Ghatak's admirers who never wanted to believe that their hero was a 'washout' were reluctant to miss the chance and managed to find the right material. *Titas Ekti Nadir Nam* — an epic novel and a classic on the tragedy-stricken lives of a fishing community living in the valley of the Titas river of Bangladesh, had long been a dear subject to huminist Ritwik Ghatak who himself nursed a nostalgia for his birthplace i.e. East Bengal which he had left with the 1947 partition of India, a historical fact that he never could accept as a permanent reality. He, however, openly despised the tribe of people called film producers. For him they constituted a group a greedy degenerates who ruthlessly exploit creative artistes only to satisfy their lust for profit and fame. As he confided later, he was physically unfit to do justice

1. Habibur Rahman Khan : Freedom Fighter and Businessman.

to *Titas* a material that warranted complete realism and such locational filming that would have required super-human endurance on the part of the crew, particularly the director.

As the proposal offered him a chance to be in Bangladesh, a land that he could never forget since 1947, and as he cared little for the producer's financial risks he seized at it. "I'd have grabbed the offer even if the producer was a Hotentot or a Zulu", he sneered in an interview published later in a Calcutta journal. Even though the young and inexperienced producer provided him with lavish technical and productional facilities Ritwik Ghatak had failed to recapture the pulse of the soil he had left behind more than two decades ago. His reminiscenses of the 'revisit' suggest that he had committed a blunder by accepting the offer as the land was no longer the land he knew—a lot had changed.

"Despite the superior quality of filming equipment and beautiful landscape in Bangladesh I had to experience difficulty...a kind of difficulty that handcaps a film, any film. I had tried to make a film with such a them in such a country which, on reflection I consider to be an act of suicide. Only, a lunatic or an ass would try to make a film like that in that country and I was both— a lunatic and an ass", he fumed in his interview.

That indeed was a devastating comment from a film director from the viewpoint of his host. Ritwik Ghatak's arrival in Dacca had been publicised in Bangladesh with great pride. Actors, actresses, technicians fell head-over-heel to be on his bandwagon irrespective of the significance of the role he might have had to offer. Apart from ever-ready studio equipment, the then chief of the Department of Films of Bangladesh Government reportedly unpacked a new Arriflex camera and handed it over to him violating official regulation for no other reason but to help great Ritwik Ghatak make what was hoped to be the greatest film of his life with Bangladeshi cooperation. And the flow of money would have made any sub-continental director bite their arms with envy. Never before in the history

of serious film-making in this sub-continent lavish finance and facility had arrived with such smoothness.

Against this background Mr. Ghatak's statements sound like an inexplicable paradox. "This film business is almost entirely populated with sons of swines. Only if their backsides could be flogged crimson with whale-skin whips then some good could perhaps come out," he said. But what was wrong with the country ? We'll never know. Belying the scepticism of the cynics (who knew that Mr. Ghatak had left at least 4 full-length feature films incomplete at various stages of production) *Titas* was completed in 1973 and released in Bangladesh. Despite the unqualified elations expressed through various newspapers of Bangladesh (one called it a "masterpiece") the film hardly carried the signature of the director of such towering productional accoplishments as *Ajantrik* and *Meghe Dhaka Tara.* There were two important reasons : (a) Ritwik Ghatak's disillusionment with newly liberated Bangladesh ("...I still can't understand or feel the political meaning of Bangladesh. Even now I understand the word Bangladesh only in its social and cultural sense.") disturbed his concentration, and (b) he was no longer physically fit to make the best of his highly personal and extremely improvised technique of film-making that carried little on paper, leaving everybody else in the unit in complete darkness about his thoughts.

His illness had almost stopped him from completing *Titas.* During the scoring of background music with Ustad Bahadur Hussain Khan he was admitted in hospital which discovered that his lungs were shot with tuberculosis, along with other deadly diseases. He was helicopter-lifted to Calcutta but like so many similar emergencies in the past this time also he had pulled a fast one on the Scythe-carrier. He returned to Dacca and rather hurriedly completed *Titas* which, barring a few scenes, gave the look of an unfinished and badly cut film. This time, in sharp contrast to his earlier *Meghe Dhaka Tara,* Dacca audiences reacted violently to the disjointed "masterpiece" and most prints had to be taken off circulation by the end of the first

week.

Despite general admiration for the talent of Ritwik Ghatak some found it difficult to endure such a collossal wastage all because of his stubborn refusal to accept his physical inability and to feel that even he had no right to let so much opportunity for fruitful creation go waste. Commercial failure of *Titas* brought long-term repercussions on the off-beat film-makers of Bangladesh. Many still believe that success of the film would have played a vital role in ushering in a virile trend of purposive cinema in this part of the world. However, his stubborn supporters reacted violently to the criticism and went all out to prove that "Titas" was, after all, a "masterpiece" much to the detriment of not only good cinema but also of Mr. Ghatak himself. Anyway, despite such deviationist acts Ritwik Ghatak once again returned to the editing table and trimmed off about 2000 feet from the "masterpiece". But the film still remained short of the target. Because of the film's commercial debacle he could not shoot some essential link shots as his producer had closed the till.

One could not rule out the possibility that easily excitable Ritwik Ghatak's latter day grumblings against Bangladesh could have stemmed from the sharp tone of the criticism he faced here. It must have been a bewildering surprise for a virulent, violent, arrogant critic such as he had often been to find himself at the receiving end for a change. Perhaps the shock did him some good. He went about his last feature film *Jukti Takko Goppo* with vengeance as if to prove to himself, and others, that he was not quite "finished" yet. The film, although yet to be released commercially had several private showings before his death and general consensus suggest determined "comeback".



RITWIK GHATAK
Holding Best Director's Award
From Bangladesh Cine Journalists Association
For His Controversial
TITAS EKTI NADIR NAM

ঋত্বিক-চলচ্চিত্রে শিশুর ভূমিকা

আনোয়ার হোসেন পিন্টু

অবশেষে পলাতক কাঞ্চন বিকলাঙ্গ নগর সভ্যতার মৃত্যু-কূপ পেরিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। ঋত্বিক তাঁর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে কাঞ্চনের এই 'পেরিয়ে' আসার বিভিন্ন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখালেন—নগরের নিরন্ন মানুষ কুকুরের সামিল এবং বেঁচে থাকার প্রশ্নে সং-সজ্জায় মানুষের নিজ সত্তা বিলুপ্ত। যা নিঃসন্দেহে একটি গভীর জীবন-আলেখ্য। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর শিশুতোষ কাহিনীর ছায়াপাতে ছবির আলেখ্যটি বিধৃত হলেও এর যে সুদূরপ্রসারী ব্যাপ্তি তা সবটুকুই ঋত্বিকের। দুঃখের কথা, সত্যসন্ধানী এই মানবিক চিত্র সম্পর্কে সমালোচকের নীরব ভূমিকার পেছনে যে কারণটি সক্রিয় ছিল তা সম্ভবত ঐ শিশুতোষ কাহিনীর ভিত্তিতেই গড়া। অর্থাৎ শিশু সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ তথা 'শিশু-চলচ্চিত্র' বিষয়টি তাঁদের কাছে সার্থক চলচ্চিত্র শিল্পের বহির্ভূত ব্যাপার। একইভাবে উপেন্দ্র কিশোরের .ভৌতিক ও রঙ্গ-ব্যঙ্গ সুলভ গল্প নির্বাচনের কারণে রায়ের অনবদ্য ফ্যান্টাসি ধর্মী ছবি 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর সাফল্যও তাঁদের কাছে শিশুসুলভ ব্যাপার বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু রঙ্গ-ব্যঙ্গের পরতে পরতে শোষক-শাসকের ভয়ার্তরূপ, শোষিত মানুষের আত্ম আকুতি, যুদ্ধ-বিপক্ষ বাণী, সর্বোপরি ছবির গভীব সৌকর্যকে অস্বীকার করি কোন্ যুক্তিতে ? এখানে যে রঙ্গ-ব্যঙ্গের আয়োজন তা মূলত ফ্যান্টাসি শিল্পের সূত্রেই সৃষ্টি; যার সৃষ্ট রসানুভূতি সার্বজনীন।

শিল্প সমালোচনাই শিল্পের বিচারালয়। এখানে শিল্পকর্মের বিবিধ বিষয়ে প্রতিনিয়ত যুক্তি-তর্কের যে ঘাত প্রতিঘাত দৃশ্যমান, তার কোন মতাদর্শেই শিল্পকর্মের বিষয় তালিকা বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি নির্বাচিত বিষয় শিশুতোষ হ'লে সেই শিল্পকর্মের মূল্য যে গৌণতার পথে বাঁধা তার স্বপক্ষেও কোন যুক্তি নেই।

আমরা জানি শিল্পী সমাজেরই এক অনন্য মানুষ। এবং তাঁর চিত্ত উদ্যানে সমাজের তাৎপর্য, যুগের যাতনা একজন সাধারণ মানুষের বিচারে অনেক বেশি সক্রিয়। আর এই সক্রিয়রূপের সত্য-সৌন্দর্য প্রকাশই তো শিল্প। এমনকি শিল্পাঙ্গিকের অমোঘ-শৈলী ফ্যান্টাসি বা কৌতুক নক্‌শার যে অবতারণা তাতেও দেখি জীবন গভীরতার অপূর্ব আর্তি। আর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে কাঞ্চনের দৃষ্টি-গভীরতার তাৎপর্য যে কিছুতেই অস্বীকার করার নয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছবির আদি এবং অন্তিম মুহূর্ত।

ছবির শুরু শিশু বয়স-সন্ধিক্ষণের এক গভীর মনস্তত্ত্ব বন্ধনে। গ্রামের বাড়িতে পাঠরত কাঞ্চন, তবে তার মনোনিবেশ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে নয়; বাবার দৃষ্টিতে যা নিষিদ্ধ মূলত সেসব গ্রন্থ-কাহিনীতেই তার আকর্ষণ। এল ডোরাডোর অভিযান মূলক গল্পপাঠকে

কেন্দ্র করে কাঞ্চনের শিহরিত ও পুলকিত রূপকে ঋত্বিক আশ্চর্য শিল্প-সুষমায় ভরিয়ে তুলেছেন। এবং শিশুর চিত্ত গঠনে গ্রন্থ্ পাঠের উদ্দীপন শক্তি যে কতখানি জোরালো ঋত্বিক তার প্রকাশ ঘটান কাঞ্চনের কৌতূহলী চেতনা, যোদ্ধার নির্ভীকতা, স্বপ্নবিলাস মন প্রভৃতির কারুকাজে, যা কাঞ্চনকে ক্রমশ ঘরছাড়া করে তোলে। অবশ্য কাঞ্চনের বাড়ি থেকে পালানোর পেছনে কেবল তার অভিযান প্রবৃত্তিকেই দায়ী করা হলে অন্যায় হবে, কেননা বাবার কড়া শাসনের অত্যাচার কাঞ্চনকে এত বেশি অতিষ্ঠ করে তুলেছিল যার প্রতিবাদ স্বরূপ নিজের পৈতে ছিঁড়তেও সে এতটুকু দ্বিধা করেনি। ঋত্বিক যেন আমাদের বলতে চান কড়া শাসন নয় স্নেহই শিশু লালনে মোক্ষম অস্ত্র। তারপর কাঞ্চনের ট্রেনযোগে কোলকাতা আগমনের মধ্য দিয়ে ছবির দ্বিতীয় পর্ব তথা নগর যন্ত্রণার চিত্রটি কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথচ বিষাদময় ঘটনার সমাবেশে ঋত্বিক সরল শিশুমনে যে করুণ রাগিণীর অনুরণন জাগায় তা ভারী চিত্তাকর্ষক। একে একে মিছিল সহকারে হরিদাস, ঠেলাওয়ালা, পরিচারিকা মা, বোবা সাজা ছেলে এবং বেদনাক্লিষ্ট বিভিন্ন মানুষ কাঞ্চনের কাছে ভিড় করে দাঁড়ায়। কাঞ্চন দেখে তাদের হতাশা, দেখে জীর্ণ শীর্ণ দেহের আঙিনায় শ্বাস প্রশ্বাসকে জীবিত রাখার কাজে মানুষের মরণাপন্ন শ্রম। যেখানে এক তরতাজা প্রাণ হরিদাস ভাজাওয়ালা বাড়তি বিক্রির আশায় নকল দাড়ির আশ্রয়ে নিজেকে বৃদ্ধ সাজে সাজিয়ে রাখে। এই 'হরিদাস' ঋত্বিকের নিজস্ব সৃষ্টি ; মূল গল্পে যার কোন পরিচয় নেই। প্রকৃতার্থে শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' গল্পটিতে ঋত্বিক তাঁর সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণ-পটুতার মাধ্যমে যে দুঃসহ জীবনের কথা বলেন তা ঔপন্যাসিকের বিচারে আরো প্রাঞ্জল। পলাতক কাঞ্চনের বাড়ি ফিরে আসা, একই বিষয় কেন্দ্র করে গল্প/চিত্রের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তাৎপর্যের দিক থেকে দু'য়ের মাঝে দুস্তর ব্যবধান।

গল্পে পাই কাঞ্চন বাড়ি ফিরে আসে এক উদাত্ত ভাব নিয়ে যার হাতে লটারি প্রাপ্ত টাকা, কেনা সাইকেল, সোনার হাতঘড়ি এমনকি মা'র জন্য কোলকাতার বিখ্যাত সন্দেশ আনতে পর্যন্ত তার ভুল হয় না। অর্থাৎ একটি মিষ্টি মধুর পরিবেশে গল্পের পরিসমাপ্তি। শিবরাম বাবুর ভাষায়— "একটা কথা শুনবে। তোমার পায়ে পড়ি মা ! বলে কাঞ্চন সুটকেস খুলে শাড়ি, জ্যাকেট ইত্যাদি বার করে বলল—ওই গুলো তোমায় পড়তে হবে মা।

—এখনই

—হ্যাঁ, এখনই আমি দেখবো।

ছেলের আবদার, কী আর করে, মাকে পড়তে হোল। কাঞ্চন বললো—বাঃ তোমাকে কি চমৎকার দেখাচ্ছে মা। সত্যি এইবার এই জিনিষটা মুখে মাখো দেখি, এটার নাম হিমানী—এক রকম স্নো। এবার তুমি কৌচটায় বসো। আমি তোমায় পূজো করবো, অঞ্জলী দেবো। ... কাঞ্চন নোটের তাড়া নিয়ে মা'র দিকে ছুঁড়ে দেয়— 'বৃষ্টির

মতো চারদিকে নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে। মা দুই চক্ষু বিস্ফোরিত করে চেয়ে থাকেন, তাঁর মুখ থেকে কথা বেরোয় না"। (বাড়ি থেকে পালিয়ে, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ১০৭)।

এর বিপরীতে ঋত্বিকের কাজে আমরা দেখি জীবন আর্তনাদের এক ভয়াবহ রূপ— যা 'হরিদাস' নামের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পী ঋত্বিকের অবিস্মরণীয় পরিচয়। হরিদাসের বৃদ্ধ সাজের মুখোশটি ছিল মূলত একটি প্রতীকী দ্যোতনা। যার আভাসে তিনি তুলে ধরেন পাষাণ নগরের সেই জীবন-ব্যবস্থা যেখানে মানব সভ্যতা বরাবরই মিথ্যার মুখোশে ঢাকা। পাষাণপুরীর নির্দয়রূপ কাঞ্চনের সরল মনে যেদিন দাগ আঁকে সে থেকে তার বাড়ি ফেরার ইচ্ছেটি ক্রমশ দানা বাঁধে। অবশ্য দানা বাঁধার মাঝে নির্দিষ্ট কোন ঘটনা বিশেষভাবে দায়বদ্ধ নয় ! অনেক অনেক নির্দয় ঘটনার সমন্বয়ে কাঞ্চনের নগর-স্বপ্ন একদিন নগর-যন্ত্রণায় পর্যবসিত হয়। ভোলা যায় না, বিয়ে বাড়ির উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কুকুর মানুষের কলহ। কাঞ্চন পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, ভাবে এবং এখান থেকে তার স্বপ্ন আর বাস্তব পথ ক্রমশ দু'পথে বাঁক নেয়। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে— 'এদিয়ে কি হবে ?' এক ভিখারীর মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই 'খায়গা'। কাঞ্চন বুঝতে চায় তবে কি দুঃখী নিবন্ন মানুষ এই শহরে ককুর ? এক গরীব ছাতুখাওয়া ঠেলাওয়ালা কাঞ্চনকে বোঝায় এ শহর লড়ায়ের শহর, 'তু বাড়ি চালিয়ে যা।' যে লড়াই এমন এক লড়াই যেখানে কাঞ্চনের সমবয়সী অনাথ ছেলেটি বোবা সেজে গুন্ডা সর্দারকে অর্থ জোগায়।

এবার কাঞ্চনের বাড়ি ফেরার পালা। গল্পের কাঞ্চন বাড়ি ফিরেছিল অর্থ-সম্পদ নিয়ে। আর ছবির কাঞ্চন ? না তেমন কিছু নয় ; অতি সাধারণ একখানা মুখোশ সম্বল করে তার বাড়ি ফেরা হয়। এই ক'দিনের সাহচর্যে হরিদাস নিজের মুখোশটি কাঞ্চনকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করেছিল। সাধারণ একটি রূপকে নগরায়নের মুল কথাটি ঋত্বিক আমাদের মাঝে তুলে ধরেন। মিথ্যার খোলসে ঢাকা নগর জীবনের এই 'মুখোশ' তথা অভিজ্ঞতার ধন সম্বল করে অবশেষে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে আসে। ছেঁড়া জামা আর রুগ্ন দেহে কাঞ্চন যখন বাবার কাছে স্বীকার করে— বাড়ির চেয়ে আর ভালো কিছু নেই— সেই মুহূর্তে এক গভীরতর মানবিক আবেশে আমরাও একাত্ম হয়ে পড়ি দৃশ্যটির সাথে।

ঋত্বিক তাঁর 'ছবি করা' প্রবন্ধের প্রারম্ভিক সূত্রে বলেছেন— 'আচ্ছা নিজের জমির উপব না দাঁড়িয়ে কিছু করা যায় কি ? কোন সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব ?' আর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' জুড়ে সে গভীরতা তা যেন ঋত্বিকের বালক বেলারই অতীত আর্তির কলতান। যার সত্যতা উপরোক্ত প্রবন্ধের মাঝপথে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— "আমার দিন কেটেছে পদ্মার ধারে ... একটা দু'দে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখেছি অন্য গ্রহের বাসিন্দে। মহাজনি হাজার দু'হাজার মণী ভাড়া করে পাটনা-বাঁকীপুর-মুঙ্গের থেকে মাল্লারা পার হয়ে যেত, এক ভাঙ্গা দেহাতী আর পদ্মাপারি

বাংলার টান মাখানো সুরে কথা বলে। জেলেদের দেখেছি, ইলশেগুঁড়ির গ্রাম বর্ষায় হঠাৎ বেজায় খুশী হয়ে যে সুরে টান মারে, মনমাতানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভেসে আসতো কেমন অস্পষ্ট মন কেমন করা পাগল সুরে, স্টীমারে শুয়ে রাত্রে দোলা খেয়েছি মাতাল নদীর দাপটে, আর শুনেছি ইঞ্জিনের ধস্ ধস্, সারেঙ্গের ঘন্টা, খালাসীর বাঁও না মেলা আর্তনাদ। পদ্মায় শরতে নৌকো নিয়ে পালাতে গিয়ে একবার তিনমাথা সমান উঁচু কাশবন হয়েছে কতলামারীর চরটার কাছে, ভারী সাপ থাকে ওখানে, ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারি না, নৌকো দুলিয়ে দুলিয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে সেই ডাকাত কাশের কেশরের সাদা রেণু উড়ে উড়ে দেহ মন আচ্ছন্ন করে নিঃশ্বাস প্রায় আটকে দিয়েছিল। কাশগুলো থেকে গিয়েছিল। 'সিন্ধুগৌরবে' রাজা জাহিরের পার্ট করার জন্য হায়ার (Hired) হয়ে গিয়ে ট্রেন ফেল করে সন্ধ্যেবেলা পৌঁছেছি অজ গাড়াগাঁয়ে। সামনের হাঙরবিল ডাক সাইটে ভূতের জায়গা, কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাত। সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলে লগী ঠেলেছি। দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জেগে আছে দ্বীপের মত গ্রাম। নীহার পড়ছে, কাঁপছি। শেষে বোঝা গেল বিলের আত্মারা ধরেছে আমাদের। দু'ঘন্টার পথ সারারাতেও কাবার করতে পারলাম না, ধাঁ ধাঁ লেগে গেছে, আমরাও গেছি বেপরোয়া হয়ে—শুয়ে পড়েছি সেই দিগন্তলীন বিলের বুকে।" (চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, পৃষ্ঠা. ৫৫)। ঋত্বিকের এই শৈশব-বেপরোয়া সুরে কাঞ্চনও অনেকখানি দীক্ষিত ছিল। এবং আমরা বলতে পারি ঋত্বিক চৌদ্দ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মাটি আর মানুষের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন তেমনটি নিয়েছে কাঞ্চনও। সমালোচক শ্রীমতি হৈমন্তী বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' প্রবন্ধে এই অভিজ্ঞতা বিষয়ে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা রেখেছেন—'ঋত্বিক ঘটক এই বক্তব্যকেই স্পষ্ট করেন যে দিনপঞ্জী অনুসারী বয়স সম্পূর্ণই নিরর্থক যদি তা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেড়ে না ওঠে, তা সে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যতই কষ্টকর বা অপ্রীতিকর হোক না কেন। সভ্যতার ইতিহাসে প্রগতি ও বয়স্কতা এই ভাবেই গড়ে উঠেছে— দুঃসাহস ও উত্তেজনাপ্রসূত সচেতনতা যেন কখনই এক চেতনালুপ্ত গ্রাম্যের কর্মবিমুখতা এবং আত্মতুষ্টির বলি না হয়।' (ঋত্বিক ও তাঁর ছবি, ১ম খণ্ড, রজত রায় সম্পাদিত, কলকাতা, সাম্প্রতিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা. ৫৯)।

এখানে ঋত্বিকের সার্বিক বক্তব্যটি গ্রথিত ছিল একটি কিশোরের বাঁধনে ! অর্থাৎ কাঞ্চনকে ভিত্তি করে ছবির যাবতীয় ইতিবৃত্তের পূর্ণ প্রকাশ। যেখানে কিশোরটি কোন বিষয় বিন্যাসের প্রতীক না হয়ে একটি উজ্জ্বল বাস্তবের মনিরূপে আমাদের কাছে স্পষ্ট। বলা যায়, তার চোখে চোখ রেখে নিঠুর শহরটাকে দেখে নেয়া। কিন্তু যে গভীরতা বোধে ঋত্বিক তাঁর ছবিতে শিশুকে টেনে আনেন, সে ছবি 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' নয়। বিস্মিত হই এই ভেবে, ঘটনা বৈচিত্র্যে পৃথক হয়েও তিনি শিশুর ব্যবহারকে কাজে লাগিয়েছেন একই চিন্তা আর একই ধ্যানে। জীবনের পলে পলে ধ্বংস, মৃত্যু, বিনাশ আর ক্লান্তির বিপরীতে ঋত্বিক শিশুর হাতে নবজন্মের পতাকা অর্পণ করে বলে ওঠেন— "জয় হোক মানুষের/ঐ নবজাতকের ঐ চিরজীবিতের"। যার প্রথম সুর ধ্বনিত হয় অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

'অযান্ত্রিক'-এ। শিল্পীর দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের চিন্তা— স্বপ্নের আন্দোলিত দর্শন অযান্ত্রিকের সর্বাঙ্গ জুড়ে খেলা করেছিল। ঋত্বিক ভেঙে পড়া একটি যন্ত্র এবং বিমল নামের সর্বহারা মানুষটির সম্পর্কের মাঝে জাগিয়ে তোলেন এক মানবিক তথা অযান্ত্রিক সম্পর্ক অর্থাৎ একটি কঠিন এবং আমাদের ধারণা বহির্ভূত বিষয়কে ঋত্বিক সেলুলয়েডের ভাষায় বিধৃত করেন। আমাদের সাধারণ ধারণা মতে—'যন্ত্র হল এক অমানবিক সৃষ্টি। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যন্ত্রের আপাতনৈকট্য আমাদের বারবার মনে করিয়েছে যেন যন্ত্রসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল আত্মিক নৈরাশ্য অথবা শূন্যতা। আমাদের অতীত জীবন ও বর্তমান জীবন-দর্শনের সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ প্রায় মৌল অন্তবিরোধের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি অবশ্য সমাজবিজ্ঞানী নই। তাই এই রহস্যের জট আমি খুলতে পারবো না। তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, বোধ হয় পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল বলেই আমাদের এই সার্বিক, অবৈজ্ঞানিক উদাসীনতা। পশ্চিমী জীবনের শূন্যতাবোধও অনেকখানি আমাদের মনোজগতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য. এই প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আমরা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যেব অন্বেষণ না করে বস্তুর বাহ্যিক প্রকাশগুলোকেই একমাত্র সত্য হিসেবে মনে করেছি। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই রক্ষণশীল মনোভাবের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে না। প্রযুক্তিবিদ্যার নবতম আবিষ্কারকে বাঁধতে হবে ঐতিহ্যের সঙ্গে। আর যন্ত্রের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্রের কথাও ভাবতে হবে। অযান্ত্রিক গল্পের কাঠামো, তার ঋজুতা, বর্ণনার প্রকাশভংগি আমাদের কাছে আশ্চর্য এক চেনা জগতের পরিচয় করিয়ে দেয়। যার প্রকাশভংগি একান্তভাবেই এই দেশের জলহাওয়ায় মিশ খেয়ে গেছে। আর শুধু মিশে যাওয়াই নয়, গল্পটি এক গভীর জীবন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' (চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু, ঋত্বিক ঘটক, সন্ধান সমবায় প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৩০)।

ঐ প্রচলিত জীবন ধারণার বুকে 'গভীর জীবন সত্যের' কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য না হলে এর অপমৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় যন্ত্র আর মানুষের ভালোবাসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিটেল-এ ঋত্বিক বিষয়টিকে অমরত্ব দানে সজীব করে তোলেন।

নিঃসঙ্গ বিমল জীবন-ধারণ ক'রে এক পুরনো মডেলের ট্যাক্সি চালিয়ে। এই জীবনধারণের পথে যন্ত্রটি তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে এমনই এক মানবিক আবেশে মূর্ত হয়ে ওঠে যেখানে গভীর মমতায় বিমল প্রিয়জনের মত যন্ত্রটিকে আদর শাসনে ভরিয়ে রাখে, কথা বলে। আর চারপাশের মানুষগুলি ভাবে বিমল বদ্ধ পাগল বৈ আর কিছু নয়! তাই বলে বিমলের মনে মানুষের সম্পর্কে এতটুকু ঘাটতি নেই। যন্ত্র প্রেমিক মানুষটি এখনো মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে। একদিন এক মহিলা যাত্রীর পরিচয় সূত্রে জানতে পারে মেয়েটি প্রেমিক পরিত্যক্তা। বিমল চায় তাকে ভালোবেসে বাঁচাতে। কিন্তু সেই অনুভূতি প্রকাশের ভাষা তার জানা নেই। পরে সাহায্য স্বরূপ মেয়েটিকে ট্রেনে

তুলে দিয়ে বিমল কিছুটা স্বস্তি পায়। অথচ জানা হয় না কে এই মেয়েটি, কি তার ঠিকানা? পরক্ষণেই ইচ্ছে চাপে সে ট্রেনটাকে অনুসরণ করবে। কিন্তু বিকলাঙ্গ জগদ্দল চলতে চায় না, বিমল রাগে গাড়িটাকে লাথি মারে। আর জগদ্দল কিছুদূর ছুটে গিয়ে এক সময় থেমে যায়। দুঃখে, অনুতাপে বিমল তার সঞ্চিত টাকায় জগদ্দলকে কিছুটা সারিয়ে তোলে। পুরনো এক লৌহ ব্যবসায়ী বলে, জগদ্দলের চলার শক্তি নিঃশেষিত। তার নিষ্ক্রিয় দেহ আজ মৃত। বিধ্বস্ত যন্ত্র প্রেমিক কারো কথায় কান রাখেন না। গাড়ির সমস্ত পার্টস বদল করে বিমল জগদ্দলকে চালাতে চায় এবং চলেও। লোক সমক্ষে জগদ্দলের দুর্দম শক্তি যাচাইয়ের কাজে রাজ্যের সমস্ত পাথরে তার দেহ ভরিয়ে দেয়। আর জগদ্দল শেষবারের মত ঝাঁকুনি খেয়ে মৃত্যু শয্যায় ঢলে পড়ে। এরপর ঘনিয়ে আসে সেই বিয়োগবিধুর দৃশ্য। আজ জগদ্দলকে নিয়ে যাবার দিন। ব্যর্থ বিমল সজল চোখে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। ধীরে ধীরে লৌহ ব্যবসায়ী মানুষগুলি প্রিয়তমার চূর্ণ বিচূর্ণ অংশ ঠেলাগাড়ি চেপে প্রেমিকের দৃষ্টিপথে হারিয়ে যায়। বিমলের আত্মকান্না আমাদের অন্তঃপটে অনুরণন জাগাবার প্রাগ-মুহূর্তে হঠাৎ তার মুখে ফুটে ওঠে এক নিষ্কলুষ হাসির রেখা : দেখি এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ভাঙ্গা হর্নটি খেলাচ্ছলে বার কয়েক বেজে ওঠে। বিমলের ভেঙে পড়া চিত্তে নতুন প্রাণের প্লাবন এনে ঋত্বিক এখানে ছবির ইতিরেখা টানেন।

একই বিষয় তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা'য় প্রত্যক্ষ হলেও এখানে শিল্পীর প্রতীকী শিশুটি কিছুটা ভিন্নাঙ্গিকে উপস্থিত। অর্থাৎ 'অযান্ত্রিক' চিত্রে শিশুর শারীরিক উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ধ্বংসের পথ ধরেই নব জীবনের উন্মেষ। আর 'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার বাঁচার আকুতি খুঁজে পাই ; দাদার সংলাপে একটি 'ছেলে' শব্দের উচ্চারণে—'গীতার ছেলেটির এমন প্রাণ।' তখন যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা নীতা দাদাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে ওঠে—'দাদা আমি বাঁচবো।' আমরা বুঝে উঠি শিশুটির জীবনাবেগে নীতা মৃত্যুকে অস্বীকার করতে চায়। (ঋত্বিকের কথায়—'এ তো মৃত্যু নয় জীবনেরই জয় ঘোষণা') এবং নীতা, গীতার শিশুর উচ্ছলতায় মৃত্যুকে অস্বীকার করার একটি হৃদয়দীর্ণ কারণও কাজ করে গেছে। যার সন্ধানে ছবির গল্পে আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

নিম্ন মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবারে আমাদের আলোচ্য 'নীতা' শ্রম নিষ্ঠার কলকাঠি হয়ে জরাজীর্ণ সংসারটিকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখে ; আর শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, বাবা মা দাদা এবং ছোট বোন গীতাকে জীবন উৎসবের রঙে রঞ্জিত করে তোলে। একই সাথে প্রণয়ী সনৎকে ঘিরে নীতার হাজার স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নের মাঝপথে সংসারের প্রতিকূল পরিবেশ প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মা, বাবা বোঝে নীতাকে হারালে তাদের শোচনীয় পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ স্বার্থের কঠিন জালে ঋত্বিকের নীতা যেন এক দিশেহারা পথিক আর সময়ের আবর্তে সনৎও ভুলতে বসে নীতাকে। যার পরিণতি ঘটে সনৎ-গীতার বিবাহ বন্ধনে! বেঁচে থাকার যে প্রেরণাটুকু নীতার কাছে এতদিন গচ্ছিত ছিল এই

অতর্কিত ঝোড়ো হাওয়ায় তার ক্ষীণতম দ্বীপশিখাও নিভে আসে প্রায়। মানসিক বিপর্যয় এবং ক্ষয় রোগের প্রবল স্রোত নীতাকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে চলে। নীতার স্বইচ্ছায় পাহাড় সংলগ্ন এক স্যানাটোরিয়ামে শংকর (দাদা) চিকিৎসার কাজে তাকে নিয়ে আসে। সময়ের চাকায় দিন গড়ায়। সনৎ -গীতার নবজাতক সন্তানের বার্তা নিয়ে শংকর ছুটে আসে নীতার কাছে ; কিন্তু তার আজ শেষ নিঃশ্বাসের দিন। এই শোচনীয় মুহূর্তে দাদার কথাটি ঘিরে ('গীতার ছেলেটির এমন প্রাণ') নীতার বুক চিরে বেরিয়ে আসে— 'আমি বাঁচবো দাদা'। এবার ঋত্বিকের ক্যামেরা পাহাড়ের দিকে এবং নীতার সেই বুক ফাটা আর্তনাদ পাহাড়ের গায়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনির সুরে আরো সোচ্চার হয়ে ওঠে, আর আমাদের জানিয়ে যায় এই অমোঘ কথাটি—এক শিশুর আগমন বাণীতে নীতা মৃত্যুকে অস্বীকার করেছিল ; যে শিশু আত্মার দিক থেকে তার, কিন্তু ঘটনার পাকে শারীরিকভাবে অন্যের তথা ছোট বোন গীতার।

বিশিষ্টতার বিচার্যে 'সুবর্ণরেখা'য় শিশুর উপস্থিতি সব থেকে প্রখর। কেননা বিনাশের বিপরীতে শিল্পী যে মোটিভের মাধ্যমে নবজন্মের কথা বলেন, তার সূত্রবিন্দু কাহিনী দ্বারা আবেশিত হলেও কখনো ঘটনাকেন্দ্রিক নয়। অর্থাৎ যার অন্তর্নিহিত রূপ কেবল প্রতীকের সৌকর্যেই নিহিত। 'সুবর্ণরেখা'র শেষ লং শটটি যখন ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে পর্দার আড়ালে মিশে যায়, তখনি আলোকময় পর্দায় ফুটে উঠে 'শিশু তীর্থ' কবিতার শেষ ক'টি লাইন—'জয় হোক মানুষের/ ঐ নবজাতকের / ঐ চিরজীবিতের।' এখানে কবিতার সুরে সুর মিলিয়ে ঋত্বিকের যে নবজন্মের জয় ঘোষণা তার নাম বিনু : সীতা-অভিরামের সন্তান। তার সত্তায় সীতার আশৈশব গান—"আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া ..."। সুতরাং বলা যায় ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা'র জয় ঘোষণা কাহিনী পরম্পরার আদর্শেই গড়া। এমন কি তা কখনো মনগড়া নয়। জীবন সত্যের গভীরতর দিকের সাথে স্রষ্টা নিজের আত্ম-আকুতিকে বেঁধে নিয়ে বলেন— "আমাদের নায়িকা যখন ছোট্টটি, তখন সে একদিন সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ঘন শালবনের মধ্যে এক বিরাট ভাঙ্গা Airport আবিষ্কার করে। ওর ভারী মজা লাগে। ভাঙ্গা এরোপ্লেনগুলো দেখে ওর শোনা কথা মনে পড়ে যে, ঐগুলোতে চেপে মার্কিন সাহেবেরা রাত্রির বেলাতে উড়ে গিয়ে কোথায় এক বর্মাদেশ, তার ঘুমিয়ে থাকা শহরগুলোর ওপর বোমা ফেলে আসতো। আর এই যে নীরব ক্লাবঘর, এখানে কত হৈ-চৈই না হত, সাহেবগুলো বোমা ফেলে এসে এখানে হৈ-হুল্লোড় করত। ভারী খুশী হয়ে যাওয়া মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে নেচে সেই ফাটল ধরে-যাওয়া সুবিশাল অ্যাসফল্টের শ্মশানের ওপরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল এক বীভৎস কালীমূর্তি। আঁতকে উঠে মেয়েটি আশ্রয় নিল পথচারী এক চরিত্রের কোলে। তখন জানল কালীমূর্তিওয়ালাটি আসলে এক বহুরূপী, যে শুধু পেটের ভাতের পয়সার জন্যে এই রকম সাজে। সে ছোট্ট দিদিমণিকে ভয় দেখাতে চায় নি, শুধু সামনে পড়ে গিয়েছিল। আমার কেমন মনে হয়, গোটা মানব সভ্যতা ঐ terrible mother-এর archetypal image-এর সামনে পড়ে গেছে। আজ সব সভ্যতার

জীবন-মরণ সমস্যা ঐ confrontation-এর ওপরে।" (চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক সংখ্যা, কলকাতা, পৃষ্ঠা. ৪১)।

এই ছোট নায়িকাটি স্বয়ং সীতা ; দাদা ঈশ্বরের ঘরে মানুষ। '৪৮-এর দেশভাগে উদ্বাস্তু হয়ে এক রিফিউজী কলোনীতে বাসা বাঁধে। নিরাশ্রিত অভিরাম ঈশ্বরের ঘরে আশ্রয় পায়। সুখে-দুঃখে তাদের দিন কাটে। অভিরাম এবং সীতা পড়াশোনা, গান করে, এক সাথে বড় হয়। তারপর দু'জনের ভালোবাসা ; কিন্তু সীতা-অভিরামের প্রেম ঈশ্বরের মর্যাদায় বাধে। পরিপ্রেক্ষিতে তারা কোলকাতায় পালিয়ে এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু তাদের নতুন সংসারে টানা পোড়েন প্রায় লেগে থাকে। অভিরাম লেখকের স্বপ্ন ছেড়ে ফেলে হয় বাসের ড্রাইভার। ভাবে প্রথম মাসের মাইনে হাতে এলে নতুন বাসা নেবে। শিশুপুত্র বিনু বলে—আমরা কি নতুন বাড়ীতে যাব বাবা ? অভিরাম : দাঁড়া বিনু আজ আমি কাজ আরম্ভ করব। কাল বাড়ীওয়ালাকে টাকা দিয়ে দেব...।

বিনুর আনন্দে চোখে ঘুম নেই। রাতে মাকে প্রশ্ন করে— সীতা মা, নতুন বাড়ী দেখতে কেমন হয় ? তুমি নতুন বাড়ী দেখেছো ? সীতা : সে অনেক ছোট বেলায়। আমি যখন তোর মত ছোট ছিলাম তখন আমাকে একজন দেখিয়েছিল। আঁকা-বাঁকা নদী,আর দূরে নীল পাহাড়। সেখানে বাগানে প্রজাপতিরা ঘোরে আর গান গায়।

বিনু : তুমি সেখানে গেছ ?

সীতা : নারে বুড়ো, দূর থেকে রাস্তাটা দেখেছি সুবর্ণরেখা নদীর বুক দিয়ে—

বিনু : সুবর্ণরেখায় আমি যাবো।

সীতা : একদিন নিশ্চয় যাবি।

বিনুর জীবনে সেই 'একদিন' এসেছিল সত্যি, কিন্তু বাবা-মাকে সাথে নিয়ে নয়, তাদের যিনি বড় করেছিলেন সেই পরাজিত ঈশ্বর নামের এক ক্লান্ত মানুষকে 'দাঁড়ালে কেন, চলো চলো' বলে টেনে নিয়ে এগিয়েছিল।

ভুলতে পারিনা সেই মানবিক বোধের মর্মবেদনা। মা-বাবা হারা অবুঝ শিশুটি মামা ঈশ্বরের হাত ধরে আজ এক বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ধান পাতার শরীরে বাতাসের উত্তাল তরঙ্গ ; বিনু ভুলে যায় তার অতীত যাতনা। আনন্দে হাত তালি গিয়ে গেয়ে ওঠে— 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়া ...।' ঈশ্বর নীরব দর্শক। খানিকপর বিনুকে কোলে নিয়ে সুবর্ণরেখা নদীর কাছে এগিয়ে আসে। হঠাৎ বিনু কেমন যেন অস্থির! মামাকে প্রশ্ন করে— মামা এইটাই কি সুবর্ণরেখা নদী ?

মামা : হ্যাঁ—

বিনু : আমায় নামিয়ে দাও।

বিনুর মনে পড়ে মা'র কথা— নীল নীল পাহাড় আর প্রজাপতির খেলা।

বিনু : মামা, সীতা মা বলেছিল—ঐখানে আমাদের নতুন বাড়ী, সত্যি করে বলো

না, আমরা কি নতুন বাড়ীতে যাচ্ছি ?

মামা : হ্যাঁ, আমরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছি বিনু।

বিনু : কি মজা, ওখানে বাবা আছে, ওখানে গেলে মাকে পাবো। চলো দৌড়ই।

কিন্তু ঈশ্বর আজ অবসাদে জর্জরিত। সে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনুকে দেখে। এর পরের লংশটে ঋত্বিক দু'টি জীবনের একটি বৈপরীত্যের শৈল্পিক আল্পনা আমাদের উপহার দেন। আমরা দেখি, বিনু এক দৌড়ে মামাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে ; পিছনে তাকিয়ে দেখে মামা একেবারেই নিশ্চল ; তার চলার শক্তি নিঃশেষিত। বিনু পুনর্বার ফিরে এসে মামার হাত ধরে বলে— চলো, চলো, তুমি বড় হাঁপিয়ে গেছ। মামা জোরে চলো ... তুমি বুড়ো কেন হলে। মামা, জোরে চলো। এবার বিনু ঈশ্বরের হাত ধরে টেনে নিয়ে বলে—এসো, এসো, এসো, এসো—।

ঋত্বিকের এই শিল্পকর্মের পেছনে কোন কোন সমালোচক অবক্ষয়ের প্রশ্ন তুলে ছবির মহত্বকে অস্বীকার করেন। আশ্চর্য হই এই ভেবে 'সুবর্ণরেখা'র বক্তব্য এবং প্রত্যেকটি চরিত্রের যে দুঃসহ বেদনা তার মূল সুর নিহিত ভাঙ্গনের আবর্তে। পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে উদ্বাস্তু, তারপর কলোনী জীবন এবং একে একে ছাতিমপুর, কোলকাতা ও পরিশেষে নতুন বাসার সন্ধান। অর্থাৎ এক পর্যায় ছেড়ে অন্য পর্যায়ে কেবল আশ্রয় রচনার আকুতি। আবার ক্ষণিকের আশ্রিত স্বপ্নজাল নানা বিপর্যয়ে ছিন্ন হয়ে আসে। এবং এই ছিন্নতা কখনো অবক্ষয় নয়, কেবল ক্ষয়। কেননা ছবির মধ্যাংশে যে নৈরাশ্য বা হতাশা তার পরিণতি অবশ্যই আশার উদ্দীপ্ত জীবনে। মৃত প্রায় ঈশ্বরের (যিনি একদা আত্মহননের পথে পা বাড়িয়েছিলেন) আজ পুনঃ জাগরণ নবজাতক বিনুর হাতে। আসলে এরা কোথাও থেমে থাকে নি। বাধা বিঘ্নতা পেরিয়ে তাদের সত্তা ঘোষণা করে : 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'।[১]

১. 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এও শিশু এক বিরাট ভূমিকা পালন করে—বিশেষ করে ঋত্বিকের দর্শন তথা প্রাণ ও সভ্যতার প্রবহমানতার প্রতিফলন তিতাসের নহলী চরে জন্মানো ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পাতার বাঁশি বাজিয়ে চলে যাওয়া শিশুর মধ্য দিয়েই ঘটতে দেখি।

ঋত্বিকাবলোকন : তাঁর বহমানতা, অমরতা

ওয়াহিদুল হক

সত্যজিতের সীমাবদ্ধতা ঘটিত ফাঁকটা পূরণ করবার জন্যই যেন মৃণাল সেনের ফিল্মী জন্ম-কর্ম-সার্থকতা। এবং সেনী ছবি দেখে রয়াল বলে ভুল করবার মত আহাম্মক নেই কোথাও, মৃণাল একরৈখিক প্রগতিতে না এগোলেও তাঁর ভাষা আর ভাব দুই-ই বিচিত্রগামী হওয়া সত্ত্বেও এতটাই স্বাতন্ত্র, বৈশিষ্ট্য এমন কি স্বমহিম স্বরাটতা অর্জন করেছে। এই দুই অনিরুদ্ধ কর্মীপুরুষের শ্রেষ্ঠ অর্জনের চোখ-ধাঁধানো শারদ দিবালোকেও এক জ্যোতিষ্ক— হতে পারত ধূমকেতু, কিন্তু তাও নয়—হয়তো চৈনিক জ্যোতির্বিদদের বর্ণিত কিংবা বাইবেলে উল্লিখিত বেথেলহেমের তারা নামের সুপারনোভা, হতে পারে আমাদেরই নিত্যদিনের সঙ্গী যেতে-না-চাওয়া দিনে-জেগে-ওঠা চাঁদ—কখনও চোখের আড়াল যদি বা হয় সে মনের আড়াল হতে চায় না। বিশেষত হৃদয়বান, চক্ষুষ্মান বাঙালির।

ঋত্বিক ঘটকের সাথে ফিন্‌সেন্ট ফান্‌খখের মিল খুঁজে বার করাটা খুবই সস্তা ব্যাপার হবে হয়তো কিন্তু একেবারে এড়ানো যাবে কি ? রসিকপ্রতিভাসীর কাছে যেমন আলাউদ্দীন, বীঠোফেন মানে কতক গাল-গল্প, ফান্‌খখের ভাগ্যে জুটেছে এ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত—এবং অর্ভিং স্টোন নামক চুটিয়ে গল্প ফাঁদার কঠিন প্রপঞ্চটি হয়তো তার জন্যে বারো আনা দায়ী। এতদিনে অনেকেই বলেছেন, আমরাও অনেকেই ভাবছি ফান্‌খখ্— মাহাত্ম্য হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে। তাঁর অবিস্মরণীয়, হয়তো বিশ্বসাহিত্যে চিরবরেণ্য, পত্রাবলীর নিবিষ্ট পাঠেই বোঝা গিয়েছিল ফানখখ্ তাঁর আত্মবিস্মরণ নিয়ে গর্বিত ছিলেন না, ওতে কোন কীর্তি কল্পনা করতেন না, বরঞ্চ তাকে অসুস্থতা, বোহেমিয়ানীকে রুগ্ন শিল্পবিরোধিতা, জীবনবিরোধিতা বলেই জানতেন। তবু সেই রোগেই তাঁকে পেল এবং শেষ করল। ঋত্বিকের কমিটমেন্ট—শিল্পের প্রতি, সমাজের প্রতি— কী অসাধারণ এবং কতই না সুস্থ, প্রাণোচ্ছল। কিন্তু ঋত্বিকও একই আত্মবিস্মরণের শিকার হলেন এবং বলতে গেলে ফান্‌খখের চাইতেও করুণভাবে নিজেকে হনন করলেন ও বিদায় নিলেন, ফান্‌খখের গালগল্পের মতই, রইল পড়ে যে চিতাভস্ম সে-বুঝি কেবলই তাঁর অসংলগ্নতার, মাতলামির, আধিক্যের, অসংযমের স্মৃতিগুলি।

সুদূর বোম্বে শহরে সাংবাদিকতা-নামীয় ভাড়াটে মসীজীবিকায় নিযুক্ত প্রাক-তিরিশ এক মানুষ আশিস রাজাধ্যক্ষ। বাঙালি কিনা জানিনা, আর কিছুই জানিনা তাঁর, শুধু পত্র-পত্রিকায় একই পদবীর এক মহিলার লেখা দেখে তাঁর মাতৃ কিংবা ভগ্নী সম্পর্কীয়া বলে কল্পনা করি। সেই আশিস এক বই লিখেছেন—'ঋত্বিক ঘটক—মহাকাব্যে

প্রত্যাবর্তন'।[১] দুরূহ, প্রায় দুষ্পাঠ্য বই। ভাবি নতুন শিং-গজানো ইনটেলেকচুয়াল মেড়ার টুঁসোবার প্রবৃত্তিতেই ঠাসা হবে বুঝিবা। ফেলে রাখি। পরে অপ্রতিরোধ্য খসরুর চাপে অধ্যক্ষকুল শ্রেষ্ঠের ঠাসবুননের প্রতিরোধ ঠেলে যে বারতা মনে ঠিক পৌঁছে গেল, সে-হল ফান্‌খখের শিল্পকর্মই যেমন তাঁর জীবনোত্থিত গালগল্পকে ছাপিয়ে অনাগত সকল মানুষের জীবনে উজ্জ্বল সবল জীবন যোগ করতে থাকবে, ঋত্বিকের চিতাভস্ম নয়, তাঁর শিল্প, তাঁর ভাবনাই চিরজাগরুক থাকবে, ভারতবর্ষীয় শিল্পভাবনা ও প্রয়াসের বিশিষ্ট অঞ্চল হয়ে থাকবে, ভবিষ্যতের শিল্পীকে ঋদ্ধ উজ্জীবিত করবে, ভবিষ্যতের মানুষের হৃদয়-গহন-দ্বারে বাংলা, বাংলা ও বাংলা বলে করাঘাত করতে থাকবে।

বাংলাকে যখন কাটে তখন সত্যজিতের সংবেদ-আকর্ষগুলো বিশ্বের তাবৎ জিনিসকে জড়িয়ে ধরছে, আগ্রহ তাঁর অধীর অতি বিশেষত চলচ্ছবি-বিষয়ে। সোভিয়েত সিনেমারম্ভের দুঃসাহসিক সোনালি দিনগুলো থেকে আজকের ওয়ারিংটনের কবুলনামা—ষাট বছর ধরে ফিরে ফিরে একই এজিন —মানুষকে বলছে ফিল্ম ঘুরে ঘুরে স্বামিন, যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম। বাংলা নামের আসমুদ্রহিমাচল একটা যন্ত্রণাকাতর মানুষকে যখন তারা কেঁচো-কাটা করল, তখন কলকাতায় জমে যাওয়া সারদারঞ্জন-উপেন্দ্রকিশোরের প্রসরমাণ সংসারের এক শাখায় এক অকালপিতৃবিযুক্ত যুবক সদ্যই বাস্তু- উৎখিন্ন কোটি শরণার্থীর সর্ববিকৃত অস্তিত্বের পঙ্গুতা-অসার্থকতার বোধ দ্বারা তাদের মত করে আক্রান্ত নাও হতেই পারতো—যদি এক লহমা পরেই কর্তিত-কিঞ্চলুক কংগ্রেস-মুসলিম লীগের যুগপৎ স্লোক—সকলেরই আরো ভালো হবে— অনুসারে পূর্ণ জীবন আরম্ভ করতে পারতো, এবং যদি না পশ্চিমবঙ্গকে সেই জখমের ভারে ক্রমেই ন্যুব্জপৃষ্ঠ অকালবৃদ্ধের শৈশবের খর্বতায় প্রত্যাবৃত্ত হতে হত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিকভাবে। কিন্তু কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের একধরনের লখিন্দরের-ঘর মত অভেদ্যতার ভিতরেই দেড় শতাব্দির উদ্বৃত্ত মানস ও বাস্তব ধনের স্রোতোবেগে পারের কথা না-ভেবে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা ভালোই ছিল,— সত্যজিতের অর্জনের শপথ—তাঁর সকল শিল্পকর্ম তার সাক্ষ্য। রবীন্দ্রযুগের সার্থক প্রসরণ সত্যজিতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেষ দিনগুলোতে তাঁর চিত্তের উদারতা ও প্রশান্তির সকল সত্যসুন্দরন্যায়ের উৎসগুলিকে ভয়ঙ্করভাবে অন্তঃসারশূন্য জানতে পারছিলেন ক্রমেই, আর তাই 'বিশ্বাস হারানো পাপ,' 'বিশ্বাস হারানো পাপ' বলে জপতে থাকলেন হারানো বিশ্বাসকে সত্যি-সত্যি হৃত জেনে নতুন বিশ্বাসের ভিত খোঁজবার জন্যে। তাওতো তেতাল্লিশের অর্ধকোটিক্ষয়ী মন্বন্তর, ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট, সাতচল্লিশের পনেরই আগষ্ট ও কোটি-কোটি মানবের বাস্তু কেবল তো নয়, জীবনজমিন থেকেই উন্মূলন ঠাকুর মহাশয়কে দেখতে হয়নি।

১. RITWIK GHATAK : A RETURN TO THE EPIC
Ashish Rajadhyaksha, Screen Unit, Bombay, India, 1982

যে-কয়জনকে দেখতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অবশ্যই আছেন, ছিলেন সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যে-জগৎ যাচ্ছিল ভেঙে, সত্যজিৎ আমাদের সেই জগতেই ফিরে যেন প্রতিষ্ঠা করলেন বাঙালিকে, অপুদূর্গা, সর্বজয়া হরিহরের, তথা বিভূতিভূষণের জগতে—যে-জগত প্রকৃতই গল্পগুচ্ছের জগৎ। নিজেকে পুনরাবৃত্তি-সঙ্কটের সযত্ন-পরিহারের সতত-অনুশীলনে রত রেখেও সত্যজিৎ কেবলই সুকুমার-নন্দন, সুবিনয়-ভাইপো থেকে সুখলতা-লীলারই দৃশ্যশিল্পে প্রসারণ এবং প্রবর্ধন হলেন। সে আমাদের মস্ত পাওয়া, ফিরে পাওয়া—জগতের আর কেউ জানবেনা সত্যজিৎ আমাদের কি ফিরিয়ে দিলেন, দিতে গিয়ে কত কী যে নতুন জগজ্জয়ী সব জিনিস দিলেন।

মৃণাল যেন গোড়া থেকেই এ-জগতটা ভাঙবেন বলে কোমর বেঁধে ছিলেন। তাই অনেক দূর পর্যন্ত তাঁকে না-পাওয়া গেল শিল্পতে, না-পাওয়া গেল মৃণালের নিজেকে, যা পাওয়া যেতে হলে শিল্পীর আদাজল পানের চাইতে স্বস্থতাকে খুঁজে-পেতে, তাতে পৌঁছাতে হয়—স্বভাবেই বটে। পৌঁছালেন মৃণাল—শেষাবধি বলব না, এখনও তাঁর কাছে আমাদের কত আশা—হোকনা একটু ঘুরপথে, পৌঁছালেন শিল্পে, জীবনে।

মৃণালের মত নিতান্ত ভেতো বাঙালি খ্যাপা-ভাবটি ধারণের চেষ্টা পেয়েছিলেন কেন? সে তো আদৌ তাঁর স্ব-ভাব নয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ক্ষত শুকায়তোনিই উপরন্তু, পচ্ ধরেছে— তার গন্ধে পাগল হয়ে ? মূল অপারেশনটির ট্রাজিকতা তাঁকে স্পর্শ করেছে, দেখা যায় না—কেন, করলে কি তা কেবলি পিছুটান হত, যা জীবন থেকে টেনে অসার দিবাস্বপ্ন এবং ভয়ঙ্কর রাত্রিজাগরদুঃস্বপ্নের এক ধরনের অলীকতার ঘেরাটোপে চেপে দিত ? তাই ?

ত্রিরত্নের সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি জপটি কেউ ঋত্বিককে গছিয়ে দিয়েছিলেন বলে জানিনা। কিন্তু দেখা পেতেই দেখি মননে বিশ্বাসে দৃঢ়প্রত্যয় এক কম্যুনিস্ট, ঢ্যাঙা শরীরটার মতই বেঢপমত গোয়াতুর্মি —মূর্তিমান। তাঁর ভাবনাচিন্তা সমাজবদলের, একা-একা নয়,—সংঘং শরণং গচ্ছামি। এটি সত্যজিতে একেবারে ছিলনা—তাঁর সাধনা পথ ভিন্ন মূলত সাধনার বিষয়ই ভিন্ন বলে—, মৃণালে হয়তো ছিল, কিন্তু ঋত্বিকের মত করে এত প্রকট করে ছিল না। অথচ চলচ্চিত্রিক ত্রিরত্নের মধ্যে ঋত্বিককেই সবচাইতেই অকম্যুনিস্ট সুলভ প্রায়-ধর্মভাবগ্রস্ত এক খ্যাপার জীবন যাপন করতে দেখি শেষাবধি। কেন এ-রকম হল ? বঙ্গব্যবচ্ছেদের মূলোচ্ছেদী মনুষ্যত্ব-উৎসাদী সংকট-বিষয়েব জ্ঞানোপলব্ধির বিষ তিনিই জেনেশুনে পান করেছিলেন— কিন্তু স্পষ্টতই দেখা যাছে, নীলকণ্ঠ তিনি হতে পারেননি—'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নিজেকে তাই বলে অভিহিত করলেও।

ঋত্বিক ঘটকের জীবন, সাধনা, অর্জন ও ব্যর্থতা এবং প্রায় ট্রাজিকো কমিক মৃত্যু.— মানুষটা যে-জিনিষটা চিরকাল বুকে-বোধিতে ধারণ করেছিল, সেই তার দেশ-মাতৃকাবই প্রকৃত অবস্থার মত হল। দেশের মৃত্যু হতে একটু বেশি সময় নেয়, এবং

মৃত্যুমাত্রই বোঝাও যায় না যে চুকেবুকে গেল— তফাৎ এই যা।

আশিস রাজাধ্যক্ষের সুপরিকল্পিত, পণ্ডিতন্মন্য গ্রন্থের সমালোচনা আমার কম্মো নয়। আমার ইচ্ছে, সময় পেলে, সে-বই থেকে কোন ছোট একটি অধ্যায় অনুবাদ করে দিই এখানে। যতক্ষণ তা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা বইটির অধ্যায়গুলির কথা বলি। চার অধ্যায় করা হয়েছে : ক. শক্তিমান ঐতিহ্য ; খ. আর্কিটাইপের মুক্তি ; গ. ফিল্ম ঘটিত বস্তুবাদের লক্ষ্যে ; ঘ. ঋত্বিক-উত্তর পরিস্থিতি। এর আগে বেনামে আছে আরো দু'টি : ১. ভূমিকা, ২. পশ্চাৎপট —দেশভাগ। এক শ' আটচল্লিশ পৃষ্ঠার এই ঠাশবুনন (অর্ধলক্ষের উপর শব্দ) বইয়ের খুঁটিনাটি দূরে থাক এর প্রতি অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনাও যেমনি দুরূহ হবে তেমনি অপরিমিত স্থান দাবি করবে এবং সর্বোপরি আলোচকের নিজের এতদবিষয়ক সীমিত ক্ষমতার উপর সীমাহীন চাপ ফেলবে। তার চাইতে আমি যেমন-চোখে-পড়ে—এমনই ইতস্তত কতক জায়গার কথা বলি।

ধরুন যেমন প্রথম পৃষ্ঠায়ই, ভূমিকার আরম্ভে, আশিস বলছেন, স্বাধীনতার তিন দশক পরে পর্যন্ত ভারতে উচ্চন্মন্য শিল্প উচ্চ শ্রেণীর একলার ব্যাপার বলে পরিগণিত হলেও ঋত্বিকের ছবিগুলো আমাদেরকে বুঝিয়ে ছাড়ে যে প্রকৃত ঘটনাবলী সত্যি সত্যি শিল্প এবং শিল্পসমালোচনার প্রচলিত খাতের চাইতে অনেক গভীর তলবর্তী। আমাদের গলগলিয়ে বেরিয়ে আসা কর্কটী রোগাক্রান্ত রক্তকোষের মত শিল্প যদি কারো মধ্যে কোন প্রকৃত শিল্পের জন্য সত্যিকারের আকুতির জন্ম দেয়, কেবলমাত্র এই ধরনের আকুতি কিংবা স্বপ্নালুতার সাথে দ্বিমত করা কিংবা একে চ্যালেঞ্জ যথেষ্ট নয়। আমাদের সেই পশুদেরকে চিহ্নিত করতে হবে যারা এইমত স্বপ্নকেও পণ্যে পর্যবসিত করেছে— এবং সেই মতাদর্শকেও যা নিষ্ঠা এবং পদ্ধতিপ্রকরণের সাথে সমাজের প্রকৃত ইস্যুগুলোকে অস্পস্ট করবার এবং চাপা দেবার প্রয়াস পাচ্ছে এবং বিক্রয়যোগ্যতার বিচারটিকে একমাত্র নিরেট নিটোল বাস্তব সত্যে পরিণত করছে— এদের সবাইকে মোকাবেলা করতে হবে।

এরপর লেখক সমাজের বিভক্তি এবং বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়ার আলোচনায় চলে যাচ্ছেন এবং প্রথমেই উল্লেখ করছেন মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের স্তর ও তার আশা-আকাঙ্খার-স্বপ্নের জগতের মধ্যেকার বিরাট ফাঁকাটাকে। পার্থক্য টানছেন মীথ এবং এপিকের মধ্যে—বিশেষত ঋত্বিক মীথকে নিয়ে সবচাইতে বেশি কাজ করেছেন বলে। মীথ ভাঙবার জন্যেই মীথের ব্যবহার—এরকমটাই যেন বলতে চাইলেন ঋত্বিকের বেলায় এবং মীথের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে বললেন মুক্তির পথ এপিকে—যা কিনা ভাবরূপগুলোর মধ্যে সংশ্লেষ ঘটায়, বোধবুদ্ধিতে একটা অন্তর-সঙ্গতি আনে এবং সমাজ-সংবেদের ভগ্নবিচ্ছিন্ন দশার নিরাকরণে সার্থক প্রথম স্তর রচনা করে।

মীথপ্রক্রিয়া ও প্রকরণ বিষয়ে লেখক ব্রেশটেরও উদ্ধৃতি দিয়ে, ঐকমত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ মীথের মধ্য দিয়ে জমাট বেঁধে যাওয়া এক-কালের প্রধান ধারণাগুলোকে আসলেই যা প্রাধান্যবিস্তারকারী শ্রেণীর চাপানো ধারণা মাত্র সেই কথা বলে ভারতের বর্তমান

সিনেমা দ্বারা ধ্রুপদী মহাকাব্য ও আধুনিক পপের খিচুড়ি পাকিয়ে শহুরে লুম্পেনের জন্যে ফরমাশী কালচার তৈরি করা ও প্রবহমান আবহ-সংস্কৃতি সকল ধারার মুলোচ্ছেদের কথা বলেছেন, খুবই অনুত্তেজিত ভাবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি ঋত্বিকের জীবনকর্মকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চেয়েছেন এই বলে যে, কিছু চেষ্টা চলেছে শ্রেণী-সংগ্রামকে ঐতিহ্যের ভিতরের দ্বন্দ্বের মধ্যে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে বর্তমানে প্রাধান্যবিস্তারী ধারার বাইরে এক বৃহৎ অবস্থান করার—এবং এই চেষ্টার প্রধান ঋত্বিক আমাদের কুমিল্লার বীর শহীদ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান রাজনীতিক প্রবক্তা ধীরেন দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ অশেষ গুণবতী প্রতীতি দত্তের যমজ ভাই যার নামই ঋত্বিক।

এই মীথ আর এই এপিক—এবং এতদবিষয়ক ব্রেশ্‌টীয় আলোকপাত—এর বিশেষ কিছুই বুঝি না আমি। ঋত্বিকের নিজের মুখে শেষ দিনগুলোর অসংযত অসংলগ্নতায় ঐ মর্মে অনেক কথা শুনেছি,— বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা হয়ে ওঠেনি, সম্ভবত আমার নিজের এ বিষয়ে অপক্কতার কারণেই। আরেকটি ছোট কারণ ছিল, মত্ত ঋত্বিক অনেক সময় মামুলি ছোটখাট ভুল জিনিসকে ঠিক বলে প্রমাণ করার জন্যে ছোটলোকের, ইংরেজিতে যাকে বলে 'বুলি' তার মত জেদ করতেন। আশাবরীর গানকে ভৈরব বলে ভুল করবার লোক তিনি ছিলেন না, সেই নিয়ে একটি কচি বয়সের গায়িকাকে তিনি, মুগ্ধ হয়েও, খুব গালাগালি করেছিলেন আমাদের প্রথম পরিচয়ে, দিল্লিতে। ফলে ঋত্বিক যখন তত্ত্বীয় বায়বীয়তায় যত প্রবেশ করতেন, আমার মন তত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত।

রাজাধ্যক্ষ জেনে বুঝেই লিখেছেন, এটুকু বেশ বুঝতে পারছি। পেরেও এ আমাকে কেন যেন আকর্ষণ করে না। আমি বরং সোৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ি প্রথম অধ্যায়ের উপক্রমণিকার উপর, যার নাম 'পশ্চাৎপট : দেশভাগ।' এবং প্রথমেই এমন সব সোনা পেয়ে যাই যার দর্শন আমাকে যুগপৎ বিস্মিত, চমকিত, এমন কি অভিভূত করে। খুব সহজেই তিনি নেহরুর, 'ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি'র উচ্ছ্বাসকে একপাশে পনেরই আগস্টের স্বাধীনতার আড়ালে অনেক দিনের এক দেশ দ্বিধাকরণ ও আনুষঙ্গিক রক্ত প্লাবনের মনুষ্যাবলোপী ব্যাপারটি দেখতে পান। এবং বলেন যে অবশ্যই ভারতীয় জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই এই বিনষ্টিকরণের বীজটি উপ্ত ছিল। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিককে এ প্রশ্নের অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে, দেশভাগ আসলেই চিরাগত ভারতীয় সমাজে বয়ে আসা অমিরাকৃত সব দ্বন্দ্বের কোন প্রকাশ কিনা, কিংবা এটা জাতীয় রাজনীতির কোন পরিস্থিতি একটা অনিচ্ছুক বিরূপ জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা— আর তাই যদি হয়ে থাকে তবে তা এত সহজে হতে পারলো কী করে। দেশভাগ, বলছেন আশিস, আসলেই আধুনিক ভারতীয় সমাজের প্রকৃতিটিকেই একটা বিতর্কিত এবং উত্তরবিহীন সব প্রশ্নের আকর করে তুলেছে।

একটা দিনে একটা মুহূর্তে মানুষের চিরকালের দেশ, অপরের হয়ে গেল, সে সেখানে বিদেশী হয়ে গেল। সব ফেলে,— জমিজমা বাড়িঘর নয় মোটেও, সমাজ

ফেলে, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ভালোবাসা, হাসি-কান্না— সব ফেলে যে কোটি লোক ভিন্‌দেশের উদার আকাশ এবং অনুদার মৃত্তিকা সঙ্কুলানে এসে দাঁড়াল তার মধ্যে ঋত্বিক একজন। এবং ঋত্বিকের সমস্ত কাজ জুড়ে রয়েছে ছড়িয়ে একটি দগ্‌দগে ঘা।

কিন্তু কম্যুনিষ্ট ঋত্বিকের কাছে ঐ সাংস্কৃতিক উন্মূলন,—ছিন্নমূলতা ধরা পড়ে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক মানবিক দুর্বিপাক বলে নয়। শ্রেণী-বিশ্লেষণে তিনি দেখেন পৃথিবীর ইতিহাসের এই অন্যতম বৃহত্তম ট্রাজেডিটিকে। ফলে অনেক কাজেই, বিশেষত গোড়ার দিকের ছবিতে মূল প্রতিপাদ্যটি প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ভিন্নতর নানা দ্বান্দ্বিকতার ভিড়ে। যেমন যন্ত্রশক্তির বিপ্লবের সাথে চিরাগত ভারতবর্ষীয় শ্রমশক্তির এখনও অনিরাকৃত দ্বন্দ্ব—এটাও যেন সেই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সাংস্কৃতিক উন্মূলনের মতই একটা ব্যাপার ঘটাচ্ছে সমাজে—এবং এই জন্যে উঠে আসছে ঋত্বিকের ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে।

যত তিনি বাঙালিত্বের উপাদান খুঁজে বেড়িয়েছেন, উৎস সন্ধানে নিরত হয়েছেন মূলত এই ছিন্নমূলতাকে প্রতিরোধ করবার জন্যে ততই তিনি মনে বাড়তে থেকেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি-বৈশিষ্ট্য থেকে ক্রমে জাতি-নামক ঘটনার বৈশিষ্ট্যের প্রকরণকে উপলব্ধি করেছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় এক ধরনের আন্তর্জাতিকতার বোধে এসে উপনীত হয়েছেন।

এরপর বইটির প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রাধান্যবিস্তারী ঐতিহ্য। বাকি বইটির অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মূল বইটির বিশেষ আলোচনায় যাওয়া প্রচুর জায়গার ব্যাপার, এবং আলোচকের প্রচুর অবকাশ ও শ্রমের ব্যাপার। দু'টিই বিশেষ অপ্রতুল হওয়ায় একটি কথা দিয়েই সব কথা বলার চেষ্টা নিতে চাই : বইটি স্বর্ণগর্ভ। সোনার খনিতে কিন্তু খাটুনি সবচাইতে বেশি। আর যে-সব পর্যবেক্ষণ ক্ষণে ক্ষণেই চমকে দিতে থাকে কিংবা বুদ্ধিকে, বিদ্যাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে সে-সবের অধিকাংশই এমন পর্যায়ের যে এখানে ঋত্বিক একটি উপলক্ষ মাত্র—প্রকৃত বিষয় ফিল্ম— সিনেমা-শিল্প। আমি আশিসের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তাঁর ফিল্ম বিষয়ক ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করবার জন্যে ঋত্বিক ঘটকের মতো একজন সৃজনশীল হৃদয়বান শিল্পীকে বেছে নিয়েছেন। এবং উপর চালাকি পরিহার করে, ঋত্বিকেরই মত প্রায়, তীব্র হয়েছেন, গভীর হয়েছেন, মৌলিকও হয়েছেন কিছুটা এবং ঋত্বিক নামীয় ঘটনাটার বিশেষ এবং সমগ্র উভয়কে যুগপৎ অনুধাবন এবং প্রকাশে কোন শ্রমকে পরিহার্য মনে করেন নি।

আশিস রাজাধ্যক্ষের বইয়ের প্রকাশনার বছরই, অর্থাৎ ৮২ সনেই, ঋত্বিকের উপর বিপরীতমত একটা বই। ঋত্বিকের সব বইয়ের কালানুক্রমিক বিবরণ ও মন্তব্য। অজস্র ছবি। শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় করা এই বই[২] আসলে বৃটিশ জাতীয় ফিল্ম

২. RITWIK GHATAK
Editor : Shampa Banerjee, Directorate of Film Festival, National Film Development Corporation Ltd New Delhi, India, 1982

থিয়েটারে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ছবির মেলার জন্য করা এবং ভারতীয় জাতীয় ফিল্ম উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত।

ঋত্বিক ছবিভিত্তিক আলোচনার বাইরে আছে প্রথমে তিনটি সাধারণ পর্যবেক্ষণমূলক নিবন্ধ—নিঃসন্দেহে প্রাঞ্জল এবং সুলিখিত: বাংলার স্মৃতি ও অখণ্ডতার দূরস্বপ্ন, আর্ট ও আর্কিটাইপ বিষয়ে, ঋত্বিকের ছবিসমগ্র। শেষে আছে এ ধরনের দু'টি নিবন্ধ : দূরাবলোকন, সমালোচকদের স্মৃতিচারিতা। সর্বশেষে ফিল্মোগ্রাফি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

রাজাধ্যক্ষের বইয়ের তুলনায় এই বই, যার নাম কেবলই 'ঋত্বিক ঘটক'—কোনক্রমে পণ্ডিতন্মন্য তো নয়ই, বরং ঠিক উল্টো, সহজ পাঠ্য, ততোধিক সহজবোধ্য। প্রথমে কোন ছবির কুশলী ও কুশীলবের তালিকা, তারপর কাহিনীটুকু, তারপর সমালোচকদের ভুরিভুরি লেখা থেকে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যময় অংশ কলন, শেষে ঋত্বিকের নিজের কিছু বক্তব্য—এই নকশা ধরে এগিয়েছে বইয়ের গর্ভবস্তু। এবং আশ্চর্যের বিষয় এতে করে যেন ঋত্বিক ও তাঁর কর্মের মর্মমূলেও অনেক অধিক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বারে বারেই যে ঋত্বিকের নিজের ব্যাখ্যা কিংবা কৈফিয়ত এসেছে, তাও কত সহজেই তাঁর শিল্পের ভয়ানক রকম জটিলতার গ্রন্থিমোচন করেছে অতি সহজে, অতলস্পর্শী গভীরতায় তলের ঠিকানা এমন কি দাঁড়াবার জায়গা দিয়েছে। ঋত্বিকের লেখার সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁরা তো জানেনই তাঁর লেখা কী আশ্চর্য মেদবিহীন, কেন্দ্রীয় ইস্যুতে দ্রুত ধাবমান, অথচ কোন গুণে যেন অনেক জটিল ভাবনা ও অজানা স্বাদ-গন্ধের উৎসারক। আবার এমন উষ্ণ, এমন তীব্র, এমন বহুল—অতলগর্ভ গদ্যের তুলনায় আমাদের দেশের একালের ইংরেজি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, বুদ্ধিদীপ্ত বাংলা গদ্যের অত্যন্ত উঁচুদরের নির্মাতা, ভারতবর্ষের অমর চলচ্চিত্রনায়ক সত্যজিৎ রায়ের লেখা হয় অ্যাকাডেমী-গন্ধী, নয় বাচ্চাদের সাথে আলতো-কথন প্রায়—সাহিত্য যেন কদাপি নয়। কিন্তু রায়ের যে স্বীকারোক্তি শম্পা-সম্পাদিত এই বইয়ের প্রারম্ভেই আছে (যা হয়তো মূল বাংলা থেকে অনুবাদ এবং যা আমি পড়িনি) তা সততায়, সত্যতায় সত্যজিৎকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। ঋত্বিকের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে কম নেই, উচ্ছ্বসিত লেখাও কম নেই। কিন্তু কী করে সত্যজিতের স্বভাবসিদ্ধ সংযত ঋত্বিকাবলোকনকে কেউ ছাপিয়ে ঋত্বিক-সম্মাননা কোনকালে করতে পারবেন ভেবে পাই না। কী বলছেন সত্যজিৎ (বইয়ের উদ্ধৃতিটুকু শুধু) ? "ঋত্বিকের ছবির একটা বিশেষ চরিত্র আছে। আমরা যারা চল্লিশ বছর ধরে ছবি দেখি, তারা তার ত্রিশ বছর শুধুই হলিউডের ছবি দেখেছি। ... এবং আমাদের সকলেই কিছুদূর পর্যন্ত হলিউড দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু কোন রহস্যাবৃত কারণে ঋত্বিক এই প্রভাব থেকে ষোল আনা মুক্ত ছিলেন, হলিউড তাঁর ওপর দাগমাত্র ফেলেনি— কী করে এ হতে পারল তা আমি আজও ভেবে পাই না। যদি প্রভাবের কথাই বলতে হয় তো আমার মনে হয় ঋত্বিকের কাজে কিছু সোভিয়েত প্রভাব পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রভাব মানে তাঁর বেলায় অনুকরণ ছিল না, কারণ ঋত্বিকের কাজের মূল গুণ ছিল তাঁর আপন বিশিষ্টতা, তাঁর মৌলিকতা,

যা তিনি জীবনে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে গেছেন। তাঁর ছবি এইমত কিছু সোভিয়েত প্রভাব ছিল, ছিল নাটকের প্রভাব সংলাপে, গর্ভবস্তুতে ও ছবি শেষ করবার প্রকরণে। আর এই দুই উপাদানই প্রকৃতপক্ষে ভীষণভাবে বাংলার মাটি থেকে উদ্ভিন্ন। ঋত্বিক ছিলেন মনেপ্রাণে এক বাঙালি চলচ্চিত্র-নির্মাতা। একজন বাঙালি শিল্পী। আমার নিজের চাইতেও অনেক অনেক বেশি করে বাঙালি। আমার দিক থেকে তাঁর বিষয়ে এই শেষ কথা—এবং সেই ছিল সবচাইতে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চারিত্র।"

উচ্ছ্বসিত হবার মত লোক সত্যজিৎ নন, হলেও তার প্রকাশ তাঁকে দিয়ে কোনকালে সম্ভব নয়। সমগ্র পৃথিবীর মানসের উপর বাংলার, বাঙালির নিসর্গ ও জীবন, সাধনা ও সংস্কৃতি, হৃদয়ৈশ্বর্য ও বাস্তব দারিদ্র্যের যে অতুল্য চিত্রকর চিরদিনের জন্য ছাপ ফেললেন, তাঁর এই উক্তিকে কেউ যেন ভুলেও ঋত্বিককে প্রাদেশিকীকরণ করলেন বলে, মহাপাপটি না করেন। বাঙালিত্বের ভিতর যার জন্ম, লালন ও সকল ও জাগ্রত ও সুপ্ত জীবন, সেই মানুষ কি বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে, কি পৃথিবীর অন্য কোথাও, এই সত্য আবিষ্কারে নিজেকে আবিষ্কার করবে যে শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটকের মত কেউ বাংলাকে ভালবাসে নাই, কেউ বাংলাকে জানে নাই, কেউ বাংলাকে, বাংলার মূল ঐশ্বর্য ও কেন্দ্রীয় ট্রাজেডিকে তাঁর মত করে প্রকাশ করে নাই— এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া। এ কথায় যেন শিল্পী ঋত্বিকের শিল্পে কোন খা্‌মতি না ইঙ্গিত করে। পৃথিবী জানুক আর নাই জানুক. মানুক আর নাই মানুক ঋত্বিক চলচ্চিত্র মাধ্যমের সকল কালের মহত্তম শিল্পীর একজন যিনি সমাজের প্রতি, সংস্কৃতির প্রতি কমিট্‌মেন্টবশত চলচ্চিত্রের অন্তর্গত সীমাবদ্ধতায় প্রতিনিয়তই পীড়িত হতেন এবং যে-কোনভাবেই তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার চিন্তা তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করেনি।

ঋত্বিক আজ নেই। আমরা আছি। আমরা কাল থাকবো না। থাকবে ঋত্বিকের স্পিরিট। বাংলা নামের দেশ মানুষ ফুল নদী পাখি যতদিন থাকবে, ততদিন তা থাকবেই। কে জানে হয়তো তারপরেও থাকবে।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে মনস্তত্ত্ব

আহসানুল হাবীব রুবেল

ছবি দেখাটাই একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। আমরা একটা ছবি দেখি তার প্রতিটি দৃশ্য আমাদের মনের মধ্যে এক প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়া ছবির ঘটনা প্রবাহ, সংগীত, গোটা বিষয়, বিশেষ কোন দৃশ্য, চরিত্র এইসব নিয়ে চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে খেলা করে, অনুভূতির জন্ম দেয়, আনন্দের, বিষাদের, হিংসার বিরক্তি আরো অনেক। গোটা ব্যাপারটা আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক। কেননা মনের সংজ্ঞা, Psyche is the part of the person consisting of thinking, feeling & function of willing i.e. con-gnition, affection and volition,— অর্থাৎ বস্তু পরিচিতি, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রকাশ। একজন স্বাভাবিক মানুষের জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব এর সঠিক সমাধান হলে জীবন সাধারণত সরল রেখায় চলে। কিন্তু কারো কারো জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব জটিলতার জন্ম দেয় এবং তার জীবন প্রণালী ও ধ্যান ধারণায় তা প্রকাশ পায়।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক। নিজের নীতি ও বিশ্বাসে আপোষহীন এই পরিচালককে নিয়ে প্রথম থেকে আগ্রহ ও বিতর্কের অন্ত নেই। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুনজীবন ভাবনায় তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষায় যেমন আমাদের তাঁর প্রতি আগ্রহ জাগিয়েছে, তেমনি ব্যক্তি জীবনে বহুবিধ অস্থিরতা, অনিয়ম, হতাশার মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মহননের প্রবণতা আমাদের ব্যথিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের মানসিক জটিলতা বহুলাংশে তাঁর ছবিতে প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

খুব স্বল্প সংখ্যক ছবি তৈরি করলেও তাঁর প্রতিটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট, ভূমিকা নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রে স্বতন্ত্র স্থান দখল করেছে। তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল চরিত্র সৃষ্টি এবং সেই চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব। ফলে প্রতিটি ছবিতেই বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ছবির অবয়ব জুড়ে ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক জীবন যন্ত্রণা, মধ্যবিত্ত মানুষের ছিন্নমূল অস্তিত্ব, মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকতা এবং শত দুঃখ ও হতাশা-ব্যর্থতা সত্ত্বেও অপরাজেয় মানুষের এক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা—এই সবই ছিল তাঁর ছবির মূল উপজীব্য। তাঁর ছবির ঘটনার বিন্যাস, কাঠামো, শৈল্পিক দিক বাদ দিয়ে শুধু মাত্র চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই তাঁর ছবিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

কোন ছবির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পিছনে Abstract or symbolic thinking বেশি কাজ করে। কারণ কোন দৃশ্যের Visual impression দৃশ্যমান ছাপ ও বাস্তবতার মধ্যে দুই ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, Object thinking বা বাস্তব চিন্তা ; দুই,

Obstruct or Symbolic thinking বা প্রতীক চিন্তা। যেমন একটা ছবিতে একটা লোক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। এর বস্তুগত ব্যাখ্যা হল আঘাতজনিত কারণে লোকটা ওভাবে হাঁটতে পারে। আর প্রতীকী ব্যাখ্যা হল ঐ লোকটা জীবনের ভারে ক্লান্ত, জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত। রাশিয়ার মনস্তত্ত্ববিদ আই. সেশেনভের ভাষায় : The similarity between impression received from external world and reality can be proved only for some aspect of visual and tactile impression such as linear configuration, disposition and displacement of object in space.

অর্থাৎ বাস্তবতা এবং বহির্জগৎ থেকে পাওয়া ছাপের মধ্যে মিল দেখা যায় দৃশ্যমান ও স্পর্শতার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন রৈখিক আকৃতি, বস্তুর অবস্থান ও স্থান কাল ভেদে বস্তুর গতি। ঋত্বিকের ছবির ক্ষেত্রে বস্তুগত ব্যাখ্যার চেয়ে প্রতীক ব্যাখ্যাই বেশী প্রযোজ্য। আমি এখন তাঁর ছবির চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করব।

ঋত্বিকের প্রথম ছবি 'নাগরিক'। যদিও ছবিটি মুক্তি পায় অনেক পরে। মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন জটিলতা এ ছবির মূল উপজীব্য। ছবির নায়ক রামু কলকাতার অগণিত নাগরিকের মধ্যে একজন। ছবির শুরুতে তার বৈশিষ্ট্য কিন্তু আর পাঁচ জন যুবকের মতই ভাল করে বাঁচবার উচ্চাশা। বাবার অবসর গ্রহণের পর অর্থাভাবে তারা শ্যাম পুকুরের বড় বাড়ি ছেড়ে কলকাতার ঘিঞ্জির মধ্যে তাদের বর্তমান বাসাতে উঠে আসে। এই বাড়িতে তার মার মত সেও হাঁফিয়ে উঠে, স্বপ্ন দেখে কোন খোলা পরিবেশে সুস্থভাবে বাঁচবার। তার বাবা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামু জীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর থাকে। স্যাঁত স্যাঁতে দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিতে বিস্তীর্ণ মাঠ ও খোলা আকাশ দেখে সে এক অনাবিল পরিশুদ্ধ জীবনের সম্ভাবনায় মেতে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণ থেকে রামুর চরিত্র Autism এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ : Autism is peculiar of self social isolation, narcissistic preoccupation and idiosyncratic thinking. In simple words turning away from reality and excessive indulgence in fantasy thinking. অর্থাৎ জীবন ও সমাজ থেকে পালিয়ে থাকা, আত্মরতিতে মগ্ন ও অলীক স্বপ্নে বিভোর এক চরিত্র। শৈশব থেকে ব্যক্তিত্ব গঠনে নিরাপত্তাহীনতা থেকে autism জন্ম নেয়। এখানে রামুর ক্ষেত্রে অর্থ নিরাপত্তাহীনতাই বেশী রকম দায়ী। নিম্ন মধ্যবিত্ত স্কুল মাস্টারের পরিবারে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা ও হীনমন্যতা জন্ম নেয়াই স্বাভাবিক। নগর কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙ্গন, ভিন্ন ব্যক্তি মানুষে যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করে, 'নাগরিক' ছবিতে ঋত্বিক সুন্দর করে তা উপস্থাপন করেছেন। দীর্ঘদিন নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষকতা করে রামুর বাবা অবসর জীবনেও আর্থিক সংকটে ভুগছেন। কদর্য সমাজ ব্যবস্থার অকৃতজ্ঞতায় এই মানুষটি সমস্ত পরিমণ্ডলের উপর আস্থা হারিয়েছেন, শুধু আছে অবিমিশ্র নৈরাশ্য।

এর পরের ছবি 'অযান্ত্রিক'। অযান্ত্রিকের বিমল ট্যাক্সি ড্রাইভার ও তার ট্যাক্সি জগদ্দলকে কেন্দ্র করে কাহিনী গড়ে উঠেছে। জড় ও মানবের সম্পর্ক এ ছবির মূল উপজীব্য। যন্ত্র যে শুধু যন্ত্র নয়, তার সঙ্গেও যে একটা মানবিক ও অযান্ত্রিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে— তাই হচ্ছে এ কাহিনীর কথাবস্তু। ঋত্বিক অযান্ত্রিক-এ C.G. Yung-এর collective unconscious বা যৌথ অবচেতনার বৃহৎ প্রেক্ষিতে বিমলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অন্তত তাঁর ব্যাখ্যা মতে। কিন্তু আমার মতে ইয়ং এর মতবাদ এ ছবিতে অতটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি। এ সম্বন্ধে কথা বলার আগে ইয়ূং এর মতবাদ সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ফ্রয়েডের শিষ্য C.G, Yung Schizophrenia (আক্রান্ত) রোগীর মানসিকতা ও তার বিষয়বস্তু খুঁজতে গিয়ে collective unconscious তত্ত্ব দেন। He interpreted the mental content of Schizophrenia much of which appeared to him archiac and archetypal, in terms of phylogenic collective unconscious, common to all men, a depsoit of primordial and primitive experience— অর্থাৎ মানুষের পরিপূর্ণ সভ্য মানুষ হয়ে উঠার আগের থেকেই বিধৃত হয়ে আছে social/collective unconscious বা যৌথ অবচেতনা। মানুষের যা কিছু গভীর অনুভূতি সবেরই উৎস এইখানে। কিছু কিছু মৌল প্রতীক বা Archetype বিভিন্ন ঘটনার প্রতি মানুষের যে প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিমলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Archetype বিমলের চরিত্র যথার্থ ব্যাখ্যা করে না। বিমল মানুষের সঙ্গ তেমন পছন্দ করে না। যে ছেলেটি তার পায়ে পায়ে ঘোরে তার সঙ্গেও তেমন সম্পর্ক তৈরি হয় না। যে কারণে বিমল এতটা আত্মমগ্ন, সমাজ বিমুখ। Psychiarty-এর ভাষায় বলা যায় introvert, withdrawn from society। এর সবচেয়ে সঙ্গত ব্যাখ্যা হল Bereavement বা প্রিয়জনের চিরতরে বিচ্ছেদ। বিমলের মায়ের মৃত্যু কারণ হিসেবে যথেষ্ট। বিমল নারী বিদ্বেষী নয় বরং সে একজন নারী যাত্রীর প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় এবং তখন সে জগদ্দলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেও ছাড়েনা। প্রমাণ হয় যে মনের মানুষ পেলে সে যন্ত্রকে মানুষ হিসেবে দেখতো না। মায়ের অভাব বোধটা এখানে বেশি কাজ করে, যদিও ঋত্বিক বাবু ছবিতে তা স্পষ্ট করে তোলেননি। ছবিতে গাড়িটির উপস্থিতি ইয়ং এর যৌথ অবচেতনার যথার্থ ব্যাখ্যা করে। আমাদের এ দেশের জীবনযাত্রায় আদিকাল থেকে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ বিরাজমান। তাই শিশুদের গাড়িটির প্রতি কাদা ছোঁড়ার দৃশ্য সংযোজন যৌথ অবচেতনায় যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশ করে। আদিবাসীদের নাচের দৃশ্য ব্যবহারের Archetypeও ইয়ং এর তত্ত্বকে প্রস্ফুটিত করে।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে শিশু মনস্তত্ত্বের যে রূপ দেখানো হয়েছে তা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। ব্যক্তিত্ব গঠনে বাবা-মা, গৃহ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা শিশু মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। ছবিতে একটা ছোট ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় আসে। বাড়িতে পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অনিশ্চিত অজানার প্রতি প্রবল আকর্ষণ শিশুটিকে বাড়ি

থেকে পালাতে প্রলোভিত করে। তারপর ঘটনা প্রবাহে সে উপলব্ধি করে—বাড়ির চেয়ে ভাল কিছু নেই। এই উপলব্ধি মানব সমাজে আদিকাল থেকে নিরাপদ আশ্রয় লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছে। তাঁর ছবির এক দৃশ্যে দেখা যায় শিশু কাঞ্চন স্বপ্ন দেখে সে তার মাকে বিরাট উপহার পার্সেল করছে। পিয়ন সে নিজেই, বাবা নিতে এলেন প্রথমে, তাকে সে কিছুতেই দেবে না, কাউকে না, শুধু তার মাকে উপহার দেবে। পিতার প্রতি বিরাগ শিশু কাঞ্চনের ব্যক্তিত্ব গঠনের পর্যায়ে মানসিক দ্বন্দ্বের ভুল সমাধানের ইঙ্গিত দেয়। শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠনের ৪র্থ বর্ষে Phallic stage-এ এই দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শিশু মাকে ভালবাসে, বাবাকে ভয় করে এবং স্নেহের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। এই পর্যায়ে বাবাদের অত্যধিক নিষ্ঠুরতা, প্রহার শিশু মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ফলে Parent identification conflict-এর সঠিক সমাধান হয় না।

বাবার কড়া শাসনে থেকেও ছেলেটি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে এলডোরাডোর কাহিনী। সে পুলকিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়। কল্পনায় সে নৌকা বায় অবলীলাক্রমে গহীন অরণ্যে, তার আস্বাদ যেন তার চোখে-মুখে। এটা infantile autism-এর পর্যায়ে পড়ে।

'অযান্ত্রিক' ছবিতে ঋত্বিক ঘটকের যে জীবন দর্শনের তীব্রতা দেখা গিয়েছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'তে তা আরো বেশি করে ধরা দিয়েছে। 'মেঘে ডাকা তারা'-র জগৎ হচ্ছে মধ্যবিত্তের গৃহবিচ্যুত দেশ বিতাড়িত পরিবারের অর্থাভাবের দৈনন্দিন জগৎ। প্রতি দিনের ক্লান্তিকর জীবন বিন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এ ছবির অন্যতম দিক। ছবির মূল চরিত্র নীতা : জীবনে সংগ্রামে ক্লান্ত বিধ্বস্ত তবুও বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা প্রবল। মানুষ জন্মের পর যখন উপলব্ধি করে তাকে একদিন মরতে হবে. তখন থেকে জীবন মৃত্যুর এই দ্বন্দ্ব জাগে মনে। একদিকে বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অপর দিকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। এই দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে যখন যক্ষাক্রান্ত নীতা পাহাড় ঘেরা পরিবেশে দাদাকে জড়িয়ে চীৎকার করে— 'দাদা আমি বাঁচতে চাই'। মানব জীবনের এই আর্তি পৃথিবীর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। নীতার চরিত্রের আরো এক দিক হল দেশীয় ঐতিহ্য ও উপকথার অনুষঙ্গ আরোপ। মেয়েটির জন্ম জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে। প্রতীককে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে পাহাড়ে যাওয়ার জন্য নীতার ব্যাকুলতায়। জীবনকেন্দ্রিক এই উপকথাবৃত্তির সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের যন্ত্রণার সংমিশ্রণ নিঃসন্দেহে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটিকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলে।

'কোমল গান্ধার' সেই সময়ের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মানসিকতার চিত্ররূপ। দেশভাগের যন্ত্রণায় রক্তাক্ত মন নিয়ে এক আধুনিক যুবক শান্তি খোঁজে শিল্পের সাধনায় আর সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীভৎস লীলায় মাকে হারানোর স্মৃতিদাহ বুকে নিয়ে দিন কাটায় প্রোষিতকান্তা এক মেয়ে। শিল্পের আংগিনায় এই ব্যক্তিত্বের মিলন ও তাদেরকে কেন্দ্র করে আরো বহু পোড় খাওয়া ছিন্নমূল অস্তিত্বের আবর্তন আর সমস্ত গ্লানির শেষে সবাইকার উত্তরণ এক সীমাহীন ভালোবাসার উদয় দিগন্তে, 'কোমল গান্ধার' ছবির বক্তব্য এইটাই। ছবির নায়ক দেশভাগের বিড়ম্বনার জীবন যন্ত্রণায় পীড়িত, সে যন্ত্রণার

উপশম সে খোঁজে শিল্পের মধ্যে। এখানে তার মানসিক দ্বন্দ্বের রূপ কে Sublimation বলা যায়। Sublimation is the defence considered most important to society as a whole, since it consists of diverting instinctual drive into personally and socially acceptable channels such as various form of creative activity. অর্থাৎ মানসিক দ্বন্দ্বের সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য উপায়ে বহিঃপ্রকাশ হয় সাধারণত সৃষ্টিশীল শিল্পের মাধ্যমে। ঋত্বিক ঘটকের নিজের জীবনে এই দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। এই মানসিক দ্বন্দ্বের উত্তরণ খুব সার্থকভাবে এই ছবিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম'— বাংলাদেশে তৈরি ঋত্বিকের ছবি। তিতাসের তীরে বসবাসকারী মালোদের জীবনধারা নিয়ে ছবিটি তৈরি। কিন্তু ছবিটি শুধুমাত্র কিছু মানুষের সুঃখ দুঃখের উত্থান পতনের কাহিনী নয়। তিতাসের দুই প্রধান নারী চরিত্র, বাসন্তী ও অনন্তের মা, বাঙালি নারীর জীবন চেতনার প্রতীক। এখানে নদীর ব্যবহার অনেকটা আদিম সমাজের 'টোটেম'-এর Archetype যাকে ঘিরে সমাজের মানসিকতা ও চিন্তা গড়ে ওঠে, যা অত্যন্ত জটিল হলেও ভিত্তিটা সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। বাসন্তীই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। দুইটি বিচ্ছিন্ন অংশের যোগসূত্র বাসন্তী। বাসন্তীই মালো সমাজ তথা বাংলাদেশ তথা তিতাসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বাসন্তীর মৃত্যুর মধ্যেই মালো সমাজের পরিসমাপ্তি হয়। আবার সে-ই স্বপ্ন দেখে নতুন সমাজের। বাসন্তীর মধ্যে ঋত্বিক ঘটক Great mother complex এর Sophia-র রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঋত্বিক ঘটক যে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বে বিশ্বাসী 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে সেই তত্ত্বের সবচেয়ে বেশি প্রতিফলন দেখা যায়। 'সুবর্ণরেখা'-র সমস্ত চরিত্রই প্রায় দেশ ভাগের শিকার। এরা সকলেই তাদের জীবনের মূল্যবোধকে ফিরে পেতে ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। আদি উপকথা বা Mythology এখনও আমাদের মধ্যে প্রতীক আকারে বিরাজ করছে। Myth and therefore civilization is a poetic supranormal image, conceived like all poetry indepth but susceptable of interpretation on various level— বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতীকগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় বিভিন্নভাবে। আদি উপকথার মূল সুর হল জন্ম-মৃত্যু-পুনঃজন্ম। ফ্রয়েডের কাছে Libido অর্থে যৌনতা যা ব্যক্তিগত ও চিকিৎসাশাস্ত্রীয়। ইয়ং-এর কাছে Libido প্রাণশক্তির উৎস যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত এবং মানুষের ধারাবাহিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অবচেতনা দ্বিবিধ, একটি ব্যক্তি স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভিড় অন্যটি সমষ্টিগত। সমষ্টিগত অবচেতনা ব্যক্তি পায় উত্তরাধিকার সূত্রে। আদিকাল থেকে অভিজ্ঞতা, অনুভব ও চিন্তা মানুষে মানুষে চলে এসেছে, তারই বিচিত্র রূপ নিয়ে জড়ো হয় Collective unconscious যা deposite of primordial and primitive experiences— সর্বকালের প্রাথমিক আদি অভিজ্ঞতার সার। সামাজিক যৌথ অবচেতনা থেকে জন্ম নেয় পূরাকল্পণীয় ইমেজ। এই প্রতীক ইমেজগুলো আদি উপকথার শৈল্পিক ফসল। সুতরাং

আধুনিক ব্যক্তিচিত্তের জীবনধারা ও জীবনভাবনার সঙ্গে আদি চিন্তা ভাবনা চেতনার ও উপকথার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। শিল্প সাহিত্যে এর প্রকাশ ঘটে Mythopia বা উপকথা বৃত্তি হিসেবে। 'সুবর্ণরেখা' এমনই একটি উপকথা বৃত্তিক শিল্প সৃষ্টি। এ ছবির ঘটনাপ্রবাহ আদি উপকথার ধাঁচে সাজানো। পুরুষানুক্রমিক ভিটে থেকে উদ্বাস্তু জীবন থেকে নব জীবন কলোনী থেকে ছাতিমপুর থেকে কলকাতায় এক রূপ থেকে অন্য রূপে, বাধা বিপদ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা মৃত্যুর দিকে। তারপরেও শিশু বিনুর হাত ধরে নতুনতর উজ্জীবন ও যাত্রা। বুড়ো ঈশ্বর, শিশু বিনু সবাই এগিয়ে চলে— দূরে আকাবাঁকা নদী, আরও দূরে নীল নীল পাহাড়, সেই খানে বাগানে প্রজাপতি ঘোরে আর গান গায়— বিনুও পৌঁছবে সেখানে আবার ভেসে চলে যাবে অজ্ঞাত দিগন্তে। সুবর্ণরেখা-র তীরে তীরে চলবে নিত্য কালের আসা যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু ও পুনঃজন্ম। কিন্তু শিশু বিনুর যাত্রাপথ নতুন আশাব্যঞ্জক জীবনের অবশ্যই ইঙ্গিত দেয়। ফ্রয়েডের আর একটি আবিষ্কার নিষিদ্ধ কাম। সন্তানের মধ্যে মাতৃ-পিতৃ গমনের নিভৃতচারী বাসনাকে লক্ষ্য করে তিনি Oedipus & Electra complex তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। ইয়ং এই তত্ত্বকে গ্রহণ করে অর্থ বদল করেছেন। তার মতে এই complex-এর মূল উৎস সহবাস নয় অন্যত্র। সীতার প্রতি ঈশ্বরের অনুরাগ, অভিরামের প্রতি তার ভালবাসায় বাধাদান, বিচ্ছেদে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এবং শেষে ঘুরে ফিরে বিশেষ পরিস্থিতিতে ও মনোভাব নিয়ে তারই কাছে ফিরে আসা— ছবির এই সচেতন ধারা একটি বক্তব্যকেই পরিস্ফুটিত করে তোলে— Oedipus complex.

শিশু সীতা বহুরূপীর কালীমূর্তি দেখে ভয় পায়। এখানে Great mother complex-এর Archetype ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুই রূপ, এক হচ্ছে কল্যাণকামী মাতৃমূর্তি Sophia আর অন্যটি হচ্ছে ত্রাসদাত্রী কালী, চন্ডীর রূপ। ইয়ং-এর সমাজভাবনা এবং তার অনুসঙ্গ সমাজবাস্তবতা, মহাকাব্যিকতা ও উপকথা বৃত্তি সমস্তের মিলনে 'সুবর্ণরেখা' যে বস্তু সত্যকে প্রকাশ করেছে, ইয়ং-এর ভাষায় : There is an identity of elementary human conflicts existing independent of time and space— অর্থাৎ সর্বকালে সবখানে মৌলিক মানবদ্বন্দ্ব বিরাজমান। এর সঙ্গে ঋত্বিক ঘটক আর এক ধারা সংযোজন করেছেন তা হল এই দ্বন্দ্বের উত্তরণ এক নতুন আশাব্যঞ্জক জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। এটাকে ছবি না বলে তার জীবন চিত্র বলা চলে। তাই এর কাহিনী নিয়ে নতুন কিছু বলবার অবকাশ নেই। তার সারা জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান (ভুল অথবা সঠিক যা হোক না কেন) এই ছবির মূল উপজীব্য। প্রধান চরিত্র মাতাল নীলকণ্ঠ বাগচীর পাশে জোটে জীবন যুদ্ধের আর সব মৌল উপাদান— বেকার যুবক, অসহায় বৃদ্ধ, বাংলাদেশ থেকে আগত ধর্ষিতা নারী, বক্তৃতাবাজ ভাড়াটে রাজনীতিবিদ, পুলিশের সঙ্গে লড়াই করা নক্সাল ছেলেদের দল। তাঁর সারা জীবনের চিন্তাধারা ও সমসাময়িক জীবন ধারার দ্বন্দ্ব এই ছবিতে ফুটে উঠেছে।

ঋত্বিকের জীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব দুই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এক. দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মধ্যবিত্ত বাঙালীর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ব্যাপক অপ্রতিরোধ্য অবক্ষয় তাঁকে নিজের জীবনে আত্মহননের পথে নিয়ে গেছে— ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে Thanatos of self destruction—অপরটি মানসিক দ্বন্দ্ব— sublimation আকারে সৃষ্টিধর্মী শিল্পকর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে সমসাময়িক জীবন ধারার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের উপস্থিতিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই দ্বন্দ্বের উত্তরণ এক নতুন আশাব্যঞ্জক জীবনেরই ইঙ্গিত দেয়।



অনন্ত : তিতাসের জলে ভাসা কচুরীপানা যেন

দ্য জিনিয়াস দ্যাট ওয়াজ ঋত্বিক ঘটক

মূল : সফদর হাশমী

অনু : সাজেদুল আউয়াল

ঋত্বিক ঘটক আর নেই, এ-কথা কলকাতাবাসীরা ১৯৭৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ভোর বেলায় জানতে পেরে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ঋত্বিকের মৃত্যু কলকাতাবাসীদের মধ্যে এক নজীরবিহীন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে— এ-মৃত্যু সংবাদ দ্রুত গতিতে এক মুখ থেকে অন্যমুখে দাবানলের মতো সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পী, সাহিত্যিক, কেরানী, শ্রমিক, চলচ্চিত্রের কলাকুশল ব্যক্তিবর্গ, চলচ্চিত্রকার, চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ, রাজনৈতিক কর্মী ও ঋত্বিক অনুরাগীরাসহ সমাজের সকল স্তরের শত শত মানুষ দুপুরের মধ্যেই প্রেসিডেন্সী গভঃহাসপাতালের গেইটের সামনে জড়ো হতে থাকে। অপরাহ্নের কিছু পর শব-যাত্রা শুরু হয়। এ এক অসামান্য পুরুষের এক দুর্লভ শব-যাত্রা—যে সব গান ঋত্বিক খুব বেশি পছন্দ করতেন হাজার হাজার মানুষ সে-সব গান গাইতে গাইতে কেওরাতলা শ্মসানঘাট পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় তাঁর শবদেহ।

কলকাতা আর ঋত্বিক এক সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে। যে কলকাতা '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, '৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকার, সিপিআই (এম) ও নক্সালাইটস্‌দের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ, '৭২-এর কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন দেখেছে— মধ্য সত্তরের দিকে সেই কলকাতার নাভিশ্বাস উঠে যায়। ঋত্বিকের নাভীর স্পন্দনও নগরীর সাথে সাথে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। বর্হিবিশ্বের কাছে এমত ধারণা বদ্ধমূল হয়, বিশেষ করে ১৯৭২-এর পর যে, কলকাতাবাসীরা এক মহা সংকটের মধ্যে বসবাস করছে। ঋত্বিকের শেষ ক'টা দিনে কলকাতার গুন্ডা ও টেরর-মাস্টারদের রাজত্ব ছিল প্রচন্ড। তবুও সেই নগরই— তার সন্তান যখন তাকে চিরদিনের মতো ছেড়ে চলে যায় তখন সন্ত্রাসের ছায়া মাড়িয়ে জেগে উঠে তার সন্তানকে বুক-উজার-করা শ্রদ্ধা জানাতে।

১৯৮২ সাল ঋত্বিকের প্রথম চলচ্চিত্র 'নাগরিক'-এর ৩০তম নির্মাণ-বার্ষিকী, এই চলচ্চিত্রকে অনেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আরম্ভ-রেখা বলে অভিহিত করেছেন। যদিও অনেকেই এ-কথা স্বীকার করবেন যে, তাঁর যে কোন চলচ্চিত্রই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সোনালী ও রূপালী ময়ূর পাওয়া চলচ্চিত্র গুলিকে গুণগত মানে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাঁর চলচ্চিত্রসমূহকে দর্শক প্রিয়করা বা আন্তর্জাতিক আসরে পরিচিত করার ব্যাপারে খুব কমই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু যেখানেই তাঁর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, সেখানেই তা সর্বোচ্চ প্রশংসা ও ভক্তি মিশ্রিত বিস্ময়ের সাথে গৃহীত হয়েছে। এখন সময় এসেছে ভারতীর কর্তৃপক্ষকে তার পূর্বেকার লজ্জাকর ভূমিকাকে ঝেড়ে ফেলার এবং

এমন কিছু করার যাতে করে শুধুমাত্র ঋত্বিকের চলচ্চিত্রিক প্রাচুর্যকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে না, ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রভা ও মানকেও গর্বের সাথে প্রতিপাদন করা যাবে।

১৯৫৫ সালে বিশ্বের তাবৎ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সমালোচকগণ একযোগে হঠাৎ সম্মিলিত উচ্ছ্বাসে আবিষ্কার করে এক নব প্রপঞ্চ যার নাম সত্যজিৎ রায়— যাঁর প্রথম প্রয়াস 'পথের পাঁচালী' প্রাচ্যের নব হিল্লোল বলে বিশ্বের কাছে প্রতিভাত হয়। তাঁকে চলচ্চিত্রের নব নন্দনতত্ত্বের উদ্ভাবক বলে স্বীকার করা হয়, ঘোষণা করা হয় এক নিপুন স্রষ্টা ও দিকপাল হিসেবে। তারপর থেকে এক শতকের সিকি ভাগেরও কিছু বেশি গত হয়েছে এবং রায় এখন চলচ্চিত্রের এক মহান শিক্ষক রূপে আন্তর্জাতিক ভাবে কবুলিত। তাঁর কাজ ভারত ও ভারতের বাইরের অনেক তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাকে প্রভাবিত করে এবং ভারতীয় আধুনিক চলচ্চিত্রকে একটি দিক নির্দেশনা দান করে বলেও অনেকে বিবেচনা করেন।

'পথের পাঁচালী' দিনের আলো দেখার প্রায় বছর তিনেক আগেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিস্ময়কর প্রতিভা ঋত্বিক ঘটকের ক্যামেরায় বিশ্ব চলচ্চিত্র ভাণ্ডারের এক গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র দৃশ্যায়িত হয়। কিন্তু এই চলচ্চিত্রটি কমার্শিয়াল-কাম-এলিট চক্রের বিরোধিতার কারণে এবং দাবিয়ে রাখার ফলে সকলের অগোচরেই থেকে যায়। এই চলচ্চিত্রটির নাম 'নাগরিক': নির্মিত হবার পর পঁচিশ বছর কাল ধরে এটি স্যাঁতস্যাঁতে গুদাম ঘরে, বলা যায়, অনন্ত অন্ধকারে পড়ে রয়। কেবল ১৯৭৭ সালে, এই চলচ্চিত্রের নির্মাতার মৃত্যুর এক বছর পর, পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং একটি প্রিন্ট বের করা হয়। এই চলচ্চিত্রটি যখন ভারতের বিভিন্ন শহরে প্রদর্শিত হয়, দর্শক সাধারণ তখন অনুধাবন করা শুরু করে যে ১৯৫২ সালে এই চলচ্চিত্রটিকে দাবিয়ে রাখার ফলে একদিকে তারা যেমন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক সৌকর্যময় ধারা সম্পর্কে অবিদিত থেকেছে অন্যদিকে ঋত্বিক ঘটকের পরবর্তী ক্যারিয়ারকে ধ্বংস করার মাধ্যমে গুরুতর অপরাধ করা হয়েছে।

এরপর ঋত্বিক ঘটক তাঁর অগোছালো এবং বেদনা বিধুর জীবনে কিছু স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র ছাড়াও সাত সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এবং সব সময়ই তাঁকে শাসক চক্রের রোষানলে পুড়তে হয়েছে। 'সুবর্ণরেখা'— তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র গুলির মধ্যে একটি, এই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবার আগে তিন বছর ধরে হিমাগারে পড়েছিল। 'আমার লেনিন' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এখনও জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের অনুমতি পায়নি— যদিও তা ১৯৭০ সালে নির্মিত হয় এবং ১৯৭১ সালে সেন্‌সর সার্টিফিকেট লাভ করে। তাঁর শেষ চলচ্চিত্র 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' (১৯৭৪) অনেক বাধা বিপত্তির পর প্রদর্শনের অনুমতি পায়।

তাঁর কাজকে যে ভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে তার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ এবং এখানে সে-সবের উল্লেখও বেদনাদায়ক। চলচ্চিত্র কলামিষ্ট, মহিমান্বিত করে যাদেরকে চিত্র

সমালোচক বলা হয়, তারা ঋত্বিক ঘটককে চূড়ান্ত কাঠামোবাদী এবং এক দুর্বোধ্য ও স্ববিরোধী ব্যক্তিত্ব বলে প্রচার করে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করেছে। ঋত্বিকের কাজ এবং এর গুরুত্বকে বিকৃত করার জন্যই এই ধরনের মতামত খুব চাতুর্য্যের সাথে ব্যক্ত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ কতটা অবদান রাখছে, সমালোচকের দৃষ্টি কেবল সেদিকেই নিবদ্ধ ছিল এবং এই সূত্র ধরেই তারা তাঁকে এক নিপুন কারিগর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে— বলেছে যে তাঁর একপেশে বিষয়বস্তু থেকে মাঝে মাঝে দীপ্তিমান অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়। ঠিক একই ধরনের আর একদল স্বার্থান্বেষী সমালোচক, যারা নিজেদেরকে উদার মতাবলম্বী রূপে জাহির করে, তারা এই মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে, চলচ্চিত্রকার হিসেবে ঋত্বিকের সংবেদনশীল মন তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুকে তুলে এনেছে এক ধরনের সীমাবদ্ধ রেজিমেণ্টালাইজ্ড চিন্তা-চেতনার গন্ডী থেকে,— তাঁর ইন্টেলেকচ্যুয়াল দায়বদ্ধতাই নাকি এই ধরনের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁকে বাধ্য করেছে।

দ্বিতীয় ধারার মতামতের পরিচয় পাওয়া যায় দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত এক প্রবণতার মধ্যে যেখানে ঋত্বিককে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এক বিরুদ্ধাচারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর এই কাজটি করা হয়েছিল চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নীতিবাগীশ ও তাত্ত্বিক পুরোধাদের বিরুদ্ধে ঋত্বিক লড়তে গেছিলেন বলে। IPTA-এর নেতারা সৃষ্টিশীল শিল্পীদের উপর যে নীতিমালা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখার যে পাঁয়তারা চালান, তার বিরুদ্ধে ঋত্বিকের প্রতিবাদকে অনেকে তাঁর মদ্যপান ও আপাত অরাজক ব্যবহারের মধ্যে খুঁজে বেড়ান। এই ধরনের সমালোচকরা ঋত্বিকের জীবনভর তাড়া খাওয়া ও মানসিক বিপর্যস্ততার জন্য যে সমস্ত চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা দায়ী, যারা তাঁকে অনিশ্চয়তা ও প্রগাঢ় ক্লেশের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন, তাদেরকে চিহ্নিত করতে চান না। চূড়ান্ত সংবেদনশীল কবি, পন্ডিত এবং শিল্পী যারা শিল্পকলার জগৎকে ব্যবসায়িক কারণে নিয়ন্ত্রণ করছিল এবং যারা নতুন চলচ্চিত্রের উৎসাহদাতা ও প্রতিপোষক হিসেবে ভান কবছিল, তারাই তো ঋত্বিককে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠায়। যে নির্বাসন তাঁর মানসিক ও শারীরিক পর্যায়ে ভাঙন ধরায়। এই সমস্ত সমালোচকরা আরও যা বুঝতে চাননা বা অস্বীকার করেন তা হচ্ছে যে, এই ধরনের অসহনীয় যাতনা থেকে ঋত্বিক বারবার জেগে উঠেছেন চলচ্চিত্র নির্মাণ করার জন্য— যে সব চলচ্চিত্র, আমরা যারা এই সত্তর ও আশি দশকের অবক্ষয়িত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ছি, তাদের শক্তির উৎস। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে যে আড়ষ্টভাব ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে ঋত্বিক কখনো পিছপা হননি এবং প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নীতিবাদী প্রতিভা সম্পন্ন শিল্পীদের মতো টলোমলো মনোভাবেরও পরিচয় দেননি। তিনি সর্বদাই তাঁর বক্তব্য এবং বক্তব্য-প্রকাশের মাধ্যমের প্রতি সৎ ছিলেন— তাঁর বক্তব্য জনগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং সে কারণেই তিনি তাদের জীবন সংগ্রামের চিত্র একের পর এক ধারণ করে

গেছেন। তিনি কখনোই তাঁর শিল্পকর্ম বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের হাতে তুলে দেন নি। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রে তিনি কখনোই পপ্যুলিস্ট এলিমেন্ট ব্যবহার করেন নি এবং আজকালকার তথাকথিত র‍্যাডিক্যাল চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মতো চট্‌-জলদি জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য কোনো সস্তা পথও মাড়ান নি।

ঘটক যখন ১৯৫২ সালে তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র 'নাগরিক' নির্মাণ করছেন— তাঁর হাতে তখন অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, স্বল্প বাজেট এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে কখনোই অভিনয় করেনি এমন সব অভিনেতা-অভিনেত্রী। তিনি এমন একটা মাধ্যমে কাজ শুরু করলেন—যে মাধ্যমের তখনও একটা discipline গোটা ভারতে দানা বাঁধেনি। তবুও, তাঁর বিষয়বস্তুর জটিল প্রকৃতিকে প্রক্ষেপণ করার বাসনায় ঋত্বিক এই মাধ্যমে এ যাবৎকাল সংগ্রহীত জ্ঞান তাঁর নিজস্ব চলচ্চিত্র-নির্মিতির প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করলেন এবং এমন এক শিল্পকর্ম সৃষ্টি করলেন যা একদিকে চলচ্চিত্রের কারিগরী ও ব্যাকরণ-কাঠামোর দিক থেকে যেমন এক ধাপ এগিয়ে যায় অন্যদিকে তেমনি তাঁর কাহিনীর conceptual treatment- এর ক্ষেত্রেও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বহন করে। প্রতিভাবান ঋত্বিক ছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন — তিনিই প্রথম 'শব্দ' কে চলচ্চিত্রিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবেন এবং দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তাঁর হাতেই, প্রথম বারের মতো 'শব্দ' ভারতীয় চলচ্চিত্র শুধু মাত্র সংলাপ ও এ্যাফেক্ট মিউজিককে উচ্চস্বরে তুলে ধরার পরিবর্তে চলচ্চিত্র-নির্মিতির সমগ্র প্রক্রিয়ার এক অংশ হয়ে ওঠে—যার ফলে 'শব্দ' দিয়ে একটা মন্তব্য, একটা কথা বা বক্তব্য—সংলাপ ও দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে রেখে যাওয়া সম্ভব হয়।

ঘটকের আরেকটি উদ্ভাবন যা তিনি 'নাগরিক'-এ ব্যবহার করেন এবং যা পরবর্তীতে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মিতির এক বিশেষ স্টাইলে পরিণত হয়—তা হচ্ছে deep focus ব্যবহারের সচেতন নকশা, যে নকশার দ্বারা তিনি তাঁর চরিত্র-নিচয়কে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতিবেশের মধ্যে দাঁড় করান। কেন্দ্রীয় চরিত্রকে দর্শকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার আগে তিনি panoramic sweep- এর মাধ্যমে মেট্রেপলিটন ক্যালকাটা, প্যান করে দীর্ণ বাসস্থান, দোকান-পাট, সুউচ্চ অট্টালিকা, বস্তি, সমস্ত শহর জুড়ে ইলেকট্রিক তারের জটিল বিন্যাস এবং রাস্তাভর্তি কাজে ছুটা কর্মব্যস্ত সাধারণ মানুষ দেখান। তারপর প্রায় ২০ ফিট উঁচু থেকে নেয়া লং শট্‌-এর মাধ্যমে তিনি প্রথম তাঁর চরিত্রকে পরিচিত করান, ভিড়ের মধ্যে একজন এক বৃদ্ধাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করছে। এরপর খুব নোংরা গলির ভিতর দিয়ে ভিক্ষুক ও বাজিকরদের পাশ কাটিয়ে তিনি ট্রাক শট্‌-এর মাধ্যমে তাঁর সাধারণ নায়কটিকে ঘরে নিয়ে আসেন। এতসবের পর যখন ক্যামেরায় ক্লোজআপ-এ নায়কের মুখ ধরা হয় ততক্ষণে দর্শকরা তাকে তাদের মাঝেরই একজন বলে ধরে নিয়েছে, যে কিনা কোনো অর্থেই অসাধারণ, নায়কোচিত, ধনী, হ্যান্ডসাম অথবা কাল্পনিক জগতের দুঃসাহসী কেউ নয়। তাঁর সব চলচ্চিত্রের সব চরিত্র সম্পর্কেই এই একই কথা প্রযোজ্য। এই স্টাইল পপ্যুলার এবং অধঃপতিত চলচ্চিত্র-

নির্মাণ ধারার বিরুদ্ধে এক সচেতন প্রত্যাখ্যান— যে ধারায় এক সর্বেসর্বা ব্যক্তির এক অদ্ভুত সংকটাবস্থা বা ভাগ্যই খুব সূক্ষ্ম ভাবে প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষণ করা হয়, যে ধারায় তারাই প্রত্যক্ষণ ও সমীক্ষণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন যারা যে ভাবেই হোক সাধারণ জীবন যাত্রা থেকে এক ধাপ উপরে ওঠে গেছে অথবা তার থেকে পালিয়ে গেছে দুরে।

এই ক্ষুদ্র পরিচিতি মূলক প্রবন্ধে ঋত্বিক ঘটকের কাজের পুরো খতিয়ান তুলে ধবা সম্ভব নয়। সেই জন্য, আমরা, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে এই প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর চলচ্চিত্রসমূহের মাধ্যমে গণ চলচ্চিত্র তথা চলচ্চিত্র-ভাষার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন, সে সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রে আসার আগে ভারতীয় চলচ্চিত্র, বলা যায়, তার শৈশব কালে অবস্থান করছিল। যদিও কিছু কিছু প্রতিবাদী সামাজিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, তবুও চলচ্চিত্র বলতে একটা অনুন্নত স্থির ক্যামেরায় একটা সোজা বর্ননা তুলে ধরাই বুঝাত—মনে হতো যেন একজন দর্শক আলোকিত মঞ্চের উপর একটা নাটক অবলোকন করছে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের দ্বারা তখনো চলচ্চিত্রের বক্তব্য-বিষয়কে ক্যামেরার এ্যাঙ্গেল, সম্পাদনার কৌশল, দৃশ্যমান প্রতীকী-ব্যঞ্জনা, দৃশ্য সংস্থাপন ও সন্নিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক কথায় বলা চলে চলচ্চিত্র একটি ভাষা হিসেবে বেড়ে ওঠেনি। ঋত্বিকই প্রথম বারের মতন দেখালেন যে movie camera কেবল মাত্র চিরখোলা একটি চোখ নয়, সে একজন ভাষ্যকার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক ও কবিও বটে, কেবল মাত্র চরিত্র-নিচয়ের জীবন গন্ডিতে উঁকি মারার জানালা নয়, এ হচ্ছে জীবনের অভিজ্ঞান, কাজে কাজেই এ-হচ্ছে দৃশ্যকাব্য, স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়ানো, ছুঁড়ে ফেলা, গ্রহন করা, প্রশ্ন তোলা, প্রতিবাদী হওয়া, হার মানা এবং জয়ী হওয়া। ঋত্বিক এই সূত্র ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরিমিতি বোধ এবং এই নতুন ভাষার সচেতন ব্যবহার-এর দিকটি তুলে ধরলেন। 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) থেকে শুরু করে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) এবং 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) হয়ে 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২) পর্যন্ত এসে দেখা যায় যে ঋত্বিক তাঁর কাহিনীর বহুস্তরতার কারণেই চলচ্চিত্রিক প্রকাশনের এক নব কাঠামো দাঁড় করে ফেলেছেন— যাকে তাঁর চলচ্চিত্র-নির্মিতির এক বিশেষ ধরন বলা যায়। 'সুবর্ণরেখা'-তে আমরা দেখি যে চলচ্চিত্রটি একই সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে বাহিত হয়ে চলেছে— সংলাপ, সঙ্গীত এবং ভিজ্যুয়াল ইমেজ কাহিনীকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব থেকেও আরও বেশি কিছু করে চলেছে। একত্রে বাহিত হয়েও প্রত্যেকে নিজস্ব একটি স্বত্ত্বা ধারণ করে চলেছে। প্রত্যেকে পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে নিজস্ব গতিতে চলছে এবং চলচ্চিত্রটিকে 'সমগ্র' হয়ে ওঠতে অবদান রাখছে, আবার এই সমগ্র থেকে একটি বেগবান 'অংশ' হয়ে ওঠছে ; যেমন, কখনো কখনো সংলাপ এবং সঙ্গীত একত্রে বাহিত হচ্ছে আবার কখনো বিপরীত পথে ধাবিত হচ্ছে— প্রত্যেকেই আলাদা একটি অর্থ বহন

করে চলেছে, এবং কোথাও কোথাও এ-দু'য়ের সংঘর্ষে আরো বেশি প্রণিধানযোগ্য একটি তৃতীয় অর্থ তৈরী হচ্ছে। ঘটক চলচ্চিত্র নির্মাণ করার সময় বাস্তব-জীবন পরিস্থিতি ও তার বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেন, আবেগ তাড়িত মেলোড্রামাকেও নেন— কিন্তু তাদের ইতিবৃত্ত এমন ভাবে তুলে ধরেন যাতে করে চরিত্রের সুস্থাপিত দুঃখ্যাবলীর আরো কিছু গভীরে দর্শকের সহানুভূতি বা বিরাগভাব প্রোথিত হয়ে যায় এবং তখন শ্রেণী প্রপীড়িত সমাজের দুঃখ, বেদনা, নিষ্ঠুরতা ও অবিচার-এর প্রতিরূপ ও তার অনুরণন দর্শকের মননে সৃষ্টি হতে থাকে। চূড়ান্ত মনো-দৈহিক যাতনা ও দুঃখবোধের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রোটাগনিস্ট চরিত্রদের চাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি একেবারে শেষে এসে নিশ্চিত করে বলে বসেন যে, 'জীবন চলিষ্ণু'। 'সুবর্ণরেখা'-য় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছেন ছোট্ট ছেলেটির মধ্যে, ছেলেটি ট্রাজিক হিবোকে হাত ধরে দিগন্ত রেখার দিকে নিয়ে চলেছে— যে রেখার ধারে দুঃখ ও যাতনা ভোগের ভিতর দিয়ে জীবন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখার বিমূর্ত প্রতিশ্রুতি আছে। 'মানুষ' শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এই বক্তব্য এতো স্থিরতা ও কাব্যময়তার ভিতর দিয়ে ঋত্বিক বলেন যা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক চলচ্চিত্র ও থিয়েটার শিল্পীদের থেকে আলাদা করে ফেলে। তাঁর সমসাময়িকরা একই বক্তব্য শ্লোগানের ভাষায় উচ্চস্বরে জানান দিয়ে যান— যা ঋত্বিক কোনোদিন করেন নি।

জীবনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার ব্যাপারে বাচ্চা ছেলের পুনরাবৃত্তি খুব সম্ভবত তাঁর চলচ্চিত্রে সব চেয়ে মূল্যবান device; তাঁর আটটি চলচ্চিত্রের মধ্যে পাঁচটিতেই এই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। অন্য তিনটিতেও এই একই বক্তব্য ভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। 'কোমল গান্ধার'-এ-একথা বিয়ের মাধ্যমে বলা হয়েছে, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'- তে পলাতক ছেলেটির গৃহে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে, 'নাগরিক'-এ মধ্যবিত্ত সুলভ মূল্যবোধ ও সমাজ ছেড়ে নিঃসম্বল এক পরিবারের ওয়াকার্স কোয়ার্টারে আশ্রয় নেবার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক, এমন একটি মাধ্যমে কাজ করেছেন যেখানে ব্যক্তিসর্বস্বতা-স্বেচ্ছাচারিতা প্রাধান্য পাবার কথা, বিশেষত যখন তাঁর চারিপাশে কোনো প্রাগ্রসর চলচ্চিত্র আন্দোলন ছিল না, কিন্তু তবু তিনি শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে সব সময় সজাগ থেকেছেন এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি নিজেকে কখনো ভবিষ্যত দ্রষ্টা অথবা প্রফেট বলে জাহির করার চেষ্টা করেন নি, বরং অত্যন্ত বিনীত ভাবে তিনি তাঁর কাজ ও সাফল্যকে বিচার করেছেন এই ভাবে, 'কোন চলচ্চিত্রকারই জনগণকে বদলাতে পারেনা। জনগণ অত্যন্ত মহান। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করে চলেছেন। আমি কেবল যে সব মহৎ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, সে গুলো ধারণ করে চলেছি।'

১৯৭৪ সালে অসুস্থ অবস্থায় এবং একেবারে স্নায়ুবিক ভাঙনের মুখে তিনি তাঁর সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' শেষ করেন। এ-এমন এক চলচ্চিত্র যাতে গতানুগতিক চলচ্চিত্রের ভাষা ও ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এবং এমন এক স্তরের

দক্ষতা ও শিল্প-সুষমা এতে পাওয়া যায়— যার ফলে ভাবতে বিস্ময় লাগে যে কি ভাবে এই চলচ্চিত্র দর্শকের আনুকূল্য পায়! এই চলচ্চিত্রে মনে হয় চরিত্ররা যেন পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে আর আপনিও তাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, তাদের কথার পক্ষে অথবা বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করছেন। এই চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঘটক স্বয়ং অভিনয় করেছেন এবং তাঁর নিজের জীবনই এতে ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে এমন ধাঁচে তুলে ধরেছেন যে তা দর্শককে তাঁকে সমালোচনা করতে বাধ্য করে। খুব সম্ভবত ঋত্বিক তাঁর চলচ্চিত্র-সমগ্র দিয়ে এ চেষ্টাটাই সারাজীবন করতে চেয়েছেন। হয়তো বা তাই একেবারে শেষে এসে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে এ-কাজটি করা সম্ভব একমাত্র এ-যাবৎকাল চলচ্চিত্রের ভাষা বলে যাকে বরণ করে নেয়া হয়েছে তাকে সচেতন ভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়েই।

এমত মহান চলচ্চিত্রকার, সারা জীবন যাঁকে বুর্জোয়া সমালোচকরা অপাংক্তেয় করে রেখেছে, এ্যাস্টাব্লিসমেন্ট যাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, এবং যারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের দ্বারা যাঁর ভবিষৎ বিনষ্ট হয়েছে, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ সালে মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাথায় অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি'-র চলচ্চিত্ররূপ দেবার কথাও ছিল। এ-সমস্ত কাজ তিনি আর এখন সম্পন্ন করবেন না সত্য কিন্তু তাঁর নাম বেঁচে থাকবে চিরদিন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর[১] তিনি আবার জেগে উঠছেন। জনগণ আবার তাঁর চলচ্চিত্র দেখতে চাইছে। তাঁর সময়ের সমস্ত শত্রুরা মিলে তাঁর যে শিল্পকর্মগুলিকে ধ্বংস করতে পারেনি, তাদেরই জনগণ আবার পুনরুত্থান ঘটাচ্ছে। তাঁর কাজ অচিরেই নতুন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের উৎসাহের-প্রেরণার স্থল হিসেবে প্রতিভাত হবে। তাঁর চলচ্চিত্র বিবেচিত হবে চরম উৎকর্ষতার প্রতীক হিসেবে।

---

১. লেখক ১৯৮১ সালের কথা বলছেন।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে বৈপরীত্য

শৈবাল চৌধুরী

সমালোচকদের মতে এটাই (বৈপরীত্য) ছিল নাকি ঋত্বিক কুমার ঘটকের সৃষ্ট চলচ্চিত্রকর্মের প্রধান ত্রুটি। কিন্তু এটাই যে ঋত্বিক চলচ্চিত্রের প্রধান গুণ এবং বৈশিষ্ট্য তা যেমন ঋত্বিক নিজে বারে বারে বলে গেছেন তেমনি বলেছেন ঋত্বিক বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে প্রথমে সবিশেষ দৃকপাত করেন পুনার ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ঋত্বিক অধ্যাপক হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। হৈমন্তী ঋত্বিকের বিভিন্ন ছবির পরস্পর বিপরীত ধর্মী পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে অর্থপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং এই যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ আরো কিছুটা পরিলক্ষিত হয় ড. বাধন সেনগুপ্ত, সুবিমল মিশ্র, আশিস রাজাধ্যক্ষ, রজত রায় এবং ধীমান দাশগুপ্ত প্রমুখের মাঝে। তবে বুদ্ধিজীবী সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বিনা অনুধাবনে আলোচ্য বিষয়সহ আরো নানাবিধ কারণ দর্শিয়ে ঋত্বিক ঘটককে তুলোধুনো করবার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছেন। মনে হয় 'ঋত্বিক নস্যাতকরণ ব্রত' ই বুঝি তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। জীবদ্দশাতে এই শিল্পীর সৃষ্টির ও দর্শনের মূল্যায়ন হয়নি যা তাঁর অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী।

'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' পর্যন্ত সমাপ্ত ও মুক্তিপ্রাপ্ত আটটি কাহিনীচিত্রের মাঝে মেলোড্রামা, অসংলগ্নতা, সঙ্গীতের অতি ও অপপ্রয়োগ, কারিগরী অসমন্বয় এবং পরস্পর বৈপরীত্য ইত্যাকার বিবিধ অভিযোগে ঋত্বিককে ব্যর্থতা আর অযোগ্যতার দন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে বহুবার। এক্ষেত্রে পরস্পর বৈপরীত্য এবং কারিগরী অসমন্বয়ের ব্যাপারে ঋত্বিক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধতায়। প্রথমটি নিয়ে এখন আমরা আলোচনারত আর দ্বিতীয়টি পরিলক্ষিত হয় 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'য়। এ দু'টি কাজ ঋত্বিক করেছিলেন একই সাথে দুই বাংলায় এবং সে সময় তিনি ছিলেন প্রচণ্ড অসুস্থ। কাজ শেষে শয্যা নেন হাসপাতালে। কারিগরী কিছু দিক বিশেষ করে তিতাসের সম্পাদনা ও যুক্তি তক্কের শব্দগ্রহণে তাঁর সম্পৃক্তহীনতার কারণে ত্রুটি লক্ষণীয়।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি পংক্তি "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা" ঋত্বিক তাঁর 'কোমল গান্ধার' ছবিতে শব্দ মন্তাজ হিসেবে প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন ভাবে। বঙ্গভঙ্গের বিচিত্র রঙ্গ ঋত্বিক তাঁর সমাপ্ত অসমাপ্ত সকল চলচ্চিত্র কর্মে এনেছেন এবং দেখিয়েছেন এর অসারতা যা তাঁর চলচ্চিত্রের অন্তসুর। ঈশ্বর গুপ্তের পংক্তিতে যে ভাঙা বাংলার রঙ্গের কথা বলা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তা তো পরস্পর বৈপরীত্যই যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত। সমাজ সচেতন ঋত্বিক তারই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন বারবার আয়রনি,

দ্ব্যর্থকতা আর বিদ্রূপতার আশ্রয়ে। এখন এসবের আক্ষরিক এবং সরলীকৃত ব্যাখ্যা খুঁজতে যেয়েই যত বিপত্তি। প্রচ্ছন্ন গূঢ়ার্থ অনুধাবনে এর একমাত্র স্বস্তি।

'নাগরিক' ঋত্বিকের প্রথম চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র কর্মে নায়ক রামু সবসময়ে একটি ছিমছাম বাড়ির স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু তার জীবন কাটতো বস্তিতে। বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত যৌবন। বাবার পেনশনের অঙ্গুলিমেয় টাকায় সংসারচক্র অঘূর্ণমান। বাড়তি উপার্জনের আশায় ডেকে আনা পেয়িং গেস্ট যখন রামুর বোন সীতাকে সপ্রেম সহযোগিতা প্রদর্শন করে সীতা তাতে করুণা এবং ছলনার ছায়া দেখে এবং কপটতার ভান করে শেষে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়ে নতুন বাড়ি ও সংসারের কথা বলে। রামু তার ঘরে সুন্দর একখানা বাড়ির ছবিঅলা ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে সেইমত একখানা বাড়ির কথা তবুও ভেবে চলে। এখানে সমালোচকদের দৃষ্টিতে পরস্পর বৈপরীত্য হচ্ছে রামুর অসম বাসনায়, যার খাওয়া-পরার কোন স্থায়িত্ব নেই, নেই মাথা গোঁজার স্থিতি সে কি না ভাবে সুন্দর বাড়ি গড়ার স্বপ্ন! আর সীতা যার কিনা বর্তে যাওয়া উচিত প্রেমের আহবানে সে যাচাই করে আহবানের নেপথ্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যা, তা হচ্ছে রামু সীতা এরা সবাই দেশভাগোত্তর ছিন্নমূলাক্রান্ত এবং চাপগ্রস্ত নগরী কোলকাতার নাগরিক। তাদের বর্তমান অবস্থার জন্যে দায়ী তারা নয়। আর উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শন কিংবা নতুন জীবনের আহবানের ধরন বিচার সহজাত এবং মানবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু এসবের অসংলগ্নতার জন্যে দায়ী হচ্ছে সমাজের কৃত্রিম সৃষ্ট জটিলতা এবং বৈপরীত্য। দ্বিজাতিতত্ত্বের দোহাই পেড়ে ত্রিভঙ্গ উপমহাদেশ এবং দ্বিভঙ্গ বাংলা পাঞ্জাব কাশ্মীরের বিপর্যস্ততা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তকদের অসার চিন্তা-চেতনা, পরস্পর বিপরীত ধ্যানধারণা এবং কূপমন্ডুকতার স্বাক্ষর বহন করছে। কাজেই 'নাগরিক'-এর আপাত বৈপরীত্য আরোপিত কোনো বিষয় নয়, তা সমাজ বৈপরীত্যেরই প্রতিফলন।

'অযান্ত্রিক'-এ যন্ত্রের উপর মানবিকতা আরোপ, যন্ত্রের সাথে মানুষের অযান্ত্রিক অর্থাৎ আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কিন্তু সবশেষে যথারীতি যন্ত্রের অসারতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন পরস্পর বৈপরীত্যই তুলে ধরে। কিন্তু হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তা ভিন্ন দ্যোতনার পরিচায়ক। শিল্প বিপ্লব ঘটিত যান্ত্রিকতা ও মানবিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তৎসৃষ্ট মানবিকতার ক্রমাবনয়ন ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঋত্বিক এ ছবিতে তুলে ধরেছেন গাড়ি জগদ্দল ও তার মালিক বিমলের সম্পর্কের দ্ব্যর্থকতায়। এতদাঞ্চলীয় মানুষের যন্ত্রের প্রতি অতিক্ষমতাসম্পন্ন মানবত্ব ও দেবত্ব আরোপ (এর নেপথ্যে এ অঞ্চলের নিজস্বরীতির কৃষিভিত্তিক জীবন ধারণ, যা কয়েক হাজার বছর আগের ইতিহাসে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানের এই চূড়ান্ত অগ্রগতির যুগেও সমপ্রবহমান এবং যা শিল্পস্থাপনার অগ্রগতিতেও তেমন বাধাগ্রস্ত নয় তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান) এবং যে যান্ত্রিকতা তাদের নিস্তরঙ্গ ও সাধারণ জীবন যাপনে তেমন ঢেউ তোলেনি ও তোলেনা সেখানেই পরস্পর বৈপরীত্য নিহিত।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে'তে কিশোর কাঞ্চন মুক্তির অন্বেষণে আর বৃহৎ জীবনের হাতছানিতে নগর জীবনের নিষ্ঠুর শূন্য আড়ম্বরপূর্ণ দ্রুতগতির স্বাদ পায়। ছেলেধরা, প্রতারক, শিশু ভিখিরি আর চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়ে বিচিত্র যত বৈপরীত্যের সন্ধান পায়। শহরের চাকচিক্য তার কাছে দগদগে পোড়া ঘায়ের উপর সুগন্ধী ক্রীমের প্রলেপ মনে হয় তাই পার্কের রেলিংকে সে দেখে জেল খানার গরাদের মতো। এই শহরে গাড়ি চলে চাকাও ঘোরে কিন্তু গাড়ি এগোয়না। কাঞ্চন তাই আবার ফিরে যায় গ্রামে মায়ের কাছে।

'মেঘে ঢাকা তারা' দেশভাগজনিত ছিন্নমূল সমস্যা একটি জাতিকে কী চরম অসহায়তায় ঠেলে দিল তা পূর্ববঙ্গের একটি রিফিউজি পরিবারের টানাপোড়েনে প্রতিভাসিত করেন ঋত্বিক। পরস্পর বৈপরীত্য যে সমাজের স্তরে স্তরে সংক্রমিত সে সমাজের এক যুবতী নীতা ছেঁড়া স্যান্ডেলে সেফটিপিন গেঁথে অমানুষিক পরিশ্রমে ভাঙা সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করে, নিজের প্রেমকে উৎসর্গ করে ছোট বোনের জীবনে, বড় ভাইকে গড়ে তোলে শিল্পী রূপে, বাবাকে ব্যাকরণ বই ছাপানোর স্বপ্নে আবিষ্ট রাখে আর সবশেষে পাহাড়ের কোলে শেষ আশ্রয় নিয়ে কেঁদে আকুল হয় 'দাদা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম।' বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এ ছবির মূল উপজীব্য ... জীবনই মৃত্যুর বলি, পুনরুজ্জীবনের আবশ্যিক খেসারত, একটি জীবনের বিনিময়ে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের কাহিনীর ধারায় ব্যাপকতর পুরুষার্থের সংজ্ঞায় বিষয়বস্তু নির্দেশ করতে হলে বলা যায়, ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিসত্ত্বার অভিব্যক্তি খোঁজে স্বকীয়তার আত্মরতিতে নয়, অনন্যতার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাতেও নয়। নির্ভীক আত্মদানের মহিমায়, আর যেহেতু সমাজে অন্যতর স্বার্থের তাগিদ গদীয়ান, যেহেতু সেখানে প্রত্যেকে নিজের তরে কেউই পরের তরে নয়। তাই বঞ্চনা, নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতা ও পরিশেষে মৃত্যুই ভবিতব্য।'

রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার দেশভাগের পর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিপর্যস্ততা, দ্বিধান্বিত নেতৃত্ব ; অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভাঙনের চিত্র পাই আমরা কোমল গান্ধারে। এ ছবির নায়ক নায়িকা ভৃগু আর অনসূয়া পদ্মার পূর্বপারে রেখে আসে তাদের দেশকে। পশ্চিম পারে গিয়ে তারা দেশকে পেতে চায় সাংস্কৃতিক মিলনের বাঁধনে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভুয়া অসার এবং মধ্যযুগীয় দোহাই খণ্ড বিখণ্ড বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা ভৃগু আর অনসূয়া, যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৈশাচিক বিভৎসতায় হারিয়েছে মাকে তারা মানসিক শান্তি খোঁজে গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। সাংস্কৃতিক বাঁধনে জুড়তে চায় ভাঙা বাঙলাকে। কিন্তু রাজনৈতিক ভণ্ডামির শিকার তখন বামপন্থী আন্দোলনও। যে আন্দোলন শুনিয়ে গেছে মানুষকে শান্তির ললিত বাণী। তাতেও তখন ভাঙনের ক্ষয়। আর তারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন গণনাট্য সংঘেও। সেখানেও দলাদলি, রেষারেষি আর দ্বিধা ত্রিধাবিভক্তি। তাই নাটক পাগল ভৃগুকে সবাই ছেড়ে গেলে কর্মী গগন নতুন নাটক নিয়ে আসে 'এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা', ভৃগু অনসূয়ার বিচ্ছেদে বিবাহের গান বাজে, রেল লাইন চলতে চলতে হঠাৎ কাষ্ঠ নির্মিত

সীমান্তে বিভক্ত হয়ে থেমে যায় আর সৃষ্টি করে একই ভূখন্ডে আন্তর্জাতিক সীমানা, সাথে আছড়ে পড়ে চাপাকান্না 'দোহাই লাগে'।

ঋত্বিকের অন্যান্য ছবির তুলনায় 'সুবর্ণরেখা'-ই পরস্পর বৈপরীত্যের অভিযোগে বেশি অভিযুক্ত। সমালোচকেরা এ ছবির প্রতিটি দৃশ্যে খুঁজে পেয়েছেন বৈপরীত্য। আর ঋত্বিক নিজেও এর সত্যতা স্বীকার করে সমালোচকদের সততার প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, 'যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, সেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি, সেখানে যত অস্বাভাবিক কিছুই স্বাভাবিক।' সুবর্ণরেখায় তীব্র হয়ে উঠেছে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। তাই এ ছবির শব্দে ও দৃশ্যে রয়েছে ইচ্ছাসৃষ্ট বৈপরীত্য। এ ছবির মুখ্য নারী চরিত্রের নাম 'সীতা', পুরুষ চরিত্র হচ্ছে 'অভিরাম' আর 'ঈশ্বর'। এই নামগুলি বিশেষ মোটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। সীতা উর্বরতার দেবী, রাম সাহস আর সততার দেবতা আর ঈশ্বরতো স্বয়ং সর্বংসহা। কিন্তু 'সুবর্ণরেখা'য় আমরা দেখি সীতাকে স্থাপন করা হয়েছে বিহার সীমান্তের রুক্ষতায়, যেখানে ধু ধূ অনুর্বর শূন্য প্রান্তর, শুষ্ক সুবর্ণরেখার ক্ষীণ ধারা, আর রয়েছে ভাঙা পরিত্যক্ত বিমানপোত। এই ভাঙা বিমানপোতে সীতা নেচে নেচে গায় 'আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা'— ফসলের গান। এই বিমানপোতে ঋত্বিক প্রধান চরিত্রগুলিকে উপস্থাপন করেন বিভিন্ন পারসপেকটিভে। অভিরামকে দেখি অসহায় পরাশ্রিত আর জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত ও পরাজিত রূপে। আর ঈশ্বব বিপর্যস্ত এক চরিত্র, ছিন্নমূল হয়ে ছোট বোনকে নিয়ে জীবন সংগ্রামরত, আপন ইন্দ্রিয়ের সাথে করে প্রতারণা, যে অভিরামকে মানুষ করে সস্নেহ ছায়ার শীতলতায় তার সাথে বোনের সম্পর্ক আর বিবাহ মেনে নিতে পারে না অজ্ঞাত কুলশীলতার দোহাই দিয়ে। নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যায় সহোদরা ভগ্নীর দেহ সম্ভোগে, ভগ্নী সীতা খদ্দের রূপী আপন ভাইকে দেখে চরম বিভৎস আত্মহননে জীবন সমর্পণ করে আর সবশেষে ঈশ্বর ভগ্নীপুত্রকে নতুন বাড়িতে যাবার মিথ্যে আশ্বাস শোনায়। পূর্বেই বলেছি এ ছবির দৃশ্য ও ধ্বনির বৈপরীত্যের কথা। কোলকাতার শুড়িখানায় অশ্লীল উদ্দ্যমতায় তাই বাজে প্যাট্রিসিয়ার সুর, ভাঙা বিমানপোত, শুষ্ক প্রান্তর আর কোলকাতার নোংরা বস্তিতে তাই সীতা গায় 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা'র গান আর হরপ্রসাদ মাঝে-মাঝে শুধোয়, 'রাত কত হলো'? আমাদের এই গেরোলাগা সমাজের পরস্পর বৈপরীত্য আর চরম অর্থহীনতায় তাই ঋত্বিক প্রশ্ন রেখে যান, 'রাত কত হলো' ?

'তিতাস একটি নদীর নাম' বিষয়বস্তু আর উপস্থাপনরীতির কারণে ঋত্বিকের আলোচ্য আঙ্গিকের প্রভাবমুক্ত আর তা সচেতনভাবেই করা। কারণ, ঋত্বিক এখানে শুনিয়েছেন জীবনে গান শত দুঃখ দুর্দশা আর ত্যাগের সুরে বেঁধে।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'—জীবনের এই অন্তিম সৃষ্টি থেকেও ঋত্বিক মুক্ত হতে পারেননি অসংলগ্নতা আর বৈপরীত্যের অভিযোগে। নিজের জীবন কাহিনীর

পারসপেকটিভে ঋত্বিক এই ছবিতে দেখিয়েছেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ফাঁপা খোলস, ভন্ডামী আর অবক্ষয়। পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যুক্তি তর্ক সমন্বিত এই ছবি প্রায় ডিডাকটিক, নীতিশিক্ষামূলক। এই আলাপমূলক ছবিটি থেকে ঋত্বিক রোমান্টিকতাকে বাদ দিতে চেয়েছেন, প্রচলিত অর্থে সৌন্দর্য সৃষ্টি থেকে দূরে থেকেছেন। এ ছবি তাঁর নিজের বিরুদ্ধে তাঁর জীবনের যারা অংশ তাদের বিরুদ্ধেও। নিজের ও চারিদিকের জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই ঋত্বিক জানাতে চান। তাই দৃষ্টি নন্দন হতে দেন না ছবিটিকে, মাঝে মাঝে মনে হয় কাঁচা, বারবার আটকে গেছে স্রোতটি। কিন্তু সেটি ইচ্ছাকৃত কেবল তর্ক জমে কেবল কথা বলা'। তাই এ ছবিতে বুদ্ধিজীবী নীলকণ্ঠ রূপী ঋত্বিক বলেন, 'আমি একজন Brocken Intellectual— তোমাদের ভাষায় ক্ষয়িষ্ণু ক্ষয়ে যাওয়া শ্রেণীর ফুরিয়ে যাওয়া প্রতিনিধি— আমি Confused— fully confused, দিশেহারা হয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো সবাই আমরা Confused', তাই চারিদিকে এত স্বার্থান্ধতা অস্বাভাবিকতা আর অসংলগ্নতা দেখে মাতাল কণ্ঠে গান ধরেন, 'কেন চেয়ে আছো গো মা'। একাত্তরের বাংলাদেশের লাঞ্ছিতা নারী বঙ্গবালা, নীলকণ্ঠ, সত্য, নচিকেতা, দূর্গা নামগুলি বিশেষ মোটিফে ব্যবহৃত। ...। বামপন্থী রাজনীতির ভেতরের দলাদলি, বুদ্ধিজীবী মহলের কূপমণ্ডুকতা চরম সাহসিকতায় ঋত্বিক তুলে আনেন এখানে। দীপেন্দু চক্রবর্তী তাই বলেন, 'বাইরের নৈর্ব্যক্তিক রাজনৈতিক বিবর্তনকে নিজের ব্যক্তিক অনুভূতি ও উপলব্ধির ভাষায় প্রকাশ করা, অর্থাৎ একই সঙ্গে একটি ছবিকে আত্মজীবনীমূলক ও রাজনৈতিক করে তোলা এবং আত্মজীবনী বলেই রাজনৈতিক, রাজনৈতিক বলেই আত্মজীবনী— এই যে দৈহিক সমীকরণ দু'টি ভিন্ন জগতের, এরকম প্রচেষ্টার দুঃসাহস একমাত্র ঋত্বিকই দেখিয়েছেন এখনো পর্যন্ত'। ঋত্বিকের চলচ্চিত্র চেতনা ছিল যথেষ্ট প্রাগ্রসর এবং ঐতিহ্যের নিগূঢ় দ্যোতনায় মন্ডিত। ফলে আমাদের পক্ষে তাঁকে বিশ্লেষণ করাটা অনেক সময় রীতিমত বালখিল্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই সুবিমল মিশ্রের মন্তব্য স্মরণযোগ্য, 'দুঃখ হয় যখন আমাদের মত ছদ্ম বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি হীনতার কথা বলে, সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গীর খামতির ওজর তুলে তাঁকে সমালোচনা করি'। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র শেষ দৃশ্যে আহত নীলকণ্ঠ সকাল বেলার আলোয় পুত্র সত্যের মুখ দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু এতো কেবল পুত্রের মুখদর্শন নয়। এতো সত্যদর্শন। তাই এ ছবি অর্থাৎ ঋত্বিকের শিল্প সৃষ্টির শেষ হয় জীবনের কথা বলে, ... জীবন জীবিতের ধর্ম। বহতা অমোঘ দুর্নিবার। ঋত্বিকের কথাতেই সমাপ্তি— 'জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। জন্মই জীবন, শিল্পই জন্ম।'

Ritwik Ghatak

Kumar Shahani

An acid staircase in a laboratory. Followed by a velvet carpet, the colour of a deep cavern. You would hardly except to immerse yourself in golden reflections.

Yet, there they were, shimmering in the light of sorrow.

'The ground has slipped away from under our feet, we are airy nothings'

What is the song of sundering that calls itself Suvarnarekha ?

The earth's cleavage gave birth to Sita and the earth took her back.

In between were the wars, the usurpations, the hunger...In between are the demolitions, riots, bombardments, airfields the quenching of thirst and the assoilment and release from the cycle of birth.

And, of course, there is the boatman from whose boat the net is cast to fish or to ferry across divinities. Sita, frightened by the Bohurupee, Are you scared of all the forms that you assume yourself ?

'After a whole day's shooting, we encamped on the river bed, things were not perfectly cohesive in my mind. The outdoor shooting was rather scattered and disjointed. One fine morning, my little daughter came running and described how she had been terribly frightened in her solitary loitering by a Bohurupee who dressed like the goddess Kali. My daughter reminded me of Sita...'

Then,one day, Bulbuli, having nestled among the silhouettes of dark fruit, comes like a breath of fresh air upon my balcony. 'I am Ritwik's daughter', she says. The domes that were the vaults of heaven no longer surround us, nor pervade our being. She presents the debris to my daughter, Revati.

'...the paramount criterion of beauty in domes (is) their apparent lightness...'

'I'd a felling it would hurt you if I displayed the body's seals of love'.

A Eurasian woman screams at me for endorsing Nita's tragedy by

praising Meghe Dhaka Tara's structure that makes 'her cry, as she collapses in the hills that she had dreamt of, affirming again her life's desire'.

You know the 'girl' whose slipper-straps snap again is watched by us and she smiles at history's tragic exultation...

'To redeem and liberate our sensibilities from the oppression of the known and usher them into a realm of re-awakening through heightened authentic experience,'

Sometimes through crude whip-lashes.

At other times through 'a symphony or the harmonic rendering and growth of a raga'.

Is that possible ?

A Malhar in the rain-shadow.

'Come, I will show you a birth'.

He stood upon a horizontal vein of a hill at night in front of Studio No. 1, the light reflecting off his glasses, the glare from a bulb high amongst the creepers hanging over a shed that had housed other peripatetic incarnations:

Sant Tukaram, Eknath, Gnyaneswar.

Witness a birth in a re-recording studio.

The water falls in great drops in puddle upon undulating rock:

Sa re pa ga-a

Re sa re (sa)

Ma Pa Ni (pa)

-Dha-Ni (Ni) Sa

Hours of the night and early morning inverse as the projectionists change reels for the next mix.

In the adjoining room, the prohibited hooch looks like hypo in a glass to which the volcanic water's mineral gives an unscrubbed look of frost.

'Buddham Sharanam Gacchami'.

If I felt the other is the source of the self, why give up desires?

'When shall I crush you against my pitcher breasts ?...'

Just hide the sorrow with laughter, make every occasion with obscenities and know that all your longing and significance has its home in shunyata.

Sleep at sunrise.

All this in retrospect 30 years and more after the event, 180° panoramics searching for the transformation of Bhava, 1976. 'Don't come to the funeral. There are people shouting slogans over Ritwik's dead body. You will be distressed.'

I was in Calcutta for a seminar by coincidence. I went to walk on college street, having observed without protest a minute's silence. ...I've left un-said the phase we are now passing through, a period of neo-colonialism, absolute neo-colonialism... You see what I've done. I won't speak out. The then existing socio-economic conditions that affected townspeople and villagers all alike are fundamental in this picture. There might be some autobiographical touches though it is not autobiographical in the strict sense.

Is it a mock autobiography of a ventriloquist ? (Geeta Kapur).

Yes emphatically so.

'Go and see my acting', he said to Karuna Bandopadhyay the last time that he met her.

'That's why I have come', She said and she tells us: '...he did not act in Jukti Takko Ar Gappo. He only leafed through the pages of his life. Some of them were torn, some were brand-new'.

'My days were spent on the Padma... The people on the passenger boats looked like dwellers from some distant planet. The large merchant ships... carried sailors speaking a strange tongue... I saw the fishermen. In the drizzling rain a youthful tune would float in the village air... I have rocked in the steamer on the turbulent river after dark, and listned to the rhythmic sounds of the engines, the bells of the sareng, the cry of the boatmen measuring the depths.'

Years later he flew over it Weeping. Is the epic form merely the superstructural symptom of the Asiatic mode of production. Every artist has to learn his own private truth through a painful personal process... there is no such things in the world called a class-less art.

The great bloody starting, perhaps with Asoka's self-criticism on the battlefield, were to end all sacrifice.

The transition from ritual to art perhaps also took place at the same instance, politcally. Its earlier manifestations were linked more to the multiple contradictions within nature, within culture: a complex of ambivalences that fractals reveal in relatively simplified patterns.

The simplified patterns express themselves not only in surfaces, continuously designed in alpanas, in embroidery, basketry and 'trans-

formed' into dances of community (Ritwik's Oraons), though projections of the self (itihas). Rama as the puroshottam maryada cannot escape contradiction. Nor can the Ramayan itself with the interruption of love-making of the birds that visit sorrow upon the world.

'Ghatak launched with Ajantrik a new investigation into film form, expounding the refugee experience into an universal leitmotif of cultural dismemberment and exile, evoking an epic tradition, drawing on tribal, folk and classical forms.'

The Oraons accepted the plough while giving up the hoe and the implements of war. Their ironsmiths did not develop them. They stuck to magic, removing terror through dance, not through reason and the beginnings of religion.

They did not accept class contradiction as a necessary force within their society but suffered from it arriving upon itself as it elaborated the vir rasa in multifarious modes of oppression, sanctioned by the progress of religion: the priest with his appropriative formalisations, the warrior with his cannons, the moneylender with his accounts.

Yet, possibly the Mauryas were Sudras who consolidated the state (Interpreting Early India— Romila Thapar), centralised it and took it forward into a higher realm, both of material welfare and spiritual tolerance, even as it launched us on to the turbulent rivers of knowledge and history.

Narbada, rakt-varni, continues to demand sacrifice through the agency of civilisation: language, organisation, art, even movements of counter-culture decimating unities as structured hierarchies while proposing horizontal multiplicities that are as vulnerable as vermin are to winged creatures, fortified with bombs and mutations in the air. Narbada, Ganga the Mississippi.

Traders strike coins which are ratified by the kings. the oligarchies, the democracies, where demos suddenly refers to mobs, temporarily coming together to impose sectarian concepts of truth as cover-ups for their anomie. The world splinters into discrete fragments, of the nation, of the classes, of the genders, of the body and the mind while the economy globalises. We have in India to day a Miss Universe and a Miss World a Miss beautiful Eyes, Hair, etceteras.

Ritwik's metaphors for the self-liberation that ended up in schizophrenic self-annihilation now seen to tear through the cultures of all lands simultaneously with the take-over by a uni-polar economy. the riots in Bombay were unprecedented; elsewhere new nations come up

with populations less than one-third or one fourth that of the island-city.

Meanwhile, uniform codes have been hammered out, for intellectual property rights, trade and tariff agreements that will set up audio-visual regimes, conquering not territories, but the hearts and minds, the environment of invisible sacred places, the acoustics of unheard songs.

After all, overtonal implications are imagined; it is not a matter of simple technical realisations of the melodic, the harmonic, the modulatory.

Improvisations themselves have different dialectics in different cultures.

Their signification changes from individual to individual, from moment to moment in contexts that are as swiftly gifted to the past or the future as they appear in the present.

How can one try and patent, possess, commodify, release or consume a 'badhet' (an elaboration) or the unanticipated glimpse of eternity. Badhet is the essence of performance in some of the oldest civilisations of the world. If one attempts to apply property rights to words, music, visuals, one will only kill it all. The loss will be global And there may indeed be other instances of creativity in other cultures—even in those of the great metropolitan centres which might be stifled, at least temporarily, wiped out from our consciousness. All forms of speech, in fact, will thus have to find ways of skirting the fossilised cliches of capitalism to be able to flow like rivers, to rise like sap, to fertilize and fall like rain.

Does God play dice?

Who can say?

Yet, it is well-known that those who are nearest to the truth—the world of becoming—have always touched upon the vibratos to produce tremors between the sensible and the intelligible.

While physical science gave up on point, line and plane in their idealised forms, social scientific thought persisted with rigid constructs, such as mechanical technology had proposed. Or, in opposition, the organic metaphor keeps returning-through 'races' cults, imaginary unities based on partial facticity. In effect, we have hardly learnt to think in terms of our knowledge of how energy travels. Nor have we as yet absorbed the links of complex growth suggested by qualitative change in biological, geological and other seemingly near

chaotic, yet awesome and wonderful phenomena. Very often what we know continues to be reductive, bringing together collapsible forms, eliminating contexts while proposing apparently new fundamentalism, 'backgrounds', so-called 'deviations' from norms as attempted reforms of orthodoxies that get stuck in mirror epistemes.

In such an atmosphere, while technology receives and retrieves information for purposes of finance capital at speeds where continuous movement is intrinsic to the operation itself, adequate freedom to begin to cope with it is not yet given to the dispossessed citizen, no longer imbued with the promise of the working-class consciousness which in its glory produced the cinema—of Ritwik Ghatak.

The cinemas of the European nations—with the Soviet Union & the United States at two poles of the European impulse—continued to work from the Renaissance parameters. The knowable-ness of the world in a unilinear technology buttressing the ramparts of bourgeois edifices would admit only such gargoyles as a whitened Christian Church allowed. It was only people like Eisenstein who actually stepped out of all constraints including those of expressionism & futurism to seek out other conjunctions of language from traditions suppressed within its own community. Thereby he marginalised himself, even within a revolutionary society that permitted him some practice. Ritwik inherited from him the desire to reach out, not in accepted forms of veneration such as the Bengal Renaissance had objectified itself into, but in the survival of language - formations that are present in the dances of the Oraons, the poetry of the Bauls the speech of the fisher folk here.

These sign formations as Kosambi had discovered, are present in all significance and therefore, for me in all musicality, even in the mortar and persle.

Archetypes, as Jung and his normal followers (including many who apply psycho-analysis to art- practice & social-science) can void thought and objects of history, claiming a perreniality which is as touching and as true as idealised beauty. But archetypes that are shot through by a working-class consciousness such as a self-liberating people, with their boats seeking an anchor on different banks and in the world's greatest harbours, have history, change, movement intrinsically embedded in them.

Like mobiles, these significations are not elect instances of representations. They are themselves, to the extent that they contain several subjectivities, historically overdetermined, un-symbolic, resis-

tant to instant interpretation, yet openly absorbing, responding to action, emotion and ever evolving modes of reason, reconciling civilisations that confronted each other through inhibiting the infinite desire of humanity.

What are these modes that the cinematographe has released? Just as the capitalist world attempts with every phase to validate its control over history: the Protestant ethic yielding to decimation of other " races" or their civilisations, to an accumulation of surplus through colonial labour, viewed now as the burden of the white man, now as a threat to his health, now as the consumer of self-creating capital; so also the working-class consciousness, even as the proletariat disappears, has to find answers to free individuals in new collective formations from acting as a targeted market required for capitalism's survival, transforming itself into civil activity through linguistic,artistic, musical and other self-revealing modes of being.

But when such a release of energy takes place the unconscious centrality, uncontrolled, can create explosions instead of implosions. The Rasas include both the Shringara and Bibhatsa, the Karuna and the Bhayanaka, simultaneously present at every instance.

There is likely to be such suffering that we may cry out for another Buddha, another Christ, another Mohammed.

Even as images of pleasure increase, proliferate, surround us, our desire is continuously reduced to needs. As if desire were not infinite, it has been dismally suppressed by displacement and goods that promise satisfaction if not satiation. As if all desire is condemned to seek its death while one is alive, not the groping, sobbing renewed caesura of life and its varied forms of poetry and music. How fond Ritwik was of Kumarsambhav I have recounted elsewhere. How truly through his Titas we have sensed the convulsions of desire. When will we realise that separation and union have to occur at the same time.

The proposal of the working-class consciousness that converted the crafts of mechanical reproduction into the arts of infinite overtonal response are still to be realised. The official socialist art had imitated, weakly, the sinews of Michaelangelo's men forgetting the enveloping robes of the women, the dynamisations through postures that were nearly possible, a kind of celebration that Michael Jackson may have been capable of, if his talent were not bought instead of being rewarded.

Indeed the entire potential of electronic fields in extending our

perceptions is being retarded by its assimilations into modes of thinking that predate the cinema both as knowledge through light and as signifying sequences in a continuum rather than objectified instances of the real or of reality. The technology of the video has transcended the mechanistic copying of events only to find itself at the service of the most positivistic concreteness in its media-praxis.

Its possibilities of engendering the subjective and fantastic are themselves going to be even more insidiously controlled than the falsely objective time that passes you by and which the TV box authorises through manipulative illusions presented as news.

I can only see the plastic arts in conjunction with the cinema, literature, and music freeing subjectivities generated by the tumultuous history of the twentieth century in which all manner of social oppression came close to an end, only to slip into an egotistical passivity where the individual is aggressively defining herself by what she buys, not by what she creates or transforms.

In such a situation, to go back to hand crafting would certainly be therapeutic. While to be content with technological formalism, in the manner of "multi-national" board rooms can only constitute an act of self-hatred. Since it is being almost entirely activated by cretinous committees. We have now to search for our atmas in those scratches that particles of dust embedded on negatives may make on polyester positives. For they are carried by water to give life to the sings of distant life. It is the vulnerability of being to the accidental, the redundant and the erroneous that bears the truth in beauty: Basanti, Sita, the little boy in the paddy fields or the bank of dissipated rivers.

The thirst of a woman in the desert made the spring burst forth...

Rehmat Khan in his wanderings made the air over the sub-continent vibrate with the Zamzam When the pukurs dry up, longing for the water fills up the domed hills. Between the mountains of Safa and Marva, in the desert, she girds up her loins seeing her prophet child from thirst. She runs like one mad, seven times where upon the angel makes a hollow with his wing or foot. She fills the empty skin with water, drinks from the skin and suckles her child, may she be blessed, for had she not done so the Zamzam would always have remained an overflowing fountain.

Now let us ask them to tell us about men who go mad.

I know the story... but I won't tell you ... the mad man went mad in a foreign land... because he lost her when he was hungry in the boat...

I hope that the mad man is not hearing us and the wet hair will not ripple upon the river's edge in terrorised calm.

Ritwik you will come back to the rice fields, perhaps among the cranes, in twilight cloud, perhaps as the swan companion of a maiden or the seed in the ghungroo of Uttara's sanguine feet.

You had always sought the blessing of the young. You died when you were 50. And here I am 54 years or more, not far from the Padma. Shall we seek your blessing or you ours ?



Kumar Shahani, Professor Kabir Chowdhury and Baby Islam

ঋত্বিক ঘটক

মূল : কুমার সাহানী

অনু : কুররাতুল আইন তাহমিনা

ল্যাবরেটরিতে ঢুকতেই অ্যাসিডের ঝাঁঝালো সোপান যেন। আর তারপর, গভীর কোন গুহার রঙের মখমলী গালিচা। স্বর্ণাভ প্রতিচ্ছবির মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে এমন আশা মনে জাগে না। তবু, দুঃখের আলোয় সেখানে ঝিকিমিকি করে সোনালী সব রূপকল্প। 'আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, আমরা বায়বীয়, নিরবলম্ব, অস্তিত্বহীন।' ছিন্ন-ভিন্নতার যে তীব্র আর্তি নিজের নাম বলছে 'সুবর্ণরেখা' সে কোন গান? ধরিত্রী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সীতার জন্ম দিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাকে ফিরিয়ে নিলেন।

আর এর মাঝে এসেছিলো যুদ্ধ, জোরদখল, ক্ষুধা ... আছে ধ্বংস, দাঙ্গা, বোমা বিস্ফোরণ, বিমানের ওঠানামা, তৃষ্ণার তৃপ্তি, ক্লেদমুক্তি আর অবশেষে জন্মচক্রের আবর্ত থেকে ছুটি।

আর সেই মাঝিটিতো আছেই, যার জাল কখনো মাছের খোঁজে ঝাঁপ দেয়, কখনো বা যে স্বর্গের বাসিন্দাদের খেয়া পারাপার করে। সীতা, বহুরূপী দেখে ভয়-খাওয়া সীতা, তুমি নিজে যে সব ভাব ধারণ কর, তার প্রতিটি রূপই কি তোমাকে ভয় দেখায়?

'সারাদিনের শ্যুটিং শেষে আমরা নদীর তীরে ছাউনি ফেলেছি। মাথার মধ্যে সবটা ব্যাপার তখনো পুরোপুরি গোছানো হয়ে ওঠেনি। আউটডোর শ্যুটিং হয়েছে কেমন টুকরো-টুকরো, ছড়ানো-ছিটানো, অগোছালো। এক সকালে আমার ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এলো। একা ঘুরতে ঘুরতে মা-কালীর বেশধারী এক বহুরূপী দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সে। আমার মেয়ে আমাকে সীতার কথা মনে করিয়ে দিল ...।'

আর তারপর একদিন গাঢ় আবছায়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে, একঝলক তাজা বাতাসের মত আমার বারান্দায় এলো বুলবুলি। 'আমি ঋত্বিকের মেয়ে', বললো সে। স্বর্গের কুঠুরির গম্বুজগুলো তখন আর আমাদের ঘিরে নেই, আমাদের অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে নেই। আমার মেয়ে রেবতীকে সে উপহার দেয় সেই ধ্বংসাবশেষ।

'... গম্বুজের সৌন্দর্যের মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার আপাত হালকা- পাতলা ভাব ...।'

'আমার মনে হলো,

যদি আমার দেহের ভালবাসার সীলমোহরগুলো দেখাই,

তবে তুমি কস্ট পাবে।'

মেঘে ঢাকা তারার কাঠামোর প্রশংসা করে আমি নীতার ট্রাজেডিকে অনুমোদন করছি— (সেই ট্রাজেডি) যা তাকে কাঁদায়, তার সাধ-স্বপ্নের পাহাড়ে সে হুমড়ি খেয়ে

ধ্বসে পড়ে তার জীবনের সাধ-স্বপ্ন আবারো সে ঘোষণা করে, সে কাঁদে— আর সেই কান্নার কাঠামো আমি অনুমোদন করছি, সে জন্য এক ইউরো-এশীয় মহিলা আমার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভে চেঁচিয়ে ওঠেন।

সে মেয়েটিকে তোমরা জানো, যার চটির ফিতা আবারো ছিঁড়ে যেতে দেখি আমরা, এবং সে হাসে ইতিহাসের করুণ জয়োল্লাসের প্রতি ...। চেনাজানার পীড়ন থেকে আমাদের বোধকে মুক্ত করা, স্বাধীন করা আর তারপর তীব্রতর নান্দনিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভবকে এক পুনর্জাগরণের জগতে প্রবেশ করানো, কখনো রূঢ় চাবুক মেরে।

কখনো কোন সিম্ফনি বা কোন রাগ-বিস্তারে ছন্দময় অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

সেটা কি সম্ভব ?

বৃষ্টির ধোঁয়াটে ছায়ার এক মল্লার।

'এসো, তোমাকে একটা জন্ম দেখাই।'

রাতের বেলা একলা স্টুডিওর সামনে টানা পাহাড়ের রেখা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চশমায় আলোর প্রতিফলন। কাছেই একটা ছাউনি ছাওয়া লতার মধ্যে জ্বলছিলো তীব্র আলোর বাল্ব, ভেতরে অন্যান্য যাযাবর প্রভুরা— সন্ত তুকারাম, একনাথ, গণেশ্বর। জন্মের সাক্ষী হও, একটা রি-রেকর্ডিং স্টুডিওতে।

দোদুল্যমান পাথরের খাদায় জমা ছোট্ট ডোবায় বড় বড় ফোঁটায় পানি পড়ছে—

সা রে পা গা- আ

রে সা রে (সা)

মা পা নি (পা)

ধা নি (নি) সা

পরবর্তী মিশ্রণের জন্য প্রজেকশনিস্টরা রীল পাল্টায়।

আর রাতের প্রহর এবং প্রত্যূষ উল্টেপাল্টে যায়। পাশের ঘরে নিষিদ্ধ কড়া মদের গ্লাসে হাইপোর মত দেখায় পানীয়। তাতে আগ্নেয়গিরিজাত পানির খনিজ মিশে মনে হচ্ছে তুষার যেন।

'বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি'

যদি ভাবতাম অন্যজনই আমার আমির উৎস, তবে বাসনা পরিত্যাগ করব কেন ?

'আমার বুকের দুই কলমে

কখন আমি তোমাকে পিষ্ট করব ? ...'

হাসি দিয়ে সব দুঃখকে লুকিয়ে রাখো, প্রত্যেক উপলক্ষ উদ্‌যাপন কর অশ্লীলতায় আর জেনে রাখো, তোমার সব বাসনা আর গুরুত্বর শেষ ঠাঁই শূন্যতায়।

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ঘুমোতে যাও।

এ বই পেছন ফিরে দেখা ঘটনার ৩০ বছরেরও পরে, ১৮০ডিগ্রি পুরো ঘুরে দৃশ্যপট খোঁজা যে ভবার[১] কোন রূপান্তর হয়েছে কি না। ১৯৭৬ । 'শেষকৃত্যে এসো না। ঋত্বিকের মরদেহ পেরিয়ে মানুষ চেঁচিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। তুমি কষ্ট পাবে।' ঘটনাচক্রে এক সেমিনার উপলক্ষে আমি তখন কোলকাতায়। বিনা প্রতিবাদে এক মিনিট নীরবতা পালন করে সভা থেকে উঠে এসে কলেজ স্ট্রীট ধরে হাঁটতে থাকি।

... যে পর্যায়টা এখন আমরা পেরুচ্ছি, তা না বলা রয়ে গেছে, এ পর্যায়, এসময়টা নয়া-উপনিবেশবাদের, চরম নয়া উপনিবেশবাদী তোমরা দেখে যাও আমি কি করেছি। কথায় আমি কিছুই বলব না। তৎকালীন আর্থসামাজিক অবস্থা যা কিনা শহুরে আর গ্রামীণ মানুষকে একইভাবে প্রভাবিত করেছিলো, এই ছবিতে তা মৌলিক বিষয়। আত্মজীবনীর কিছু ছোঁয়া থাকলেও থাকতে পারে, যদিও চূড়ান্ত অর্থে এটা আত্মজৈবনিক নয়। এটা কি তবে কোন ভেনট্রিলোকুয়িস্টের ছদ্ম আত্মজীবনী? (গীতা কাপুর) নিশ্চিতভাবে এটা তাই। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর শেষ দেখার সময় তিনি বলেছিলেন : 'আমার অভিনয় দেখে এসো।' 'সেজন্যই আমি এসেছি', করুণা বলেছিলেন। আর পরে আমাদের তিনি বলেছেন : 'যুক্তি তক্ক আর গপ্পোতে তিনি অভিনয় করেননি। তিনি শুধু তাঁর জীবনের পাতা উল্টে গেছেন। তার কিছু পৃষ্ঠা ছেঁড়াখোঁড়া, কিছু আনকোরা।

'আমার দিন কেটেছে পদ্মার বুকে ... যাত্রীবাহী নৌকার মানুষদের মনে হতো দূর কোন গ্রহের অধিবাসী। বড় মালবাহী জাহাজগুলো ... নাবিকরা কথা বলতো অচেনা ভাষায় ... জেলেদের দেখতাম। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে গ্রামের বাতাসে ভেসে বেড়াতো সতেজ নবীন এক সুর ... অন্ধকার নেমে এলে বিশু নদীতে স্টিমারের দোলায় দুলেছি, ইঞ্জিনের ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি ; সারেং এর শিঙ্গা, মাল্লাদের পানি মাপার ডাক— এসব শুনেছি।'

বহুবছর পর এই পদ্মার ওপর দিয়ে উড়ে গেছেন তিনি, কেঁদেছেন। এপিকধর্মিতা কি আসলে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার উপরিকাঠামোর লক্ষণ? প্রত্যেক শিল্পীকে যন্ত্রণাকর ব্যক্তিগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের একান্ত সত্য জানতে হয়, শিখতে হয় ... পৃথিবীর কোথাও শ্রেণীহীন-শিল্প বলে কিছু নেই। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে অশোকের আত্ম সমালোচনায় যার সূচনা হয়েছিলো, সেই বিপ্লব সব বলিদান আর ত্যাগের সমাপ্তি ঘটিয়েছে।

আচার অনুষ্ঠান থেকে শিল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়া হয়ত একই সাথে রাজনৈতিকভাবেও ঘটেছিলো। গোড়াতে এসব প্রকল্পের বেশি যোগ ছিলো প্রকৃতির অন্তঃস্থ অসংখ্য বৈপরীত্য, সংস্কৃতির ভেতরকার অসঙ্গতি, পরস্পর বিরোধিতা ইত্যাদির সাথে দ্বন্দ্ব আর

১. ঋত্বিক ঘটকের ডাক নাম 'ভবা'।

বিরুদ্ধ শক্তির জটাজালের সাথে, যে বিষয়টা হয়ত ফ্র্যাকটালসের বিক্ষিপ্ত ভগ্নচিত্রে তুলনামূলকভাবে সরল ধারায় ধরা পড়ে।

সরলীকৃত ধারাগুলো কেবল ওপরে ওপরেই প্রকাশ পেত না, অবিরত তারা এসেছে আলপনার প্রসাদ-ভিক্ষায়, সুঁচ-সুতোর নকশী ফোঁড়ে, ঝুড়িবুননে এবং 'রূপান্তরিত' হয়েছে গোষ্ঠীর নৃত্যকলায়, (ঋত্বিকের ওঁরাও) 'আমিত্ব' সম্পর্কে চিন্তাভাবনার প্রতিফলনে। পুরুষোত্তম, পৌরুষের চূড়ান্ত সীমায় থেকেও রাম দ্বন্দ্ব আর বিরুদ্ধতার হাত এড়াতে পারেননি। যেমন পারেননি রামায়ন, পক্ষী মিথুনের ভালবাসায় ছেদ টেনে, পৃথিবীতে দুঃখ ডেকে এনে।

অযান্ত্রিকের সাথে সাথে ঘটক চলচ্চিত্র মাধ্যমে এক নতুন অনুসন্ধানী ধারা আনলেন, উদ্বাস্তু অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে নিয়ে গেলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গচ্ছেদ, বিভাজন/নির্বাসনের সার্বজনীন ঐক্যতানের পর্যায়ে, জাগিয়ে তুললেন মহাকাব্যের ধারা,— উপজাতীয়, লোকজ আর চিরায়ত ধারাগুলো উপজীব্য করে। নিড়ানি এবং যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করে ওঁরাওরা লাঙ্গল গ্রহণ করেছিলো। তাদের লোহার কারিগররা সেগুলো গড়েনি। যাদুবিদ্যায় আস্থা অটল রেখে, ভয়মুক্তির জন্য তারা নির্ভর করেছে নাচের ওপর, যুক্তিতর্ক বা ধর্মের সূচনার সাহায্য খোঁজেনি। শ্রেণীগত ভেদাভেদকে তাদের সমাজে জরুরি বলে তারা মনে করেনি। কিন্তু এই বিভেদের আঘাত তাদের ওপরেও এসেছে যখন শোষণ- নিপীড়ণের অজস্র পথ ধরে বীর রসের বিস্তার ঘটেছে, ধর্মের অগ্রযাত্রা তাকে অনুমোদন যুগিয়ে গেছে।

পুরোহিত এসেছে তার ভোগের ক্ষমতার অধিকারকে রীতিবদ্ধ করে, যোদ্ধা এসেছে কামান নিয়ে আর মহাজন এসেছে তার হিসাবের খাতা নিয়ে। তবু, মৌর্যরা যারা রাষ্ট্রকে সংহত করলো, কেন্দ্রীকৃত করলো, বস্তুজাগতিক উন্নতি এবং আত্মিক সহনশীলতাকে যারা উঁচু স্তরে নিয়ে গেল, তারা খুব সম্ভব শুদ্র ছিলো ;— যদিও এখান থেকেই আমরা গিয়ে পড়ছি জ্ঞান আর ইতিহাসের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ নদীতে। নর্মদা, রক্ত বরণী আজও সভ্যতার দালালি করে বলে দাবি করে যাচ্ছে। ভাষা, শৃঙ্খলা, সংগঠন, শিল্প এমনকি বিকল্প সাংস্কৃতিক যে সব আন্দোলন যা কিনা শক্তপোক্ত পদমর্যাদা কাঠামোর ঐক্যবল অনেক কমিয়ে দিচ্ছে আনুভূমিকভাবে বহুগুণ, বহুমুখী বিস্তারের প্রস্তাবনা করে, তারাও বোমা আর বিকৃতিভরা বাতাসের সাহায্যে শক্তিশালী সব ডানাঅলা প্রাণীদের কাছে কীটানুকীটের মত অসহায়। নর্মদা, গঙ্গা এবং মিসিসিপি। বণিকরা মুদ্রায় ছাপ মারে, তা বলবৎ করে রাজারা, শাসকগোষ্ঠী, গণতন্ত্র, যেখানে জনতার বিক্ষোভ সহসা নির্দেশ করে 'উশৃঙ্খল জনতা'— নিজেদের লক্ষ্যহীনতা, ন্যায়নীতিহীনতাকে ঢাকার জন্য সত্যের কিছু সাম্প্রদায়িক ধারণা চাপিয়ে দেয়ার জন্য একত্র হয়। পৃথিবী অসংলগ্ন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়— জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ এমনকি শরীর ও মনের মধ্যেও সূক্ষ্ম বিভাজন চলে আর এদিকে অর্থনীতি জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এককাট্টা হয়ে। আজকের ভারতে আমাদের একজন মিস ইউনিভার্স আছেন, একজন মিস ওয়ার্ল্ড আছেন, আছেন মিস

সুলোচনা, সুকেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। ঋত্বিকের আত্ম-মুক্তির রূপক যা শেষ হয়েছিলো অসংলগ্ন আত্মধ্বংসী উন্মাদনায়— আজ মনে হয় সেটা সর্বদেশের সর্ব সংস্কৃতিকে ছিঁড়েফুঁড়ে দিচ্ছে একই সাথে যখন 'এক-মেরু'র অর্থনীতি সমস্ত অধিকার করে নিচ্ছে। বম্বের দাঙ্গা ছিলো কল্পনার বাইরে, অন্যত্র আমরা দেখছি এই দ্বীপ শহরের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশেরও কম জনগোষ্ঠী আলাদা, নতুন জাতি/দেশ সৃষ্টি করছে।

আর ইতিমধ্যে ইনটেলেকচুয়াল সম্পত্তির মালিকানা, বাণিজ্য শুল্ক চুক্তির জন্য একছাঁচের নিয়মাবলী তৈরি হয়ে গেছে। এসবই স্থাপন করতে যাচ্ছে অডিওভিস্যুয়াল রাজত্ব, এবারে আর দেশ জয় করা লক্ষ্য নয়। এবার বিজিত হবে হৃদয় আর মস্তিষ্ক, অদৃশ্য অনাবিল সেসব পরিবেশ জয়ের প্রশ্ন এবার ; না শোনা গানের শ্রবণাধিকার। তবে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের তাৎপর্য (overtonal implications) তো কাল্পনিক, এটা তো কেবলমাত্র সুর-তান-পরদার ওঠানামার টেকনিকাল বা যান্ত্রিক বাস্তবায়ন না। সংস্কৃতি ভেদে উদ্ভাবন বা Improvisation এর নিজস্ব দ্বান্দ্বিকতা আছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বে, মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, ঘটমান বর্তমানের মতই অতীত বা ভবিষ্যতের সাথেও একই বিদ্যুৎলতায় জড়িত প্রেক্ষাপটে তাদের মর্মার্থ পাল্টে যায়।

সঙ্গীতের বিস্তার বা অননুমেয় অনন্তের আভাসকে কি কেউ অধিকার করতে পারে, পণ্যে পরিণত করতে পারে, তার পেটেন্ট নিতে পারে, ইচ্ছেমত উন্মোচন করতে পারে বা ভোগ করতে পারে ? যদি কেউ শব্দ, সঙ্গীত রূপকল্প বা ছবির ওপরে মালিকানা ফলাতে যায় তবে যে এসব কিছুর মৃত্যুই ডেকে আনবে। এ ক্ষতি হবে পুরো বিশ্বের। অন্যান্য সংস্কৃতিতে, এমনকি বড় বড় মেট্রোপলিন কেন্দ্রেও এরকম ধামাচাপা পড়া, বিকাশ-রুদ্ধ সৃজনশীলতার নজির থাকতে পারে।

ফসিল হয়ে যাওয়া ধনতন্ত্রের সস্তা প্রকাশভঙ্গী এড়িয়ে আসার উপায় খুঁজে নিতে হবে বাণীর সকল রূপকেই— যাতে তারা নদীর মত বহতা হতে পারে, প্রাণরসে উৎসারিত হতে পারে, জীবনের বীজ বুনতে পারে আব বৃষ্টির ধারার মত ঝরে পড়তে পারে।

ঈশ্বরও কি পাশা খেলেন ?

কে বলতে পারে ?

তা সত্ত্বেও, একথা সুবিদিত যে যাঁরাই সত্যের, ঘটমান জগতের, সবচেয়ে কাছাকাছি পৌছেছেন তাঁরাই সেই তারগুলো ছুঁয়ে গেছেন যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যতার মধ্যে অনুকম্পণ জেগেছে।

যখন ভৌতবিজ্ঞান, বিন্দু, রেখা আর সমতলের আদর্শায়িত রূপগুলো পরিত্যাগ করেছে, সমাজবিজ্ঞানেব চিন্তা তখনো যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রস্তাবিত অনমনীয় ধারণাগুলো আঁকড়ে রয়েছে। অথবা, এর বিপরীতে, জৈব রূপকগুলো ফিরে ফিরে এসেছে।

জাতিগত ভক্তি-বিশ্বাস, আর কাল্পনিক একতাবোধ, যার ভিত্তিতে কাজ করেছে আংশিক সত্যতা। কার্যতঃ শক্তির গতিবিধি সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রেক্ষিতে আমরা চিন্তা

করতে শিখিইনি প্রায়।

উপরন্তু, জীববিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব বা অন্যান্য প্রায় বিশৃঙ্খল অথচ অত্যাশ্চার্য এবং অপূর্ব ঘটনা বা বিষয়াবলীর গুণগত পরিবর্তনগুলো যে জটিল ব্যবস্থার ইংগিত দেয়, তার যোগসূত্রগুলোও আমরা এখনো আত্মস্থ করতে পারিনি। প্রায়শঃই আমাদের জ্ঞান হয়ে যায় সীমিত ও সংকীর্ণ—ভঙ্গুর রূপকে একত্র করার চেষ্টামাত্র। আমরা প্রসঙ্গ বা প্রাসঙ্গিকতা (context) উপেক্ষা করে যাই, অথচ আপাতঃ নতুন বিশ্বাসের বুনিয়াদ 'প্রেক্ষাপট', গোড়ামি ও প্রথাবিরোধী তথাকথিত সংস্কার প্রস্তাব করি, অথচ রূপকল্প বা ভাবনাগুলো আয়নার প্রতিবিম্বের মত একই রয়ে যায়।

এখন লগ্নী পুঁজির স্বার্থে প্রযুক্তি অসম্ভব দ্রুতগতিতে তথ্য আহরণ ও গ্রহণ করছে। অবিরত গতিশীলতা এ কাজের সহজাত ধারা। এদিকে অধিকারবঞ্চিত সাধারণ মানুষকে এখনো এ পরিস্থিতি সামাল দেবার মত যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। শ্রমিক-শ্রেণীর সচেতনতার যে মহিমায় ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলো তৈরি হয়েছিলো, সে সচেতনতার প্রতিশ্রুতিও আজ আর তাদের জন্য নেই।

ইউরোপীয় প্রেরণার দুই বিপরীত মেরুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রেখে, ইউরোপীয় দেশগুলোর সিনেমা রেনেসাঁর পরিধিতেই কাজ করে যাচ্ছিলো। যে দুনিয়ায় বুর্জোয়া দুর্গের প্রাকারকে ধরে রেখেছে একরৈখিক প্রযুক্তি, সেই দুনিয়ার জ্ঞান-বুদ্ধি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের ক্রিশ্চান চার্চ অনুমোদিত নিঃসরণকেই স্বীকার করবে। কেবলমাত্র আইজেনস্টাইনের মতো ব্যক্তিত্বরাই ভাববাদ এবং ভবিষ্যৎবাদসহ সবরকম বাধা পেরিয়ে এসেছিলেন, নিজেদের ভেতরে চাপা পড়া ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই ভাষার ভিন্নতর সম্মিলন খুঁজে নিতে। সেজন্যই, তাঁর বিপ্লবী সমাজ যদিও তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষার চর্চার কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছিলো, তবু তিনি নিজেকে একপ্রান্তে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঋত্বিক, আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে গন্ডি পেরিয়ে হাত বাড়ানোর এই বাসনা উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই গ্রহণ করা শ্রদ্ধায় অন্ধ অনুকরণের প্রথাসিদ্ধ নয় (বাংলার রেনেসাঁ যেভাবে করেছিলো)। তিনি গ্রহণ করেছিলেন ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টা— যার রূপ দেখা যায় ওরাওঁদের নাচে, বাউলের লেখায় আর বাংলাদেশের জেলেদের মুখের বুলিতে।

কোসাম্বীর দৃষ্টিতে, এই সব চিহ্ন রূপায়ণ সব মর্মার্থের ভেতরেই আছে। আর তাই আমার কাছে তা রয়েছে যে কোন সুরতরঙ্গে এমনকি খলনুড়ির ঘর্ষণের শব্দেও।

আর্কিটাইপ, ইয়ং আর তাঁর অনুসারীরা (যাঁদের মনো-বিশ্লেষণকে অনেকে শিল্পচর্চা ও সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন) যেমন চিন্তা ও বস্তুকে ইতিহাস নিরবলম্ব করে দেখতে পারেন এবং এমন চিরঞ্জীবতা দাবি করেন যা একই সাথে মর্মস্পর্শী এবং আদর্শায়িত সৌন্দর্যের সত্য।

কিন্তু যেসব আর্কিটাইপ ধরা পড়ে শ্রমজীবী শ্রেণী সচেতনতার মধ্য দিয়ে, যেমন স্ব-স্বাধীন মানুষরা যাদের নৌকা তীরে তীরে, পৃথিবীর বড় বড় বন্দরে নোঙর খোঁজে, সে রকম আর্কিটাইপগুলোর রয়েছে সহজাত, অন্তঃস্থ ইতিহাস, পরিবর্তন আর গতিময়তা।

সঞ্চরণশীল এসব মর্মার্থ নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। তারা তারাই, এ অর্থে যে তাদের কিছু কিছু বিষয়নিষ্ঠতা বা subjectivity আছে, ঐতিহাসিকভাবে পূর্বনির্ধারিত, অপ্রতীকী,তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যার প্রতিরোধী। তা সত্ত্বেও তারা খোলামনে গ্রহণ করে, কাজ, অনুভূতি এবং নিয়ত বিবর্তনশীল যুক্তিযুক্ততার ধারায় সাড়া দেয়, মানবজাতির অসীম আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাধা দিয়ে যখন সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন তারাই আপোষ রফা করে নেয়।

কি সেই ধারাগুলো যা চলচ্চিত্র উন্মোচন করেছে ?

পুঁজিবাদী বিশ্ব যেমন প্রতি ধাপে ইতিহাসের ওপর তার নিয়ন্ত্রণের বৈধতা চাপিয়ে দিতে চায় ঃ প্রটেস্ট্যান্ট নীতিশাস্ত্র যেমন অন্য জাতি বা সভ্যতার নিশ্চিহ্নকরণে, হ্রাসকরণে সমর্থন করেছে, ঔপনিবেশিক শ্রম অর্জিত উদ্বৃত্তের স্তূপ জমিয়ে, যা কিনা এখন সাদা মানুষদের ওপর বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে— তার স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ এবং নিজের সৃষ্ট পুঁজির ভোক্তাস্বরূপ— তেমনি শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাকেও, খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে পুঁজিবাদের উপজীব্য লক্ষ্য বাজার হওয়ার হাত থেকে ব্যক্তিমানুষকে মুক্ত করে নতুন একতা গড়ে তোলা যায়। কিভাবে ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত, এবং অন্যান্য আত্ম-উন্মোচনকারী পথে নাগরিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া যায়।

কিন্তু শক্তি যখন এভাবে মুক্ত হয় তখন অবচেতন কেন্দ্রিকতা, নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ভেতরে সুসংহত না হয়ে বাইরে ফেটে পড়তে পারে। নব (নয়) রসে যেমন শৃঙ্গার রস রয়েছে, তেমনি আছে বিভৎস রস, যেমন আছে করুণ রস তেমনি রয়েছে ভয়ানক রস, একই সাথে প্রতিটি ঘটনায়।

যন্ত্রণা আর কষ্ট এমন নিদারুণ রূপ নিতে পারে যে আমরা হয়ত আরেকজন বুদ্ধ, আরেকজন যীশু, আরেকজন মোহাম্মদকে আকুল হয়ে চাইবো।

যখন আনন্দের রূপকল্প বা ইমেজ বেড়ে চলে, ছড়িয়ে পড়ে, আমদের ঘিরে ধরে, তখনো কিন্তু আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়তই প্রয়োজন বা চাহিদার সীমানায় নেমে আসে। যেন আশা-বাসনা সীমাহীন নয়, নিত্য প্রতিস্থাপনযোগ্য এবং পণ্য যা পরিতৃপ্তির না হলেও সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দেয় তা দিয়ে এদের চেপে রাখা হয়েছে। যেন জীবদ্দশায় সব বাসনাই নিজেব মৃত্যু খুঁজতে বাধ্য। যেন বাসনা জীবনের নব নব যতি, ছন্দ এবং নানা ছাঁদের পদ্য আর সঙ্গীতের জন্য আকুল আর্তিতে হাতড়ে বেড়ানো নয়। অন্যত্র আমি বলেছি—

কুমারসম্ভব ঋত্বিকের কি ভীষণ প্রিয় ছিলো। তাঁর তিতাসের মধ্যে বাসনার চরম

আলোড়ন কী সত্য হয়ে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। কবে আমরা বুঝবো যে বিচ্ছেদ আর মিলন ঘটতে হবে একই সাথে, একই সময়ে।

শ্রমিক-শ্রেণীর চেতনা কর্তৃক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির কৃৎকৌশলকে অনন্ত অসীম প্রচ্ছন্ন সজাগ প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারি সমাজতান্ত্রিক শিল্প দুর্বলভাবে মাইকেল এঞ্জেলোর পেশী নকল করে গেছে, নারীর ঢাকা পোষাকের কথা ভুলে গিয়ে। সেই গতিশীলতা হয়ত মাইকেল জ্যাকসন ঘটাতে পারতো যদি কিনা তার প্রতিভাকে কিনে না নিয়ে পুরস্কৃত করা হতো।

আসলে আমাদের বোধকে প্রসারিত করার জন্য ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন সব চিন্তাধারা দিয়ে যা জ্ঞান এবং একটা ধারাবাহিকতার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সিকোয়েন্স হিসেবে সিনেমাকে অচল এবং পুরনো হিসেবে দেখছে। বাস্তবনির্ভর এবং বস্তুনিষ্ঠ সত্য বা বাস্তবের নিদর্শন হিসেবে দেখছে না। ঘটনার যান্ত্রিক অনুকরণকে ছাড়িয়ে উঠেও ভিডিও টেকনোলজি এসে ঠেকে গেছে মিডিয়া চর্চার সবচেয়ে বাস্তব, নিশ্চিত concreteness এর কাজে লেগে।

বস্তুনিষ্ঠতার নামে টিভি যেসব উদ্দেশ্যমূলক বিভ্রান্তিকে খবর হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত করে, ভিডিও মাধ্যমে বিষয়নিষ্ঠ এবং দারুণ কিছু জন্ম দেয়ার সম্ভাবনাকে তার চেয়েও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সিনেমা, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের সাথে এক কাতারে দেখতে পারি একমাত্র ভাস্কর্য-মৃৎশিল্প ইত্যাদিকে, যে শিল্প ধারাগুলো বিংশ শতাব্দীর এই উথালপাথাল ইতিহাসজাত বিষয়নিষ্ঠতা বা বিষয় নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ যুগে সব ধরনের সামাজিক নিপীড়ন যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন কিন্তু আমরা পড়ে গেছি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর উদাসীন নিষ্ক্রিয়তার ফাঁদে। এই সমাজে একজন মানুষ উদ্ধতভাবে নিজেকে ব্যাখ্যা- বর্ণনা করে, দোকানে সে কি কিনছে তা দিয়ে, সে কি সৃষ্টি বা রূপান্তরিত করছে তা দিয়ে নয়। এই অবস্থায় হাত দিয়ে কারুশিল্প গড়ায় ফিরে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে একটা চিকিৎসার মত হবে। অন্যদিকে, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত বাধাধরা গণ্ডিতে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকাটা কেবলমাত্র আত্মঘৃণারই জন্ম দিতে পারে।

নেগেটিভের গায়ে লেগে থাকা ধুলিকণা পলিয়েস্টার পজিটিভে যেসব আঁকিবুকি তৈরি করতে পারে, আমাদের এখন সেরকম আঁকিবুকির মধ্যে 'আত্মা'র অনুসন্ধান করতে হবে। আর ঐ ধূলিকণা বয়ে নিয়ে এসেছে পানি, সুদূরের জীবনের চিহ্নকে জীবনদান করার জন্য। আকস্মিকতা, বাহুল্য এবং ভ্রম এই তিনের প্রতি অরক্ষিত থাকার মধ্যেই সৌন্দর্যের সত্য নিহিত আছে : বাসন্তী, সীতা, ধানক্ষেতের ছোট ছেলেটি, অথবা বিশীর্ণ নদীর পাড়।

মরুভূমিতে উছলে উঠেছিলো ঝর্ণা, এক নারীর তৃষ্ণার তাগিদে।

রহমত খান তার ভ্রাম্যমানতায় এই উপমহাদেশের বাতাসকে কাঁপিয়ে তুলেছে

'জমজম' দিয়ে। পুকুর যখন শুকিয়ে যায়, গম্বুজের মত পাহাড়ের ঘের তখন পানির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠে।

সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মধ্যে, মরুভূমিতে সেই নারী দেখে তার পয়গম্বর শিশু তৃষ্ণায় ছটফট করছে। পাগলিনীর মত সে ছুটে বেড়ায়, সাতবার, আর তারপর ফেরেশতা তাঁর পা বা পাখার আঘাতে মরুর বুকে গর্ত খোঁড়ে। মা শূন্য মশক ভরে নেন সেই পানিতে, নিজে পান করেন, শিশুকে স্তন্য দেন। তাঁর মঙ্গল হোক, কারণ যদি তিনি এটা না করতেন, জমজম চিরকালই উপচে পড়া ঝর্ণা রয়ে যেত।

আসুন, এবার তবে জানতে চাই সেই সব মানুষদের কথা যারা অপ্রকৃতিস্থ, পাগল হয়ে যায়। গল্পটা আমি জানি... কিন্তু আপনাদের সেটা বলবনা ... পাগল মানুষটি পাগল হয়েছিলো বিদেশের মাটিতে ... কারণ নৌকোয় যখন সে ক্ষুধার্ত তখন সে তাকে হারিয়েছিলো।

আশা করি, পাগল মানুষটি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না— নদীর কোল ঘেঁষে ভয়াবহ প্রশান্তিতে হঠাৎ ঢেউ-এর কোলে ভেসে উঠবেনা তার ভেজা চুল ...।

ঋত্বিক, তুমি ফিরে আসবে ধানের ক্ষেতে, হয়ত বক-সারসের মাঝে, দিনান্তের মেঘে, হয়ত কোন রমণীর সঙ্গী রাজহাঁস হয়ে, হয়ত উত্তরার রক্তিম পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের ঘণ্টি হয়ে।

ঋত্বিকদা, তুমি চিরকাল তরুণদের আশীর্বাদ চেয়ে এসেছো। যখন চলে গেলে তখন তোমার বয়স ৫০। আর আজকে এই যে আমি এখানে, পদ্মার বেশি দূরে নই, ৫৪ বছর বা তারও বেশি বয়সী। আমরা কি তোমার আশীর্বাদ চাইব, নাকি তুমি আমাদের ?

চেনা অচেনা ঋত্বিক

শেখ মিজানুর রহমান

ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। তাঁর অসামান্য প্রতিভা সম্পর্কে দু'চারজন চলচ্চিত্র বোদ্ধা ছাড়া আর কেউ কিছু জানেন বলে মনে হয় না। জানলেও অন্যদের জানানোর চেষ্টা নেই তেমন।

ঋত্বিক ঘটক দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রযোজক হাবিবুর রহমানের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি বানান। তখন সিনে সাংবাদিকতার সূত্রে এফডিসির এডিটিং রুমে তাঁকে দেখি। আমি তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলিনি। কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক-দেড় মিনিট এডিটিং রুমে দরজায় দাঁড়িয়ে শালপ্রাংশু কিন্তু অনবরত বিড়ি ফুঁকতে থাকা লোকটিকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। মিথ্যাভিমান বা দাম্ভিকতা নেই এমন লোকদের সামনে নত হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

ঋত্বিক ঘটক ডজন ডজন ছবি বানাননি তাঁর ছবির সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। এর মধ্যে আমি দেখেছি আড়াইখানা। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং টেলিভিশনে 'সুবর্ণরেখা'র খানিকটা। হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়ায় বাকিটা আর দেখা সম্ভব হয়নি।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটি শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছিল। উপন্যাস আকারে লেখাটি 'সিনেমা জগত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নাম 'চেনা মুখ'।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি মজার ঘটনারও উল্লেখ করতে হয়। 'চেনামুখ'-এর লেখক শক্তিপদ রাজগুরু 'আমার জানা ঋত্বিক' প্রবন্ধে লিখেছেন : উল্টোরথে প্রকাশিত হয়েছিল 'চেনামুখ' উপন্যাস।

'মেঘে ঢাকা তারা' ঢাকার নিশাত সিনেমায় দেখেছিলাম। উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম বলেই ছবি দেখতে যাওয়া। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে তখন কিছু জানতাম না। জানবার আগ্রহও ছিল না। ছবিটার শেষ দৃশ্য দেখে কাঁদতে কাঁদতে ছবিঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ছবির নায়িকা নীতার [?] ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। শেষ দৃশ্যে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত নায়িকার [সংসারের জন্য যে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছে] বেঁচে থাকার জন্য সে কী আকুলতা!

'তিতাস একটি নদীর নাম' অদ্বৈত মল্লবর্মণের অমর সৃষ্টি। অমর সৃষ্টির আলাদা একটা মহিমা আছে; 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি কোন বইয়ের দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি দেখে আমার মন ভরেনি।

মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ফাঁকটা যে কি তা আমি বুঝতে পারিনি। অনুভূতি থেকে হয়ত অতৃপ্তিটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। পরে শুনেছিলাম, ছবির সম্পাদনা ঋত্বিকের মনের মতো হয়নি। তবে শোনা কথায় কান না দেয়াই ভাল।

স্বপন মল্লিক লিখেছেন, "ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ২৪ বছর জড়িত ছিলেন। কিন্তু ছবি বানিয়েছিলেন মাত্র ৮টি। আরও কয়েকটি ছবি অসমাপ্ত অবস্থায় বাক্সবন্দী হয়ে রয়েছে। তাঁর নির্মিত ছবিগুলো সচেতন দর্শককে রীতিমতো নাড়া দিয়ে গেছে।" স্বপন মল্লিক আরও লিখেছেন :

> Artistic integrity and passion marked most of his work. But what was equally evident was his singular lack of consistency and patchy excellence. Ritwik Ghatak was himself quite embarassed when experts drew comparisons with Satyajit Ray. The question as to who was greater. He felt irrelevent. Since more than anyone else, he followed an individual approach to the film medium. He rediculed the gross commercial in Indian cinema. But never lost his friends for his forthright viewes : he had plenty of friends both within and outside the film industry.



অনন্ত নতুন মাসী বাসন্তীর মাঝে মা-কে খুঁজে

ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) ছাড়া আর কোন ছবি বক্স অফিসের আনুকূল্য পায়নি। ১৯৫৩ সালে তিনি 'নাগরিক' নামে একটি ছবি বানিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম ছবি। ছবিটি তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি পায়। 'নাগরিক' ছবি বানাবার পাঁচ বছর পর তিনি সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে 'অযান্ত্রিক' ছবিটি বানান। ছবিটিতে এক মোটর চালকের তার গাড়ির ব্যাপারে অশেষ দুবর্লতা চিত্রিত করা হয়েছে। ভেনিস, বেলজিয়াম, ইতালি এবং ফ্রান্সের সমালোচকদের প্রশংসাধন্য হলেও দেশের লোকের কাছে উল্লেখযোগ্য সমাদর পায়নি। ১৯৫৯ সালে ঋত্বিক 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' নামে একটি ছবি বানান। একটি বালকের চোখে বাবা-মা-প্রতিবেশীদের আচার-আচরণ এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। খুবই উঁচু দরের ছবি, সন্দেহ নেই। এই ছবিটিও ভেনিস এবং ফ্রান্সের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এ সব সত্ত্বেও ঋত্বিক ঘটকের নাম বিশ্বের চলচ্চিত্র বিশারদদের কাছে অজানাই থেকে যায়।

ঋত্বিক ঘটক ১৯২৫ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা এই ঢাকা শহরেই। দেশ বিভাগের ব্যাপারটি তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি। এটা তাঁর মানসিক যন্ত্রণার প্রধান কারণ ছিল বলে অনেকে উল্লেখ করেন। 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা' তাঁর এই যন্ত্রণারই আলেখ্য বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন।

আগেই বলেছি, কোন ছবিই 'মেঘে ঢাকা তারা' ছাড়া দর্শকদের কাছে সমাদর না পাওয়ায় ঋত্বিক ঘটক হতাশ হতে হতে মদের বোতলের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন : exile into the bottle.

ঋত্বিক ঘটকের সর্বশেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। ছবিটি সম্পর্কে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, ছবিটি আত্মজৈবনিক।

ঋত্বিক ঘটক ছবি বানানোর কৃৎকৌশল খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। ছবি বানাতে পারতেন, আবার অন্যদের ছবি বানাবার কায়দা-কানুনও শেখাতেন। অনেকেই জানেন না ঋত্বিক ঘটক এক সময় পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের কথা অনেকেই এখনও স্মরণ করেন। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা।

ঋত্বিক ছিলেন খেয়ালি মানুষ। তিনি কখন যে কি করবেন তা তাঁর কাছের লোকরাও আন্দাজ করতে পারত না। কমার্শিয়াল ছবির প্রতি ছিল তাঁর তীব্র বিদ্বেষ। কিন্তু বিমল রায়ের জন্য তিনি 'পয়গাম' [হিন্দী] ছবির গল্প লিখে দিয়েছিলেন। দিলীপ কুমার-বৈজয়ন্তী মালা অভিনীত ছবিটি সে সময় সুপারহিট হয়েছিল। ছবিটির গল্পের বিষয়বস্তু ছিল পুনর্জন্ম। ছবির বিখ্যাত গান ... সুহানা সফর আওর মওসুম হাসিন ...। ঋত্বিক ঘটক সবই পারতেন। ঋত্বিক ঘটক বেশ কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। তাঁর নির্মিত ছবির মতো তাঁর নাটকগুলোও দর্শক নেয়নি। তাঁর লেখা নাটকগুলো হচ্ছে : 'দলিল', 'জ্বালা', 'শঙ্খ' এবং 'গ্যালিলিও'[১]।

১. অনূদিত নাটক

ঋত্বিক ঘটকের ৪টি ছবিতে অনিল চার্টার্জী অভিনয় করেন। ঋত্বিক সম্পর্কে ১৯৭৬ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি নিজের কজায় রাখতেন। কিন্তু তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় ধারার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতেন না।' সতীন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন : 'লোকে বলাবলি করে তিনি সেটে পাগলামি করতেন। এটা একবারে বানানো কথা। কাজ পাগল ছিলেন। ভড়ং করতে জানতেন না। এই তো।'

শক্তিপদ রাজগুরু 'আমার জানা ঋত্বিক' নামে স্মৃতিচারণমূলক একটি রচনায় ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। ঋত্বিক যে কত বড় গুণী লোক ছিলেন তা তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন : "যাদের দেখলে সহজে ভোলা যায় না, সহজে চেনা যায় না, চিনলে মনে হয় অন্য এক জগতের মানুষ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, মনের ভিতর অন্য একটা সত্তা অহরহ চিন্তা করে চলেছে, সেই ভাবনা অন্যের মাঝে সঞ্চারিত করে তাকেও ভাবিত করে তোলে কি মহৎ চিন্তনে, সৃজনীধর্মী আলোড়নে, ঋত্বিকবাবু তেমনি মহান শিল্পীদের অন্যতম ... প্রসাদ বাবু বললেন, ঋত্বিকবাবু আপনাকে খুঁজছেন। 'চেনা মুখ' ছবি করতে চান। 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ইত্যাদি ছবি করেছেন তিনি, সুনামখ্যাতিও তখন প্রচুর, তরুণ পরিচালকদের মধ্যে তিনি তখন প্রোজ্বল। তাই কথাটা শুনে খুশি হয়েছিলাম। তার কিছুদিন পরই তার সহকারী পরিচালক শৈলেনবাবু এসে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন আমায় গঙ্গা প্রসাদ মুখার্জি রোডে ঋত্বিক বাবুর বাড়িতে।

দীর্ঘদেহী তরুণ, পরনে পাজামা, ঢাকাই পাঞ্জাবি, সামনের রেডিওগ্রামে বাজছে ভীমসেন যোশীর লংপ্লেয়িং রেকর্ডে মিঞা কি মল্লারের সুর, সেই সুরের রাজ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে আছেন। লম্বা চুলে আঙ্গুলগুলো নড়ছে, অন্য হাতে বিড়ি একটা ধরা। মাঝে মাঝে গোটা কয়েক টান দিয়ে আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হচ্ছেন।

হঠাৎ চোখ পড়তে বসতে বললেন।

কথায় কথায় বললাম, আপনি এই ছবি করবেন জেনে খুব খুশি হয়েছি। ঋত্বিকবাবু বললেন, এটা আপনার কথা, আমি বলব ছবির জগতে একটা ভাল গল্প দিতে পেরেছেন এর জন্য ছবির ইতিহাসে নামও থাকা উচিত"।

বোঝাই যাচ্ছে গুণী লোকের কদর করতে জানতেন ঋত্বিক ঘটক। ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর বানানো ছবির একটি রেটরোসপেকটিভ চলচ্চিত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন যাঁরা তারা করলে ভাল হয়।

ঋত্বিক ঘটক বাংলা মদ আর বিড়ির জহুরী ছিলেন— এটা হয়ত তাহলে অনেকের কাছে ভ্রান্ত বলেই মনে হবে।

ঋত্বিক চলচ্চিত্রের নির্যাস

শৈবাল চৌধুরী

ঋত্বিক কুমার ঘটক নির্মাণ করেছিলেন মোট আটটি কাহিনী চিত্র। অসমাপ্ত রেখে গেছেন চারটি। ঋত্বিকের এই চিত্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়নে প্রতিভাত হয়, বিষয় ও আঙ্গিকগত প্রেক্ষিতে তাঁর ছবিগুলো পৃথক বৈচিত্রে নির্মিত হলেও অন্তসুর বা নির্যাসগত দিক থেকে প্রায় সবছবিই এক সূত্রে গাঁথা। নাগরিক, অযান্ত্রিক, বাড়ী থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা, তিতাস একটি নদীর নাম এবং যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। বিষয় ও আঙ্গিকগত নির্মিতির প্রেক্ষিতে আটটি ছবিই পৃথক বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত। নাগরিকে নগর যন্ত্রণা ও জটিলতা এবং যুবপ্রজন্মের বেকারত্ব ও হতাশাবোধ, অযান্ত্রিকে যান্ত্রিকতা ও মানবতার দ্বন্দ্ব, বাড়ী থেকে পালিয়েতে নিজের বাড়ী পরিবারের প্রতি মমতা, মেঘে ঢাকা তারায় দেশভাগ জনিত সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও পারিবারিক অসহায়তা, কোমল গান্ধারে ঐ একই কারণে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও ভাঙন, সুবর্ণরেখাতেও দেশবিভাগ জনিত কারণে সৃষ্ট সামাজিক বৈপরীত্য ও মূল্যবোধের ক্রমঅবক্ষয়, তিতাস একটি নদীর নামে নদীমাতৃক একটি সমৃদ্ধ জনপদের অবলোপন এবং যুক্তি তক্কো আর গপ্পোতে যুগযন্ত্রণা ও বুদ্ধিজৈবিক হতাশা।

লক্ষণীয়— মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা এই তিনটি ছবি মূলত দেশ ভাগের ওপর চিত্রায়িত। দেশভাগ জনিত সৃষ্ট অজস্র কারণের বেশ কিছু পৃথকভাবে এই তিনটি ছবিতে এনেছেন ঋত্বিক। ট্রিলজি হিসেবে ছবিত্রয়ী আখ্যা পেলেও ঋত্বিক স্পষ্ট কিছু বলেননি এ সম্বন্ধে। সে যাহোক, এই ছবিত্রয়ী ছাড়া বাকি আর পাঁচটি ছবিতে আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত না হলেও আটটি ছবিতেই বিষয়গত সাদৃশ্য রয়েছে। ফল্গু ধারার মতোই যা বহমান। ঐ তিনটি ছবিতে যে মিল দেখা যায় তা মনগোচর হয় বাকি পাঁচটিতেও। দেশ বিভাগ ও ১৯৪৭ এর প্রদত্ত স্বাধীনতার কারণে বহুধাবিভক্তদেশ, দ্বিধাবিভক্ত জাতি এবং তার ফলে সৃষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক যে বিশৃঙ্খলা, শঠতা, বঞ্চনা আর অস্থিরতা তারই পৌনঃপুনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঋত্বিকের সমাপ্ত আটটি ছবির সাতটিতেই।

ঋত্বিকের প্রথম ছবি নাগরিক। ১৯৫২ সালে নির্মিত এ ছবি বাক্সবন্দী দশা থেকে মুক্ত হয় ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পর। (জীবদ্দশায় প্রথম সম্পূর্ণ ছবিটি যার মুক্তি পায়না তার মন মানসিকতার অবস্থা কী রকম হতে পারে তাতো সহজানুমেয়।) নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে চিত্রায়িত ছবিটির পটভূমি দেশভাগোত্তর কোলকাতা। ধ্বংসাত্মক দেশভাগের পর কোলকাতা শহরের ওপর ভৌগোলিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং

তাতে করে পুর্ববঙ্গের ছিন্নমূল নিরপরাধ সাধাবণ জনগণের ওপর যে দুর্দশার ঘুর্ণিঝড় নেমে আসে এবং উভয় বঙ্গের যুব সম্প্রদায়কে হতাশার যে কালোছায়া গ্রাস করে মূলতঃ বেকারত্বের মাধ্যমে তাই সততার সাথে তুলে ধরেছিলেন নাগরিকে। কিন্তু ছবিটি তখন মুক্তি পায়নি। সত্যজিৎ রায়ের মতে ছবিটি যথাসময়ে মুক্তি পেলে সেটিই হতো বাংলা তথা উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর টালমাটাল পরিবেশে দ্বিভঙ্গ বাংলার নবসৃষ্ট শ্রেণী নিম্নমধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধ এবং অক্টোপাসের মতো অজস্র সমস্যা যা ক্রমেই তাদের সবপথ রুদ্ধ করে দিচ্ছিল আর এতে করে স্বাধীনতার স্বপ্ন যে মরীচিকা হয়ে দাঁড়াল সেটা ঋত্বিক তুলে ধরেছিলেন নাগরিকে এক নতুন শিল্পরূপমায়।

দ্বিতীয় ছবি অযান্ত্রিক (১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে। বিশেষজ্ঞদের মতে অযান্ত্রিক ঋত্বিক সাম্রাজ্যের প্রথম তোরণ। যন্ত্র ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে বিন্যাসিত তাঁর এই ছবি। বিষয় ও দর্শনগত কারণে এ ছবিতে স্বভাবতই দেশভাগের প্রসঙ্গ আসেনি।

শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাসে ঋত্বিকের তৃতীয় সৃষ্টি বাড়ী থেকে পালিয়ে (১৯৫৯)। ছবিটির নামেও একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। বাবার কড়াশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে দুরন্ত ছোট্ট কিশোরটি বাড়ী থেকে পালিয়ে কোলকাতায় যেয়ে নানা টানাপোড়েনের পরে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে ঐ পাষাণপুরী থেকে গ্রামে মায়ের কোলে ফিরে আসে। শিবরামের কাহিনীর ছিমছাম কৌতুকাবহকে ঋত্বিক সিরিয়াস ভাবে সচেতন আবহে নিয়ে এসেছেন। আপনভূমের বাইরে গিয়ে মানুষ কতটুকুইবা টিকতে পারে, কতটুকুইবা সৃষ্টিশীলতার পরিচয় রাখতে পারে। ফিরে তাকে আসতে হয় নদীর সাগরে ফেরার মতো, না হলে সে তো হয়ে পড়ে পরগাছা প্রায়। এই উপলব্ধি ফুটে উঠেছে এই ছবিতে। ঋত্বিকের কথায়, 'নিজের মাটির ওপর না দাঁড়িয়ে কেউ কী কিছু কখনো করতে পারে? সত্যিকারের কিছু?' এ ছবিতে তাই দেখি বুলবুল ভাজা বিক্রেতা হরিদাস, পথের বাউল, ভিখিরি সবাই পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল, মাতৃহারা গৃহহারা। পদ্মাপাড়ে ফেলে আসা জীবনের কথা বারে বারে তারা বলে, চায়ের দোকানের আড্ডায় ধূসর দৃষ্টি নিয়ে কয়েকজন উদ্বাস্তু দেশভাগের কারণে তাদের সর্বস্বান্ত হবার কথা ভাবে। বাউলের গানে পদ্মার পূর্বপাড়ে রেখে আসা জীবনের সবকিছুর কথা কান্নাধ্বনিত হয়। কী দোষে সে তার সবকিছু হারালো সে প্রশ্ন অভিশপ্ত নগরী কলকাতার পাথুরে পথে ছুঁড়ে মারে। দেশভাগজনিত কারণে ভাঙা বাংলায় উদ্ভুত নব্যধনিক শ্রেনীর প্রতিনিধি ভুল বাংলায় বেসুরো গান গায় পরম আত্মস্তুতিতে, 'ঐ লতুন গাসে লতুন লতুন পুল পুটিয়াসে।' ছবির শেষে তাই কিশোর কাঞ্চন বলে, সবার চেয়ে বাড়ীই ভালো। অথচ সেই বাড়ীকেই কিনা টুকরো টুকরো করা হলো স্বাধীনতার নামে। ঋত্বিকের ভাষায় তা চরম বিশ্বাসঘাতকতা। যার ফলে আমাদের সব সম্পর্ক সব বিশ্বাসগুলো নষ্ট হয়ে গেল। একটা সমাজ ব্যবস্থা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো, বাড়ী থেকে পালিয়েতে এই কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত নগরী

কোলকাতার ক্রমবিপর্যস্ততার চিত্র সারা ছবি জুড়ে। এই ছবির কিশোর নায়ক কাঞ্চন যেন পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর প্রতীক হয়ে ওঠে। লড়াইয়ের শহর কলকাতা নিয়ে তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটে (যা তিনি মৃত চিলের মোটিফে এনেছেন)। তার বাড়ীতে ফিরে যাবার মাধ্যমে ঋত্বিক একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখেছেন। বাস্তবে সে ফিরে আসাটা অনেক ভাবেই হতে পারে।

এরপর ত্রয়ী চলচ্চিত্র মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০) শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প চেনামুখ অবলম্বনে, কোমল গান্ধার (১৯৬১) নিজের কাহিনী এবং সুবর্ণরেখা (১৯৬২) রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালার চুম্বক গল্প অবলম্বনে। বিশ্ব চলচ্চিত্রে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল—যেখানে সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য, ইতিহাস বলা হয়েছে সম্পূর্ণ সততা ও সাহসিকতায়।

মেঘে ঢাকা তারার যে সম্ভাবনাময় পরিবার তাতো ছিন্নমূল ও ক্রমক্ষয়মান হলো দেশ বিভাগের কারণে। ঋত্বিক কোনো রাখঢাক না করেই এটা সারা ছবিতে বারবার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। পরিবারটিতো আর কিছু নয়। পরিবারটি বাংলা। তার শরীরে ভাঙ্গনের রক্তের ছোপছোপ দাগ, তার কণ্ঠে ভাঙ্গনের কান্না, তার হাতে ভাঙ্গনের দারিদ্র, তার চোখে ভাঙনের পারস্পরিক অবিশ্বাস, তার দৃষ্টিতে ভাঙনের স্বপ্নহীনতা, তার আছে কেবল কোন মতে অস্তিত্ব রক্ষার দিবারাত্রির সংগ্রাম। বঙ্গভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দুঃসাহসী, সোচ্চার প্রতিফলন এ ছবি।

কোমল গান্ধারে দু'টুকরো বাংলা উঠে এসেছে অন্যভাবে। যুবক ভৃগু আর যুবতী অনসূয়া দেশভাগের সৃষ্ট যন্ত্রণা থেকে আশ্রয় খোঁজে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কিন্তু সেখানেও তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, স্বার্থান্বেষণ, চক্রান্ত, দলাদলি, কোন্দল এবং তার কুপরিণতি ভাঙন। গণনাট্য সংঘের ও কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের প্রেক্ষাপটে দেশভাগের বিপর্যয় চিত্রায়িত করেছেন ঋত্বিক এখানে। ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ ড. বাঁধন সেনগুপ্তের মতে, 'এই ছবি নির্মাণের পরিকল্পনার পিছনে মানব জীবন তথা বাংলা বিভাগের পরিণতি এবং ট্র্যাজেডির ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।' আর ঋত্বিকের কথায়, 'চারপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙন আমি জানি তার মূল হচ্ছে ভাঙা বাংলা। কোমল গান্ধারে আমার সমস্যা কাহিনীর তিনস্তরের বিবরণ। আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্থ নেতৃত্ব এবং দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদন, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। এ ছবির নায়ক ভৃগু দেশভাগের কারণে ছিন্নমূল যুবক যে তার শিল্পসাধনার বিপর্যয়ে কাতর আর নায়িকা অনসূয়া যে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎতায় মাকে হারানোর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, এরাতো আমরাই। বাইরের কেউতো নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুরভিসন্ধির ফলে ক্ষত বিক্ষত বাংলা, আর সেই দূর্গতির কুফল সাম্প্রদায়িকতা, আশ্রয়হীনতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, বিশ্বাসহীনতা এবং সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা—তারই চিত্রায়ণ কোমল গান্ধার'।

সুবর্ণরেখা-য় দেশভাগেরই কারণে ঈশ্বর ও তার শিশু বোন সীতা, কৌশল্যা ও তার শিশুপুত্র অভিরাম সকলে ছিন্নমূল হয়ে ভেসে যায় ওপারে। অভি শৈশবে তার মাকে

হারিয়ে যৌবনে ফিরে পায় মায়ের মরণদশায়। স্বামীহারা সীতা পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য হয় আর তার ওপর উপগত হতে আসে তারই সহোদর ভাই ঈশ্বর। স্বভাবতই আত্মহননে শেষ পরিণতি সীতার। ঋত্বিকের কথায়, 'সীতা আর কেউই নয়, সে আমাদের এই ভাঙা বাংলা, পতিতার মতো দীর্ণদশা তার।' সবাই তাকে কেবল ব্যবহার করছে। ভেতরের বাইরের সকলে। ভাগ করেছে, নিজেদের সুবিধেমত। কেউই ভাবছেনা তাকে নিয়ে। ঋত্বিক বলেন, 'বেশ্যালয়ে ঢুকে ঈশ্বর তার বোন সীতাকে আবিস্কার করে, তার কারণ কি? বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতোই দশা। আর আমরা অবিভক্ত বঙ্গের বাসিন্দারা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি।' তারপরেও সীতার শিশুপুত্র যখন নতুন বাড়িতে যাবার কথা বলে তখন এত বিপর্যয়ের পর নতুন আশার স্বপ্ন জাগায় মনে।

সাতচল্লিশের দেশভাগ বাঙালির জীবনে এক চরম বিপর্যয়। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে বিভেদের পাঁচিল তুলে একটা জাতিকে যেভাবে দুটো আলাদাভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো স্বদেশী দোসরদের যোগসাজশে তাতে করে কেবল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দ্বিখণ্ডিতকরণই নয় পূর্ব বাংলার এক বিশাল জনসংখ্যাকে অসহায় ছিন্নমূলে পরিণত করে। তারই চলচ্চিত্রিক দৃষ্টান্ত সুবর্ণরেখা। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক প্রলয় শূরের অভিমত, 'এদেশে দেশভাগের যন্ত্রণার সবচেয়ে সার্থক দলিল সুবর্ণরেখা। দেশভাগের ঘটনাকে ঋত্বিকের মতো আর কেউ এরকম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন নি। মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা এই তিনটে ছবিতে এটাই বোঝা গিয়েছে যে বাংলা ভাগটাকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয় আজকের সমস্ত অর্থনীতি যে চুরমার হয়ে গেছে তার Basic factor ছিল ঐ বাংলা ভাগ। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে বাধা যে ছেদ যার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি সবই এসে পড়ে, সেটাই তাঁকে ঐ ছবি করতে প্রেরণা দিয়েছে। তিনটি ছবিই ঐ সাংস্কৃতিক মিলনের কথা।'

সপ্তম ছবি তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৭৩) অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের চিত্ররূপ। ঋত্বিকের নিজের কথায়, 'অদ্বৈত বাবুর পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাই তিনি করেছেন, শেষ করেছেন একটা অবক্ষয়ের মধ্যে, সমস্তকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমার রাজনৈতিক বক্তব্য, সেখানে আমি সম্পূর্ণ প্রাণের পক্ষে নোতুন জীবনের ইঙ্গিতে ছবি শেষ করেছি'। এই যে প্রাণের পক্ষে নোতুন জীবনের ইঙ্গিত এতো বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনেরই ইঙ্গিত, যে কারণে তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরই ছুটে গিয়েছিলেন জন্মভূমি ঢাকায় তিতাস করতে। ঋত্বিকের কথায়, 'তিতাস হচ্ছে মায়ের কাছে সন্তানের শ্রদ্ধাঞ্জলি।' বাঁধন সেনগুপ্তের মতে, 'এ ছবি করবার যে পরিকল্পনা তাঁকে তরান্বিত করেছে তার পটভূমি হলো তাঁর ফেলে আসা বাংলাদেশ এবং সেই সঙ্গে ঋত্বিকের দুই বাংলার মিলন বা ঐক্যের স্বপ্ন।'

তিতাসের তীরে তীরে যে সমৃদ্ধ জনপদটি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে গেল, যে নদীটি

শুকিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল যে কোলাহল, সে জনপদটিতো বাংলা, নদীটিতো আমাদের নাড়ীর স্পন্দন, আর যে কোলাহল সে তো আমাদেরই কণ্ঠস্বর। তবু তিতাস শুকিয়ে গেলেও সেখানে আবার ধানের ক্ষেত জন্মায়, শিশুটি ভেঁপু বাজিয়ে এগিয়ে আসে। এতো মিলনেরই সুর।



রাজার ঝি বেদনা ও অপবাদ সহ্য করার জন্যই যেন জন্মেছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রিয়কে পাওয়ার মুহূর্তটিও যেন তার সাথে বঞ্চনা করে

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪), নিজের কাহিনীর এই চিত্রায়ণ ঋত্বিকের সবচেয়ে বিতর্কিত চলচ্চিত্র। জীবনের শেষ এই চিত্রকর্মে নিজের জীবন দর্শন এবং আত্মযন্ত্রণাকে চিত্রায়িত করেছেন তিনি। অসংলগ্নতার আর বৈপরীত্যের অভিযোগ এনেছেন সমালোচকেরা বারবার এ ছবির বিরুদ্ধে। পুনের ফিল্ম ও টিভি ইন্সটিটিউটের ঋত্বিক অধ্যাপক হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে, 'ঋত্বিক তা সচেতন ভাবেই করেছেন। কারণ এই ভঙ্গ বঙ্গে সবখানে সবকিছুকেই জড়িয়ে রয়েছে আপাতঃ বৈপরীত্য, অসংলগ্নতা এবং স্ববিরোধিতা। ঋত্বিক তাই তুলে ধরেছেন'। যুক্তি তক্কো আর গপ্পো-তে শাঁওলি মিত্র অভিনীত বঙ্গবালার চরিত্রটির মাধ্যমে তিনি অখন্ড বাংলা, ভাঙা বাংলা এবং তার অসহায়ত্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন। সরাসরি রাজনীতিকে এনেছেন এ ছবিতে, প্রশ্ন তুলেছেন, আক্রমণ করেছেন রাজনীতি এবং রাজনীতিকের ভন্ডামির বিরুদ্ধে,

বুদ্ধিজীবীর ভণ্ডামির মুখোশ খুলতে চেয়েছেন, উভয় বঙ্গের বিপর্যয় তুলে ধরেছেন। আর এর জন্যে নিজের বিপর্যস্ত জীবনধারাকে এই ছবির কাহিনী করে নিয়েছেন চরম সততা ও সাহসিকতার সাথে। তাই সুবিমল মিশ্র বলেন, 'আমাদের দেশময় সমাজ অর্থনৈতিক স্তরে যে ঘনীভূত অব্যবস্থা, রাজনীতি-সংস্কৃতিতে যে ব্যাপ্ত নৈরাজ্য তার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ঋত্বিক বঙ্গবিভাগকে চিহ্নিত করেছেন বার বার।' দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনে তাঁর যে বিশ্বাস ছিল তা বারবার অনুরণিত হয় আত্মজৈবনিক এই ছবিতে। বলা হয় Broken intellectual এবং অসৎ রাজনীতিকদের কথা, যাদের কারণে টুকরো টুকরো এই দেশ, সংস্কৃতি, সমাজ সবকিছু।

দু'টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র দূর্বার গতি পদ্মা ও ইয়ে কিঁউতে এই প্রসঙ্গ এসেছে। বিশেষত ইয়ে কিঁউ হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যার কুফল এই দেশভাগ তার ওপর চিত্রিত। দূর্বার গতি পদ্মা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্তে নির্মিত।

ঋত্বিক বিশ্বাস করতেন, একজন শিল্পীর কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার নেই, যদি না তিনি তার দেশের সংকটকে কোনো না কোনো দিক থেকে উদঘাটিত করতে পারেন। ঋত্বিক যেহেতু মনে করতেন এই উপমহাদেশের বিশেষত দুই বাংলার যে সমস্যাজর্জর অবস্থা তার মূলে রয়েছে সেই দেশভাগ, তাই তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন এই সংকটকে তাঁর চলচ্চিত্রে ধরতে। সচেতন করতে চেয়েছেন বাংলার দর্শককে নিজের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে। সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে প্রলয় শূর বলেছেন, 'আমরা সকলেই যে জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে গিয়েছি এ কথাটিই ঋত্বিক সুবর্ণরেখায় বলতে চেয়েছিলেন।' আমার মনে হয়, কেবল সুবর্ণরেখায় নয়, সবক'টি ছবিতেই ঋত্বিক তা বলে গেছেন।

ঋত্বিকের আত্মভাষ্য নিজের ছবির সম্পর্কে, 'এখন এদেশের যা অবস্থা যে অব্যবস্থা সমস্তই হচ্ছে ঐ Great betrayal. সে সাতচল্লিশের তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র Result, এটা আমি আমার ছবিগুলোতে বলেছি।' ঋত্বিক এই গ্রেট বিট্রেয়েলের কথা বারবার বলেছেন তাঁর অসমাপ্ত ছবিগুলিতেও, তাঁর গল্পে, তাঁব নাটকে, তাঁর সঙ্গীত প্রয়োগে। আর তাই হলো ঋত্বিক চলচ্চিত্রের মূলসুর। যে খণ্ডিত স্বাধীনতাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, মেনে নিতে পারেন নি যে খণ্ডিত বাংলাকে তারই কথা বার বার বলেছেন তাঁর ছবিগুলিতে। দেখাতে চেয়েছেন তার কুফল বিভিন্নভাবে। রূঢ় এই সৃষ্ট বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেন নি বলেই যুগদ্রষ্টা এই মহান শিল্পী বলতে চেয়েছেন সাংস্কৃতিক মিলনের কথা যা অসম্ভব অযৌক্তিক কিছুই নয়।

নগর : নির্মিত ও অস্বীকৃত
[ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র]

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

ঋত্বিক ঘটকের ছবির ভূগোল নগর কলকাতা। দু'টি বাদ দিয়ে তাঁর সব ছবিতেই নগর কলকাতা থেকেছে। 'নাগরিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'কোমল গান্ধার', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে পুরনো নগর কলকাতা। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় পুরনো নগরের প্রান্তে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু নগর কলকাতা। আর 'সুবর্ণরেখা'য় দু'টোই।

নগর
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

ঋত্বিকের ছবিতে ভূগোল রয়েছে ইতিহাসের চিহ্ন নিয়ে। 'নাগরিক' আর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কলকাতা। 'কোমল গান্ধার'-এর প্রেক্ষাপট বামপন্থী আন্দোলন আর 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নকশালবাড়ির সংগ্রাম। 'সুবর্ণরেখা' আর 'মেঘে ঢাকা তারা'য় দেশভাগ-উত্তর প্রেক্ষিত।

পুরনো নগর কলকাতা, আর গড়ে তোলা উদ্বাস্তু নগর কলকাতা, যেখানে সেই সময়ের ইতিহাসকে বুঝে নেওয়া যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটকের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েকটা লেখায়, সাক্ষাৎকারে। যেমন :

> এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, মুসলীম লীগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে দিয়ে আদায় করলো ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক বন্যা ছুটলো চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমার নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা ... আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন বাংলা, যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের প্রিয় সঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা এই বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোক চক্ষে উপস্থিত করা।[১]

ঋত্বিক সময়ের-ইতিহাসের চিহ্নগুলো দেখিয়েছেন নগরের প্রেক্ষাপটে।

'নাগরিক'-এ দেখা যায় আস্তাকুঁড় থেকে খাবার জোগাড় করছে ক্ষুধার্ত মানুষ। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র অন্যতম মুখ্য চরিত্র হরিদাস ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দেশভাগ হওয়াতে শহরে চলে এসেছে। দশবছর ধরে চাকরির খোঁজ করে না পেয়ে বুলবুল ভাজা বিক্রি করছে। এই ছবিতেও ঋত্বিক দেখিয়েছেন বিয়ে বাড়ির ফেলে দেওয়া খাবার, কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়ে, আস্তাকুঁড় থেকে সংগ্রহ করছে লোকজন। ছবির প্রধান

চরিত্র কাঞ্চন প্রশ্ন করে জানতে পারে তারা গ্রাম থেকে এসেছে।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় রয়েছে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু নগর। উল্লিখিত হয়েছে কলোনী থেকে উচ্ছেদের নোটিশের ভয়। 'সুবর্ণরেখা'তেও দেখানো হয়েছে পূর্ববাংলা থেকে আসা মানুষজন নগর নির্মাণে রত। ছবিতে রয়েছে জমিদারের লোকদের হামলা। রাতে পাহারা দেওয়ার প্রস্তুতি।

'কোমল গান্ধার' ছবি শুরু হয়েছে একটা নাটক অভিনয়ের দৃশ্য দিয়ে। সেখানে নাটকের একটি চরিত্র বলছে, 'ক্যান যামু দেশ ছাইড়া, যামু ক্যান'। এখানেও দেশভাগের উল্লেখ। এর সাথে এই ছবির পটভূমি গণনাট্য আন্দোলন। নাটকের দল নিয়ে গ্রামে যাওয়া। এবং উচ্চাবিত হয়েছে শিক্ষকদের দাবি, মিছিল, পুলিশের গুলি চালনা।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। ছবির মুখ্য চরিত্র নীলকণ্ঠের ঘরে বঙ্গবালা প্রবেশ করে বলে, 'বাংলাদেশ থাইক্যা আইছি, ... এ শহরে পথে পথে ঘুরি, যাওনের জায়গা নাই ...।' পরে নীলকণ্ঠের কাছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের কথা শোনায় সে। ঋত্বিকের ইতিহাস রচনা কখনও প্রকাশিত, কখনও প্রচ্ছন্ন। নগর এখানে ক্যানভাস।

নগর

সামাজিক প্রেক্ষিত

সময়ের ইতিহাস চেহারা তৈরি করছে সমাজের। ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে নগর সামাজিক বিষয়ের আধার হিসেবে নির্মিত।

ঋত্বিকের ছবির চরিত্ররা মধ্যবিত্ত। বিশ্বযুদ্ধ আর দেশভাগ দু'টি ঐতিহাসিক বিষয় মধ্যবিত্তের সামাজিক জীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তার দৈনন্দিন ও সামগ্রিক বিষয় ঋত্বিক তাঁর ছবিতে এনেছেন। নগর এখানে সমাজের ভূগোল।

'নাগরিক'-এর নায়ক রামু বেকার। সে চাকরি পাবার চেষ্টা করছে। অবসর প্রাপ্ত বাবা, অবিবাহিত বোন, ছোট ভাই, মা। অর্থের অভাবে আগের বড় বাড়ি থেকে ছোট একটা বাড়িতে চলে এসেছে। রামু একের পর এক ইন্টারভিউ দিয়ে চলেছে। দারিদ্র তাদের বাড়িতে, দারিদ্র তার প্রেমিকার বাড়িতে, অন্যান্য বাসিন্দাদের। বাড়িওয়ালা বকেয়া ভাড়ার জন্য তাগাদা দিয়ে যায়। পেয়িং গেস্ট হয়ে আসা উচ্চশিক্ষিত সাগরও একটা চাকরির চেষ্টা করে। ঘরে চাল নেই শুনে সাগর তার বই বিক্রি করে চাল কেনার টাকা নিয়ে আসে, রামুর প্রেমিকা উমা সেলাই করে সংসার চালাবার চেষ্টা করে। উমার বোন শেফালী দারিদ্রের জন্য বেশ্যা হয়ে যায়। উমাদের প্রতিবেশী যতীন বাবুর আকাঙ্খা ভালো খাবার। খাবারের অভাবে ছেলে মারা যায়। যতীন বাবুরা বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে চলে যায়। ছবির শেষে রামুও তাদের বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে উঠে যায়। 'মেঘে ঢাকা তারা' উদ্বাস্তু কলোনীর ছবি। সেখানে সামাজিক স্তরে গড়ে তোলা হয়েছে বিদ্যালয়, পাঠাগার,

উদ্যোগ চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্য চর্চার। ব্যক্তি স্তরে অন্য ছবি। উদ্বাস্তু নীতা সংসার চালানোর দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছে।

সেই সময়ের মধ্যবিত্ত জীবনের নগর কেন্দ্রিক সামাজিক বিষয় টুকরো টুকরো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় এসেছে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা। মন্টু কারখানায় চাকরি নেবার পর অভাবগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে ধীরে ধীরে তার ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এসেছে জীবিকা প্রসঙ্গে মধ্যবিত্তের গোঁড়া মনোভাব। মন্টু কারখানায় কাজ নেওয়ায় তার বাবার আপত্তি শোনা যায়, 'মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রার মান কোন চড়ায় গিয়া ঠ্যাকে দ্যাখো'। আবার কারখানায় মন্টুর দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি বলেন, 'যন্ত্রে গ্রাস করিতে পারে নাই'।

নগরভিত্তিক মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্র, বেকারী, পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নেওয়া, কারখানায় কাজ নেওয়া, স্বার্থপরতা, আদর্শচ্যুতি এইসব বিষয় ঋত্বিক তাঁর ছবিতে রেখেছেন কখনো মূলধারায়, কখনো পারিপার্শ্বিকতায়।

নগর

উপাদান

ঋত্বিকের ছবিতে নগর কলকাতা তার সমস্ত চিহ্ন নিয়ে উপস্থিত। ছবির ভৌগোলিক পটভূমি বিশ্বস্ত করে তুলতে ঋত্বিকের ক্যামেরা কলকাতার বাহির ও ভিতরকে ধরেছে নিপুণতায় :

'নাগরিক' ছবির শুরুতেই পর পর দৃশ্য রয়েছে গঙ্গা, হাওড়া ব্রীজ, ট্রামের তার, ট্রাম লাইন, মানুষ, রাস্তা, বাস, পথের মোড়, বেহালা বাজিয়ে ভিক্ষে চাওয়া। ছবির মাঝখানে দৃশ্য সমষ্টি : ময়দান, অক্টোরলনী মনুমেন্ট, মূর্তি, গলি, রিকসাওয়ালা, কোলে সন্তান নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করছে ভিখারী দম্পতি, রাস্তার ধারে ভাঙ্গা দেওয়ালে ঘুঁটে লাগানো, পথে হকার। আবার একটা বিশেষ সময়ের পরিচয় দিতে পূজোর প্যান্ডেল, মাইকের গান। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে কাঞ্চন গ্রাম থেকে তার অচেনা নগর কলকাতায় ঢুকছে। নদী, নদীতে লঞ্চ, নদীর উপরে সেতু, হাওড়া সেতুর জটিল কাঠামো। কাঞ্চন যত কলকাতার ভিতরে আসছে, ছবিতে এসেছে বাস, দোতলা বাস, ট্রাম, মাল ভর্তি ঠেলা, পুলিশ, পথচারী। এই ছবিতে সারাক্ষণই কলকাতা। সাধারণ নাগরিক উপাদান থেকে বিশেষ বিশেষ দৃশ্য তৈরি করে ঋত্বিক কলকাতাকে দেখিয়েছেন পরিপূর্ণতায়।

একেকটি দৃশ্যপর্ব এসেছে এইভাবে। ট্রাফিক লাইট-ট্রাফিক পুলিশ-নিওন আলোর বিজ্ঞাপন- নিউ মার্কেট; ময়দান- ঘোড়ায় চড়া পুলিশ-খেলার মাঠ- দর্শকদের উল্লাস- খেলা শেষে লোকদের বাড়ি ফেরা ; ভোরের কলকাতা- জলদিয়ে রাস্তা ধোয়া হচ্ছে; কলেজ স্ট্রীট- বই পাড়া- ফুটপাতে বইয়ের দোকান- ক্রেতার পকেট কাটা।

কখনো এসেছে তুলনামূলক ভাবে। শিয়ালদহ স্টেশনের ধারে উদ্বাস্তুদের ঝুপড়ির সারির পরেই অফিস অঞ্চলে ডালহৌসী স্কোয়ারের বড় বড় বাড়ি। বস্তি অঞ্চলের পরেই

ফ্ল্যাটবাড়ি। মিছিলের দৃশ্যের পর বিয়ে বাড়ির বাজনা।

কখনো বিশেষ দৃশ্য নির্মাণ। কাঞ্চন দেখছে রাস্তায় ভেল্কি খেলা— ঝুড়ির মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে রেখে তাকে তলোয়ার দিয়ে কাটার ভান করা ; ম্যানহোলের ভিতর মানুষ ঢুকছে, কাঞ্চনের চোখে বিস্ময়।

'নাগরিক' ও 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে নগরের ছবি এসেছে চরিত্র নিরপেক্ষভাবে, নগর যেখানে নিজেই চরিত্র। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', আর 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নাগরিক উপাদানের ছবি এসেছে চরিত্রের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকতায়।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার কলকাতায় পথ চলায় এসেছে ফুটপাত, ফুটপাতে পথচারীর ছায়া, ট্রাম, সনৎ এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় মেসবাড়ি। মন্টুর দুর্ঘটনার পর হাসপাতাল। আর অফিসে বসে ক্লান্তি দূর করতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে উপর থেকে দেখা কলকাতা।

'সুবর্ণরেখা'য় ঈশ্বরের চোখ দিয়ে দেখা তার ব্যবসায়ী বন্ধু রামবিলাসের বিরাট বাড়ি, তার ধর্মগুরু, তার জন্য আয়োজন করা বাজনার আসরে কলকাতা, উচ্চবিত্ত লোকজন। পরে ঈশ্বর আর হরপ্রসাদের অংশগ্রহণে ঘোড় দৌড়ের মাঠ, ঘোড়ার দৌড়, হোটেলে মধ্যপান, নাচ, বাজনা, কলকাতার রাতের আলো, ট্যাকসির ভিতর থেকে আলোর ফুল্‌কি।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নীলকণ্ঠ, নচিকেতা, বঙ্গবালা আর জগন্নাথের কলকাতায় পথচারণার পারিপার্শ্বিকতায় রাস্তা, বাড়ির সারি, খাবারের দোকান, মদের ঠেক, পার্ক, পার্কের বেঞ্চি, ভোরবেলায় বৃদ্ধদের হাঁটাহাঁটি, ছোটদের খেলা, চায়ের দোকান, চা পান. গঙ্গার পাড়, ফকিরের গান, গঙ্গায় লঞ্চ, শহরের রাস্তায় রাত্রিবাস, মশা এই সব।

'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'সুবর্ণরেখা'য় গড়ে তোলা উদ্বাস্তু নগরের অন্য চিহ্ন। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় খোয়া ফেলা রাস্তা, চাঁটাইয়ের বেড়া, মাটির ঘর, টালির চাল, মুদির দোকান, 'সুবর্ণরেখা'য় নগর নির্মাণের উদ্যোগ। বাঁশ, চাঁটাই, 'নবজীবন কলোনী'র সাইন বোর্ড টাঙ্গানো।

নগর

টানা পোড়েনের ভূগোল

ঋত্বিক তাঁর ছবির একটি বা একাধিক চরিত্রের মানসিক অবস্থান বা অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করার প্রেক্ষাপট হিসেবে নগরের জমি এবং উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। কলকাতার রাস্তা, পার্ক, রেলস্টেশন, চায়ের দোকান, এইসব নাগরিক চিহ্ন চরিত্রদের জড়ো হবার জায়গা করে দিয়েছে। উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে তাদের মানসিক অবস্থানকে প্রকাশ করার। 'নাগরিক' ছবিতে ঋত্বিক কয়েকবার চায়ের দোকান এনেছেন সেই সময়কার যুবকদের ভাবনাচিন্তা প্রকাশের স্থান হিসেবে। একটা টেবিলে

রামুর বয়সী যুবকেরা কেউ আলোচনা করছে ঘোড় দৌড় নিয়ে, তাদের হাতে ঘোড়ার টিপসের ছোট বই। আবার অন্য টেবিলে রাজনীতিক সমাবেশের কথা, এইসব বিপরীত ধর্মী কথোপকথনের মধ্যেই রামু বন্ধুদের কাছ থেকে চাকরির খোঁজ করে নেয়।

চায়ের দোকানে বসে 'কোমল গান্ধার'-এর অনসূয়া-ভৃগু দু'টি নাট্যদলের মধ্যে বিরোধ নিয়ে আলোচনা করে।

ঋত্বিক পার্কের জমি ব্যবহার করেছেন অনেক ছবিতে। 'নাগরিক'-এ রামু চাকরির সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে পার্কে বসে আছে। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় তাদের বাড়ির নবাগত পেয়িং গেস্ট সাগরের। রামু জানতে পারে বাড়িতে চাল নেই, শুনে, সাগর তার বই বিক্রি করে চাল কেনার টাকা জোগাড় করছে। রামু অনুভব করে সংসারের জন্য যে কাজ তার করার কথা, তা করছে একজন অনাত্মীয়।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে কাঞ্চন দেখে পার্কের বেঞ্চিতে একজন বসে খবরের কাগজ পড়ছে। গোলমালের আওয়াজ শুনে কৌতূহলী কাঞ্চন তাকে প্রশ্ন করে, 'ওখানে কি হয়েছে ?' চারপাশ সম্পর্কে নির্লিপ্ত ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। কাঞ্চন এগিয়ে গিয়ে দেখে পার্কের পাশের রাস্তা দিয়ে একদল লোক তার পূর্ব পরিচিতা পরিচারিকাকে চোর সন্দেহে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। পরিচারিকা বলছে, 'আমি চুরি করিনি, আমাকে মেরো না বাবা'। কাঞ্চন বাধা দেবার জন্য দৌড়ে যাচ্ছে। ওদের মাঝখানে পার্কের রেলিঙের সারি। আরো পরে কাঞ্চন যখন নগরের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পার্কের রেলিঙের সামনে দাঁড়ায়, ঋত্বিকের ক্যামেরায় তখন রেলিঙ বল্লমের ফলার মতো।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র নীলকণ্ঠ, নচিকেতা ও বঙ্গবালাকে নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে নবীন বাংলার স্বপ্ন দেখে, যে বাংলাদেশ জন্মায়নি, জন্মাবে। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় ঋত্বিক ব্যস্ত শিয়ালদহ স্টেশনের ট্রেনের আওয়াজ, স্টেশনের বাতি, লোকদের যাতায়াতের পটভূমিকায় প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিকে ব্যবহার করছেন নীতা ও সনৎ এর মতপার্থক্যের সংলাপের স্থান হিসেবে। নীতা জানায় কেন সে এখন বিয়ে করতে পারবে না। তার স্বপ্ন তার দাদা শংকর ও সনৎ এর প্রতিষ্ঠা নিয়ে। কিন্তু সনৎ বলে সে অপেক্ষা করতে রাজী নয়। সময় হয়ে যাওয়াতে নীতা বেঞ্চি ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরতে এগিয়ে যায়। সনৎ বেঞ্চিতে বসে থাকে।

নগর

দ্যোতনা

ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে নগরের উপাদান কখনো এনেছেন চরিত্র ও ঘটনা নিরপেক্ষভাবে, নিছক ভৌগোলিক পরিবেশ তৈরির জন্য, কখনো এনেছেন চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে তার পারিপার্শ্বিক করে। এ ছাড়াও নগরের চিহ্ন ব্যবহৃত আপাত সম্পর্কহীন ঘটনার ব্যঞ্জনা রূপে। কখনো শহরের কোন চিহ্ন, কোন ঘটনা, কোন শব্দ কিংবা প্রাকৃতিক বিষয় ঋত্বিক এনেছেন রূপক করে।

'নাগরিক'-এ রামুরা অর্থের অভাবে বড় বাড়ি ছেড়ে ছোট বাড়িতে চলে এসেছে। বাড়িটার অসুবিধা দেখাতে ঋত্বিক ব্যবহার করেছেন বাড়ির পাশে গাড়ি সারানোর গ্যারেজের আওয়াজ। রামুর বাবা বসে আছে। জানালা দিয়ে গাড়ি সারানোর আওয়াজ আসছে। তার সংলাপ, 'জানলাটা বন্ধ করে দেতো'। পরে এই একই বিষয় ঋত্বিক নিয়ে এসেছেন এক চরম মুহূর্তে। বাবার রোগশয্যার পাশে রামু বসে আছে। বাবার হঠাৎ মৃত্যু হলো। জানলার পাশে গ্যারেজে একটা লরী প্রচণ্ড শব্দ করে উঠলো, ক্যামেরা লরীটিকে বীভৎস করে দেখালো।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় আছে সিঁড়ির ব্যবহার, নীতা সংসারের দায়িত্ব নিতে এম. এ. পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিল। অফিসের সিঁড়ির জটিল কাঠামোয় নীতাকে দেখানো হয়। সে সিঁড়ি বেয়ে নামছে।

নীতার স্বপ্ন ছিলো সনৎ এখন চাকরি না নিয়ে গবেষণা করবে। সে খবর পেল সনৎ চাকরি নিয়েছে। মেসে গিয়ে জানতে পারলো সনৎ মেস ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে উঠে গেছে। বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে নীতা সেখানে গিয়ে পৌঁছলো। সিঁড়ি ভেঙ্গে আস্তে আস্তে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নীতা উঠলো। সনৎ এর ঘরে গিয়ে দেখলো সনৎ এর চেহারা ও পোষাক বদলে গেছে। টের পেল পাশের ঘরেই রয়েছে তারই বোন গীতা। নীতা আবার সিঁড়ির এক একটা ধাপ আস্তে আস্তে ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে নামতে থাকে। উঁচু বাড়ির সিঁড়ি এখানে প্রতীকী হয়ে উঠেছে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে গঙ্গার বুকে জাহাজ দেখে কাঞ্চন দূর দেশে চলে যাবার কথা বলে। কলকাতার রাস্তায় মৃত চিল স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের আশাহত প্রতীক।

'কোমল গান্ধার'-এ নাটকের মহড়া ঘরে যখন নাট্যদলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিবু দলের পরিচালক ভৃগুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো, দলের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিল। তখন ঋত্বিক শহরের যান্ত্রিক আওয়াজ ব্যবহার করেছেন নেপথ্যে। অনসূয়া যখন তার মনে কলকাতার টান অনুভব করছে নেপথ্যে এসেছে ট্রামের আওয়াজ।

নগর

চরিত্রের সংলাপ

ঋত্বিক তাঁর ছবিতে নগর উপস্থাপন করেছেন দৃশ্যের মাধ্যমে। পরিচিত শব্দের মধ্যে দিয়ে। নগরের এই রচনা কোথাও আপাত ব্যাখ্যাহীন। কোথাও রচয়িতার বক্তব্য পরোক্ষভাবে এসে গেছে।

ঋত্বিক নগর উপস্থাপনার আরেকটি পদ্ধতি নিয়েছেন। চরিত্রের সংলাপে নগর এনেছেন। যেখানে নগরের নিছক বর্ণনা নয়। নগরের ব্যাখ্যা। নগরের ভিতরটাকে নানা দিক দিয়ে দেখা। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে কাঞ্চন পালাবার আগে বন্ধুকে বোঝাবার চেষ্টা করছে তার সঙ্গে কলকাতায় যেতে। কাঞ্চন বন্ধুকে বলছে, 'কলকাতা দারুণ শহর, রাতের বেলায় দিনের মতো আলো'। বন্ধুর কলকাতা সম্বন্ধে ভয়। উত্তরে বলছে,

'কলকাতায় ছেলে ধরা আছে। ছোট ছেলে দেখলেই ধরে।' কাঞ্চন মানেনি। সে বলছে, 'কলকাতাই তো এলডোরাডো'। ঋত্বিক এলডোরাডোর উপকথার সঙ্গে কলকাতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে বাউলের গানের কথা, 'আমি অনেক ঘুইরা শেষে, আইলামরে কলকাতা, রকম সকম দেইখ্যা আমার ঘুইর‍্যা গেছে মাথা'।

'নাগরিক'-এ রামুর জিজ্ঞাসা, চারপাশে খাড়া খাড়া বাড়ি উঠে গেছে, কি করে মানুষ বাস করবে।

'বাড়ী থেকে পালিয়ে'তে কনকের মা কাঞ্চনকে বলছে, 'ছাদের উপর থেকে বোঝা যায় না কলকাতা কত ব্যস্ত।' রেস্তোরাঁয় কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে ঋত্বিক বলিয়েছেন, 'কলকাতা তারপর হইতে ইতর হইয়া গেল'। কাঞ্চন একটা বাড়ির রোয়াকে শুয়ে আছে। একটা ছেলে ওর জুতো নিয়ে ছুটে পালালো। কাঞ্চন ধরতে পারলো না। ব্যাপারটা দেখে একজন পথচারীর মন্তব্য, 'কলকাতা শহর চোরে ভর্তি।'

নগর কলকাতায় ঘুরে ঘুরে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে কাঞ্চন প্রশ্ন করছে, 'আচ্ছা হরিদাস এখানে এত দুঃখ কেন?' 'সুবর্ণরেখা'য় চাকরি হারিয়ে, স্ত্রী ও সন্তানদের দারিদ্রে মৃত্যুতে বিপর্যস্ত হরপ্রসাদ কলকাতা ছেড়ে আসা বন্ধু ঈশ্বরকে অনুরোধ করছে, 'ঈশ্বর আমারে একবার কলকাতায় নিয়া যাবা, ... কলকাতায় এখন মজা ... সে যে কি বীভৎস মজা, মাইনষে কেমনে স্রোতে গা এলাইয়া দেয় ... গড্ডালিকা প্রবাহই সত্যি।'

আবার হোটেলে মদ্যপান করে ট্যাক্‌সি চড়ে যেতে যেতে রাতের কলকাতা দেখে হরপ্রসাদ ঈশ্বরকে শুনিয়েছে, 'এই নগর যুদ্ধ দ্যাখে নাই, মন্বন্তর দ্যাখে নাই, দাঙ্গা দ্যাখে নাই, দেশভাগ দ্যাখে নাই।' 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নীলকণ্ঠ, নচিকেতা ও বঙ্গবালা গৃহহীন হয়ে কলকাতার একটা পার্কে বসে রাত কাটাচ্ছে। হঠাৎ আওয়াজ করে পার্কের পাশে পুলিশের গাড়ি থামলো। একজন পুলিশ কর্মচারী পার্কে ঢুকে নীলকণ্ঠকে দেখতে পেয়ে বক্রোক্তি করলো। নীলকণ্ঠর মন্তব্য, 'এই হচ্ছে কলকাতার বর্তমান নাগরিক জীবন।'

পরদিন সকালে নীলকণ্ঠদের সঙ্গে দেখা হলো গায়ের বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক জগন্নাথ ভট্টাচার্যের। বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসেছেন। নীলকণ্ঠের প্রশ্ন কলকাতায় কেনর উত্তরে জগন্নাথের জবাব, 'কলকাতা বড় শহর, একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।' কলকাতার একটা সারাংশ ঋত্বিক রেখেছেন 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র একজন অবাঙালি মালবাহকের সংলাপে। অফিস অঞ্চল লালদীঘির পাড়ে পাঁচিলের ওপর শুয়েছিলো মালবাহক। কাঞ্চনকে দেখে তার মমতা হয়। জানতে পারে কাঞ্চন ক্ষুধার্ত। তাকে নিয়ে ফুটপাতে বসে খেতে খেতে বুঝতে পারে কাঞ্চন অভিমান করে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। সে কাঞ্চনকে বোঝায়, 'এখানে মান করলে দেখবার কেউ নাই... এ লড়ায়ের জায়গা ... এ কলকাত্তা শহর ... মারদাঙ্গার শহর...'।

কলকাতার অন্য এক চেহারা এসেছে 'কোমল গান্ধার'-এ। অনসূয়াব সংলাপে।

ভৃগুর ঘরের জানালা দিয়ে পাশের বাড়ির ভাঙ্গা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। একটা পাখীর ডাক শোনা গেলো। অনসূয়া বললো, 'কলকাতার ইট কাঠ ধোঁয়া, পাখীটা তার মধ্যে ডাকছে'।

নগর

স্বপ্ন রচনা

ঋত্বিকের ছবির চরিত্ররা স্বপ্ন বানায়। তাদের স্বপ্নের জমি নগর কলকাতা। 'নাগরিক'-এ রামু তার পরিবারের সবাইকে স্বপ্ন দেখায় চাকরি পেলে তারা 'এই বাড়ী ছেড়ে বড় বাড়িতে চলে যাবে।' রাতে মার পাশে শুয়ে রামু বলে, 'উপরে ঠেলে ওঠার ইচ্ছেটা কোনদিন যায়নি। দিন বদলায়। আবার বড় বাড়িতে উঠে যাবো, এইভাবে দিন কাটবে মানিনা'।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র কাঞ্চনের স্বপ্নে কলকাতাই এলডোরাডো। কাঞ্চনের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়া পরিচারিকা তার হারানো ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার স্বপ্নে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার মা-র স্বপ্ন উদ্বাস্তু নগরে গড়ে তোলা তাদের মাটির বাড়িটা দোতলা হবে। 'সুবর্ণরেখা'য় অভিরাম আর সীতা ছাতিমপুর থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে— অভিরামের উপন্যাস প্রকাশের স্বপ্ন নিয়ে। 'কোমল গান্ধার'-এ অনসূয়া কলকাতা ছেড়ে যেতে চায় না। নাটকের দল গড়া, নাটক করার স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে। ঋত্বিকের কলকাতায় তাঁর চরিত্রদের স্বপ্ন সফল হয় না। রামুদের বড় বাড়িতে যাওয়া হয় না। আর্থিক অনটন নিয়ে তারা বস্তিতে উঠে যায়। কাঞ্চনের কলকাতা এলডোরাডো হয়ে ওঠে না। পরিচারিকা তার হারানো ছেলেকে খুঁজে পায় না। অভিরামের উপন্যাস প্রকাশক পায় না। অভিরাম ও সীতার ঘর ভেঙ্গে যায়। অভিরাম দুর্ঘটনায় নিহত হয়। সীতা আত্মহত্যা করে। নীতাদের বাড়ি দোতলা হয়। কিন্তু সে বাড়িতে নীতার থাকা হয় না।

নগর

প্রতিবাদ

ঋত্বিকের কলকাতা প্রতিবাদের স্থান। কখনো সাংগঠনিক প্রতিবাদের দৃশ্য। কখনো ব্যক্তিক প্রতিবাদের উপস্থাপনা। মিছিলের দৃশ্য আছে 'নাগরিক', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'কোমল গান্ধার'-এ।

'নাগরিক'-এ চায়ের দোকানে রামুর বন্ধুদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে রাজনীতিক সমাবেশের প্রস্তুতি। রামুর বন্ধু সুশান্ত একজন রাজনীতিক কর্মী। সে রামুকে বলেছে, এ বাজারে বাঁচতে হলে দল বাঁধ। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে কাঞ্চন ছবি আঁকিয়ে ছেলেটিকে যখন ওস্তাদ অত্যাচার করছিলো কাঞ্চন ওস্তাদকে মেরে ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাকে সাময়িক মুক্ত করে। কাঞ্চনের পরিচিত পরিচারিকাকে যখন

একদল লোক মারছিলো কাঞ্চন প্রতিবাদ করছিলো, 'ওকে মেরো না, বলে ওঠে, ও আমার মা'।

'সুবর্ণরেখা'য় উদ্বাস্তু বসতি নবজীবন কলোনী গড়ে তোলার প্রক্রিয়া থেকে অন্যতম উদ্যোক্তা ঈশ্বর যখন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নগর থেকে চলে যায় বন্ধু হরপ্রসাদ প্রতিবাদ করে। বলে, ঈশ্বর পলাতক। নবজীবন কলোনীতে জমিদারের হামলা রুখতে যুবকদের রাত জেগে পাহারা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে বিনোদ।

'কোমল গান্ধার'-এ চায়ের দোকান থেকে ভৃগুকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলে শ্লোগান দেবার জন্য। ভৃগুর বন্ধু অনসূয়ার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেয় পুলিশের গুলি চালনায় ছত্রভঙ্গ গ্রাম থেকে আসা প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য। এই সব সংক্ষিপ্ত রচনায় প্রতিবাদ প্রকাশিত। সরাসরি রাজনীতিক বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে 'নাগরিক' ছবির শেষে রামুর সংলাপে। কলকাতায় গলিতে দাঁড়িয়ে সে বলে, বেঁচে থাকতে হবে ... দু'হাতে জীবনটাকে ধরে বাঁচতে হবে... এটাই ইতিহাসের লেখা... নতুন শিশুর জন্ম দিচ্ছি...যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি... সবাই মিলে চীৎকার করে বলে উঠি ... আমরা মরবো না।

নগর

অস্বীকৃতি

ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে নগর সমালোচিত। চরিত্রের অধঃপতন ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নগরের জটিলতা ও অমানবিকতার সমীকরণ করেছেন তাঁর ছবিতে, ঋত্বিকের মননে নগরের অস্বীকৃতি। নগরে বঞ্চনা, অপ্রাপ্তির বিপরীতে চরিত্ররা নগরের বাইরে নিজেদের সুখ, আনন্দ, ভাললাগাকে সন্ধান করে, স্থাপন করে।

'নাগরিক'-এ রামুর মা কলকাতার ছোট বাড়িতে বসে অনটনের মধ্যে বাস করে তার দেশের কথা ছোট বেলাকার কথা মনে করে। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে কাঞ্চন বিয়ে বাড়িতে মিনির সঙ্গে আলাপ হবার পর ক্লান্ত হয়ে ভিড়ের মধ্যে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে মিনিকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে খাল বেয়ে নৌকা করে চলেছে মা-র কাছে। ডালহৌসি স্কোয়ারে ক্ষুধার্ত হয়ে লালদীঘির পাড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কাঞ্চন। স্বপ্ন দেখে, বাড়ির কাছে নদী, খাল... বাড়িতে চুরি করে খেতে গিয়ে মার কাছে ধরা পড়ে যাওয়া.. মাকে আদর করা... কাঞ্চন স্বপ্ন বলেও। ফুটপাতে যে ছেলেটা ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করে আর ওস্তাদের হাতে সব পয়সা তুলে দেয়, কাঞ্চন তাকে ওস্তাদের কব্জা থেকে সাময়িক মুক্ত করে। তারপর সেই ছেলেটাকে নিয়ে ময়দানে মনুমেন্টের নীচে বসে স্বপ্ন দেখে দু'জনে বড় শিল্পী হবে। এই শহরটা ছেড়ে চলে যাবে।

মিনির মা কাঞ্চনকে নিজের ছোটবেলাকার কথা মনে করে বলেন কলকাতা তার কাছে ক্লান্তিকর।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার জন্মদিনে তার বাবা তাকে আর দাদা শঙ্করকে নগরের

বাইরে নিয়ে যায়।

নীতা সাংসারিক অনটন, তার প্রেমিকের সঙ্গে তার ছোটবোনের বিয়ে হওয়া, তার যক্ষ্মা হওয়া, এই সবের মুখোমুখি হয়ে ছোট বেলায় পাহাড়ে যাবার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরছে। পাহাড়ে যাবার স্বপ্ন দেখছে।

'সুবর্ণরেখা'য় সীতা ও অভিরামের প্রেম কলকাতার বাইরে। সীতা-অভিরাম, তাদের ছেলে বিনু কলকাতায় নতুন বাড়ি পেতে চেয়েছিল। অভিরামের দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও সীতার আত্মহত্যার পর বিনু তার মামা ঈশ্বরের সঙ্গে নতুন বাড়ির দিকে যাত্রা করে কলকাতার বাইরে।

'কোমল গান্ধার'-এ নাটকের দলের মধ্যে সংঘাত কলকাতায়। কলকাতার বাইরে দলের মধ্যে উচ্ছ্বাস। নাটক ব্যর্থ কলকাতার মঞ্চে। গ্রামের মঞ্চে নাটক সফল। ভৃগু-অনসূয়া পরস্পরকে গভীর ভাবে জানে নগরের বাইরে।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে নীলকণ্ঠ ও দুর্গার প্রেমের দৃশ্যে এসেছে পাহাড়, নদী, খোলামাঠ, ঝর্ণা, জঙ্গল। নচিকেতা কলকাতার জীবনধারণে বীতশ্রদ্ধ। তার সংলাপ, 'এভাবে আর বাঁচা যায় না, একটা কিছু খুঁজে নিতে হবে।' এই সংলাপের পর ছবির চরিত্ররা কলকাতা ছেড়ে চলে যায়।

ঋত্বিকের ছবিতে সুখের সন্ধান, আনন্দের প্রাপ্তি, প্রেমের প্রকাশ, নতুন যাত্রার গন্তব্য নগরের বাইরে। ঋত্বিকের ছবিতে নগরের অস্বীকৃতি।

'মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার যক্ষ্মা ধরা পড়ার পর বাবা বলে, 'তোকে এরা বোঝা মনে করে, তুই চলে যা, তুই চলে যা'। নীতা নগরের বাড়ি ছেলে চলে যায়। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে মাল বাহক কাঞ্চনকে বলে, 'তু এখানে কি করবি, তু ঘর যা, ঘর যা'। কাঞ্চন নগর ছেড়ে নগরের বাইরে তার ঘরে ফিরে যায়।

নগর

তাত্ত্বিক বিষয়

ঋত্বিক দেশভাগে উদ্বাস্তু। পূর্ব বাংলার গ্রাম থেকে পশ্চিমবাংলার নগরে তাঁর ভূগোল বদল। ভূগোল বদলেছে ইতিহাসের কারণে, যে ইতিহাসকে ঋত্বিক মেনে নিতে পারেনি। ইতিহাসের এই অস্বীকৃতি থেকে বর্তমান নগর ভূগোলকে অস্বীকার। অতীত গ্রাম ভূগোলের স্মৃতিতে থেকে যাওয়া :

> আমার দিন কেটেছে পদ্মার ধারে ... একটা দুঁদে ছেলের দিন .. ইলশে গুঁড়ির গ্রাম বর্ষায় হঠাৎ খুশি হয়ে যে সুরে টান মারে মনমাতানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভেসে আসতো কেমন অস্পষ্ট মন কেমন করা পাগল সুরে। স্টীমারে শুয়ে রাত্রে দোলা খেয়েছি মাতাল নদীর দাপটে আর শুনেছি ইঞ্জিনের ধস্‌ধস্‌। সারেঙ্গের ঘন্টা খালাসির বাঁও না মেলা আর্তনাদ। মা বাবা দাদা দিদি একান্তবর্তী পরিবার হই চই করে ভাই বোন মিলে খাওয়া, কত ডান পিটে বন্ধু, মারপিট। আম লিচু চুরি, পড়ে পা ভেঙ্গে যাওয়া, ধরা পড়ে মার

খাওয়া, কত ছবি কত মন, একটা সভ্যতা। মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ। আর নেই, কিন্তু যদি থাকতো... দাঁড়াতে পারতাম তার ওপরে, বলতে হয়তো পারতাম কিছু। এমনভাবে বর্তমানকে বিকৃত মন নিয়ে দেখতাম না। ভবিষ্যতকে এত ভয় করতাম না। দেশের এই মানুষের ভবিষ্যতকে'।[২]

অতীত অনগর বাস্তবতায় প্রাপ্তি, তার প্রতি মমতা ও মগ্নতায় ঋত্বিক বর্তমান নগর বাস্তবতাকে সমালোচনা করেছেন। ঋত্বিক নিজের ভৌগোলিক উদ্বাস্তুতাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তুতায় রূপান্তরিত করেছেন :

উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা বলতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না ... আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি — এটাও আমার বক্তব্য। বাস্তুহারা কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই আমার অন্বিষ্ট।[৩]

ঋত্বিকের ছবির চরিত্ররা নগরে উদ্বাস্তু। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ছিন্নমূল। ঋত্বিক নগরে তাদের প্রতিস্থাপন করেছেন এই ছিন্নমূলতা রূপায়ণে। নগর তাদের বাসভূমি নয়। নগরে তাই অপ্রাপ্তি। নগর সেহেতু সমালোচিত।

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে নগর এসেছে অস্বীকারের দর্শনে।

সূত্র :

১. ঋত্বিক ঘটক, *'আমার ছবি'*, চিত্রবীক্ষণ, ঋত্বিক ঘটক সংখ্যা, নবম বর্ষ, চতুর্থ-সপ্তম সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ১৯৭৬

২. ঋত্বিক ঘটক, *'ছবি করা'* চিত্রবীক্ষণ, উপরে উল্লিখিত।

৩. ঋত্বিক ঘটক, *'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে'* চিত্রবীক্ষণ, উপরে উল্লিখিত।

[এই প্রবন্ধ রচনায় সাহায্য করেছে আমার বন্ধুরা · লক্ষণ ঘোষ, মৈনাক বিশ্বাস ও নবীনানন্দ সেন। আমি এদের কাছে ঋণী]

ইতিহাসের মাত্রা ও ঋত্বিক কুমার ঘটক

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

Look here upon this picture and on this :
Have you eyes ?
হ্যামলেট : তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

ইতিহাসকে আমরা তথ্যের বদলে নীতির ভিত্তিতে সাজিয়ে নিতে চাই।

জীবনানন্দ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন—'এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে'; সিনেমা যদি আলোর শিল্প হয় ঋত্বিকের নির্মাণে তবে এই অপর আলোর তাৎপর্য আছে। যেমন কমল কুমার মজুমদার একটি অপর ভাষা খুঁজে গেলেন আজীবন তেমনি ঋত্বিক ঘটকও ইতিহাসের প্রথা স্বীকৃত চিত্রায়ণকে উপেক্ষা করে চলচ্ছবির জন্য চেয়েছিলেন একটি অপর মাত্রা-চেতনা।

আমার তখনো পাঁচ বছর বয়েস, *অযান্ত্রিক* মুক্তি পেলো ১৯৫৭-য়। ঘন শিহরণে, সত্তর দশকের শুরুতে, প্রথম আমি অযান্ত্রিকে প্রবেশ করি। তারপরে আরও পনেরো-ষোলোবার দেখার সুযোগ হয়েছে। লিখেছি বার তিনেক। কিন্তু আজ মনে হয় যে ভাষায় কথা বলেছি তা আজকের নয়, গতকালের, অতীতের। আমার সমালোচনার ভাষা বাস্তব অবস্থার সম্পূরক হতে পারেনি। বাতিল হয়ে যাওয়া এক মূল্যবিচার আমাকে ছলনা করে যাচ্ছিল গবেষণার নামে। নিরাশার, উজ্জ্বলতার এক প্রদেশ— অযান্ত্রিক ; তন্বী শরীরের অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি নয়। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে আমাদের শিল্পবেত্তাদের, এমনকি আমার 'ঋত্বিকতন্ত্র' ও লেখা প্রায়ই রুদ্ধবয়ানপ্রতিম। স্বপ্ন দেখা শিল্পীর কাজ, কিন্তু শুধু নিজে স্বপ্ন দেখতে জানলে মহৎ শিল্পের জনয়িতা হওয়া যায় না। শিল্পীকে স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই স্বপ্নকে এমনভাবে অবয়ব দান করতে হবে যাতে তা অন্যদের মাথায় স্বপ্নের ডালপালা মেলে দেয়। মৃত্তিকার গহন থেকে মহীরুহে—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে :

মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

শিল্পের ইতিহাসে পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গির দাম কতটুকু ? কেউ কি আছে যিনি খবরের কাগজের কলমচির বাক্‌বিভূতির সঙ্গে র‍্যাবোঁর শব্দহীনতার তুলনা করবেন! আমাদের শতাব্দীকে যিনি শাসন করতে পারেন সেই ফ্রানজ কাফ্‌কা কি অসামান্যভাবেই না তপোক্লিষ্ট! তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা তো এক অঙ্কেই থেমে গেল ; আর চলচ্চিত্র শতায়ু হওয়ার আগেই ধারণ করেছে এমন স্রষ্টা—যেমন আন্দ্রেই তারকোভ্‌সকি, যেমন ঋত্বিক কুমার ঘটক— যাঁরা সাত কিংবা আটটি অধ্যায়ে নিবেদন করেছেন মহাকালের সঙ্গে

তাঁদের বিখ্যাত কথোপকথন। অথচ বহুবাচনিকতার দিক থেকে এই সৃষ্টিসমূহ ক্রমশই আমাদের কাছে নতুনতর অর্থদ্যোতনা মেলে ধরছে। এই সব অর্থ স্থাণু ও অনড় নয়, পরমার্থ নয়, দ্রষ্টার অবস্থানসাপেক্ষ— মুক্তরেখ ও সম্প্রসারণশীল। চলমান ছবির প্রতিমা থেকে চলচ্চিত্রভাষার ভাস্কর্যে উত্তীর্ণ হতে হতে ঋত্বিক, তারকোভ্সকি বা গোদার শুধু আমাদের অনুগমন দাবি করেন না তাদের নির্মাণের বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্য রেখে যান প্রতিনির্মাণের উৎস ও সম্ভাবনা। আমাদের সাম্প্রতিক বিচারবুদ্ধি শিল্পে সমাপিকা ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয় না। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রকর্ম, ঈষৎ প্রণিধানেই দেখা যায় মুক্তধারা। সেই ধারা থেকে যে কোনও অংশেই উপধারা আলাদা করে নেওয়া যায়। স্বয়ং সমাপ্তির বদলে তিনি রচনা করেন পরিপক্কতা যা সময়োত্তীর্ণতার অব্যর্থ চিহ্ন। বয়ানের এই বিচিত্রমুখি বিস্তারই ঋত্বিক ঘটককে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র থেকে পৃথক ও সম্ভ্রমী দূরত্ব দেয়। পাঠ্য বিষয়ে ফরাসি মনীষী রল্যাঁ বার্তের অভিজ্ঞতার অল্প একটু আমি এখানে স্মরণ করতে চাই :

> And what is infinite in that book is not only its end ; at everypoint the supplement is possible : something new can always grow later on in the interstices of the fabric, of the text. The book has holes, and therein lies its productivity... it is not going somewhere, it is going away, it never stops going away.

ফ্রান্সে জঁ-লুই ল্যোত্রার মতন আলোচক রয়েছেন যিনি গোদারের *প্যাশন* (১৯৮২)-কে কেন্দ্ররহিত বয়নভঙ্গি হিসেবে নির্দেশ করেন ; আবিষ্কার করেন বার্ত-উক্ত পরিপূরকতা কীভাবে সংশ্লিষ্ট ছবিটিকে প্রসারণশীল করে রেখেছে। দুর্ভাগ্য ঋত্বিকের নয় আমাদের, যে, আমাদের সমালোচনা আজও অপ্রাপ্তবয়স্ক। আমাদের বাক্যরাশি শুধু ঋত্বিক ঘটকের অবিন্যস্ততা ও অসংহতি সন্ধান করে। আহা! উত্তর-অযান্ত্রিক ঋত্বিক এত অমিতাচারকে প্রশ্রয় দিলেন! কার্তেজীয় নৈপুণ্যের পরেই ভাঙচুর ও নৈরাজ্য, অন্তর্ঘাত ও নাশকতা। সামঞ্জস্য শব্দটিই ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গেল ঋত্বিকের বর্ণমালায়। আমাদের আজ উল্লেখ করতেই হবে আপাত এই 'বিশৃঙ্খল' স্বর্গীয়, প্রকৃত প্রস্তাবে, শৃঙ্গারোহণপর্ব। পঞ্চাশোত্তীর্ণ ভিলাসকেথ আর মূর্ত ও যথাযথ কিছু আঁকেননি; তাঁর পটে সার্বভৌম সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে দেশ— *পিয়েরো ল্যো ফুর* সূচনায় জানাচ্ছে জঁ লুক গোদার। যেমন সালভাদর দালির চিত্রমালার ফাঁক-ফোঁকর থেকে ভেসে ওঠে নতুন দ্বীপ— অন্য চিত্রমালা, যেমন জঁ-ককতোর চলচ্চিত্রে চিড় ধরলে প্রবেশ করে কাব্য, তেমন ঋত্বিকের রচনায় আছে নানা ফাটল যার স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বক্তব্য। মনীষার এই কারুকার্যময় বিন্যাস অনুসরণ করতে না পারলে ঋত্বিক-সংক্রান্ত আমাদের যে কোনো কথা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরিপ্রেক্ষিতের এই যে নানা উপকরণ ও তাদের যৌগিক অবস্থা— পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের অনুকরণে উত্তর-আধুনিক অভিধাটি না ব্যবহার করে অথবা বাখতিন প্রমুখ রুশ রূপবাদীদের প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে— আমরা সানন্দে

উপলব্ধি করি, সাম্প্রতিকতার শাশ্বত অবস্থান। অতঃপর আমার সামান্য সঞ্চয় নিয়ে *অযান্ত্রিক* নামের তীর্থ দর্শনে নির্গত হব।

একটি যন্ত্রের থরে থরে ঝরে পড়েছে প্রণয়াঞ্জলি। কি উপমা- রহিতভাবেই না জঁ জেনে তাঁর আত্মজীবনী 'চোরের পুঁথি'তে মন্তব্য করেছেন— প্রতিভা হল বস্তুর প্রতি সৌজন্য ; তা হল যা মূক ছিল তার ওপর গান আরোপ করা। আর এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছি *অযান্ত্রিক* কোনও একক সুরের দূরপ্রয়াণ নয় বরং নানা সুরের সমন্বয়ে ঐকতান, মিশ্রস্বরের মন্তাজ, এমনকি ক্যাকোফনি।

অযান্ত্রিক ঋত্বিক ঘটকের দ্বিতীয় ছবি এবং একমাত্র ছবি যা সর্বজনপ্রশংসিত ; ঋত্বিক-কৃত একমাত্র শিল্পকর্ম যার উৎকর্ষ বিষয়ে মার্কসবাদী থেকে শান্তিনিকেতনপন্থী, মিডিয়া ও অধ্যাপক, গন্ধর্ব কিন্নর সকলেই একমত। আশ্চর্যের বিষয় প্রায় যাবতীয় উচ্ছ্বাসই ধাবিত হয়েছে ছবিটির আঙ্গিক দক্ষতা ও গঠনের সৌন্দর্যের প্রতি। উচ্চারিত হয়েছে এই ছবির আখ্যানভাগ যা আমাদের চেনা আটপৌরে অভিজ্ঞতার বাইরে। অভিনন্দিত হয়েছে গল্প বলার রীতিটুকু— যা রূপসীর শরীরের মতই মেদহীন ; রূপসীর ত্বকের মতই মসৃণ ও অব্যর্থ। অথচ সবিনয়ে জানানো ক্যামেরার কৃৎ-কুশলতা, আউটডোর লোকেশনের অভিনবত্ব, সম্পাদনার আধুনিক ও নিরাবেগ ক্ষিপ্রতা অথবা পূর্বোক্ত কৃতিত্বসমূহ স্থায়ী শিল্পের নিশ্চিত অভিজ্ঞান নয় কোন মতে। সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে মুগ্ধ অবলোকনের শিখরে আমরা উন্নীত হয়েছিলাম আগেই। সেই আপাত আচ্ছন্নতায় অবলিপ্ত না থেকে ঋত্বিক 'ভাষাপথ খননি স্ববলে' যা আয়ত্ত করলেন তা মননধর্মের উদ্বোধন। মানুষের অস্তিত্বের ইতিহাস আসলে চেতনার দার্শনিক সম্প্রসারণের ইতিহাস ; ভারতীয় চলচ্চিত্রে *অযান্ত্রিক* সেই প্রক্রিয়ার প্রথম সচেতন অভিঘাত।

নাগরিক (১৯৫২) ছবিটিকে যদি আমরা উপরিতলের বাস্তবতা থেকে পৃথক করি অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটটিকে অর্জুনের একাগ্রতা নিয়ে না বিচার করি এবং যদি পাখির চক্ষুর সঙ্গে সমগ্র বৃক্ষটিও জরুরি হয়ে ওঠে আমাদের কাছে তবে প্রধানত দুটি তাত্ত্বিক অভিযান আমাদের নজরে পড়ে :

(ক) একজন মার্কসবাদী শিল্পী দৃশ্যভাষার সঙ্গে অনবদ্য শব্দভাষার সমানাধিকার দাবি করছেন। মৃত্যুর ধাতব পদধ্বনি অথবা আরও কিছু কোলাহল এবং আরোহী ও অবরোহী বাক্-প্রতিমা প্রমাণ করে তরুণ ঋত্বিক মানুষের প্রকাশ ক্ষমতার অনুষঙ্গে চিত্রিত ভাষার সর্বজনীনতা সত্ত্বেও শব্দসরণীকে গৌণ মনে করেন না। আমরা এ প্রসঙ্গে ১৯২৮ সালে আইজেনস্টাইন-পুদভকিনের একটি যুগ্ম ইস্তাহারের প্রতি পাঠককে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেব যেখানে বিপ্লবোত্তীর্ণ সোভিয়েতভূমিতে তাঁরা এমন একটি চলচ্চিত্রীয় সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যা শুধু শব্দকে ছবির সমান গুরুত্বই দেবে না উপরন্তু অনুমতি দেবে ইমেজ-নিরপেক্ষ আত্মপ্রকাশে।

(খ) দুর্গাপ্রতিমার আগমন ও বাস্তচ্যুতি যা জায়মান স্তরে প্রমাণ করে জাতীয় ঐতিহ্যের

> সমানুপাতে মহীয়সী মাতার রূপকল্প সংযোজন বস্তুত ইতিহাস রচনার প্রণালীবিশেষ। এই পদ্ধতি আসলে প্রত্ন-সময়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের সেতুবন্ধন প্রচেষ্টা। অন্যভাবে বলা যায় আপাত ও প্রকৃতর সমন্বয়ে সময়ের স্থাপত্যরচনা। জয়েসের রচনার পরিচয় দানে এলিয়ট কিংবদন্তি-নির্ভর বয়নভঙ্গির তাৎপর্য উল্লেখ করেছিলেন। লেভি স্ট্রাউসের সময় থেকে মিথের গহন অবয়ব আধুনিক শিল্পতত্ত্বের অন্যতম পরীক্ষণীয় বিষয়। জানি *নাগরিক* প্রসঙ্গে এসব কথা অতিশয়োক্তি মনে হতে বাধ্য কিন্তু আমি একই সঙ্গে জানাতে চাই যদি আমরা ঋত্বিকের স্রষ্টা-বৃত্তির (auteurism) একটি চিত্রলেখ রচনায় প্রবৃত্ত হই তবে দেখব *নাগরিক* থেকে *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* পর্যন্ত সংযুক্তির কয়েকটি সাধারণ স্থানাঙ্ক কাজ করে। যেভাবে এতদিন বলা হয়েছে যেন *অযান্ত্রিক* আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তি, তা নয়। নাগরিকেই আলোচ্য শিল্পীর চৈতন্য এমন কয়েকটি অঙ্কুর প্রসব করেছিলেন যা পরবর্তী পাঁচ বছরের কৃচ্ছ্রসাধনে বিকশিত হয়ে ওঠে।

সত্য এই যে অযান্ত্রিকেরও একটি প্রকাশ্য রাজনীতি ছিল। সেই রাজনীতি আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধ্রুপদী চরিত্র তখনো অক্ষুণ্ন এবং অনুত্তীর্ণ তিরিশ ঋত্বিকের পক্ষে, স্তালিন প্রয়াণের পরও সোভিয়েত যুগের মতাদর্শগত বিতর্কের অংশীদার হওয়া অনিবার্য না হলেও স্বাভাবিক। চলতি শতক শুরু হওয়ার ন'বছর বাদে মারিনেত্তি সমাধিফলক চূর্ণ করার আহবান জানান ; পরামর্শ দেন ভেনিসের সুনাব্য জলপথসমূহকে পয়ঃপ্রণালীবৎ ব্যবহারের জন্য। ফিউচারিস্ট ইস্তাহার আসলে গতিবন্দনা ও যন্ত্রের জয়ধ্বনি। তাঁরা ব্রোঞ্জের বিমূর্ততায় উৎকীর্ণ দেখেছিলেন অশ্ব। মায়াকোভ্‌সকি, জিগা ভেরতভ প্রমুখ রুশ নির্মাণবাদীরা বস্তুত এই যন্ত্রস্তবেই উৎসাহ পেয়েছিলেন। মার্কসবাদের প্রতি গভীর আনুগত্য তাঁদের মনে করিয়ে দেয় শিল্পকর্মী হিসেবে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে পরিবর্তিত উৎপাদন-সম্পর্কের মুখ চেয়ে উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর জন্য একটি মাতৃভাষা আবিষ্কার। কারখানা ও ল্যাবরেটরি মায়াকোভ্‌সকি-সহ তরুণ কবিদলকে উত্তেজিত করে। যন্ত্রসভ্যতার নতুন চিত্রকল্প উদ্ধারে চলচ্চিত্রস্রষ্টা আইজেনস্টাইন বা জিগা ভেরতভের মন্তাজ ও কিনো-প্রাভদার সংগ্রাম, মায়ারহোল্ডের বায়োমেকানিকস, কবিতার পরিকল্পিত বিশ্লিষ্টায়ন ও ছবিতে ঘনভবিষ্যবাদ সবকিছুই ইঙ্গিত করেছিল :

> the struggle
> for construction
> instead of style,
> the stern calculation
> of steel precision.

মায়াকোভ্‌সকির চিত্রনাট্যে রৌদ্রস্নাতা শ্রোণীযুগের বদলে ভেস এল Benz N·
নামের মোটরগাড়ি ৷ নীলাভনয়না সুন্দরীকে প্রতিস্থাপিত করল অক্টোবর বিপ্লব। প্রস্তা

ছবিটির সগর্ব ঘোষণা—"একমাত্র অক্টোবর, যা মানুষকে মুক্তি এনে দিয়েছে, যন্ত্রকেও মুক্তি এনে দেবে।"

আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি ঋত্বিকের রাজনৈতিক পুরোভূমি। এমন নয় যে কথিত চিত্রনাট্যটি সম্বন্ধে ঋত্বিক অবহিত ছিলেন কিন্তু *অযান্ত্রিক* রচনার যে সমস্ত সূত্রের কথা সংশ্লিষ্ট পরিচালক উল্লেখ করেন তা থেকে স্বচ্ছ হয়ে আসে যে সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংগ্রামের বিবরণ তাঁর খুব অজ্ঞাত ছিল না। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঋত্বিক 'যন্ত্রের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক' অযান্ত্রিকের মূল ব্যঞ্জনা হিসেবে নির্দেশ করেন। সমগ্র ঔপনিবেশিক মায়াজালটিকে পরীক্ষা করে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্য— 'আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি আবার অনুপ্রবেশ না করি তাহলে কোনও জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না।' অপরদিকে কিন্তু শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে মেশিন ও অমানবিকতা সমার্থবাহী, 'বোধহয়' ঋত্বিক বলে চলেছেন, 'পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল বলেই আমাদের এই সার্বিক, অবৈজ্ঞানিক উদাসীনতা, পশ্চিমী জীবনের শূন্যতাবোধও অনেকখানিই আমাদের মনোজগতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।' সামাজিক দায়িত্বপরায়ণ ঋত্বিক তাই আসন্ন ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে একটি মোটরযানের সঙ্গে মানুষের আত্মিক যোগসূত্রের বিষয়টিতে আলোকপাত করলেন।

এ পর্যন্ত পিরামিডের একটি বাহু।

তুলনামূলক পশ্চাদভূমি হিসেবে আমরা স্বচ্ছন্দে আরও যুক্ত করতে পারি মারিনেত্তি ১৯১২ সালে লন্ডন শহরে বাসের গর্জনে অভিভূত হয়ে পড়েন। আমরা বলতে পারি বিপ্লবের অগ্নিবলয় এমনভাবে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে সহসা মনে হয় জড় হয়ত চৈতন্যও অর্জন করেছে— অযান্ত্রিকে জগদ্দলের কয়েকটি কম্পোজিশন তো তার নিশ্চিত অভিব্যক্তি। *অযান্ত্রিক* যেভাবে গাণিতিক মাত্রায় সম্পাদনা ও দৃশ্যরচনা করে তা নির্মাণবাদের নানাবিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্মরণ করায়। তবু আমি বলব বিপ্লবপূর্ব ও উত্তররুশী শিল্পচেতনার সঙ্গে ঋত্বিকের সঞ্চারপথের একটি মৌলিক ব্যবধান আছে। ১৮৬৩ থেকে লেনিনের নব আর্থিকনীতি পর্যন্ত রুশ কলাবিদ্যার একটি সমীক্ষা চালিয়ে ক্যামিল্লা গ্রে তাঁর *গ্রেট একস্‌পেরিমেন্ট* বিবরণে দেখাতে পেরেছেন যে রাশিয়ায় যন্ত্রের আগমন আশীর্বাদক শক্তি হিসেবে ; মেশিন নির্দয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়পতাকা এবং সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যসৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। ফলে বলশেভিকতন্ত্র শিল্পায়ণের দ্বারা সামাজিক মলাট বদলের সময়ে বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক সমর্থন পায়। যেহেতু আলোচ্য বিষয় রুশ কান্তিতত্ত্ব নয় ; ঋত্বিক ঘটক, সুতরাং আমি তো যোগ করতেই পারি জারতন্ত্র আর যাই হোক ইংরেজদের মতো বহিরাগত ঔপনিবেশিক রাজশক্তি নয় উপরন্তু জাতীয় মানসিকতার প্রতিফলনের সৌজন্যে এখানে যেমন রক্তকরবী বা মুক্তধারা জনস্বীকৃতি পেয়েছে, হিমার্ত রুশভূমিতে তা ঘটেনি সুতরাং তাঁর সঙ্গে প্রগতিশীল রুশ শিল্পচর্চার সরাসরি অন্বয়সাধন পরিস্থিতিকে লঘু ও একদেশদর্শী করে তোলে।

আমরা বরং পিরামিডের অপর একটি বাহু নিয়ে আলোচনা করি।

বাস্তবিক সিনেমা কি নিয়ে বা কীভাবে কথা বলবে তা অন্তত নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন গ্রিফিথ-উত্তর মার্কিন চলচ্চিত্র ব্যবস্থা। কিন্তু সংস্থা অনুমোদিত এই উপস্থাপনা পদ্ধতি স্পষ্টতই কুড়ির দশক থেকে সর্বজনমান্যতা হারাতে শুরু করে। সংখ্যালঘু হলেও ফরাসি আভ-গার্দ ও রুশ চলচ্ছবি কাহিনীর নিরাপত্তা থেকে মস্তিষ্কের বিকিরণকে আদরণীয় ভাবার কারণ খুঁজে পেয়েছিল। বাস্তবতার ওপরের স্তরটি আঁচড়ে দেওয়া যে শ্রেষ্ঠ শিল্পের পক্ষে গৌরবজনক পন্থা নয়— এই বোধ থেকেই ছবিতে বক্তব্য যোগ করার প্রয়াস শুরু হয়। ইতিহাসের এক আশ্চর্য কৌতুকে যেদিন চোরাপথে চলে আসা *ইনটলারেন্স* মস্কোতে প্রদর্শিত হল সেদিনই আইজেনস্টাইনের মনে হয়েছিল ব্যক্তিসত্যের এই সফল আপেক্ষিক রূপ কখনই সাধারণকৃত বক্তব্য নয় ; তত্ত্ব ও প্রতিতত্ত্বের সংঘর্ষ ও সমন্বয়, পলেমিকস, প্রকাশের জন্য একটি বিকল্প পথ চাই।

যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনের দিকে তাকালে আমাদের অনুমান করতে কোনও অসুবিধে হয় না যে কাহিনী এক্ষেত্রে তথ্য-প্ররোচিত কিন্তু তথ্যভিত্তিক নয়; স্বভাবজাত প্রকৃতিগত বাস্তবতা এখানে লুপ্ত বরং কৃত্রিম, নির্মিত, চিন্তাশ্রয়ী প্রতিবেদন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে শিল্প ও অভ্যুত্থান পারস্পরিক অবস্থানবদল করতেই পারে। বিশ্বচলচ্চিত্রের সেরা ছ'মিনিট ওই অডেসা সিঁড়ির বৃত্তান্তের ক্লোজ-আপ, গতিপরিবর্তন, সমষ্টি ও ব্যক্তির প্রতিমুখী বিক্রিয়া, অধোগামী প্যারাম্বুলেটর— সব কিছুই যেন বয়ানের অতিরিক্ত কিছু অর্থবহন করে।

এই ছবি থেকেই কার্ল ড্রেয়ার খুঁজে পেয়েছিলেন জোয়ান অফ আর্কের যন্ত্রণার ধারাবিবরণী। কিন্তু আমাদের বলার যে এই একটি দৃষ্টান্তই ঋত্বিককে বিশ্বাস করায় বিষয়ের আর কোনও মূল্য নেই। জনৈকা বিবাহিতা মহিলার রুমালপাত শিল্পের রাগমোচন সম্ভব করে। মাংসে পোকা পড়লে যুদ্ধজাহাজ পটেমকিনে শুরু হয় শীতপ্রাসাদ দখলের মহড়া। তাহলে, মোটরগাড়ির অন্তর্দহন কেন ইতিহাসের অচর্চিত প্রদেশগুলিকেও তপ্ত করবে না ?

অতএব বিষয় গৌণ, আমরা বক্তব্য চাই। ঋত্বিক নিজেই আত্মপক্ষের বিবৃতি দিয়েছেন— 'ছবিতে গল্পের যুগ শেষ হয়ে গেছে, এখন এসেছে বক্তব্যের যুগ।' আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় মনে হয় সকল মন্ত্রের মধ্যে এই-ই গায়ত্রী অনন্ত ঋত্বিকতন্ত্রে। নাট্যান্তগর্ত চিন্তাস্রোতের চাইতে তাঁর কাছে নাট্যোর্দ্ধ বা নাট্যাতিরিক্ত চিন্তাপ্রবাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঋত্বিকের দৃশ্য ও ধ্বনি চিন্তার চলমানতাকে নথিভুক্ত করতে চায়। প্রথাস্বীকৃত সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রবোধকে তিনি শুধু পরিত্যাগ করলেন না, আবিষ্কার করলেন বক্তব্য রাখার নতুন ও মৌলিক রীতি। 'অযান্ত্রিক'— বিশেষণের এই পলেমিক্যাল প্রকৃতি আমাদের বলে দেয় পরিচালক এবার টীকা ও ভাষ্য দান করবেন। বক্তব্যের এই সমালোচনামূলক অবস্থান, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে, ঋত্বিক ও গোদার প্রায়

সমসাময়িকভাবে নির্ণয় করেন। গোদার যখন চলচ্চিত্র ও তাঁর সমালোচনাকে সমান্তরাল অথচ একীভূত স্তরে নিবেদন করেন, ঋত্বিক তখন *মেঘে ঢাকা তারা* তে মুদ্রিত করেন অতিরঞ্জনের বর্ণমালা— ওভারটোনস ; *কোমল গান্ধার*-এ চলচ্চিত্রীয় প্রবন্ধ স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে।

যেহেতু আমাদের আলোচ্য আপাতত অযান্ত্রিক-পরবর্তী ছবিগুলি নয় তাই ভেবে দেখি অযান্ত্রিকের বক্তব্য বা ডিসকোর্স কী ধরনের। কেন ঋত্বিক উত্তর প্রজন্মের কাছে শুধু স্বদেশে নয়, সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও, সর্বাধিক উর্বর হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন। ঋত্বিকের বিরুদ্ধে যা মূল অভিযোগ, আমরা যদি তার অবিনির্মাণ সম্ভব করি তবে দেখব এই অভিযোগ আসলে, অভিযোক্তারা যা অনুধাবন করেন না, সত্য। ঋত্বিকের কেন্দ্রীয় সমস্যা প্রকৃতই বাস্তুহীনতার। *মেঘে ঢাকা তারা* থেকে এই সমস্যার একটি ভৌগোলিক বিগ্রহ রূপ পেতে শুরু করে। কিন্তু তদন্ত করলে দেখা যাবে ঋত্বিকের চরিত্ররা, যেমন আন্তোনিওনির চরিত্ররা, কেউ গৃহস্থ নয়। তারা নষ্টনীড়। হয় তারা গৃহচ্যুত, নয় তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ সমাসন্ন, নয় তারা পথচারী। নাগরিকে, আমরা যদি দেখি, ভ্রষ্টকুলায় মধ্যবিত্তদের প্রস্থচ্ছেদ ; একেবারে ব্যাকরণস্বীকৃত অর্থে তারা উচ্ছেদেরও শিকার। এরপরেই *অযান্ত্রিক*। যদিও দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা ঋত্বিকের মূল অভিপ্রায় তখনো হয়ে ওঠেনি তথাপি এই ছবিতেও কিন্তু উপস্থিত নষ্টনীড় মানবক ও গৃহপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। এই রহস্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই স্বচ্ছ হয়ে যায় অযান্ত্রিকের বয়নরীতি নববাস্তবতাপন্থী নয়। এস্তোয়ার জেনারেল দুরসিমেনার জন্য আমরা যদিও আভূমি প্রণত থাকব, তথাপি মহামান্য জর্জ সার্দুল, ঋত্বিকের প্রতি তাঁর সপ্রেম আগ্রহ সত্ত্বেও, ভুল করেছেন। অযান্ত্রিক কখনই নিওরিয়্যালিস্ট ছবি নয়— না বক্তব্যে, না আঙ্গিকে। ফরাসি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দে সিকার বাইসাইকেলের একটি প্রতিচিত্র ঋত্বিকের জগদ্দলের মধ্যে মিলতে পারে ; আউটডোর লোকেশন, নক্ষত্রশূন্য অভিনয়— সবই সত্য কিন্তু অযান্ত্রিকের ওঁরাও নৃত্যের অংশটি কাহিনীর দৈনন্দিতা হরণ করে। সঙ্গে যুক্ত হয় নায়কের অস্বাভাবিক প্রায় ভূতগ্রস্ত চরিত্র। নব-বাস্তবতা গোত্র হিসেবে এধরনের সংযোজন অনুমোদন করে না।

বয়ানটুকুর প্রাথমিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে ঋত্বিক পরিচিত ভূগোল থেকে সরে এসেছেন। গাঙ্গেয় পলিমাটির চেনা শ্যামলিমাকে প্রতিস্থাপিত করছে রুক্ষ, পাথুরে উপত্যকা। বিমল অস্বাভাবিক, কল্পনাপ্রবণ, অশান্ত-মানচিত্রের বাইরে। সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আদিবাসী নৃত্য পর্যায়ে—ইতিহাসের মাত্রামোচন। আকস্মিক অশনিসংকেতের মতো মনে হয় এও তো শতাব্দীর অন্যতম প্রজ্ঞান। ভ্রান্ত, খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ সরল ইতিহাসকে যথার্থ, পূর্ণ, অখন্ড বক্রিমায় স্থাপন করাই অযান্ত্রিকের মৌল অবদান। শিল্পী ছাড়া আর কে সভ্যতার সাময়িক মত্ত রজনীর অবসানে আলোকিত জাগরণ চাইবেন ? আত্মজ্ঞানরহিত সহজীবীদের ঋত্বিক উপহার দিতে চান চেতনার অভিজ্ঞান। ইতিহাসকে সম্প্রসারিত অখণ্ডিত পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করতে চান বলেই ওঁরাও নৃত্য সংযুক্ত হয়।

আমরা সমান্তরাল উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারি প্রায় একই উদ্দেশ্যে শতাব্দীর সূচনায় ব্রাক, পিকাসো পটে নিগ্রো ও আদিম অভিব্যক্তি যুক্ত করেন। পাঠক-শ্রোতা সমীপে নিবেদন করব পিকাসোর Demoiselles d' avignon (১৯০৭) : সেই ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত— যেখানে সমতল পরিপ্রেক্ষিতে ও মুখোশের আবহ সর্বনাশের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করেছে। একই সঙ্গে আমাকে সমর্থন জোগাবে জর্জ ব্রাকের বিবৃতি :

> Negro masks also opened a new horizon for me. They permitted me to make contact with instinctive things, direct manifestations that ran counter to a false traditionalism which I abhorred.

আপনারা জানেন ঈষৎ পরে কাব্যে এলিয়ট ও উপন্যাসে জয়েস আখ্যানধর্মী কথকতাকে পৌরাণিক আবহ দিয়ে গর্ভিনী করে তুলবেন। কেননা বিশৃঙ্খলা ও বন্ধ্যাঋতু থেকে উত্তরণের জন্য সমকালীন ইতিহাসকে চিরায়তকালের দ্বারা শুদ্ধ করে নিলেই একমাত্র স্রষ্টা কালোত্তীর্ণ হতে পারেন। যা কিছু বর্তমান, সমকালীন ও চাক্ষুষ তা অপ্রাকৃত ভয়প্রদ, ভঙ্গুর ও অলীক। শিল্পী তাই সমগ্রতার, মহাসময়ের, সীমাতিক্রমণের অভিজ্ঞতা শোনাতে চান যাতে ইতিহাস ও জনসমাজ তাদের প্রকৃত অবস্থান খুঁজে পায়; যাতে বিবৃতির অবসান হয় সুস্থতায়। উইন্ডহ্যাম ল্যুইসের আলোচনায় এলিয়টের কয়েকটি কথা এ প্রসঙ্গে মোটেই উপেক্ষার নয় :

> The artist, I believe, is more primitive, as well as more civilized, that his contemporaries, his experience is deeper than civilization, and he only uses the phenomenon of civilizaton in expressing it.

শিল্পী ঋত্বিক কুমার ঘটক যেহেতু সভ্যতার অধিকবয়সী, তিনি সময়ানুক্রমিকতাকে উপেক্ষা করেন। ভূগোল ও সমাজতত্ত্বে হীনমানস, ঔপনিবেশিক সংস্কারে আচ্ছন্ন স্বদেশকে তিনি এক প্রত্ন-সাম্প্রতিকের দীক্ষা দিতে চান। ওঁরাও নৃত্য ও জগদ্দল দুই-ই তাঁর কাছে উপলক্ষ এমনকি রূপক। অযান্ত্রিকের সাহিত্যরূপে সত্যের এই সর্বার্থসাধক অভিযান ছিল না। অযান্ত্রিকের স্রষ্টার ইতিহাসচেতনা অবিচ্ছিন্ন। চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক আমাদের সাময়িক চ্যুতিকে চিরায়ত কক্ষপথে পুনরায় সংস্থাপিত করতে চান। দার্শনিকতায় এই প্রকল্প তবু সাম্প্রতিক উদ্ভাবনা ও প্রাচীন উপখ্যান দুটি স্তরেই সমান সংরক্ত।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এ শতকের শুরুতেই ১৯০০ সালে ম্যাকস প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশ। ফলে বাস্তবতার উপস্থাপনে শুধু যে রৈখিক প্রবহমানতার অবসান হল তাই নয়, আপাত বুদ্ধি ও অবদমনের বিরুদ্ধে চৈতন্যের প্রকৃত প্রকাশও আরাধ্য হয়ে উঠল। 'অযান্ত্রিক নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা' নিবন্ধে ঋত্বিক আদিবাসীদের সঙ্গে এই ছবির জৈব সম্বন্ধ নিয়ে কথা বলার

সময়ে যে সরল, নিষ্পাপ, প্রশ্নহীন, ভূতগ্রস্ত বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তার সমান্তরাল বীক্ষা পল গগ্যাঁর তাহিতি চিত্রমালাতেও পাওয়া যাচ্ছে। যেমন 'মৃতের আত্মার পর্যবেক্ষণ' (১৮৯২)। আর এই আদিম বিকল্পই পিকাসো-সহ সমগ্র আধুনিকতাকে চক্ষুস্মান করে তুলল। মানবজাতির যৌথ অবচেতনার এই যে সৃজণশীল প্রয়োগ তা নেহাৎ প্রায়োগিক তাৎক্ষণিকতাকে কল্পনাপ্রতিভাতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। বিমল নিজে বিকারগ্রস্ত নয় ; সে বিকারগ্রস্ততার অন্য মেরু। তাকে আমরা যে আচ্ছন্ন পাগলামির মধ্যে দেখি, প্রায় এক দৈবী উন্মাদনা, একেই হয়ত প্রাচীন গ্রীকেরা এনথিওসমস বলতেন। তুলনামূলক পৌরাণিকতায় জোসেফ ক্যাম্পবলের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহ ঋত্বিক অযান্ত্রিকের নায়কের টেন্ডার মাইন্ডেডনেস বিষয়ে সরব হয়েছেন। অযান্ত্রিক নামটির রহস্য এইখানে যে যন্ত্র এখানে কাব্যের প্রতিপক্ষ নয়, সম্পূরক। কি দুর্ভাগ্য যে, আমাদের চলচ্চিত্র সমালোচনা কখনই কুড়ি শতকীয় শিল্পের বিকাশ অনুপঙ্ক্ষে ভেবে দেখে না। দেখে না বলেই বোঝে না যে আর্কিটাইপ কী সুদুরপ্রসারী অনুঘটকের কাজ করতে পারে সভ্যতার ব্যাখ্যা ও নবীভবনে।

আমি নিশ্চিত নই, আপনারা কীভাবে নেবেন, যদি বলি *নাগরিক*-এর গৃহচ্যুতি, *অযান্ত্রিক*-এর ইতিহাসচ্যুতি অর্থাৎ নায়ক ও পরিবেশের বিচ্ছিন্নতা, *বাড়ি থেকে পালিয়ে*-এর ছিন্নবাধা পলাতক বালক, *মেঘে ঢাকা তারা* থেকে *সুবর্ণরেখা* পর্যন্ত উদ্বাস্তু সমস্যা মূলচ্যুতি, *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর ভূমিক্ষয় এবং *যুক্তি তক্কো গপ্পো*-র রাজনৈতিক কেন্দ্রভ্রষ্টতা সবই অদ্বৈতস্তরে পরিচালকের অতরিজমকে মুদ্রিত করে। উৎস থেকে মোহনা— ঋত্বিক আমাদের ছিন্নমূল আত্মার কণ্ঠস্বর শুনেছেন। একদা ১৮৪৪ সালের দর্শন ও অর্থনীতির খসড়ায় কার্ল মার্কস যেমন ছিন্নশ্রম ব্যক্তির প্রতিকৃতির দার্শনিক তত্ত্ব প্রণয়ণ করেছিলেন : সে স্রষ্টা কিন্তু বিচ্ছিন্ন—ফলভোগী নয়। মার্কসবাদী ঋত্বিকও জীবনের সূচনায় ব্যক্তি ও ইতিহাসের অবস্থানচ্যুতি নিয়ে ভাবিত হন। বলা বাহুল্য, তিনি যদি আমাদের নিটোল, সুগোল, নরম কাহিনীমালা উপহার দিতেন, যদি তাঁর বিপ্লবের আদি ও অন্ত চিত্রনাট্যের মধ্যেই অথবা প্রেক্ষাগৃহের সান্ধ্য নিরাপত্তায় জন্ম ও মৃত্যু খুঁজে পেত তাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক মতান্তরে স্তব্ধতা রচিত হত না। কিন্তু ঋত্বিক সেই অর্থে সুশীল ও ব্যবহার্য ছিলেন না। হে পাঠক, পুনরায় পাসোলিনির শরণাপন্ন হতে হল বলে আমায় ক্ষমা করবেন :

> The real marxist must not bc a good marxist His function is to put orthodoxy and codified certainities into crisis. His duty is to break the rules.

অতএব যা ছিল দৃশ্যাশ্রয়ী, হয়তো বা সীমিতভাবে শব্দাশ্রয়ী, ঋত্বিক কুমার ঘটক নির্বিকল্পভাবে তাকে চিন্তাশ্রয়ী করে তুললেন। সিনেমা নিজেই হয়ে উঠল একটি ডিসকোর্স। চলচ্চিত্রের মাধ্যমটিকে যে পাঠযোগ্য বয়ানে পরিবর্তিত করা যায়, চলচ্চিত্রর দৃশ্যপর্যায় যে তর্ক ও মতাদর্শের একক হয়ে দেখা দিতে পারে— মননের এবম্বিধ প্রহার

পঞ্চাশের শেষে ও ষাটের প্রথমে আমাদের মধ্যবিত্ত রুচিতে অপ্রত্যাশিত ও পরিহার্য মনে হয়েছিল। আরামপ্রদ বিনোদনে অভ্যস্ত আমরা শিল্পের ফলিত সম্প্রসারণের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনি।

ইতোমধ্যে রক্তে যেভাবে জীবাণুর বিস্তার ঘটে, ঋত্বিক সেভাবেই সংক্রামিত করেছেন পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে। যে শিকড়শূন্যতা তাঁর প্রধান স্বর : শুধু দেশবিভাগ-উত্তর ভারতবাসী বা বাঙ্গালি নয়, যুদ্ধ ও পারমানবিক ছত্রছায়া ক্লান্ত প্রতীচ্যে সেই একই ভয় বিহবলতা। ঋত্বিকের ব্যক্তিগত যন্ত্রণা যে ক্রমেই সর্বজনীন অর্থ পাচ্ছে, নিতান্ত বাঙালিয়ানার হাহাকার যে আসলে আন্তর্জাতিক অনিকেত মনোভাবেরও সমরেখ, দূরে কাছে যে কেবলই গৃহপতনের শব্দ হয় এ বিষয়ে আমাদের চেতনা দেশনিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত হচ্ছে। অংশ থেকে সমগ্রের দিকে যাত্রায়, বিরহ থেকে মিলনে তিনি তো অন্যতম শিল্পী যিনি আমাদের অস্তিত্বের মূলে জলদান করেন। তথাপি তাঁর পক্ষে এই জয় এত সহজে অর্জিত হয়নি। এই যাত্রা যা তীর্থযাত্রাই, তাতে মাঝে মাঝে থেকে গেছে স্ব-বিরোধিতার দায়। অন্য অর্থে হয়তো বিরোধী ধাতুসমূহের সমন্বয়— এলিয়ট-কথিত ইউনিফায়েড সেনসিবিলিটি। অযান্ত্রিকের সমাপ্তি শুধু কি জীবনের অগ্রগতি ? বিমলের অশ্রু ও শিশুর হাসি বিপ্রতীপ আবেগের অনুষঙ্গ বহন করে না ? জগদ্দলের ধ্বংসাবশেষ দেখে পরিচালকের মৃতা মা-র কথা মনে পড়েছিল। অযান্ত্রিকের অন্তিম পর্যায়, স্ববিরোধিতার যে মৌলিক অধিকার আধুনিকতা শিল্পীকে উপহার দিয়েছে, তার উজ্জ্বল ইশারা। ভবিষ্যতের প্রতি আগ্রহ ও অতীতের প্রতি মমতা একই বিন্দুতে সংযুক্ত হয়ে আমাদের জন্য বার্তা রেখে যেতে পারে। কিন্তু নীতিকথায় পর্যবসিত হয়নি। বস্তুত নিষ্ঠুরতার এই সজীব উপপাদ্যটি সহ-ই ঋত্বিক ইতিহাসের প্রণয়প্রার্থী হয়েছেন। যে কোনও মহৎ শিল্পীই জানেন সময় প্রবাহ ছলনাময়ী, নিষ্ঠুর ও চলৎপ্রতিভাময়ী। কিন্তু একই সঙ্গে ক্লিওপেট্রাপ্রতিম অনন্তযৌবনা। ঋত্বিক সেই বিশ্বাস থেকেই আজীবন ইতিহাসের শরীরে সংলগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। অযান্ত্রিক তার প্রথম পাঠ। আমাদের এই চেনা সময় একদিন পুরোনো হয়ে যাবে। একদিন অতীত হয়ে যাবে এই সমসাময়িকতা। একদিন ব্যাবিলন-আসিরিয়া ছাই হয়ে যাবে। মৃতের মধ্য থেকে অলীক স্বপ্নের থেকে, আমরা জেগে উঠে দেখব প্রজাতির মহাভারত রচনার চেষ্টা হয়েছিল। সেই পাণ্ডুলিপির উড়ে বেড়ানো যে কোনও একটি ছিন্নপত্রের নাম অবশ্যই *অযান্ত্রিক*।

আমাদের সময় পরিধিতে শিল্পের অন্যতম প্রধান অভিজ্ঞান তো মনস্বিতার এই সর্বার্থসার্থক বিকাশ। তাঁর সব থেকে বিখ্যাত পর্যায় *মেঘে ঢাকা তারা*, *কোমল গান্ধার* ও *সুবর্ণরেখায়* একটু সাহস করে কি আমরা দাবি করবো যে দেশভাগের অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে ঋত্বিক প্রচলিত সমাজবাস্তববাদের সমাধিমৃত্তিকা হিসেবেই প্রয়োজনীয় ভেবেছেন।

মননের এই অতিরিক্ত দাবি তাঁর তৃতীয় ছবি *বাড়ি থেকে পালিয়ে* (১৯৫৯) প্রথম জুড়ে দেয় অন্য বাসভূমি সন্ধানের থিম যা পরবর্তীকালে *সুবর্ণরেখায়* নতুন বাড়ির

প্রতীকটিকে জড়িয়ে রচনা করে স্বতন্ত্র কোন উপবৃত্ত। এর পরেই *মেঘে ঢাকা তারা*-র নির্মাণের দিকে তাকালে দেখা যাবে ঋত্বিক সারূপ্যতার হাতছানি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন; আখ্যায়িকা হয়ে উঠেছে স্থূল ও ভঙ্গুর ; শিল্পের স্বায়ত্বশাসনের বদলে ঋত্বিকের অন্বিষ্ট হয়েছে এক ধরনের মেটা-আর্টিস্টিক কাঠামো যা সমকালীন ইতিহাস বিষয়ে তার সমালোচনাকে ধারণ করবে। এই ছবিতে হিন্দু কিংবদন্তির গহন বয়ান পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, দেশ বিভাগ উপলক্ষ মাত্র, এলিয়েটের ওয়েস্টল্যান্ডের মত ঋত্বিকও চাইছেন প্রত্নসময়ের সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ রচনা যাতে আপাত বাস্তবতা প্রকৃত বাস্তবতার শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে সময়ের ভাস্কর্যে চক্ষুদান করে। তারপরেই আসে *কোমল গান্ধার* (১৯৬১) প্রসঙ্গ। শুধু দেশ বিভাগের সমস্যা নয়, অথবা প্রগতিনাট্যর অন্দর মহলের বিরোধও নয় এই ছবির বহুস্বরযুক্ত আবেদনের মধ্যে কাজ করে গেছে একটি ডিসকোর্স যা বস্তুত বিরোধের একীভবন। আসলে সংস্কৃতি সমীক্ষা যে উদ্ধৃতির সমাহার, কোমল গান্ধারে তা ভারতীয় পটভূমিতে এত তীব্রভাবে ঋত্বিক প্রকাশ করেন যে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দণ্ডিত হন। *কোমল গান্ধার* সম্পূর্ণ ফ্লপ করে। কিন্তু এই ব্যর্থতা ঋত্বিককে দমন করতে পারেনি। পারেনি বলেই *সুবর্ণরেখা* সমাধি রচনা করে কার্য-কারণ সম্পর্কের। মহাকাব্য ও লোকশিল্পের যৌথ অবচেতনাকে ব্যবহার করে ঋত্বিক সময়কে বেঁধে দেন মহাসময়ের পারম্পর্যে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা তবু চলচ্চিত্রের দর্শক ছিলাম এবার *তিতাস একটি নদীর নাম*-এর সূত্রে একজন শিল্পী প্রথম আমাদের দ্রষ্টায় রূপান্তরিত হবার সুযোগ দিলেন। জলের ঐশ্বর্য ও জলের কঙ্কাল—নদীমাতৃক সভ্যতার বিবরণে ঋত্বিকের গভীর প্ররোচনাকে লক্ষ না করলেও আমাদের না মেনে উপায় নেই এই ছবির আস্তিক্য ও ইতিহাসের বিস্তার।

সত্তর দশকের সেই অন্তিম নিশীথে কু-রাষ্ট্রের মূঢ় ভ্রষ্টতা অস্বীকার করে জীবনানন্দের রূপসী বাংলার একটি প্রতিস্পর্ধী বিকল্প ছড়িয়ে পরে *যুক্তি তক্কো আর গপ্পো* র পর্ব থেকে পর্বান্তরে।

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। তারা ইতিহাসের মাত্রা নিজেদের মতো পুনর্বিবেচনা করবে না— এমন হতাশা অন্তত শিল্পীর নয়। নয় বলেই ঋত্বিক রাত্রির তপস্যা শেষে খুঁজে পেয়েছিলেন সময়ের পরতে পরতে আত্মার রেখাচিত্র।

ঋত্বিক ঘটকের সুবর্ণরেখা

শেখ নিয়ামত আলী

দেশভাগের ট্রাজেডির ওপর ভিত্তি করে লেখা রাধেশ্যামের কাহিনী 'সুবর্ণরেখা'-এর চিত্ররূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্রী ঋত্বিক ঘটক। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্রোতের টানে ভেসে আসা কয়েকটি পরিবার—ঈশ্বর চক্রবর্তী, তাঁর ছোট বোন সীতা, বাগদী বৌ কৌশল্যা এবং তাঁর ছেলে অভিরাম, হরপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী এ ছবির প্রধান চরিত্র। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক প্রতিটি চরিত্রের করুণ পরিণতিতে নিজের একাত্মতা এমন অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করেছেন যা দেখলে নিতান্ত নির্দয় দর্শকের অন্তরেও গভীর দুঃখের সঞ্চার হয়।

চিত্রনাট্যের কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা ঈশ্বর চক্রবর্তীকে দেখতে পেয়েছি এবং তাকে ঘিরে কাহিনীর ঘটনাজাল বিস্তৃত হয়েছে এটা তো সত্য। ঈশ্বরকে প্রথম দিকে আদর্শবাদী, চরিত্রবান ও সৎ বলে মনে হলেও পরিচালক মূল গল্পের মধ্যে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন যাতে ঈশ্বর চক্রবর্তী শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী, চরিত্রবান ও সত্যবাদী বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না। আমরা দেখেছি, ঈশ্বর সীতার পালিয়ে যাবার দুঃখ ভুলতে না পেরে দীর্ঘ এক যুগ পরেও গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েছে। আমরা দেখেছি, সোভিয়েত রাশিয়ার মহাকাশ জয়ের প্রথম সাফল্য সংবাদে জগৎ যখন আনন্দ মুখরিত, শোকাতুর ঈশ্বরের কাছে তখন এই সুসংবাদকে আনন্দের মনে হয়নি। তাই সে খবরের কাগজটা নিয়ে ফার্নেসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলেছে গ্যাগারিনের ছবিটা। অর্থাৎ বোনের অবর্তমানে কোন কিছুই তার কাছে ভাল লাগছে না। এমন কি বেঁচে থাকতেও সে নারাজ। এহেন মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে অপারগ হয়ে হরপ্রসাদের উপদেশকে মোক্ষম হাতিয়ার করে 'ভোগেই মুক্তির পথ' বেছে নেয়। দু'জনে কলকাতায় এসে ঘোড়ার রেস দেখে এবং পরে একটা বারে ঢুকে মদ পান করতে থাকে। ক্যাবারে নাচগান চলতে দেখা যায়। হরপ্রসাদ উপনিষদের বাণীকে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করে নচিকেতার (জ্ঞানের দেবতা) ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের মানসিক যন্ত্রণা-জ্বালা জুড়াতে চায়। তারা দু'জনে বোতলের পর বোতল টানে। হরপ্রসাদ বেসামাল। তারা ট্যাক্সিতে ওঠে। রাতের অন্ধকারে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে হরপ্রসাদ আকালের কথা, যুদ্ধের কথা ও দেশভাগের কথা ব্যক্ত করল। ট্যাক্সি বস্তি এলাকায় দাঁড়ালে দুজন লোক হরপ্রসাদকে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। ঈশ্বরকে Fresh girl, singing girl-এর প্রলোভন দেখিয়ে একজন দালাল তাকে নিয়ে যায় বস্তিতে। এভাবে পরিচালক ঈশ্বরকে ক্রমশ করাপশনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। হরপ্রসাদ পুত চরিত্র ঈশ্বরকে জোর করে এত নিচে নামিয়েছে। নইলে দীর্ঘ এক যুগ পরে যে রাতে ঈশ্বর

আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, ঠিক সে রাতের ওই মুহূর্তেই জানালার কপাট সরিয়ে 'রাত কত হলো—' এই সংলাপের মাধ্যমে হরপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটল কেন ?

হরপ্রসাদ ঈশ্বরের জীবনে অশুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কাজ করেছে বলে আমি মনে করি। এছাড়া কাহিনীগত দিক দিয়ে হরপ্রসাদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। জবর দখল নবজীবন কলোনিতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাকে দেখেছি। কিছুদিন পর ঈশ্বর তার বন্ধু রাম বিলাস বাবুর কারখানায় ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে ছাতিমপুরে চলে যায়। সেখানে সীতা ও অভিরাম পর্ব শেষ হয়। হরপ্রসাদের চাকরি চলে যায়। তার স্ত্রী মারা গেল— এ খবর শুনেছি। কিন্তু হরপ্রসাদকে কোন দৃশ্যে আর দেখতে পেলাম না। হঠাৎ বারো বছর পরে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাবে তাই খানিকটা বিস্মিত হয়েছি। হরপ্রসাদ যেন জানে সীতা কোথায় থাকে। তাই সে ঈশ্বরকে মদটদ খাইয়ে ট্যাক্সি চড়িয়ে সীতার বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে যায়। সীতার মর্মান্তিক মৃত্যুর পর পরিচালক insert of a card তুলে ধরলেন। তাতে লেখা, 'এ রাত্রিরও শেষ আছে, দিন কাটিয়া মাস, মাস কাটিয়া বৎসর।' এরপর হরপ্রসাদকে এক হোটেলের সিঁড়ির ওপর রিপোর্টার বেনী মাধবের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বিনু (সীতার ছেলে) আছে। এত কাণ্ডের পর ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে হরপ্রসাদ বিনুকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বেনী মাধবকে অনুরোধ করে। হরপ্রসাদ একজন স্বার্থপর লোক। বিনুকে বেণী মাধবের কাছে দেয়া উচিত ছিল না।

এ কথা সত্য, কাহিনীর দিক থেকে হরপ্রসাদ সমালোচিত বটে ; তবে বক্তব্য প্রকাশে ও সর্বহারা উদ্বাস্তু মনের বেদনা প্রকাশে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিচালক হরপ্রসাদের চরিত্রকে এমনভাবে এঁকেছেন যার মূল্যবান সংলাপের মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সর্বোপরি জগতকে জানার সুযোগ পেয়েছি। চলমান ট্যাক্সির অভ্যন্তর থেকে হরপ্রসাদের সংলাপের কথা ধরুন। ট্যাক্সি চলছে। রাতের কলকাতার দৃশ্য। বিজ্ঞাপনের ওপর উজ্জ্বল আলোক সারি সারি রাস্তার দু'পাশে জ্বলছে। ট্যাক্সির অভ্যন্তরে ঈশ্বর হাসিমুখে গা এলিয়ে বসে আছে। হরপ্রসাদ তার দিকে খুশি মনে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলে— 'এটম বোমা দেখে নাই।' চলমান ট্যাক্সির দৃষ্টিকোণ থেকে সারি সারি দুধারে রাস্তার আলোকমালা দৃশ্যমান, নেপথ্যে হরপ্রসাদের কণ্ঠস্বর আবার ভেসে আসে। '... নেভার। যুদ্ধ দেখে নাই। মন্বন্তর দেখে নাই। দেশভাগ দেখে নাই।' আবার নিজের কপালে সকল দোষ চাপিয়ে সান্ত্বনা খুঁজে পাবার বৃথা চেষ্টা করে বলে— 'অকারণ সেই পুরাতন সূর্য বন্দনা করতে চাই না। অন্তর্জলী কর, অন্তর্জলী কর। সাতটা সেপাই মেরে হরপ্রসাদ মরল। এখন মধুক্ষরন্তি সিন্দব। শান্তি। শান্তি।' হরপ্রসাদের খেদ ও ক্ষোভ প্রকাশে যে দার্শনিক তত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায় তা হরপ্রসাদকে অমর করে রাখবে। সুবর্ণরেখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো মন্তাজ দৃশ্য রচনা কৌশল যা ঋত্বিক ঘটককে আজীবন স্মরণ করিয়ে দেবে। আইজেনস্টাইনের আবিস্কৃত মন্তাজ যে চলচ্চিত্রের প্রাণ, পরিচালক সুবর্ণরেখায় তা আর একবার প্রমাণ করলেন। আমি এখানে

সম্পূর্ণ একটি সিকোয়েন্সের উপস্থাপন করছি। যেটি পুরোপুরি মন্তাজের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয়েছে।

১ম দৃশ্য ঃ ঈশ্বর দরজা ঠেলে সীতার ঘরে ঢোকে। সে দরজার কাছে দাঁড়ায়। সীতা প্রসাধন করছিল, তার দিকে ফিরে তাকায়। ২য় দৃশ্য ঃ সীতা তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। ৩য় দৃশ্য ঃ ঈশ্বর সীতাকে অস্পষ্ট দেখছে। ৪র্থ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর সীতার দিকে খানিকটা এগিয়ে যায়। ৫ম দৃশ্য ঃ সীতা ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ৬ষ্ঠ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর সীতার দিকে তাকায়। ৭ম দৃশ্য ঃ দু'টি চোখ তাকিয়ে আছে। ৮ম দৃশ্য ঃ বটি দা দেখা যায়। ৯ম দৃশ্য ঃ একটি চোখ তাকিয়ে আছে। ১০ম দৃশ্য ঃ সীতা বঁটি দাটা হাতে নেয় এবং সরে যায়। কি যেন একটা কাটার শব্দ ভেসে আসে। ১১শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বরের পাঞ্জাবিতে রক্তের ছিটা লাগে। সে এবার মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। ১২শ দৃশ্য ঃ সীতা চৌকির ওপর একটা হাত রেখে মেঝেতে পড়ে আছে। ঈশ্বর তার দিকে তাকিয়ে দেখছে। সীতাকে স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট, অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট লাগছে। ১৩শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর তাকিয়ে থাকে। তারপর সীতার দিকে এগিয়ে যায়। সে বিষ্ফারিত নেত্রে সীতাকে দেখছে। ১৪শ দৃশ্য ঃ রক্তমাখা বঁটি দাটা মাটিতে পড়ে আছে। ঈশ্বর সেটা তুলে হাতে নেয়। ১৫শ দৃশ্য ঃ সীতার মুখ অস্পষ্ট থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৬শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর বঁটি দাটা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে এগিয়ে আসে। ১৭শ দৃশ্য ঃ সীতা মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। নেপথ্যে ভেসে আসে 'হায় রাম'। ১৮শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর বঁটি দাটা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসে। বিনুকে কোলে নিয়ে কাজলদি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দালালটির পাশে। ১৯শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর দাটা তুলে ধরে তাকায় ও সেটা মাটিতে ফেলে দেয়। ২০শ দৃশ্য ঃ ঈশ্বর মাথায় হাত দেয়। এবং মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে। ২১শ দৃশ্য ঃ সে মাটিতে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ২২শ দৃশ্য ঃ বিনু বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দেখছে।

এই দৃশ্যগুলোতে কোন কথা ছিল না, শুধু ছিল অন্তরের অভিব্যক্তির প্রকাশ। ঈশ্বরের অন্তরের বেদনা এখানে ফুটে উঠেছে। অধিকাংশ ক্লোজ শটের মাধ্যমে পরিচালক এই মন্তাজ দৃশ্যায়িত করেন। এই শটগুলোর মধ্যে পরিচালকের মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় মেলে।

ছবিতে একটা অর্থবোধক সিম্বল দেখা গেছে। সিম্বলটি হচ্ছে সীতার ফেলে দেয়া বিয়ের মুকুটটা সুবর্ণরেখা নদীর ওপর ভাসছে। সীতা ও অভিরাম নদীর ধারে এগিয়ে আসছে। সীতা বিয়ের পোশাকে সজ্জিত। সীতা ও অভিরাম এবার নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। মোহনায় দুই দিক থেকে জলস্রোত বয়ে চলেছে। দুই স্রোতের টানে মুকুটটি প্রবাহিত জলধারার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে দ্রুত ভেসে যায়। প্রবাহিত দুই মিলিত জলস্রোতের মতো তাদের মনের ইচ্ছা একই সূত্রে যেন গাথা। তাই ফেলে দেয়া মুকুটটাকে তারা দু'জনে অন্তর দিয়ে ধরে রাখতে চায়। এরপর দেখা গেল সীতা মাথায় ঘোমটা টেনে দিল। সীতার কাঁধে অভিরামের হাত— তারা এগিয়ে চলেছে। অদ্ভুত

প্রতীকী প্রয়োগ বলা যায় এটাকে। ওস্তাদ বাহাদুর খানের দেয়া সঙ্গীত প্রশংসার দাবি করে। সীতার মুখে 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা' রবীন্দ্র সঙ্গীতটি এবং 'মোরা দুখুয়া কাঁদে কহু মোহন বিনা জায়া নেহি লাগে'— ভজন গানটি এক কথায় অপূর্ব। কয়েকটি করুণ দৃশ্যে আবহ সঙ্গীত যেন ঘটনার সাথে মিশে গেছে। বড় ভাইয়ের ভূমিকায় অভি ভট্টাচার্যের অভিনয় চিরদিন মনে রাখার মতো। মাধুরী মুখার্জী যে একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রী তা তাঁর একত্রিশ বছর আগের অভিনীত সীতাকে দেখে বোঝা গেছে। জহর রায় ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (হরপ্রসাদ)কে ভুলা যায় না। এ ছবিতে শব্দ, সম্পাদনা ও ক্যামেরায় কাজ উপলব্ধি করার মতো। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্যানিং শট এবং ক্লোজ কম্পোজিট শট লক্ষ করেছি যা চিত্রগ্রাহক দীলিপ রঞ্জন মুখার্জীকে মনে করিয়ে দেয়।

এ ছবির প্রতিটি সূক্ষ্ম ফ্রেমিং ও নিঁখুত কম্পোজিশনে পরিচালকের আবেগ-অনুভূতির যে প্রকাশ দেখেছি, তাতে ঋত্বিক ঘটক যে একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার এবং তাঁর একটা নিজস্ব স্টাইল আছে সে সম্বন্ধে বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না। শৈল্পিক প্রয়োগ কুশলতা ও সোশাল বক্তব্যের বিচারে সুবর্ণরেখা ঋত্বিক ঘটক নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আজ ঋত্বিক ঘটক আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর শিল্পকর্ম। প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু দিবসে তাঁর কথা মনে পড়লে আমরা যেন তাঁর নির্মিত ছায়াছবির কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে তিনি জাগরুক থাকুক—এই কামনা করি। আমি ইতোপূর্বে দুইবার সুবর্ণরেখা ছবিটি দেখিছি। সেদিনও আবার দেখলাম। তাই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এই লেখার উদ্দেশ্য।

চিরায়ত চলচ্চিত্র : অযান্ত্রিক

শৈবাল চৌধুরী

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'ফসিল' যেটি বিষয় বৈচিত্র ও ব্যতিক্রমী আঙ্গিকের কারণে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ একটি ছোট গল্পের আসনে অধিষ্ঠিত। সেই ফসিলের চলচ্চিত্ররূপ 'অযান্ত্রিক'। এই চলচ্চিত্র বিশ্ব চলচ্চিত্রে দুটি সুবর্ণ সোপান নির্মাণ করে। একটি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের দীপ্ত অভ্যুদয়, অন্যটি উপমহাদেশীয় তথা বিশ্বচলচ্চিত্রে ভিন্ন মাত্রার সংযোজন। এটি অবশ্য ঋত্বিকের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র। প্রথমটি নাগরিক, ১৯৫২ সালে নির্মিত হলেও মুক্তির আলো দেখে '৭৬ সালে ঋত্বিকের জীবনাবসানের পর। সে সূত্রে ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি অযান্ত্রিক। প্রথম (মুক্তিপ্রাপ্ত) ছবিতেই ঋত্বিক তাঁর জ্যোতি প্রকাশে সক্ষম হন। এ ছবির অভিনব বিষয়বস্তু যা ছিল এতদ্ অঞ্চলের চলচ্চিত্রের প্রচলিত বিষয়রীতি বহির্ভূত, তা প্রয়োগ ও উপস্থাপন কুশলতায় এ অঞ্চলে তো বটেই চলচ্চিত্র বিশ্বেও এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। তখন মারী সিটন বলেছিলেন, 'ঋত্বিক ঘটকের সবচেয়ে চিন্তাসমৃদ্ধ এবং সবচেয়ে সংহত চিত্র সৃষ্টি হলো অযান্ত্রিক। ভবিষ্যতই প্রমাণ করবে যে ছবিটি খুবই উঁচু জাতের। এর কাহিনী একেবারে নতুন ধরনের, কিছুটা অদ্ভুতও'। ঋত্বিকের নিজের মতে অযান্ত্রিক ছিল একটা Sheer experimental ছবি। বহমান সময়ের থেকে অনেক অগ্রবর্তী মূল্যবোধের এই ছবি তখন সর্বজন গ্রাহ্যতা পায়নি। বিষয় ও প্রয়োগগত অগ্রবর্তিতাও একটা অন্তরায় ছিল সচেতন ও সাধারণ উভয় পারিপার্শ্বিকতার জন্যে। ঋত্বিক বলেছিলেন, 'আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিল না। বিষয়বস্তু এবং পটভূমিকার কারণে। কাজেই esoteric হয়ে থাকতে হলো সাধারণ গ্রাহ্য হওয়া গেল না'। জর্জ শার্দুল যে ছবিকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'নিউ রিয়ালিজমের শ্রেষ্ঠ একটি নিদর্শন' বলে। ঋত্বিক অযান্ত্রিকে যন্ত্র ও মানুষের দ্বান্দ্বিকতা প্রতিস্থাপন করেছেন বটে তবে যন্ত্রের সারতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেননি। মার্কসীয় দর্শনস্নাত শিল্পী ঋত্বিক যন্ত্রে আরোপ করেছেন মানবিকতা, মানুষকে করেছেন যন্ত্রপ্রেমী (যান্ত্রিক নয়)। চলচ্চিত্র সমালোচক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন, রুশ বিপ্লবের অনতিকাল পরে, ১৯২২ সালে বলশেভিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মায়োকোভস্কি Benz No.2 নামে একটি চিত্রনাট্য রচনা করেন। নায়ক ছিল একটি মোটর গাড়ি। ছবিটি ঘোষণা করে 'একমাত্র অক্টোবর, যা মানুষকে মুক্তি এনে দিয়েছে, যন্ত্রকেও মুক্তি এনে দেবে'। সংকীর্ণতা মনে হতে পারে তবু আমার মনে হয় ছবিটি একভাবে দেখলে অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। পূর্ব কথিত রুশ চিত্রনাট্যটি সম্বন্ধে ঋত্বিক অনবহিত ছিলেন হয়ত কিন্তু মার্কসবাদের প্রতি গভীর আনুগত্য তাঁকে মনে করিয়ে দেয় শিল্পী হিসেবে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে আগত

সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মুখ চেয়ে শ্রমজীবী জনসাধারণের জন্য একটি মাতৃভাষা আবিষ্কার।

যন্ত্রে মানবত্ব আরোপ এটা এতদঞ্চলের অতি প্রাচীন এক ঐতিহ্য। কামার সম্প্রদায়ের বিশ্বকর্মা পুজোয় নানান যন্ত্রপাতিকে অর্ঘ্য নিবেদন কিংবা তাঁতী সম্প্রদায়ের তাঁত সরঞ্জামের প্রতি শ্রদ্ধা তর্পণের প্রাচীন রীতি যেমন অন্নদাতা যন্ত্রপাতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশকে তুলে ধরে, তেমনি ভারতবর্ষে ট্রেন আগমনের পর বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় কর্তৃক ট্রেনকে বিশেষ এক দানব ভেবে তাকে তুষ্ঠ করার জন্যে বিভিন্ন পূজাযজ্ঞ ইত্যাদি করাকে অপদেবতাকে সন্তুষ্ট করার বিষয়টি তুলে ধরে। এসব সংস্কার কুসংস্কারের মাধ্যমে যন্ত্রের প্রতি অযান্ত্রিকতা আরোপের বিষয়টিই প্রতিভাত হয়। ঋত্বিক বলছেন, 'মানুষের একটা অংশ প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেটা পশু। আর একটা অংশ সভ্যতার মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সেটা যন্ত্র। যন্ত্র ও জন্তুর এক যন্ত্রনাদায়ক সঙ্গমে মানবিক বোধ জন্মায়।' তিনি বলেছেন, 'আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি আবার অনুপ্রবেশ না করি তাহলে কোন জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল বলেই আমাদের এই সার্বিক, অবৈজ্ঞানিক উদাসীনতা। পশ্চিমী জীবনের শূন্যতাবোধও অনেকখানিই আমাদের মনোজগতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে'। বস্তুত মূল্যবোধের এই দ্বান্দ্বিকতার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'অযান্ত্রিক' চলচ্চিত্রের পটভূমি।

যন্ত্রের প্রতি মানুষের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ও যন্ত্রের সীমিত ক্ষমতার অক্ষমতার কারণে তার ওপর অনাস্থার প্রতিস্থাপন এই দ্বান্দ্বিকতায় যা কিনা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিক। একটি ভগ্নপ্রায় পুরোনো গাড়ি ও তার মালিক-চালককে ঘিরে গড়ে উঠছে এ ছবি। গাড়ি জগদ্দল ও তার চালক বিমল এই দু'জনের সম্পর্কের টানাপোড়েনের পরতে পরতে বিধৃত হয়েছে মানবতার জয়গীতি। ছবির চিত্রায়ণ রীতির স্বার্থকতার গুণে জীর্ণ গাড়ি জগদ্দল একটি মানবীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয় আর দানবের বেশে আসে তাকে কেনার পর ভাঙতে আসা মাড়োয়ারী লোহালক্কড় ব্যবসায়ীটি। জগদ্দল আর বিমলের পারস্পরিক সম্পর্কটা এতই হার্দিক হয়ে ওঠে, তা যেন দয়িত দয়িতার প্রেম, যে প্রেমের সাড়ায় বিমল সুন্দরী যাত্রীর ইশারাকে অস্বীকার করে অবলীলায়, যে প্রেমের হাতছানিতে বিমল খুঁজে পায় জীবনের মধুর সাবলীলতা। আর এই কারণেই সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' ঋত্বিক ঘটকের ক্যামেরায় পরিণত হয় অযান্ত্রিকে।

পরিবার পরিজনহীন ছন্নছাড়া বিমল তার নিজের গাড়ি 'জগদ্দল'এর ড্রাইভার। প্রাণের চাইতে ভালোবাসে সে এ গাড়িকে। আদর করে হাত বুলায় তার শরীরে। সাজায় মনোমতো। কথা শুধোয়। অভিমান করে। এসব দেখে শুনে বাকিরা হাসে। পাগল ঠাওরে বিমলকে। কিন্তু বিমলের এসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। জগদ্দলকে কেউ কিছু বললে সে

তেড়ে আসে। প্রমাণ করে দেয় নতুন শিফন গাড়ি এমনকি রেল গাড়িরও আগে চলে তার জগদ্দল। জগদ্দলের ভালোবাসায় জীবনের সব না পাওয়াকে ভুলে থাকে বিমল। কিন্তু যতই মানবিক হোক না কেন জগদ্দল, যন্ত্র হয়ে যতোই অযান্ত্রিক হোক শেষ পর্যন্ত সে বিকল হয়ে পড়ে মানবিক মানুষেরই মতো। সর্বস্ব ব্যয় করেও জগদ্দলকে সারিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয় বিমল। বাধ্য হয়ে ছাড়তে হয় বিমলকে জগদ্দলের মায়া। অসহায় উদভ্রান্ত বিমল সস্তায় বেচে দেয় প্রাণপ্রিয় জগদ্দলকে স্ক্র্যাপ হিসেবে লোহালক্কড়ের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কাছে। জগদ্দলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার শব্দে কেঁপে কেঁপে ককিয়ে ওঠে সে। শেষে এক শিশু হাতে তুলে নেয় গাড়ির ভাঙ্গা হর্নটি আর খেলার ছলে তা বাজাতে থাকে। বিমল যেন সম্বিত ফিরে পায়। সে যেন দেখে তার জগদ্দল তাকে ডাকছে। ভাঙা দুটি হেড লাইটের আলো প্রতিফলিত হয় আর বিমল দেখে তার জগদ্দলের দুটি চোখ তারই দিকে চেয়ে যেন হাসছে। যন্ত্রপ্রেমী মানুষ বিমলের সাথে জীর্ণ গাড়ি জগদ্দলের এক মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। যন্ত্র জগদ্দল যখন আমাদের মানসে অযান্ত্রিকতার আবেশ আনে তখন এই যন্ত্রের ভালোমন্দের সাথে আমরাও একাত্ম হয়ে যাই। প্রথম দিকে বৃদ্ধ লোকটি তখন হেলাভরে বিমলকে শুধোয় জগদ্দল ঠিকমতো চলতে পারবে কিনা তখন আমাদেরও রাগ আর চ্যালেঞ্জ জাগে বৃদ্ধের প্রতি। তেমনি আমরা উদ্বেলিত হই যখন জগদ্দল ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে ট্রেনকে হারিয়ে আগেই পৌঁছে যায় স্টেশনে। শিশুরা যখন জগদ্দলের গায়ে কাদা ছোঁড়ে তখন যেন তা আমাদের গায়ে লাগে। আহত হই যখন অনেক সারানোর পরও জগদ্দল আর চলতে পারে না, থেমে যায়! আর শেষে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী যখন জগদ্দলকে কেনার জন্যে দরদাম করতে আসে তখন তাকে ভয়ংকরী ভিলেন মনে হয় এবং জগদ্দলকে হাতুড়ি পিটিয়ে ভাঙার শব্দে আমরাও কেঁপে কেঁপে উঠি যেন বিমলেরই সাথে। যন্ত্রের সাথে মানুষের এই আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের মনস্তাত্ত্বিক দক্ষতা সত্যিই বিস্ময় জাগায়। এই আবেশ আমাদের এতটাই সম্মোহিত করে রাখে যে, বিমল যখন সুন্দরী যাত্রীটির প্রতি প্রথমে উদাসীন হয়ে পরে উৎসাহী হয় এবং তার আশায় ছুটে চলে তখন আমরা জগদ্দলের কথা ভেবে একটু ভীত হই বৈকি। আর তারপর যখন বিমল সেই মেয়েকে কাছে পায় না তখন একটু খারাপ লাগে বটে, তবে জগদ্দলের কথা ভেবে আবার ভালোই লাগে। বরং বিমলকে একটু স্বার্থপর মনে হয় যখন সময়মত স্টেশনে পৌঁছুতে না পারার কারণে মেয়েটিকে হারাতে হলো বলে সে জগদ্দলের ওপর একটু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ঋত্বিক ঘটক আমাদের প্রচলিত ধারণার বহির্ভূত এক বিষয়কে চিত্রায়িত করেছেন অপরূপ কুশলতায় যা বিশ্ব চলচ্চিত্রে ব্যতিক্রমী। কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৫৯ সালে এ ছবি শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়ে ছিল জড় ও মানবের সম্পর্কে অযান্ত্রিকতা ফুটিয়ে তোলার কুশলতায়। ঋত্বিকের চলচ্চিত্র-দর্শনের ভিত্তি যৌথ অবচেতনা (Collective Unconsciousness) এবং মাতৃত্ব আদর্শ (Great Mother Archetype)-এর প্রতিফলন আমরা অযান্ত্রিকেও দেখি। উর্বর কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির এই অঞ্চলে যন্ত্রের

সাথে মানুষের সম্পর্কটা বরাবরই দূরত্বের। যন্ত্রের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের অতি ক্ষমতা সম্পন্ন মানবত্ব, দেবত্ব এবং অলৌকিকত্ব আরোপ এরই বহিঃপ্রকাশ। অনেক আদিবাসী রেল গাড়িকে চলমান দেবতা কল্পনা করেছে এই সেদিনও। পথের পাঁচালীতেও ট্রেনের মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে অপু দুর্গার অবাক দৃষ্টি আর ভাবনার অলৌকিকত্বে। নতুন এক জগতের নতুন এক চিন্তার সন্ধান পায় যেন তারা ট্রেন দর্শনে। অযান্ত্রিকে ঋত্বিক গাড়ি এবং বিমলের সম্পর্কে যৌথ অবচেতনার আভাষ এনেছেন। আমাদের উপমহাদেশীয় জীবনধারায় আদিকাল থেকে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি যে উদাসীনতা আর অবজ্ঞা বিদ্যমান তার প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন ঋত্বিক গাড়িটির প্রতি শিশুদের কাদা ছোঁড়ার দৃশ্যের মাধ্যমে যা যৌথ অবচেতনাকে তুলে ধরে। এখনো আমাদের শিশুরা অবাক নয়নে গাড়ির দিকে তাকায় চরম কৌতূহলে, তাতে চড়তে ভালোবাসে। গাড়ি বা প্লেনের ভয় পাইয়ে বা লোভ দেখিয়ে শিশুদের শান্ত করানো হয়। যান্ত্রিকতা বিরোধী ধীরলয়ের জীবনধারার ঐতিহ্যগত পরম্পরারই লক্ষণ এসব। আর আর্কিটাইপের বিষয়টি এখানে আমরা দেখি ভিন্নতায়। ওরাঁও আদিবাসীদের চক্রনৃত্যের মাধ্যমে। এই নৃত্যের চক্রটি জন্ম বৃদ্ধি পরিণয় মৃত্যু ধ্বংস এবং আবার সৃষ্টির আবর্তনে আবর্তিত।

বিমল ও জগদ্দলের সম্পর্কের প্রতিভাসনে ঋত্বিক প্রয়োগ করেছেন ছোট্ট সুন্দর মন্তাজ। ছবিতে দেখা যায় পাগলটির একমাত্র সম্বল তার গামলাটি যখন গাড়ির নিচে পড়ে চ্যাপটা হয়ে যায় তখন সে অকূল পাথারে কাঁদে। কিন্তু পরে সে যখন আরেকটি নতুন গামলা পায় তখন পুরনোটির স্মৃতি ভুলে আঁকড়ে ধরে নতুনটিকে। কিন্তু শত বিদ্রূপ আর যন্ত্রণার পরেও বিমল তার জগদ্দলকে ছাড়ে না। পুরনো স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকে সে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ মন্তাজ এটি।

ঋত্বিক ঘটকের বারো বছরের চিন্তার ফসল অযান্ত্রিক বাস্তবে রূপায়িত হয় বিহারের কয়লাখনির মালিক চলচ্চিত্র প্রেমিক প্রমোদ লাহিড়ীর (পরশ পাথর, লৌহ কপাট ছবিরও প্রযোজক) প্রযোজনায়। আপন শ্রেষ্ঠ কীর্তির স্বপক্ষে ঋত্বিকের ভাষ্য, 'যন্ত্র হলো এক অমানবিক সৃষ্টি। জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক মূল্যবোধগুলির সঙ্গে যন্ত্রের আপাত নৈকট্য আমাদের বার বার মনে করিয়েছে যেন যন্ত্র সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো আত্মিক নৈরাশ্য অথবা শূন্যতা। আমাদের অতীত জীবন ও বর্তমান জীবন দর্শনের সঙ্গে যন্ত্রের বিরোধ প্রায় মৌল অন্তর্বিরোধের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি অবশ্য সমাজ বিজ্ঞানী নই। তাই এই রহস্যের জট আমি খুলতে পারবো না। তবে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বোধহয় পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের দেশে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করেছিলো বলে আমাদের এই সার্বিক, অবৈজ্ঞানিক উদাসীনতা। পশ্চিমী জীবনের শূন্যতাবোধও অনেকখানি আমাদের মনোজগতে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আমরা বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের অন্বেষণ না করে বস্তুর বাহ্যিক

প্রকাশগুলোকেই একমাত্র সত্য হিসেবে মনে করেছি। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই রক্ষণশীল মনোভাবের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে না। প্রযুক্তিবিদ্যার নবতম আবিষ্কারকে বাঁধতে হবে ঐতিহ্যের সঙ্গে। আর তার সঙ্গে যন্ত্রের আত্মিক যোগসূত্রের কথাও ভাবতেও হবে'। 'অযান্ত্রিক' গল্পের কাঠামো, তার ঋজুতা, বর্ণনার সরল ভঙ্গি আমাদের কাছে আশ্চর্য এক চেনা জগতের পরিচয় করিয়ে দেয়। যার প্রকাশ ভঙ্গি একান্তভাবেই এই দেশের জল হাওয়ায় মিশ খেয়ে গেছে। আর শুধু মিশে যাওয়াই নয়, গল্পটি এক গভীর জীবন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।



ঋত্বিক ঘটক-এর স্কেচ

নিঃসঙ্গ বেণুবাদক ঋত্বিক

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ ও ঋত্বিক কুমার ঘটক ইদানীং সহসা বহুল আলোচিত। বোধহয় তাঁদের এই পুনরুজ্জীবন খানিকটা অপরাধবোধ সঞ্জাত। জীবদ্দশায় তাঁরা অবহেলিত ছিলেন। পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয়নি, হয়তো বাঙালি বিদ্বসমাজের পরচিকীর্ষাপরায়ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাদেশে এবং ঋত্বিক সম্বন্ধে উভয় বাংলায় চর্চা হচ্ছে বেশ। তবুও যাঁদের সমঝে চলার বয়স ও অভিজ্ঞতা হয়েছে যথেষ্ট তাদের কারও কারও মুখে এখনও শুনতে পাওয়া যায় যে, বাংলা কথাসাহিত্যের অভ্যস্ত ছাঁচ ও ঐতিহ্য অতিক্রমকারী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌কে নিয়ে খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত সেই মনমানসিকতার প্রাবল্যের জন্যই বর্তমান জনপ্রিয় সরকারের বিজ্ঞ উপদেষ্টাদের বিচারে আরেক পথিকৃৎ শিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন লাভ করার পরও সে সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। মরণোত্তর এই পুরস্কার তাঁকে দেয়ার সপক্ষে সাক্ষীর কোন অভাব ছিল না। সকল সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শওকত ওসমান থেকে ভারতের 'জ্ঞানপীঠ' পদকপ্রাপ্ত মহাশ্বেতা দেবী পর্যন্ত ইলিয়াসের অসাধারণ কীর্তি ও প্রতিভার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা দেবীর একটি পরিচয় হলো, তিনি কবি-সাহিত্যিক মনীশ ঘটকের কন্যা এবং ঋত্বিক ঘটকের ভ্রাতুস্পুত্রী। যে দুই মনীষীর নামোল্লেখ করে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছিল তাঁদের দুজনের সম্পর্কেই ঋত্বিকের যমজ বোন (মাত্র সাত মিনিটের ছোট) প্রতীতি দেবীর মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য---'ঐ বিশাল বিস্ময়কর মহান প্রতিভাধর মানুষটি।' (ঋত্বিককে শেষ ভালবাসা', সাহিত্য প্রকাশ, জুলাই, ১৯৯৭)।

ঋত্বিক সম্পর্কে বহু বই, গবেষণাকর্ম, সন্দর্ভ-নিবন্ধ বেরিয়েছে এবং গোগ্রাসে পঠিত হচ্ছে। বাঙালির ঐতিহ্যই এরূপ। সৃষ্টির চক-মিলান সুরম্য প্রাসাদের দরদালানে অনাহুত পরিক্রমা করে পেশাদাব সামলোচক হিসেবে যাঁরা নাম কেনেন,তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষকে হেয় করার অদম্য প্রবৃত্তিদৃষ্টে নিধুবাবুর টপ্পার ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে---'সে কেনরে করে এত অপ্রণয় ?' আবার অপ্রেমের শানানো ছুরির আঘাতে যখন হতোদ্যম অমৃতপুত্রদের ধরাশায়ী করতে সক্ষম হন তখনই সহসা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে তাঁরা প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের অশোভন হুড়োহুড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। আর জীবনানন্দ দাশের ভাষায় 'মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটে' যাদের রুজি রোজগার তাদের উদ্দেশে প্রতীতি দেবীর দাহক ভাষা ফেটে পড়েছে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় :

'আজ অনেকেই তাঁদের সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা ঋত্বিককে নিয়ে কিছু শোনা কথা আর

মনগড়া গল্পের (বিকৃতও হতে পারে)সমাহারে বই অলঙ্কৃত করেন। ... তাঁরা কেউ-ই তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। অতএব কোন বিষয়ে কারুর মত হাজির করতে হবে প্রমাণসহ।' এহেন কড়া হুশিয়ারির পর স্বভাবতই সমালোচককুল সাবধানে পা ফেলবেন। আমাদের চিরায়ত রীতি মোতাবেক 'আন কাঠ তো মার পেরেক' করে নবাগত লেখককে কফিনে পুরে ফেলার চেষ্টা অন্তত প্রতীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ- হঠকারী পদক্ষেপ হবে। তার অনেক কারণের মধ্যে রয়েছে লেখিকার চারিত্রিক দৃঢ়তা, যা প্রতিকূলতার আগুনে পুড়ে পুড়ে বাঁকা তলোয়ার তৈরির উপযোগী দামেস্ক ইস্পাতে পরিণত, আর সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূতার উপযোগী আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মসম্মান জ্ঞান।

প্রতীতি দেবীর বইতে তাঁর বাবা, ব্রিটিশ আমলের জাঁদরেল প্রশাসক সুরেশচন্দ্র ঘটক এবং তাঁর বিরল প্রতিভাধর ও মেধাবী নয় পুত্রকন্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে। তাঁর নিজের অন্য যে পরিচয় তার উল্লেখমাত্র সমগ্র শিক্ষিত দেশব্রতী বাঙালি সমাজের সচকিত হয়ে ওঠার কথা। তাহলো— প্রতীতি হলেন স্বনামধন্য রাজনীতিক: বাঙালির ভাষা, কৃষ্টি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত এবং একাত্তরের প্রথম লগ্নের ও কাতারের বীর শহীদ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্রবধূ। সেই আদর্শ বাঙালির জীবনের শেষ মুহূর্তেও বর্বরতার বিরুদ্ধে বীরোচিত আচরণের আলেখ্য এই পুস্তকের অন্যতম আকর্ষণ।

অনেকে হয়ত ভাববেন যে, এত স্বল্পপরিসরে এত বেশি উপাদানের সমাবেশের ফলে প্রধান চরিত্র ঋত্বিকের ওপর মনোযোগের অচঞ্চল রশ্মি কেন্দ্রীভূত রাখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বইটি একাধিকবার পড়ার পর আমার মতো একনিষ্ঠ ঋত্বিক ভক্তও স্বীকার করতে বাধ্য যে, এটি একটি অসাধারণ সংযোজন, যার মধ্যে ঋত্বিক সম্পর্কে এমন সব কথা, তথ্য ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক মন্তব্য রয়েছে যা মাতৃজঠর হতে একটি নাড়ির টানে চিরজীবনের জন্যে বাঁধা যমজ না হলে আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। শৈশব কৈশোর ও পরিণত বয়সের কত যৌথ অভিজ্ঞতার অঙ্গাঙ্গী নিবিড় অংশীদারিত্ব। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পরও যমজ ভাই বোনের কি গভীর, প্রায় অশরীরী, অপ্রাকৃত অভিন্নতাবোধ। চটি একটা বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে শৈশব কৈশোরের হাসির আমোদ ফুর্তির গল্প ছড়ানো ছিটানো যেমন রয়েছে তেমনি জীবনের নির্মম আগ্রাসনে জ্বলে ওঠা আত্মঘাতী অন্তর্দাহ ও সাহসী প্রতিরোধের কি অবিশ্বাস্য ইতিহাস বিধৃত রয়েছে।

যখন ঋত্বিকের সবেমাত্র গোটা দুই দুধ-দাঁত উঁকিঝুঁকি মারছে এবং প্রতীতি তখনও দন্তহীন, সে সময়ের জন্মভীতু ঋত্বিকের দুঃসাহসিক কাহিনী ('একটুও ভয় পেও না ছোট্ট বেবী আমি তো আছি!') রবীন্দ্রনাথের তেপান্তরের মাঠে অসম রণে বিজয়ী 'বীরপুরুষ'-এর সমপর্যায়ের। আর হবেই না বা কেন ? ঋত্বিক-জায়া সুরমা ঘটক তাঁর বড় ননদ তপতী দেবীর দেয়া ঘটকদের যে বংশ পরিচয় দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে, তাঁদের আগে বাগচী বলা হতো। তাঁদের আদিপুরুষ পণ্ডিত কবি ভট্টনারায়ণ সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের একজন যাঁদের কান্যকুব্জ থেকে রাজা বল্লাল সেন আনিয়েছিলেন, এসব বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণের সাহায্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক বর্ণাশ্রম ও জাত পাতের ভেদবুদ্ধি বাঙালি হিন্দু সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। পণ্ডিত মহাশয়ের দুই পুত্রের একজন রাঢ় ও অন্যজন বরেন্দ্রভূমে বসতি স্থাপন করেন। রাঢ়ী শ্রেণীয়দের বংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম আর বরেন্দ্রীয় শাখার শান্তিলা গোত্রে ঋত্বিকদের জন্ম ('ঋত্বিক— পদ্মা থেকে তিতাস', অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৫)। অন্তরাল থেকে নিশ্চয় অন্তর্যামী হেসেছিলেন, বহিরাগত রাজবংশের আমদানিকৃত ব্রাহ্মণদের কঠোর অনুশাসন ও শ্রুতি ও স্মৃতির শক্ত বাঁধনে বাঙালি জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার ষড়যন্ত্রে। ভট্টনারায়ণ শুধু পন্ডিতই ছিলেন না, তাঁর অপর পরিচয় তিনি কবি, আর তাঁর বংশের উত্তর প্রজন্মের ঠাকুর ও ঘটকরা ধর্মের সঙ্কীর্ণ বিধিবিধানের বিরুদ্ধে উদারনীতিক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনেও তাঁদের আসন পাকা।

যমজ ভাইবোন দুটির জন্ম ঢাকায়, ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে। তাঁদের পিতার বদলির সরকারি চাকরির জন্য যশোর, ময়মনসিংহ, রাজশাহীর মতো পূর্ববঙ্গের বহু স্থানে ভাইবোনের একাত্ম অস্তিত্ব ও নিবিড় সহমর্মিতার স্মৃতিকথা মনের মাধুরী মিশিয়ে বলা হয়েছে এমন করে যা মানুষ, শিল্পী ও বিপ্লবী ঋত্বিকের বহুমাত্রিক চরিত্র বুঝতে সহায়ক হবে। আরও বাড়তি পাওনা হলো, যে বংশে ঋত্বিক-প্রতীতির জন্ম তার বিচিত্র চরিত্রের ও বহুগুণে গুণান্বিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আর তাঁরা যেসব অসামান্য লোকের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদেরও খুব কাছের থেকে দেখার দুর্লভ সুযোগ পাওয়া।

যেমন ধরুন, সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনীশ ঘটক। তাঁর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'বলতে, গেলে, মনীশই কল্লোলের প্রথম মশালচী। সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে সে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। তাদের একমাত্র পরিচয় তারাও মানুষ। জীবনের দরবারে একই সেই মোহর-মারা একই সনদের অধিকারী। ... যে জীবন ভগ্ন, রুগ্ন, পর্যুদস্ত তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে, তাদের নিজেদের ভাষায় বললে তাদের যত দগদগে, জীবনের এই খলতা, এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধে কশায়িত তিরস্কার।' ('কল্লোল যুগ', ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৭)।

'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে এই যে বাস্তবধর্মী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিত সমাজের জীবনঘনিষ্ঠ পথিকৃৎ গল্পকার, তার ঠিক বিপরীত মেরুতে ছিল তাঁর চারিত্রিক অধিষ্ঠান। মনীশ ঘটকের আত্মভোলা খামখেয়ালি স্বভাবের খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর বিরল প্রতিভাময়ী কন্যা মহাশ্বেতা দেবী একটি মজার শিশুতোষ বই লিখেছেন। ('তুতুল', স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪)। প্রতীতি দেবী ও ভাইঝি মহাশ্বেতা দেবী দু'জনই মনীশ পত্নীর প্রিয় দুধেল গাই, নির্বিচারে সর্বভুক 'ন্যাদোশ'-এর অবিশ্বাস্য কীর্তিকলাপ সম্পর্কে লিখেছেন। খোলা ছাদের ওপর খড়ের গাদার মধ্যে সযত্নে লুকায়িত মনীশ ঘটকের স্কটল্যান্ডের মহার্ঘ সুরার বোতল ভেঙ্গে ভেজা খড় খেয়ে স্বর্গীয় নূরানী সুরত বানিয়ে ন্যাদোশকে সাঁ করে নেমে যেতে দেখেছেন প্রতীতি। আর মহাশ্বেতার

দেখা দোলপূর্ণিমার রাতে ফরাসী মাদক পানীয় সিক্ত খড়ে পেট পুরে নিয়ে ন্যাদোশের পূর্ণিমার চাঁদ আড়াল করে কার্ণিশের ওপর নেশার ঘোরে দোল খাওয়া একেবারে পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা, অনেকটা উত্তরকালে ঋত্বিকের ছায়াছবি 'অযান্ত্রিক'-এর শামিল। আর শিশুদের চোখে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ কারণে যে, ইংরেজি ছড়ার বইয়েও তারা পড়ে এই চাঁদের ওপর দিয়ে লাফ দেয়া গরুর কথা।

সমান্তরাল পাঠ হিসেবে সুসাহিত্যিক ও অতি-সম্প্রতি 'ভারত রত্ন' উপাধি-ভূষিত মহাশ্বেতা দেবীর বর্ণনা আরো মনোজ্ঞ। পিতা মনীশ ঘটকের উদ্ভট কান্ডকারখানা সম্পর্কে তাঁর শিশুতোষ পুস্তকে মহাশ্বেতা বর্ণনা করেছেন সেই দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যার অবিস্মরণীয় দৃশ্য : 'ফরাসী কনিয়াক্-সিক্ত খড় খেয়ে নেশায় বুঁদ ন্যাদোশ ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল, একটু এগুলেই উঠোনে পড়ে নির্ঘাৎ অক্কা পাবে। পাশের বাড়ির রাশভারী মেশোমশাই জানালা খুলে চাঁদ দেখতে যেয়ে আৎকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি! আমি জানালা খুলেছি চাঁদ দেখব বলে, চাঁদের সামনে গরু কেন? গরু টলছে কেন ?'— বর্ষীয়ান পাঠক নিশ্চয়ই তাঁর শৈশবে ফিরে যাবেন যখন ঘরে ঘরে বৃদ্ধদের রেওয়াজ ছিল নানা ব্যাধি ও উপসর্গের প্রতিষেধক বলে গণ্য গাঁজা, ভাঙ বা আফিম সেবন করা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকা'ন্তর উইল' প্রমাণ করে যে এসব মাদকাসক্তি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। অনেকেরই মনে পড়বে সেই উপন্যাসে আফিমচি ও মার্জারের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব বিনিময়ের রসালো উপাখ্যান। আবার ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রদের হয়তো স্মরণ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতিপুষ্ট উনিশ শতকি লেখক টমাস দ্য কুইন্সির কথা। তিনি নেশায় চুর হয়ে সৃষ্টি করেছেন অমর সাহিত্যকর্ম যার নাম হল 'জনৈক আফিমখোরের স্বীকৃতিমূলক (স্বীকারোক্তিমূলক) জবানবন্দী'। অহিফেনসেবন যে সৃষ্টিশীলতার কতটা সহায়ক তার প্রমাণ হল দ্য কুইন্সির লেখা 'ম্যাকবেথ নাটকে মধ্যরাতে কড়া নাড়া।'এর মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ধ্রুপদী সাহিত্য সমালোচনা সত্যি বিরল।

এই হাসি-খেলার নানা রঙের জীবনের সমাপ্তি ঘটল যখন ঘটক পরিবার মহাযুদ্ধজনিত কারণে ১৯৪১-এর শেষাশেষি মহানগর কলকাতা থেকে মফস্বল শহর রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হলো আর ঋত্বিক ও মহাশ্বেতা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। শ্রমজীবীদের বাঁচামরার লড়াইয়ে আগেই ঋত্বিক জড়িয়ে পড়েছিলেন যখন ১৯৩৯ সালে মনীশের উদ্যোগে ঋত্বিক শিল্প এলাকা কানপুরে যান অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতে।

তৎকালীন জটিল ও দ্রুত পরিবর্ত্যমান রাজনীতি সম্পর্কে মনে হয় প্রতীতি দেবীর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই তাঁর গ্রন্থের এই পর্যায়ে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভ্রমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। লিখেছেন যে, ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে 'ঋত্বিকরা তখন দিন-রাতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং নানা জায়গায় কাজ উপলক্ষে যাতায়াত শুরু করে দিল। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের ঘন অরণ্যে চলে গেল ঋত্বিক তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী

প্রচারণার কাজ করার জন্য। সঙ্গে মহাশ্বেতাও।'

মহাশ্বেতা এখনও জীবিত এবং আশ্চর্যরকম সক্রিয়, তিনি তাঁর সমবয়সী পিসিমাকে তখনকার রাজনীতি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানাতে পারতেন। সে পর্যায়ে ভারতীয় রাজনীতি নাটকীয় মোড় নিল এবং যুদ্ধমান দুই শিবিরের আকর্ষণ-বিকর্ষণে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে গেল (আজন্ম সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন)। অক্ষশক্তি জাপানের বিজয়ী জগন্নাথের রথ তখন মার্কিন উপনিবেশ ফিলিপিন্স, মাঞ্চুরিয়াসহ চীনের অর্ধেক, ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিজ (ইন্দোনেশিয়া), ফরাসি ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস), ব্রিটিশ মালয়া (মালয়েশিয়া) ও ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার) অনায়াসে দখল করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে হানা দিতে প্রস্তুত। অন্যদিকে ২২ জুন, ১৯৪১-এ হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী অতর্কিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছে। কংগ্রেস আগস্ট, ১৯৪২-এ ব্রিটিশবিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করল, কংগ্রেস হতে বিতাড়িত বামপন্থী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশের হাতে নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে কাবুলের পথে জার্মানি হয়ে জাপানে পৌঁছে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জাপানী সহায়তায় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য জাপানিদের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (আইএনএ)। কমিউনিস্ট পার্টি, যা এতদিন বেআইনী ছিল "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ"- এর ঘোর বিরোধিতা করার অপরাধে অকস্মাৎ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মান অগ্রাসনের সাথে সাথে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ'-কে আখ্যায়িত করে 'জনযুদ্ধ' বলে এবং সমাজতন্ত্রের জন্মভূমিকে রক্ষার স্বার্থে ব্রিটিশসহ মিত্রশক্তির বিজয়ের জন্য সর্বাত্মক সমর্থনের অংশ হিসেবে কংগ্রেসের 'আগস্ট আন্দোলনের' বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়। তাদের সে জন্য বড় উচ্চমূল্য দিতে হয়েছিল যার অন্যতম হল, ঢাকায় তরুণ কমিউনিস্ট লেখক ও সংগঠক সোমেন চন্দকে[১] আগস্ট বিপ্লবীদের দ্বারা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে নৃশংসভাবে হত্যা। তাই কমিউনিস্ট ঋত্বিক ও মহাশ্বেতার পক্ষে ব্রিটিশ তাড়ানোর আন্দোলন বা প্রচারণায় অংশ নেবার প্রশ্নই ছিল না। এ সময়ের আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন : শেষরাতে ঋত্বিককে সাইকেলের পিছনকার সওয়ারী করে প্রতীতি ধূ ধূ পদ্মার চর পার হচ্ছেন, সঙ্গে কিছু খাবার ও টাকা যা বালুচরে খেজুরপাতা নির্মিত কুঁড়েঘরে আত্মগোপনকারী অনামী কোন ব্রিটিশবিরোধী নেতাকে পৌঁছে দিতে হবে। ঋত্বিক বোনকে বলেছিলেন, কোন প্রশ্ন করো না। কিন্তু প্রতীতি আন্দাজ করেছেন যে, তিনি বোধহয় এম এন রায়। এ ধারণাও ভ্রান্ত কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি যখন যুদ্ধের প্রারম্ভে ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ তখনও মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হতে বহিষ্কৃত দলছুট নেতা, ভারতসহ

---

১. ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকার রাজপথে তাঁকে হত্যা করা হয়— তিনি তখন রেলওয়ের শ্রমিক সংগঠনের একটি মিছিল নিয়ে সূত্রাপুরে অনুষ্ঠিত একটি ফ্যাসীবিরোধী সভাব দিকে এগুচ্ছিলেন।

বিশ্বজোড়া উপনিবেশ শাসন ও শোষণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর এবং প্রকাশ্য সমর্থক ছিলেন। এই অপ্রিয় নীতির তাত্ত্বিকভিত্তি বোঝাতে গিয়ে এম এন রায় প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যাডিকেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' এবং 'ইন্ডিয়ান কনফেডারেশন অব লেবার' সে সময়ে হিমশিম খাচ্ছিল।

এরপরেই ঋত্বিকের জীবনে পটপরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রতীতি। রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষের প্ররোচনায় যখন ঋত্বিকের বাবা তাঁকে একটু পড়াশোনায় মন দিতে অনুরোধ করেন তখন পুত্রের বেয়াড়া কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী জবাব মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো : 'আমার কাজের ক্ষেত্র অনেক বড়, তবে অত্যন্ত ভাল পড়াশোনা দবকার, সেটা আমি করবো। যদি বেঁচে থাকো, সেদিন দেখবে আমি ফার্স্ট হবার জন্য কেন উদ্বিগ্ন নই।'

১৯৪২ সালে শিল্প-নাটক-রাজনীতির ক্রমবর্ধমান ব্যস্ততার মধ্যেও ঋত্বিকের নিঃসঙ্গ ধূসরিমা আর সৃষ্টিশীলতার অপর্যাপ্ত প্রকাশজনিত অন্তর্দাহের কথা বলেছেন প্রতীতি দেবী :

'ভয়ঙ্কর রৌদ্রতপ্ত দুপুরে মাঝে মাঝে আমাদের রাজশাহীর বাড়ির ছাদের নহবতখানায় ওর মতোই বিরাট এক বাঁশি নিয়ে আমাকে বলতো গান গাইতে। দুটো গান প্রায় রোজই করতে হতো। তার একটি 'দূরদেশী ওই রাখাল ছেলে', অন্যটি 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, হে রাখাল বেণু তব বাজাও একাকী'। সে হৃদয়ের ও কর্মের বেণু সারাজীবন ও সত্যিই একাকীই বাজিয়ে গেল। তখন তো আর কাউকে গানে হৃদয়ের কথা বলার লোক ছিল না।... পরবর্তী জীবনে আমি বহু গান গেয়েছি কিন্তু ওই প্রিয় দু'টি গান আর গাইতে পারিনি কখনো।'

এ কি জীববিজ্ঞানের সূত্র মতে নাড়ীর টান, না আধিভৌতিক অস্পর্শযোগ্য অন্য কিছু জানি না। শুধু জানি এমন বুকের রক্ত নিংড়ানো আর্তি খুব কমই শুনেছি :

'কোনদিন মনোমালিন্য বা ঝগড়া কাকে বলে বুঝিনি। শুধু ভালবেসে গেছি একে অপরকে। শুধুই বুকভরা কান্না কেঁদে গেছে। আজ আমার জন্য সে কান্না রেখে গেছে প্রাণ দিয়ে। ... ঐ গ্রামছাড়া রাখাল ছেলেটি অভূতপূর্ব সব কাজ করে গেছে। নির্মম উপবাসে বাধ্য হয়ে থেকেও নিজের কাজ করে গেছে। আজ আমার কোন কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না। ওর কঠিন যন্ত্রণার উপবাস আমার রক্তে মিশে গেছে।'

তারপর দেশ বিভাগের মহড়া হিসেবে মনুষ্যপরিকল্পিত ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে হাতিয়ার করে নিরীহ অসহায় নর-নারী-শিশুর গণহত্যা, স্টেটসম্যান পত্রিকা যে মহা-নরমেধ যজ্ঞের নাম দিয়েছিল 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং।' ঘটক পরিবারের ঐতিহ্য আপসহীনভাবে অসাম্প্রদায়িক, তার ওপর ঋত্বিক ও মহাশ্বেতা কমিউনিস্ট এবং গান্ধীজি বাদে কমিউনিস্ট পার্টিই সে দুঃসময়ে ছিল একমাত্র শনাক্তযোগ্য সংগঠিত শক্তি যা প্রাণপণে ভ্রাতৃঘাতী হিংসার দাবানল নিভাতে সচেষ্ট ছিল। প্রতীতির অনবদ্য ভাষায়

১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট ছিল 'ঘরের মানুষ দিয়েই ঘর পোড়ানোর বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।' কলকাতায় প্রতীতি দেবী বালীগঞ্জ পাড়ায় জিন্নাহ্ সাহেবের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' প্রথম ফসল চাক্ষুষ দেখলেন : 'দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে বাড়ির সামনে ঠেলাগাড়ি ভরে মৃত, অর্ধমৃত মানুষের স্তূপ ঢালতে দেখে আমি নিকটবর্তী তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা শ্রদ্ধেয় কিরণশঙ্কর রায়ের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে এনে দেখালাম সে দৃশ্য। ভাগ্যহতদের অধিকাংশই ছিল গ্রামের ফল, তরকারি, ডিম, মুরগি সরবরাহকারী গরিব মুসলমান। কিরণশঙ্কর উত্তেজিত হিন্দু যুবকদের প্রতিহিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করতে বহু সাধ্য সাধনা করে কৃতকার্য হন। ঋত্বিক রাজশাহীর প্রত্যন্ত এলাকায় দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত অন্য হিন্দু ও মুসলমান কমরেডদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। 'ঋত্বিকরা তখন ঘরে ঘরে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। উভয় দিকে, মুসলমান ও হিন্দু এলাকায়। ঋত্বিক তখন প্রায়ই ওদের ফেলে আসতে পারত না। ঘুম ও খাওয়ারও ঠিক ছিল না।'

এক বছর যেতে না যেতেই ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দখলদার ইংরেজদের তড়িঘড়ি তল্পি গুটানোর তাগিদে দেশ ভাগ তথা বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত। সে সময়ের কথা লিখেছেন প্রতীতি দেবী : 'জাতিগত বিচারে দেশ ভাগ হয়। আক্রোশে ঋত্বিক প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারানোর পথে। আজীবন এই দেশ ভাগকে সে স্বীকৃতি দেয়নি, মনের গভীর থেকে মেনেও নেয়নি। যার জন্য সে 'পদ্মশ্রী' সম্মানও প্রত্যাখ্যান করে।'

দেশ ভাগজনিত যে রক্তগঙ্গা বয়েছিল ঋত্বিক জীবনভর তা ভুলতে পারেনি, মনীশ ঘটকের ভাষায় : 'মহাকাশ জানে সে লোহুর স্বাদ এখনও লোনা।' সংবেদনশীল বড় ভাইয়ের খুব কাছের লোক ছিলেন ঋত্বিক, তাঁরই সঙ্গে একমত ছিলেন ১৯৪৭-এর দেশমাতৃকার হতদ্দশায়—

'গুণতিতে বেশি পশুর দাপটে বলাৎকৃত। বিবশা জননী ঘৃণা-লজ্জায় অর্ধমৃতা'। যারা ক্ষমতা ভাগাভাগির লোভে দেশমাতৃকা বিবশা হতে দেখেও আপত্তি করেনি, তাদের সম্পর্কে ঋত্বিকের ক্ষমাহীন শেষ রায়, অবশ্য মনীশের ভাষায় :

'এরা সত্যবাদী নয়, এরা সুবিধাবাদী,
এরা মিছে কথা কয়।
এরা রসিক নয়
রাসায়নিক
কীসের সঙ্গে কী মেশালে
কোলে ঝোল টানা যায়
এরা মোক্ষম জানে।'

তাই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এসব সুবিধাবাদীব আত্মীকরণ প্রয়াস ঋত্বিক ঘটক ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ 'পদ্মশ্রী' গ্রহণ করার অর্থই হতো দেশ ভাগকে

প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেয়া। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল কাফেলা নিরাপদ আশ্রয়ের তালাশে পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করতে লাগল। 'কলকাতার শেয়ালদায় সবচেয়ে বেশি আশ্রয়প্রার্থীর ভিড়। সেই সব শরণার্থীর জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে আবারও পাগলের মতো ছুটাছুটি শুরু করল ঋত্বিক।' এদের খাদ্যাভাব, স্থানাভাব, বেকারত্বের মর্মান্তিক বাস্তবচিত্র ঋত্বিক তুলে ধরলেন তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক'-এ, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রতীতির ভাষায় : 'তার চলচ্চিত্রকর্মের ভিতর দিয়েই প্রমাণ করে গেছে সে দেশ বিভাগের নৃশংসতা কী ভয়াবহ'। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বাস্তবতার এই পলেস্তরাশূন্য রূপ দেখুক সকলে সেটা চাননি, তাই 'নাগরিক'-এর প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে দিলেন। সত্যজিৎ রায় প্রতীতি দেবীকে এই অপূর্ব শিল্পকর্ম সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তখন যদি ওই ছবি দেখানো হতো, তাহলে ঋত্বিকের আগে ভারতবর্ষে আর কারো নাম উচ্চারিত হতো না।'

১৯৬০ সালে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'কে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সংজ্ঞায়িত করেছেন 'জীবন মৃত্যু ও প্রত্যহ' বলে (ঋত্বিক কুমার ঘটক, সম্পাদনা : অতনু পাল। এপ্রিল ১৯৮৮, বাণীশিল্প, কলকাতা।) শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা কাহিনী ভিত্তি করে এ ছবিতে গৌরীদান প্রথার আধুনিক রূপায়ণ সম্পর্কে প্রতীতি দেবী বলেছেন : 'এই প্রথম ও (ঋত্বিক) শরণার্থী উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষভাবে ছবিতে আনে। এখানেও (প্রদর্শনী নিষিদ্ধকবণের) আশঙ্কা ছিল, কলকাতা তখন আশঙ্কাজনকভাবে শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত। যা হোক ছবিটা মুক্তি পেল'।

প্রদর্শনীর আবহাওয়া লেখিকার কলমে ধরা পড়েছে : 'নিস্তব্ধ হল। শুধু মাঝে মধ্যে কান্না, ফোঁপানোর আওয়াজ। হয় নিজেদের জীবনের অতীত বাস্তবতা চোখের সামনে দেখেই কিংবা শুধুই ভালো লাগায়। যতই কান্নার বেগ বেড়ে যাচ্ছে, ততোই আমাকে ধরে সেও (ঋত্বিক) কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে, পুরো ছবি এভাবেই দেখতে দেখতে এক সময় আমাকে বলল— বাস্তব এতো কঠিন অথচ এতো হৃদয়গ্রাহী, যার তুলনা শুধু আজকের দর্শকদের দিয়েই প্রমাণ হয়। চোখ মুছতে মুছতে যখন বেরিয়ে এলাম সব দর্শক তখনও চোখ মুছছেন। সে অভিব্যক্তি আজ আমি লিখে বোঝাতে পারবো না। তারা বলেছিলেন ঋত্বিকই আমাদের লোক, আমাদের সব দুঃখের অংশীদার। বাড়িতে ফিরে দেখি বিজন বাবু (ভট্টাচার্য) ও সুপ্রিয়া (চৌধুরী) দরজায় দাঁড়িয়ে। সুপ্রিয়া আমাদের প্রণাম করে বলল, দিদি, আজ আমি পূর্ণতা পেলাম। ঋত্বিক ওকে ধরে বললো, বুবু আজ তুই আমার মায়ের প্রতিচ্ছবি। সুপ্রিয়া কান্নায় ভেঙে পড়লো।'

১৯৬২ সালে আবার উদ্বাস্তুদের নিয়ে ছবি করলেন ঋত্বিক 'সুবর্ণরেখা'—পূর্ববঙ্গ হতে বিতাড়িত শরণার্থী এক মেয়ের মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত পরিণতি। কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য লোক পাওয়া সহজ ছিল না, ঋত্বিক তাই চিন্তিত যে, কে চরিত্রটির সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে তার নিঁখুত রূপায়ণ করতে পারে। প্রতীতি সে সময়ে কলকাতায় গেছেন কুমিল্লার তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে, তাই তাঁর সাহায্য চাইলেন

ঋত্বিক। দেখা করতে এলেন মাধবী মুখার্জি। বরিশালের সম্পন্ন ঘরের মেয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে উদ্বাস্তু। সরকারের দেয়া সেলাই কল দিয়ে মা-মেয়ে কোন রকমে দিন-গুজরান করছিলেন। প্রতীতির খুব ভাল লাগল কারণ মাধবীর অটুট আত্মসম্মানবোধ, মুখে বেশ দৃঢ়তার ছাপ। বুঝলেন এ মেয়ে ভিক্ষে করে চলার মেয়ে নয়। প্রতীতি লিখেছেন : 'বেশ কিছুক্ষণ কথা বলা পর আমার খুব ভাল লাগল, বিশেষত ঋত্বিকের যে চরিত্রের জন্য আমাকে বলা হয়েছিল সে চরিত্রে এমন মেয়েরই দরকার। যার নিজের বাস্তব জীবন সুবর্ণরেখার চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে আছে।' প্রথম ছবিতেই মাধবী অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন ঋত্বিকের নির্দেশনায়। এর পরের ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম।' ঘটকদের আদি নিবাস পাবনা জেলার পুরনো ভারেঙ্গা গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হবার পর পদ্মার পাড়ে রাজশাহীতে। সেই 'পদ্মা থেকে তিতাস' ঋত্বিকের সহধর্মিণীর পুস্তকের শিরোনাম হতে পারে। কিন্তু তার আসল রহস্য ও প্রকৃত কাহিনী একমাত্র বয়ান করতে পেরেছেন তাঁর যমজ বোন প্রতীতি। তা তিনি প্রথমবারের মত করেছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ট্রাজেডি বাঙালি জাতির মর্মন্তুদ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত তা না বললে এগুনো সম্ভব নয়।

প্রতীতি দেবীর শ্বশুর কুমিল্লার প্রখ্যাত আইনজীবী ও সর্বভারতীয় মানের কংগ্রেস নেতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত শাসক গোষ্ঠির চক্ষুঃশূল ছিলেন। তাঁর আদি পাপ ছিল যে, পাকিস্তান শাসনতন্ত্র রচনাকল্পে প্রতিষ্ঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই তিনি ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মাতৃভাষা বাংলার যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণে দাবি করে বসেন।

সেদিন পূর্ববঙ্গের একজন মুসলমান বিধায়কও বাংলা ভাষা ও ধীরেন দত্তকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, উত্তরাধিকার, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায্য দাবিদাওয়ার সপক্ষে সারাজীবন লড়েছেন বাংলার এই কৃতী সন্তান। তাই যখন পাকিস্তানের অপশাসন ও সীমাহীন শোষণের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সমগ্র বাঙালি জাতি রুখে দাঁড়াল এবং মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগের সমান্তরাল সরকার কায়েম করল তখনই বাঙালি জাতিকে শায়েস্তা করে গণহত্যার মাধ্যমে তার নেতৃস্থানীয়দের নিশ্চিহ্ন করার নীলনক্সা চূড়ান্ত করল পাকিস্তানের সামরিক শাসকবর্গ। ২৫ মার্চ ঢাকায় ও অন্যত্র যে নজিরবিহীন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নিরস্ত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ হলো, তারই ধারাবাহিকতায় ৮৫ বছর বয়স্ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ২৯ মার্চ হতে ১৪ এপ্রিল অকথ্য অত্যাচারের পর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নাতনি আরমা দত্ত তখন সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, তাই তাদের কুমিল্লার বাড়ির ওপর পাকবাহিনীর আক্রমণের এবং দাদুর মৃত্যুর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমরা এর বেশি আর জানতে চাই না।'(স্মৃতি : ১৯৭১, ৩য় খণ্ড। সম্পাদক : রশীদ হায়দার।

ডিসেম্বর ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)। কিন্তু সরদার ফজলুল করিম ধীরেন দত্তের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তাঁকে সম্পূর্ণ পঙ্গু, অথর্বত্বে পরিণত করার প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান উদ্ধৃত করেছেন। (শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদক : আনিসুজ্জামান। জানুয়ারি ১৯৯৪। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিরক্ষা পরিষদ, ঢাকা)। কথাসাহিত্যক শওকত ওসমান একই ভয়াবহ দৃশ্য জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর 'মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি' তে। (পোর্ট্রেট গ্যালারি। অক্টোবর ১৯৯৭। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা)। প্রতীতি দেবী ২৯ মার্চের কালরাত্রির ধারাভাষ্য দিয়েছেন যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ ভাষায়, যার ফলে ঘটনার ভয়াবহতা ও পাকিস্তানী বর্বরতা আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। পাকিস্তানীদের সুপরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩-এর শেষাশেষি এলেন ঋত্বিক, উদ্দেশ্য শৈশব কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত কীর্তিনাশা পদ্মা নদীকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে ছবি বানাবেন। কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'। প্রতীতি তাঁকে বোঝালেন রাজশাহী যাবার পথঘাট এমন কি ঐতিহাসিক হার্ডিঞ্জ ব্রিজও ধ্বংস করে গেছে পলায়ণপর হানাদার পাকবাহিনী, তাই পদ্মাকে আপাতত ছেড়ে দিতে হবে। কুমিল্লায় ধীরেন দত্তের বিধ্বস্ত বাড়ির মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিও লুট হয়ে গেছে। ডোবার জলে প্রতীতি পেয়েছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

ঋত্বিক সেই রোদে শুকানো জরাজীর্ণ বইটি গভীর রাত পর্যন্ত গোগ্রাসে গিলে প্রতীতিকে হুকুম করলেন তক্ষুণি কাগজ-কলমে দিতে, কারণ চলচ্চিত্রায়ণের জন্যে চিত্রনাট্য লিখতে হবে। এমনিতেই দোকানপাট ঠিকমতো বসেনি, তার ওপর এই নিশুতি রাতে কোন দোকান খোলা নেই। কুছ পরোয়া নেই করে ঋত্বিক বোনের হাতের ওপর লিখতে বসে গেলেন। যদ্দিন না ঢাকায় ফেরত যাওয়া হয় ততদিন প্রতীতিকে সেই ফিল্ম স্ক্রিপ্ট অস্নাত অবস্থায় বয়ে বেড়াতে হবে দেখে তিনি একটা ইস্ত্রি করা সাদা শাড়ি এনে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। সেই শাড়ির ওপর সেই রাতের গভীর নিস্তব্ধতায় রচিত হলো ঋত্বিকের চিত্রনাট্য যার ভিত্তিতে রচিত হলো অনবদ্য আলেখ্য মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের তিতাস নদীর ওপর ও তীরে বংশানুক্রমে কঠিন জীবনযাত্রার।

প্রতীতি দেবীর বইয়ের শেষ দুটি অধ্যায় এমন যন্ত্রণাবিদ্ধ যে পড়া কঠিন। ১৯৭৪ সালে ঋত্বিককে ঢাকা বিমানবন্দরে শেষবারের মতো বিদায় দেবার যে দৃশ্যের অবতারণা প্রতীতি করেছেন তা যেমন স্মরণীয় তেমনি অসহনীয়। গভীর রাতে দূত মারফত জরুরি তলব পেয়ে প্রতীতি কুমিল্লা থেকে ছুটে গেলেন দাউদকান্দি ফেরিঘাটে, সেখানে রেস্ট হাউসে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে প্রথম ফেরিযোগে তড়িঘড়ি ঢাকায় পৌছে শুনলেন ঋত্বিক বিমানবন্দর চলে গেছেন। আবার ছুট ছুট : 'গিয়ে দেখি সব প্যাসেঞ্জার চলে গেছে, এক ঋত্বিক তার ছেলের (ঋতবান) হাত ধরে সম্পূর্ণ ফাঁকা এয়ারপোর্টে রাজপুত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে।' ঋত্বিক বলে দিয়েছে সে যখন খুশি যাবে, তাই প্লেন ছাড়তে পারছে না। প্রতীতিকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না ঘোষণা করে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

প্রতীতির ভাষা ও তাঁর অঙ্কিত সেই শেষ সাক্ষাতের দৃশ্য কাব্যময়তায় সত্যজিতের ফিল্মস্ক্রিপ্ট মনে হয় : 'সারাজীবন কেঁদে গেল আমার জন্য। ... রাজপুত্রের মতো যেন আমাকে আলোয় উদ্ভাসিত করে চলে গেল। ... আমার সৌভাগ্য, ওই দেবদূতের মতো চেহারা দেখার পর অন্য আর চেহারা দেখতে হয়নি আমার'।

দেখতে হয়নি, কারণ ১৯৭৬-এর ৬ ফেব্রুয়ারি যেদিন কলকাতায় ঋত্বিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন প্রতীতি ঢাকার সরকারি হাসপাতালে মরণাপন্ন। ঋত্বিকের শেষ যাত্রা ও তাঁর সহস্র অনুরাগীর আহাজারি যাতে শুনতে বা দেখতে না পান সেজন্য তাঁর কেবিন থেকে শব্দদূষণের অভিযোগে রেডিও-টিভি নির্বাসিত হয়েছিল। রোদন ভরা কত বসন্ত গত হলো এই দুই দশকে, কিন্তু প্রতীতির শূন্য হৃদয়ে এখনও হাহাকার :'সারা জীবন কেঁদে গেল আমার জন্য।'



বাসন্তী : নদীর মতন শুকায় নারী

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'সুবর্ণরেখা'*

সাজেদুল আউয়াল

ভূমিকা

বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয় ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব পরিমাপ এবং 'সুবর্ণরেখা'-র সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বাংলা-ভাগ বলতে এখানে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় এক সময়কার অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করাকে বুঝানো হচ্ছে— যার ফলে অবিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশ ভারতে এবং পূর্বাংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ১৯০৫ সালেও একবার ইংরেজরা বাংলাকে ভাগ করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তখন তারা ব্যর্থ হলেও ১৯৪৭ সালে তা বাস্তবে পরিণত হয়।

বাংলা-ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের দু'টি অংশের অন্তর্গত হওয়ার ফলে, উভয় দিক থেকেই বাস্তুত্যাগ (migration) ঘটে। যার ফলে উভয় বাংলার জনসংখ্যার আয়তন (size), বিন্যাস (distribution), গঠন এবং প্রবণতা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক দিকে বহিরাগত গোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংঘাত অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়— যার শৈল্পিক প্রমাণ আমরা ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রে পাই। শুধু সুবর্ণরেখা নয়, ঋত্বিক নির্মিত প্রায় সব চলচ্চিত্রেই বাংলা-ভাগের প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। তৎকালীন ভাঙ্গা বাংলার জরাজীর্ণ বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে— সমাজের বিভিন্ন প্রবণতার প্রতিচ্ছবি যেন তাঁর চলচ্চিত্রসমূহ। ভাঙ্গা বাংলার মানুষ ও তার সামাজিক বাস্তব অবস্থাই ছিল তাঁর চলচ্চিত্রের মূল বিষয়।

তাই ঋত্বিক-মানসকে বুঝতে হলে, তাঁর চলচ্চিত্রসমূহকে বুঝতে হবে। ঋত্বিক ঘটক এই উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকর। তাঁর কাছে, চলচ্চিত্র বক্তব্য প্রকাশের, সমাজকে ব্যবচ্ছেদ করার, বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের ও বাস্তুত্যাগী মানুষের নিঃস্ব - নিমজ্জমানতার ছবি তুলে ধরার একটি মাধ্যম ছিল। তিনি যে-সব চলচ্চিত্র নির্মাণ

---

* প্রবন্ধটি প্রথম লিখিত হয় এম.ফিল. কোর্সের টার্ম পেপার হিসেবে ১৯৯৬ সালে ড. রংগলাল সেনের তত্ত্বাবধানে। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে 'রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ' কর্তৃক আয়োজিত '৫ম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ পঠিত। ১৯৯৯ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'-এর সংখ্যা ৬৪-তে মুদ্রিত।

করেছেন, সে-সব যেন তাঁর কালের কথক হয়ে উঠেছে। মানুষ ও সমাজ নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, দার্শনিক অভিজ্ঞান, শিল্পী হিসেবে মানুষের জন্য মর্মবেদনা— সব কিছু এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চলচ্চিত্র-কর্মে। মানব গোষ্ঠীর, জাতিসত্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তাঁর চলচ্চিত্রে।

ঋত্বিকের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তাঁর চলচ্চিত্রে দেশ ভাগের প্রভাব নিয়েও বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, আমাদের জানা মতে, তাঁর চলচ্চিত্রের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আজ অবধি হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ঋত্বিকের 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। চলচ্চিত্র, শিল্পকলার জগতে সবচেয়ে কনিষ্ঠ অথচ শক্তিশালী মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে Arnold Hauser- এর বক্তব্য :

> The film is an elastic, extremely malleable, unexhausted form which offers an inner resistance to the expression of new ideas. It is an unsophisticated, popular means of communication, making a direct appeal to the broad masses, an ideal instrument of propaganda the value of which immediately recognized by Lenin.[১]

ঋত্বিকও এই মাধ্যমটির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গল্প-নাটক রচনা এবং নাটক-নির্দেশনা ছেড়ে তিনি চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে মেতে ওঠেন। কারণ, তাঁর কাছে মনে হয়েছিল, চলচ্চিত্র -মাধ্যমে বহু মানুষের কাছে পৌছানো যাবে। তাঁর ভাষায়, "আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা : এই বিভক্তবাংলার জরাজীর্ণ চেহারাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙ্গালিকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।"[২]

ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নানা স্তরে বিভক্ত থাকে বলে তাঁর চলচ্চিত্রের পর্যালোচনা বিভিন্ন কোণ থেকে হতে পারে। তাঁর চলচ্চিত্রের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ঋত্বিকের ভাষ্য :

> সব শিল্পকর্মেই বিভিন্ন স্তরে রস সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অধিকারী ভেদে বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষ রস গ্রহণ করে থাকে। যেমন ধরুন ছবিতে। প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে— হাসিকান্না, সুখদুঃখ দিয়ে বিচিত্র জীবনের নক্সা আঁকা থাকে। একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলি খেলা করছে। আরও গভীরে প্রবেশ করে যাঁর মন তিনি দেখেন দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিগনির্দেশগত সংকেতগুলি। তারও গভীরে তলিয়ে যিনি যান, তিনি যে মুহূর্তগত অনুভূতির আস্বাদন লাভ করেন, তাকে কথা দিয়ে ধরা যায় না। সেই মুহূর্তগুলিতে তিনি অজ্ঞেয় কিছু-একটার দোর গোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। ... এই যে গভীরতম দিকটি, এর স্বরূপ বুঝতে comparative mythology আমাদের প্রচুর সাহায্য করে। শুধু সিনেমায় নয়, সর্বকালের সব শিল্পেই।[৩]

'সুবর্ণরেখা' নির্মাণ করতে গিয়ে ঘটক 'মানসিক' ভাবে প্রচুর খেটেছেন বলে তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন। এই চলচ্চিত্রেই ঋত্বিক-কথিত ছবির বিভিন্ন স্তরের উপস্থিতি সব

চেয়ে বেশি পাই। তাঁর কাছে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করা মানে কিছু একটা জন্ম দেয়া। প্রকৃত অর্থে সৃষ্টির রহস্য সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়ার মতনই। সেই জন্যই Jung-কে লিখতে হয়েছে :

> The creative process has feminine quality, and the creative work arises from unconscious depths— we might say, from the realm of the mothers.[৪]

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব অন্বেষণ করতে হলে দেশ-ভাগ প্রসঙ্গটি প্রথমেই আনা দরকার :

> দেশভাগ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে একটা বড়ো বিপর্যয়। ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করে, বিভেদের পাঁচিল তুলে দেওয়া একটা গোটা জাতির পক্ষেই বিরাট যন্ত্রণা। আর শুধু একটা জাতিকে দুটো আলাদা ভাগে ভাগ করে দেওয়া নয়, দেশভাগ সেই একটা বিরাট অংশকে ছিন্নমূল হতেও সাহায্য করেছিল।[৫]

তাঁর চলচ্চিত্র সৃষ্টিতে এই ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পরিবার বারবার এসেছে। 'মেঘে ঢাকা তাঁরা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'—সব ক'টি চলচ্চিত্রেই দেশ-ভাগের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেয়, যা একটা বিশাল মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যা—ঋত্বিক তাকে সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই শুধু ধরতে চাননি—তাকে আরো বিস্তৃত করে মানুষের ক্রমযাত্রার এক চিরকালীন সমস্যা বলে সমাজে ও ইতিহাসে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। আর এই কাজটি করতে যেয়ে বারবার মিথ-পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব বুঝতে হলে কেন তিনি মিথ-পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাও আমাদের বুঝতে হবে। মিথ-পুরাণ-লিজেন্ড-ফেইরীটেল-ফোকমোটিফ-লোকগান-ব্রতকথা সবকিছুকেই সমাজতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে দেখা দরকার। ড. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে :

> আজকের এই বৈজ্ঞানিক প্রগতি এবং বস্তুগত বৈভব মানুষকে সমৃদ্ধি দান করছে, অথচ বিনাশের ভয় তার আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ঐতিহাসিক নিয়তিবাদের কবলিত কবি-শিল্পীরা পলায়নবৃত্তি অবলম্বন না করে মিথ-পুরাণের আদিম কাহিনী-বিন্যাসের আশ্রয়ে জীবনের সত্যরূপ আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে চাইছেন।[৬]

ঋত্বিকও জীবনের সত্যরূপ অনুসন্ধানের জন্য মিথ-পুরাণ প্রসঙ্গ তাঁর চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন।

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব বুঝতে হলে বাংলা-ভাগের ফলে উভয় অংশের 'সামাজিক কাঠামো'র মধ্যে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাও আলোচনায় আসবে। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে শ্রেণী, দল, সংস্থাসমূহ অবস্থান করে সেখান থেকেই তাঁর

চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীরা পর্দায় দেখা দেয়। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের অধিকাংশ পাত্র-পাত্রীই উদ্বাস্তু— তাই, দলবদ্ধভাবে দেশত্যাগী একটি সম্প্রদায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে কি ধরনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পড়লো, তার চলচ্চিত্র-রূপ আমরা তাঁর কাজে পাই। বাস্তুত্যাগী মানুষ (ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে) যে কি রকমভাবে অসহায়, নিঃস্ব, নিমজ্জমান হয়ে যেতে পারে— তাও আমরা তাঁর সৃষ্টিতে দেখি। তাঁর চলচ্চিত্রের চরিত্রদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখতে পাই, পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে দেখি, আত্মহননের পথ বেছে নিতেও দেখি— সব কিছুকে এক জায়গায় এনে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব দাঁড় করানো যাবে বলে আমাদের ধারণা। কার্ল ম্যানহাইম তাঁর Sociology of Culture গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে :

> সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব নির্ণয় করতে হলে চারটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার : (১) অবস্থা অর্থাৎ কোন একটা সমাজের সম্প্রদায়গত, শ্রেণীগত, জাতিগত অবস্থা ; (২) ব্যক্তি ঐ বিশেষ অবস্থায় নিজেকে কিভাবে জড়িত করে এবং ঐ অবস্থার রূপকল্প তৈরি করে। অমন জড়িয়ে পড়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে পেশাগত উদ্দেশ্য, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, আত্মীয়তার সম্পর্ক, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও মৈত্রী, মোদ্দা কথায় বহুবিধ জড়ানো সম্পর্ক ; (৩) ব্যক্তি কিংবা দল যে রূপকল্প গ্রহণ করে ; (৪) যাদের কাছে রূপকল্প পৌঁছানো হয়, তারা তাকে কিভাবে গ্রহণ করে।[৭]

ঋত্বিকের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে এই চারটি দিকসহ সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধগুলোর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা দরকার। যেমন : social mobilization (সামাজিক স্থানান্তর) ; accommodation (উপযোজন) ; acculturation (সংস্কৃতিকরণ) ; assimilation (আত্মীকরণ) ; enculturation (প্রাথমিক সংস্কৃতিকরণ), বিচ্ছিন্নতা (alienation) ; পতিতাবৃত্তি (prostitution) ; আত্মহত্যা (suicide) ইত্যাদি ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব বুঝতে সহায়ক হবে। ঋত্বিক নির্মাণ করেছিলেন মোট আটটি কাহিনী-চিত্র। আটটির মধ্যে সাতটিতেই কোনো-না-কোনোভাবে দেশ-ভাগের প্রসঙ্গটি এসেছে। তার মধ্যে তিনটি : 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'কে ভিত্তি করেই ঋত্বিকের ছবির সমাজতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব

বাংলা-ভাগের প্রভাব ঋত্বিকের ছবিতে কতোটা পড়েছে, তা খতিয়ে দেখার আগে— এর প্রভাব তাঁর মানসে কতোটা পড়েছে, তা দেখা দরকার। ঋত্বিকের লেখা থেকেই এ বিষয়ে অবগত হওয়া যাক :

> আমরা এক বিড়ম্বিত কালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে-সময়ে কাটে সে-সময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্য কীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন, কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলাসাহিত্য নব-

বিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুব সমাজে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালী আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময় এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে দিয়ে আদায় করলো ভগ্ন-স্বাধীনতা। সম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটলো চারিদিকে। গঙ্গা-পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের (রাজনীতিকের) রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি! আমি যে-ক'টি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় (বাংলা-ভাগ) থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা : এই বিভক্তবাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙ্গালিকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।[৮]

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঋত্বিক এক সাক্ষাৎকারে তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা তাঁকে এবং তাঁর চলচ্চিত্র-ত্রয়ীকে বুঝতে সাহায্য করে :

প্রশ্ন : 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', সুবর্ণরেখা', দেখে মনে হয়েছে দেশ বিভাগ অর্থাৎ বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বেশি ভাবিত, যেন এই দেশভাগটাই আপনার কাছে সমস্ত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু।

ঋত্বিক : বটেই তো আমি সচেতন ভাবেই ওটা দেখাতে চেয়েছি।

প্রশ্ন : কিন্তু দেশভাগ ছাড়াও তো অনেক সমস্যা ছিল বা আছে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। আপনি যেন এ ব্যাপারে ভীষণ রকম emotionally involved.

ঋত্বিক : এই বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়াটা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। সেই সময়ে আপনাদের বয়স কত ছিল জানি না তবে তখন জ্ঞান-গম্যি যাদের হয়েছিল তাদের জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন আজকের সমস্ত অর্থনীতিটা যে চুরমার হয়ে গেছে তার basic factor ছিল ঐ বাংলা ভাগ। বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না। আর ঐ তিনটে ছবিতে আমি ঐ কথাই বলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও হয়ে গেল একটা trilogy, 'মেঘে ঢাকা তারা'. 'কোমল গান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আমি 'মেঘে ঢাকা তারা' দিয়ে যখন আরম্ভ করলাম তখনো আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলিনি, এখনও ভাবিনা। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, তা পাল্টানো ভীষণ মুস্কিল। সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে বাধা যে ছেদ যার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি সবই এসে পড়ে সেটাই 'কোমল গান্ধার'-এ পরিষ্কার করে বলা আছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র ভেতরকার কথাও তাই. 'সুবর্ণরেখা'-তেও সেই একই কথা। এখন অবশ্য অর্থনৈতিক সমস্যা নানান গণ্ডগোলে জড়িয়ে গেছে তবু ভালো করে ভেবে দেখুন বহু অর্থনৈতিক সমস্যার জট হচ্ছে ঐ দেশভাগ। একেবারে দু' টুকরো করে দিল দেশটাকে, একেবারে ছিনিমিনি খেলে গেল এরা।[৯]

এই ছিল বাংলা ভাগ ও তার পরবর্তী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে ঋত্বিকের বিবেচনা। তাঁর এই বিবেচনাই উল্লিখিত ত্রয়ী (trilogy) চলচ্চিত্রে বিধৃত। এবার পরপর তিনটি চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো।

মেঘে ঢাকা তারা

ঋত্বিক ঘটকের 'ছবির বিষয়বস্তু ... তাৎক্ষণিক, সমকালীন সংকটের ও সংগ্রামের ; চলিষ্ণু সমাজকে-সময়কে ধরে রাখা স্থায়ী শিল্পদৃশ্যে'। 'মেঘে ঢাকা তারা'ও তার ব্যতিক্রম নয়। শক্তিপদ রাজগুরু-র গল্প 'চেনামুখ' অবলম্বনে এই ছবি নির্মিত হয়েছে। ঋত্বিক লিখেছেন :

> এর নামটাও আমার দেয়া। 'চেনামুখ' নামে কোন এক জনপ্রিয় কাগজে এ গল্পটা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে কোন একটা জিনিস আমাকে আঘাত করেছিল। তাই Bill সেক্সপীয়রের 'The Cloud Clapped Star' এইটে আমার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে আমি এই ছবির Script করি। এটা খানিকটা sentimental হতে পারে, কিন্তু এর মধ্য থেকেই আমার ছবিতে overtones throw করার ব্যাপার আসতে শুরু করে। এইখানে আমি ভারতীয় Mythology ব্যবহার করা শুবু করি। যেটা আমার জীবনের একটা অংশ।[১০]

'মেঘে ঢাকা তারা' উদ্বাস্তু জীবনভিত্তিক। কাহিনীটি এরকম :

দরিদ্র সংসারটিকে কোন ক্রমে দাঁড় করিয়ে রাখে নীতা। বাবা-মাকে সাহস দেয়, ভাই-বোনকে সহায় দেয়, উৎসাহ দেয় দাদাকে সঙ্গীত চর্চায়। কঠিন দুঃখেও মুখে হাসি। কিন্তু যেদিন তার প্রেমিক সনৎ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে করল তারই ছোট বোন গীতাকে, অসহ্য হয়ে উঠল দিন-রাত্রি। যক্ষ্মা, স্যানটোরিয়াম ; মৃত্যু। এ মৃত্যু সে চায়নি ; এর জন্য দায়ী সমাজেরই বহুতর পাপ-অপরাধ। বাপ-মা চায় রোজগেরে মেয়ে আইবুড়ো থাকলেই ভালো, সনৎ চায় গ্লামার ; গীতা চায় স্বাচ্ছন্দ্য। সবাই স্বার্থপর। সততা-ন্যায়-সমতা থেকে বিচ্ছিন্ন। শুধু বাইরে নয়, মনে মনেও সকলেই উদ্বাস্তু। অন্ধকারের প্রাণী। যদিও আলোর আকাঙ্ক্ষা আছে ... দাদার মুখোমুখি নীতার কূলহীন জিজ্ঞাসা, আমি বাঁচবো দাদা ?[১১]

এই ছবি দর্শক নিয়েছিল এবং এর প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে :

এ ছবির মৌল উপজীব্য— পুডভকিন যাকে বলেছিলেন 'সেন্ট্রাল থীম',— জীবনই মৃত্যুর বলি, পুনরুজ্জীবনের আবশ্যিক খেসারত, একটি জীবনের বিনিময়ে একটি উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের কাহিনীর ধারায় ব্যাপকতর পুরুষার্থের সংজ্ঞায় বিষয়বস্তু নির্দেশ করতে হলে বলা যায়, স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিসত্তা অভিব্যক্তি খোঁজে স্বকীয়তার আত্মরতিতে নয়, অনন্যতার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাতেও নয়, নির্ভীক আত্মদানের মহিমায়; আর যেহেতু সমাজে অন্যতর স্বার্থের তাগিদ গরীয়ান, যেহেতু সেখানে প্রত্যেকে নিজের তরে কেউই পরের তরে নয়। তাই বঞ্চনা, নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতা ও পরিশেষে মৃত্যুই ভবিতব্য।

এই মৌল উপজীব্যে ভর করেছে বাংলাদেশের আদি অকৃত্রিম গৌরীদানের গল্প। সে গল্পই এ-ছবির অধিষ্ঠাত্রী রূপক। জন্ম-মৃত্যুর দোলায় চেপে পিতৃগৃহ থেকে গিরীশের কোলে কন্যার বিদায় যাত্রা রূপ পায় ছবির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের বিস্ময় ভাবনায়

আশু উপস্থিতিতে কাহিনীর সংলগ্নতায়। একটি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রাত্যহিক দিন আনা-দিন-খাওয়ার, ব্রত পূজোর নৈবদ্যে বাড়ির বড় মেয়ে (নীতা) বলি হয়ে ওঠে পরিব্যাপ্ত বঞ্চনার সামাজিক হাঁড়িকাঠে।[১২]

নীতার মৃত্যুর সাথে গৌরীদানের গল্প মিলিয়ে দেয়ার কাজটি ঋত্বিক করেছেন একটা সমাজের একটি রূপকের প্রবহমানতাকে ধরিয়ে দেবার জন্য। নিজেকেও এর মধ্য দিয়ে তিনি ঐতিহ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। ঋত্বিক তাই 'ছবি করা' নামের এক প্রবন্ধের শুরুতেই প্রশ্ন করেন : 'নিজের জমির ওপর না দাঁড়িয়ে কিছু করা যায় কি? কিছু সত্যিকারের গভীরতাকে ছোঁয়া সম্ভব?' 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রে গৌরীদান প্রসঙ্গটি নিয়ে ঋত্বিকের নিজের মন্তব্য :

> ... একটা Universal theme নিয়ে কাজ করেছি এবং নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করেছি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে। গত সাত-আটশো বছরের বাংলাদেশে একটা বড়ো মজার ব্যাপার গড়ে ওঠেছিল যা একেবারেই বাঙালী। স্মার্তপ্রভাবপুষ্ট বাঙালি সমাজ গৌরীদানেতে পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই অষ্টমবর্ষীয় শিশু খেলার আঙিনা ছেড়ে অজানা গাঁয়ের অজানা বাড়িতে গিয়ে চারিপাশের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখগুলো দেখে বড়োই ভয় পেত, বড়োই তার নিজের বাড়ির জন্য মন কেমন করতো। এই ব্যথা আমাদের লোককথায় শাশ্বত কালের জন্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই কান্না ঝরছে, আমাদের আগমনী বিজয়াতে। তাই দূর্গা আমাদের মেয়ে, তাই শরৎকালে বড়ো মন কেমন করে। Great Mother Archetype-এর এই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ : ... তাই আমার নীতার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পূজোর দিন। তাই যক্ষ্মার আবিষ্কারের সময় মেনকার বিজয়ার বিলাপোক্তি শোনা যায় 'আয় গো উমা কোলে লই'। নীতা মহাকাল পাহাড়কে জীবনভর দেখতে চায়, দেখে তখনই যখন মহামিলন ঘনিয়ে আসে, মহাকালরূপী সংহারদেব তাকে আলিঙ্গন দেন সেই পরম অবলুপ্তিতে।[১৩]

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, 'মেঘে ঢাকা তারা'য় বাংলা-ভাগের প্রভাব পড়েছে নানা ভাবে। এই ছবিতে যে পরিবারটি ছিন্নমূল হয়ে ক্রমক্ষয়িষ্ণু তা দেশ বিভাগের কারণেই। পরিবারটিকে দেশ বিভাগ দান করলো অবক্ষয়, গৌরীদান করার মতোই যেন! এই চলচ্চিত্রে গৌরীদান প্রসঙ্গ ছাড়াও আরো নানা দিক আছে যা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। এবার আমরা 'কোমল গান্ধার' চলচ্চিত্রটির বিষয়বস্তু অনুধাবন করার চেষ্টা করবো।

কোমলগান্ধার

'কোমলগান্ধার' ঋত্বিকের স্বরচিত কাহিনীর আশ্রয়ে তৈরি। গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখেছেন:

> গহীনতম বেদনার একটি অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। এই বিমূর্ত বেদনাকে দেশমাতার আত্মায় সঞ্চারিত করেছেন বিষ্ণু দে একই নামের কাব্যগ্রন্থে। তারপর ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' যার 'মূল সুর দুই বাংলার মিলনের। তাই অবিরত বেজেছে প্রাচীন বিবাহের সুর' (ঋ. ঘ.)। দেশভাগ ; উদ্বাস্তু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নাটকের দলেও ভাগাভাগি, একদল বিখ্যাত ক্লাসিক নাটকের পক্ষে, অন্যদল চায়

বাস্তবের মঞ্চরূপ। ভৃগু পরিচালক ; অনসূয়া শিল্পী ; দু'জনের মধ্যেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। দুই দেশ, দুই দল, দুটি হৃদয়— যথাক্রমে রাজনৈতিক ব্যর্থতা, গণনাট্য সংঘের অস্থিরতা। স্বাধীন প্রেম— একই সঙ্গে দুলছে, ধাক্কা খাচ্ছে, বারে বারে ছুঁয়ে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। অনসূয়ার দ্বিধা, সেতো নবনাট্যেরই দ্বিধা ; ভৃগু-অনসূয়ার প্রেম-প্রত্যাখ্যান, পরিণয়, সেতো দুই বাংলার যোগ-বিচ্ছেদ-পূর্ণমিলন।[১৪]

শৈবাল চৌধুরী তাঁর 'চলচ্চিত্রের পটভূমিকায়' কোমল গান্ধারকে দেখেছেন এ ভাবে :

কোমলগান্ধারে দুটুকরো বাংলা উঠে এসেছে অন্যভাবে। যুবক ভৃগু আর যুবতী অনসূয়া দেশভাগের সৃষ্ট যন্ত্রণা থেকে আশ্রয় খোঁজে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। কিন্তু সেখানেও তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, স্বার্থান্বেষণ, চক্রান্ত, দলাদলি, কোন্দল এবং তার কুপরিণতি ভাঙ্গন। গণনাট্য সংঘের ও কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপটে দেশভাগের বিপর্যয় চিত্রায়িত করেছেন ঋত্বিক এখানে। ঋত্বিক-বিশেষজ্ঞ ড. বাঁধন সেনগুপ্তের মতে, 'এই ছবি নির্মাণের পরিকল্পনার পিছনে মানব জীবন তথা বাংলা ভাগের পরিণতি এবং ট্রাজেডীর ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।' আর ঋত্বিকের কথায় : 'চারপাশের যে দ্বিধা, যে ভাঙ্গন আমি জানি তার মূল হচ্ছে ভাঙ্গা বাংলা। কোমল গান্ধারে আমার সমস্যা কাহিনীর তিন স্তরের বিবরণ। আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধা বিভক্ত বাংলাদেশের মর্মবেদন, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। এ ছবির নায়ক ভৃগু দেশ ভাগের কারণে ছিন্নমূল যুবক যে তার শিল্প-সাধনার বিপর্যয়ে কাতর আর নায়িকা অনসূয়া যে সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতায় মাকে হারানোর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, এরাতো আমরাই। বাইরের কেউতো নয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুরভিসন্ধির ফলে ক্ষত-বিক্ষত বাংলা, আর সেই দুর্গতির কুফল সাম্প্রদায়িকতা, আশ্রয়হীনতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, বিশ্বাসহীনতা এবং সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা— তারই চিত্রায়ণ কোমল গান্ধার'।[১৫]

'কোমল গান্ধার'-এর পরে ঋত্বিক নির্মাণ করেন 'সুবর্ণরেখা'—রাধেশ্যাম ঝুনঝুন-ওয়ালার চুম্বক গল্প অবলম্বনে।

সুবর্ণরেখা

প্রলয় শূর তাঁর 'রাজনৈতিক সিনেমার রাস্তা ও ঋত্বিক' প্রবন্ধে বলেছেন :

দেশভাগের মতো একটা বিষয়, এই বাস্তুহারা সমস্যার মতো একটা বিষয় নিয়ে মহৎ উপন্যাস রচনা করার জন্য দরকার একজন টলস্টয়। এদেশে টলস্টয় কোথায়? এই বিষয়টা ঋত্বিকই এনেছেন তাঁর ছবিতে, 'সুবর্ণরেখা' সেই বিস্ময়কর ছবি, যা হবার কথা ছিল আমাদের উপন্যাসে এবং যা হয়নি, আমাদের সিনেমায় অর্থাৎ ঋত্বিকের ছবিতে তা হয়েছে, সাংস্কৃতিক মিলনের কথাটা এসেছে তাঁর রাজনৈতিক বোধ থেকে।[১৬]

'সুবর্ণরেখা' ঋত্বিকের এক অসাধারণ সৃষ্টি— তাঁর চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাবের পরিমাপ করতে গেলে এই চলচ্চিত্রটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া চলবে না। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের ফলে পূর্ব বাংলা থেকে হাজার হাজার হিন্দু ধর্মাবলম্বী পশ্চিম

বাংলায় চলে যেতে বাধ্য হয়। ওখানে গিয়ে বিভিন্ন রিফিউজী কলোনীতে তাদের থাকতে হয়— এরকম একটি কলোনীর জীবন-যাত্রা থেকেই শুরু হয় সুবর্ণরেখার কাহিনী :

> বাস্তুচ্যুত মানুষগুলো বাসা বেঁধেছে রিফিউজী কলোনীতে। ঈশ্বরের (ছবির একটি প্রধান চরিত্র) নেতৃত্বে দিন কাটে সুখে-দুঃখে-সংগ্রামে। একদিন ঈশ্বর চলে যায় বাইরে কাজ পেয়ে, সুবর্ণরেখার তীরে। সংসারে বোন সীতা, অন্ত্যজ অভিরাম। এক সঙ্গে বড় হয়, খেলা, গান, সংলাপ। খুশী হয় রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ খোয়াই, আশ্চর্য কোমল নদীর সান্নিধ্যে। ভয় পায় বহুরূপীকে দেখে কিংবা পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টের বিভীষিকায়। বড়ো হয়। সীতা-অভিরাম ভালবাসে পরস্পরকে। ঈশ্বর এখন উচ্চপদস্থ, তার মর্যাদায় বাধে। বাধা দেয়। ওরা চলে আসে কলকাতায়, বিয়ে করে নতুন ঘর বাঁধে। কিন্তু ঘর আবার ভেঙ্গে যায়, অভিরাম দুঘর্টনায় নিহত হয়। শিশুপুত্রকে বাঁচাতে সীতা হয় দেহব্যবসায়িনী। ঈশ্বরও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বন্ধুর সঙ্গে ফূর্তি করতে শহরে আসে, বার থেকে বারবণিতালয়ে— সীতা। আর্ত কান্নায় কঁকিয়ে ওঠে ঈশ্বর, কাটারী দিয়ে আত্মহত্যা করে সীতা। মা-বাপ হারা শিশুটির হাত ধরে সুবর্ণরেখার তীর ধরে দিগন্তের অভিমুখে হাঁটতে থাকে ঈশ্বর। উদ্বাস্তু থেকে বসতি, বসতি থেকে উদ্বাস্তু।[১৭]

সংক্ষেপে এই হল সুবর্ণরেখা-র কাহিনী। ঋত্বিক তাঁর 'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে' এক নিবন্ধে লিখেছেন :

> ... যা আমি ছবিটির মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, তা হচ্ছে, আজকের বাংলাদেশের (তৎকালীন পশ্চিম বাংলার) অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের কথা। যে বিশাল সংকট আস্তে আস্তে একটা দানবের রূপ পরিগ্রহ করেছে, '৪৮ থেকে '৬২ সালের পরিধির মধ্যে, সেটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই সংকটের প্রথম বলি হচ্ছে আমাদের বোধশক্তি। সেই শক্তি ক্রমশ অসার হয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে, আমি সেটাকেই ঘা দিতে চেয়েছিলাম। ... প্রত্যক্ষ স্তরে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তু সমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না—ঐ কথাটির সাহায্যে আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এই ভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই অন্বিষ্ট, ছবিতে হরপ্রসাদের মুখের সংলাপে, (আমরা বায়ুভূত, নিরবলম্ব) কিংবা ছবির প্রথমেই এসে একজন্ন কর্মচারীর মুখে, 'উদ্বাস্তু! কে উদ্বাস্তু নয়?' এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে।[১৮]

'সুবর্ণরেখা'র সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দেশ-বিভাগ ও '১৯৪৭-এর প্রদত্ত স্বাধীনতার কারণে বহুধা বিভক্ত দেশ, দ্বিধাবিভক্ত জাতি এবং তার ফলে সৃষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক যে বিচ্ছৃঙ্খলা, শঠতা, বঞ্চনা আর অস্থিরতা তারই পৌনঃপুনিক প্রকাশ ঘটেছে ঋত্বিকের বেশির ভাগ চলচ্চিত্রে'। 'সুবর্ণরেখা'র সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা মানে চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্বের (Sociology of Film)

অন্বেষণ করা। আর এই কাজটি কার্ল ম্যানহাইমের সংস্কৃতির সমাজতত্ত্বের আলোকে করা যায়। সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব নির্ণয় করতে হলে যে চারটি দিকের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার, সেই চারটি দিক ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করবো। 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। গুরুদাস ভট্টাচার্য 'সুবর্ণরেখা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন :

> এ ছবিতে বাস্তবের ও তন্নিষ্ঠ চিন্তার একাধিক স্তর আছে ...। 'সুবর্ণরেখা' সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের নেমিচক্রে, রাজনীতির দাবাবরে হয়ে যে সব নির্লিপ্ত মানুষ চলে আসতে বাধ্য হল সাতপুরুষের ভিটে, কালানুক্রমিক জীবিকা, আর পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে, তারপর নতুন করে ঘর বাঁধার লড়াই শুরু করল, তাদের কয়েকজনকে কেন্দ্র করে পরিচালক এ কালের জীবন ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি প্রকাশ করেছেন, ঘটনা ও চরিত্র উভয় দিক থেকে। ফুটে উঠেছে বর্তমান পরিবেশ ও তদন্তর্গত জীবন সংগ্রাম, বাঁচবার দুরন্ত প্রচেষ্টা। এ চেষ্টা কোথাও দল বেঁধে, কোথাও দলছুট একাকিত্বে. কোথাও পারিবারিক ঐক্যে. কোথাও বা সেই ঐক্যের অনিবার্য ভাঙনে।[১৯]

ম্যানহাইম সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব নির্ণয় করার লক্ষ্যে প্রথম যে দিকটি নির্দেশ করেছেন, তা হল সেই সংস্কৃতি চর্চাকারী সমাজের জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থা সম্যকভাবে জানা। 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটিতে যে সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে, তারা প্রায় সবাই উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পশ্চিম বাংলার সমাজ-কাঠামোর এমন একটা স্তরে গিয়ে জায়গা পায়, যাকে নিম্নবিত্ত শ্রেণী বলে আখ্যায়িত করা যায়। নিম্নবিত্ত তবে ভাসমান— যদিও এই উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের কেউ কেউ সরকারের খাস জমি দখল করে কলোনী বানিয়ে নতুন বসতি গড়ে তোলে। 'সুবর্ণরেখা'তেও দেখা যায় যে, দেশ-ভাগের বলি উদ্বাস্তুরা 'নবজীবন কলোনী' নাম দিয়ে জায়গা দখল করে নতুন বসতি গড়ে তোলে। এই কলোনীতেই ঈশ্বর তার বোন সীতাকে নিয়ে থাকে। সকল উদ্বাস্তু যাতে একসাথে থাকতে পারে, সেইজন্য সংগ্রাম করে। কিন্তু একদিন তার এক পুরোনো বন্ধুর ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরির আহবান পেলে, ঈশ্বর তার বোন সীতা ও মা-বাপ হারা অভিরামকে নিয়ে ছাতিমপুরে চলে যায়। গুরুদাস লিখছেন :

> নবজীবন কলোনীর অন্যতম যোদ্ধার সামনে যখন লোভনীয় চাকরির হাতছানি, তখন থেকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত... উদ্বাস্তু ঈশ্বর ও ম্যানেজার ঈশ্বর, নবজীবন কলোনী ও ছাতিমপুর বাংলোর মধ্যে ক্রমদূরত্ব। তারপরে, সমষ্টিবিরোধী ব্যষ্টিচেতনা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব তো শুধু বাইরে নয় ভেতরেও— প্রতিষ্ঠার মোহে ঈশ্বর পিছন ফিরে তাকায় না, সমষ্টির কথা ভাবে না ... আপন মানুষ সরে গেল দূরে। তারাও কি সুখ-শান্তি পেল? হরপ্রসাদের, ঈশ্বরের, আর সকলের মত, তারাও পরিবেশের হাতে নিয়ত নিহত, বাস্তবের অশান্ত স্রোতে বিপর্যস্ত, নিরবলম্ব বায়ুভূত... পরাজিত। সীমান্তের ওপারে যে বাড়ি হারিয়ে গেল, কোন পারেই তা আর মিললো না।[২০]

ম্যানহাইম দ্বিতীয় যে দিকটির কথা বলেছেন, অর্থাৎ ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে

সেই বিশেষ সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তি 'নিজেকে কিভাবে জড়িত করে', তার 'পেশাজাত উদ্দেশ্য', 'আত্মীয়তার সম্পর্ক', 'অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা' ইত্যাদি কিভাবে ক্রিয়া করে, তা সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব নির্মাণ করতে হলে জানা দরকার। এখানে ঈশ্বরের উদ্বাস্তু জীবন যে ভাবে এগিয়ে যায়, তার যে সমাপ্তি— তার মধ্যে ম্যানহাইম কথিত দ্বিতীয় দিকটির সব কটিই ক্রিয়া করতে দেখা যায়।

'সুবর্ণরেখা'-য় সমকালীন বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটেছে। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> সুবর্ণরেখা আমাদের অনেককেই ভয়ানক চমকে দিয়েছিল— তাঁরা একটা সত্যের ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছিলেন এই ছবিতে পরিণত শিল্পের রূপে। ... স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের মত একটি প্রচণ্ড বাস্তবতাকে রূপদানের দুঃসাহস ও সৎ চেষ্টা ছিল এই ছবি যেখানে উদ্বাস্তু মানুষের পুরনো মূল্যবোধগুলি সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে অসহনীয়তার মধ্যে। ঈশ্বর যখন তার বোনকে আবিষ্কার করলো জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন দেহোপজীবী রূপে সেই মুহূর্তটি কি অসামান্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভাস্বর নয়? আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের আদি বসবাসী, এমনকি তারাও এক অর্থে উদ্বাস্তু নই? মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ থেকে উদ্বাস্তু আমরাও কি জীবনের পথে এক-একবার সেই ভয়ঙ্কর সংকটের মুহূর্তে উপনীত হচ্ছি না, এবং আবিষ্কার করছি ন আমাদের সত্য-সীতা জীবন যুদ্ধে পরাজিত আত্মসমর্পিত একটি বিক্রিত সত্তা?[২১]

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই ছবির আলোচনা করতে গিয়ে উদ্বাস্তু মানুষের মূল্যবোধের সংকট নিয়ে কথা বলেছেন— পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের ভাঙনের প্রসঙ্গও এনেছেন। মূল্যবোধ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মানসিকতা ইত্যাদি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুবর্ণরেখার চরিত্ররা উদ্বাস্তু হলেও পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-কাঠামোর একটি স্তরে জায়গা করে নেয়। এবার সেই স্তরের আলোচনায় আসা যাক।

সমাজ-কাঠামো

'সুবর্ণরেখা'র উদ্বাস্তু চরিত্ররা সমাজ-কাঠামোর একটি অংশে পরিণত হয়। ছোট ছোট দল, বড় বড় সংঘ, সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়েই সমাজ-কাঠামো গড়ে ওঠে। এমনটাও বলা হয়ে থাকে যে, 'A social structure is an organized system of social relations'. সমাজ-কাঠামোর আলোচনা ছাড়া 'চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব' দাঁড় করানো অসম্ভব। সমাজ-কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সামাজিক স্তরবিন্যাস। সামাজিক স্তর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই যে-কোন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী কিভাবে অবস্থান করছে, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর গুরুত্ব কতটুকু তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সমাজের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস উদ্ভূত হয়। সমাজ-কাঠামো যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি সামাজিক স্তর বিন্যাসও চিরন্তন কিছু নয়। সমাজ-কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভেতর একটা পারস্পরিক ক্রিয়া বিদ্যমান। 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটির চরিত্রদের বুঝতে হলে

একদিকে তারা যে সামাজিক স্তরে অবস্থান করছে, তা যেমন বোঝা দরকার, অন্যদিকে তারা তৎকালীন পশ্চিম বাংলার যে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে জায়গা করে নেয়, তাও জানা প্রয়োজন। মার্কস-এর মতে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থানকে বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ফেলেই চিহ্নিত করা উচিত।[২২]

'সুবর্ণরেখা'র প্রধান পুরুষ চরিত্র ঈশ্বর— উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাংলায় 'নবজীবন কলোনী'তে আশ্রয় নেয়। পশ্চিম বাংলার সামাজিক কাঠোমোর একটা স্তরে জায়গা করে নেয়— যেখানে একটা social stratum- এর যে-সমস্ত objective criteria থাকা দরকার তার সব ক'টি সে পূরণ করতে পারে না। তাই চাকরি খুঁজতে বের হয় এবং কলেজের পুরনো বন্ধু অবাঙালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের মাধ্যমে চাকরি পায়। আয়ের সংস্থান হয়, ক্ষমতা বাড়ে, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, অভিরামের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় ইত্যাদি। কিন্তু শেষ অব্দি টিকতে পারে না।

এক বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিম বাংলায় যাওয়ার ফলে সেখানকার সামাজিক স্তরবিন্যাসে যেমন পরিবর্তন সাধিত হয়, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক কাঠামোতেও এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[২৩] বাংলা-ভাগের সময় পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাংলায় যারা অভিবাসিত (migrated) হয়, তারা সেখানকার সমাজ-কাঠামোতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে, পশ্চিম বাংলা, বিহার তথা ভারত থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব বাংলায় এসে আশ্রয় নেয়, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম অধ্যুষিত সমাজে নগরায়ণ প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়।[২৪] দেশ ভাগের ফলে উভয় বাংলায় সামাজিক স্থানান্তর (social mobility) ঘটে। প্রফেসর রংগলাল সেনের মতে পূর্ব বাংলায় দেশ ভাগের ফলে অবাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে প্রধানত উদ্বাস্তুদের দ্বারা কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যেহেতু বহু পুর্ব থেকেই একটি শক্ত বুর্জোয়া শ্রেণী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তাই পূর্ব বাংলা থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে সেখানে যায়, তাদের বহু কষ্ট করে সেখানকার সমাজ-কাঠামোতে জায়গা করে নিতে হয়। 'সুবর্ণরেখা'তে ঈশ্বরকে দেখে আমাদের সেই ধারণাই জন্মায়। 'সুবর্ণরেখা'র সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে হলে যে প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করা দরকার বলে মনে করছি, সে গুলো হচ্ছে : social structure, social stratifiction, accommodation, acculturation, assimilation, alienation, suicide, myth ইত্যাদি। সুবর্ণরেখার কোন-না- কোন পর্বে এই প্রত্যয়গুলোকে ক্রিয়াশীল অবস্থায় পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে আমরা সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার অন্য পদগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

উপযোজন

যে-সমস্ত আচরণ বা কার্যাবলী দ্বারা মানুষ তার পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ায় ঐ সকল আচরণ বা কার্যাবলীকে বোঝাবার জন্য মনস্তত্ত্ববিদ James Mark

Baldwin সর্ব প্রথম উপযোজন (accommodation) পদটি ব্যবহার করেন। উপযোজন হলো সামঞ্জস্য বিধান বা খাপ খাওয়ানো, যা মানুষ সামাজিক সূত্রে অর্জিত আচরণ কিংবা নতুন কোন আচরণ গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। ... Park এবং Burgress দু'টি প্রধান ধরনের উপযোজনের উল্লেখ করেছেন ; (ক) নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান এবং (খ) নতুন সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান। ... দ্বিতীয় ধরনের অভিযোজন দ্বারা নবতর সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোকে বোঝায়। এক কথায় একে দেশজকরণ (naturalization) বলা যেতে পারে।[২৫]

সুবর্ণরেখা-য় চরিত্ররা কি নবজীবন কলোনী, ছাতিমপুর বা কলকাতায় নিজেদের 'দেশজকরণ' করতে পেরেছে ? প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিণতি লক্ষ করলে দেখবো যে, তারা তা পারেনি। এক সামাজিক পরিবেশ থেকে উৎখাত হয়ে অন্য সামাজিক পরিবেশে তারা সামঞ্জস্যবিধান করতে সক্ষম হয়নি। তাই তো নবজীবন কলোনীর উদ্বাস্তু হরপ্রসাদের বউ, ছেলে-মেয়েদের রেখে আত্মহত্যা করে ; ঈশ্বর ছাতিমপুরে ম্যানেজার হয়েও আত্মহত্যা করতে যায় ; সীতা পতিতায় পরিণত হয় এবং শেষে আত্মহত্যা করে। সবগুলো চরিত্রই উদ্বাস্তু—উদ্বাস্তু মানসিকতাই কি 'নবতর সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে' খাপ খাওয়ানোতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়? নাকি পশ্চিম-বাংলার সামাজিক-কাঠামোই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে অপারগ ছিল? অন্যদিকে, যারা পশ্চিমবাংলা বা বিহার বা ভারতের অন্যত্র থেকে পূর্ব বাংলায় আসে— তারা কিন্তু খুব সহজেই পূর্ব বাংলার সমাজ-কাঠামোতে জায়গা করে নেয়। এমনকি তারা এই অঞ্চলে এলিট শ্রেণীতেও পরিণত হয়। রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সমাজের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বও দেয়। পক্ষান্তরে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা পশ্চিম-বাংলায় গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। এমনও দেখা গেছে দুই তিন জেনারেশন ধরে উদ্বাস্তুদের কোন কোন পরিবার রেলস্টেশন বা ফুটপাথে কাটিয়ে দিয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল। মোটা দাগে আমরা উদ্বাস্তুদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণী। উচ্চবিত্তদের মধ্যে জমিদার (উপস্থিত এবং অনুপস্থিত), ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মধ্যবিত্তদের মধ্যে উকিল, শিক্ষক, দোকান-মালিক প্রমুখ এবং নিম্নবিত্তদের মধ্যে কৃষক ও স্বল্প আয়ের শ্রমিকশ্রেণী পড়ে। এদের মধ্যে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ই বেশি সংখ্যায় উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়— কেননা এক্ষেত্রে তারা forced migration-এর শিকার হয় বেশি।

উচ্চবিত্তের দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলার সমাজ-কাঠামোতে মিশে যায় সহজেই। মধ্যবিত্তদের একটা অংশ তাদের স্ব-শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়ে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের একটা সুবিধা ছিল এই যে, তারা পশ্চিম বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মুসলমানদের সাথে তাদের জায়গা, বসতবাড়ি, দোকান-পাট ইত্যাদি বদল করতে সক্ষম হয়। তাই, এই দুই শ্রেণী 'নতুন সামাজিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান'

করতে সক্ষম হয় ; 'নবতর সামাজিক রীতিনীতি, লোকাচার সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে' এবং 'দেশজকরণের সঙ্গে' খাপ খাওয়াতে পারে। দেশজকরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু নিম্নবিত্তের উদ্বাস্তু মানুষেরা তা পারে না। অবশ্য মধ্যবিত্তদের সবাই যে দেশজকরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেরেছে বা সমাজ-কাঠামোতে জায়গা করে নিতে পেরেছে— তা কিন্তু নয়। তাই তো সুবর্ণরেখা-র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের উদ্বাস্তুরা 'ঘর' খুঁজে বেড়ায় শুধু, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। গুরুদাস লিখেছেন, "সুবর্ণরেখার মানুষগুলি চেয়েছে বাসা বাঁধতে, স্থাবর হতে, আর কেবলই বাসা বদল করেছে, ... জঙ্গম হয়েছে, শেষে পা রেখেছে সেই দিগন্তে, যেখানে সুবর্ণরেখা-র নিরবধি গতি, যেখানে তার তীরে নতুন বাড়ির ইশারা..." ।[২৬]

সংস্কৃতিকরণ

সংস্কৃতিকরণ (সাংস্কৃতায়ন) হচ্ছে 'আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় কোন সমাজ বা সংস্কৃতি অন্য সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করে। ... সাধারণত উন্নত মানের সংস্কৃতি নিম্নমানের সংস্কৃতিকে তিনভাবে প্রভাবিত করে, উন্নত সংস্কৃতির কিছু উপাদান গ্রহণ করে, কিছু বর্জন করে এবং দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য কিছু সংশোধন করে গ্রহণ করা হয়। ... তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এবং উন্নয়নকামী সমাজ উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ার নামই সাংস্কৃতায়ন।[২৭]

সাংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া দেশ-ভাগের পর উভয় বাংলাতেই ঘটেছে—উভয় বাংলাই যেহেতু শ্রেণী-বিভক্ত এবং সব শ্রেণী থেকেই যেহেতু বাস্তুত্যাগ ঘটেছে, তাই সাংস্কৃতায়ন সব শ্রেণীতেই ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। তবে, যেহেতু 'তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া অনুন্নত এবং উন্নয়নকামী সমাজ উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করে', তাই, বলা যায় যে, পশ্চিম বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি অনেক উপাদান গ্রহণ করে থাকবে। কেননা, তখন পশ্চিম বাংলাই ছিল বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র। শিক্ষা, ব্যবসা, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চিম বাংলা অনেকদূর এগিয়ে ছিল পূর্ব বাংলা থেকে। সেই জন্য পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। উচ্চ ও মধ্যবিত্তের কোনো কোনো পরিবার হয়তো সেখানকার অর্থনৈতিক অঙ্গনে জায়গা করে নিয়ে পুঁজি বাড়িয়েছে, কিন্তু অন্য কোন ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিম বাংলায় গিয়েছিল, তারা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, কোন ক্ষেত্রেই সেখানে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়নি। বলা চলে যে, পশ্চিম বাংলার উন্নতমানের সংস্কৃতির কাছে পূর্ববাংলার সকল শ্রেণীর উদ্বাস্তুই আত্মসমর্পণ করে।

পক্ষান্তরে, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে যারা তৎকালীন পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে আসে, তারা সেখানকার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয় তাদের অধিকাংশই অবাঙালি উদ্বাস্তু। সরকারিভাবেও তাদের সহায়তা দেয়া হয়।[২৮] এই অবাঙালি উদ্বাস্তুরা এখানকার সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি—বরং তাকে আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পাল্টে দিয়েছে। সরকারী সহায়তা ও উদ্যোগী ব্যবসায়ী মনোভাব এবং উন্নত একটি অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে আসার কারণে অবাঙালি উদ্বাস্তুরা এদেশে প্রাথমিক পর্যায়ে কোন বড় ধরনের 'সাংস্কৃতিক সংঘাত'-এর মুখোমুখি হয়নি। কিন্তু এদেশ থেকে যারা পশ্চিম বাংলায় গেছে, তাদের সাংস্কৃতিক সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে— কারণ তারা অনুন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে গিয়ে পড়ে। 'সুবর্ণরেখা'র চরিত্রদেরও আমরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক সংঘাতের মধ্যে পড়তে দেখি। 'সুবর্ণরেখা'র চরিত্ররা "প্রাণরক্ষার দুরূহ সংগ্রামে, নানামুখী সংঘাতে, জীবনের ধারা বক্র, মন তির্যক, পুরনো ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-বাসনা, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ভাঙনের মুখে; নীড়ের হাতছানি অথচ আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নবিলাস বারবার ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে বিশ্বাসকে, এষণাকে ; ঐক্যবদ্ধ মানুষ একলা হয়ে উঠছে। বিক্ষোভ, বিচ্ছিন্নতা. বিভ্রান্তি অবেশেষ বিনষ্টি। ঈশ্বরের চোখের সামনে সীতার মুখ তাই কেবলি অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, স্পষ্ট থেকে অস্পস্ট হয়ে যায়। চশমা গুঁড়য়ে যায় ভোগের পদতলে, আদর্শ গুঁড়িয়ে যায় পলায়নী মনোবৃত্তির অতিচাপে। শেষ পর্বে পরিচালক নতুন করে লড়াই আরম্ভের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, তবু অবসাদ, বিষণ্নতা, অসহায় আশাহীনতা, ফ্রাসট্রেশন ও ডিসইনট্রিগেশনের সুর সচেতন চিত্তকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে থাকে"।[২৯]

আত্তীকরণ

আত্তীকরণ "পদটি দ্বারা একটি সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে যেখানে বহিরাগত একটি সংখ্যালঘু বর্ণগোষ্ঠী বৃহত্তর (dominant) সংস্কৃতির মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাস ও উত্তরোত্তর অংশগ্রহণের ফলে ঐ বৃহত্তর সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হয়ে যায়। ...সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রায়শ আত্তীকরণের পূর্বে সংস্কৃতিকরণ সংঘটিত হয়ে থাকে। ...সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রায়শ আত্তীকরণের হার ও গতি কতকগুলো সামাজিক উপাদানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে কিছু কিছু উপাদান আত্তীকরণকে সহায়তা করে এবং কিছু তাকে বাধা দেয়। গিলিন ও গিলিন কর্তৃক তালিকাভুক্ত সহায়তাকারী উপাদানগুলো হলো : সহিষ্ণুতা, সম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, লঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতি গরিষ্ঠদের সহানুভূতিশীল মনোভাব, গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ সংস্কৃতির মধ্যে সাদৃশ্য এবং সংযুক্তি (amalgamation) কিংবা আন্তর্বিবাহ। পক্ষান্তরে, বাধাদানকারী উপাদানসমূহ হলো : বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন রীতি, লঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতি গরিষ্ঠ গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি, দু'টি গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জাতিগত (ক্ষেত্রে) বিস্তর ব্যবধান এবং গরিষ্ঠ গোষ্ঠী কর্তৃক লঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতি নিপীড়ন ইত্যাদি।"[৩০]

'সুবর্ণরেখা'-য় আত্তীকরণের উভয় দিক অর্থাৎ 'সহায়তা' ও 'বাধা' দুটোই প্রত্যক্ষ করি। ছবির শুরুতেই আমরা দেখি যে নবজীবন কলোনীর যুবকেরা পালা করে রাতে পাহারা দেয়। কেননা বাইরে থেকে হামলা হতে পারে। একদিন ট্রাক এসে জোর করে উদ্বাস্তুদের ক'জনকে তুলে নিয়ে যায়— অভিরামের মাকেও তুলে নিয়ে যায়। 'গরিষ্ঠ গোষ্ঠী কর্তৃক লঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর প্রতি নিপীড়ন' চলে।

তাছাড়া, 'সুবর্ণরেখা'র চরিত্রেরা উদ্বাস্তু হবার কারণে এক ধরনের 'বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন রীতি'তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ঈশ্বর তার নিজস্ব গোষ্ঠী ছেড়ে ছাতিমপুরে একলা হয়ে যায়, সীতাও অভিরামকে বিয়ে করে কলকাতায় এসে বিচ্ছিন্ন জীবনই যাপন করে এবং এক পর্যায়ে অভিরাম ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে যখন মারা যায়, সীতা তখন তার শিশুপুত্র বিনুকে বাঁচাবার জন্য পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তখন তো সে স্বাভাবিক জীবন থেকেই দূরে সরে যায়।

আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় "একদল মানুষের সৃষ্টি হয় যারা নব্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে এবং পুরনো সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারে না। সাধারণত দ্বিতীয় পুরুষে এ জাতীয় ঘটনা ঘটে থাকে। যখন ব্যক্তি নব্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে তখন সে তার পুরনো সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যায়। অথচ নব্য সংস্কৃতি তখনো তাকে সম্পূর্ণভাবে আপন ভেবে গ্রহণ করে না। দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েনের ফলশ্রুতি এই ব্যক্তিবর্গকে পার্ক (Park) প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব (marginal personality) নামে অভিহিত করেছেন।"[৩১]

ঈশ্বর, হরপ্রসাদ— এদের মধ্যে আমরা এই 'প্রান্তিক ব্যক্তিত্ব' লক্ষ করি। এরা নব্য-সংস্কৃতির ভেতর নিজেদের মানিয়ে নিলেও, নব্য-সংস্কৃতি তাদের সম্পূর্ণভাবে আপন ভেবে গ্রহণ করে না। তাই তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয় এবং দ্বিতীয় পুরুষে এসেই আত্মহননের ঘটনাগুলি ঘটে। 'সুবর্ণরেখা'র কাহিনী শুরু হয় দেশভাগের পর থেকেই অর্থাৎ ১৯৪৭-এর পরবর্তী পর্যায় থেকে। সীতার বয়স তখন ৭-৮। যখন সে দা দিয়ে নিজের গলা কুপিয়ে আত্মহত্যা করে, তখন তার ৭-৮ বছরের ছেলে আছে, মাঝখানে অন্তত ২০ বছর পার হয়ে গেছে। তাহলে, বলা যায, সুবর্ণরেখার কাহিনীর সময়সীমা ২০ বছরের কাছাকাছি। এই বিশ বছরের মধ্যেও দেখলাম যে, উদ্বাস্তুরা আত্তীকরণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে পারেনি। উদ্বাস্তু মানসিকতাই কি এর জন্য দায়ী? নাকি নব্য সংস্কৃতির সাথে পুরনো ফেলে আসা সংস্কৃতির টানাপোড়েন দায়ী?

বিচ্ছিন্নতা

'সুবর্ণরেখা'র চরিত্রদের আত্তীকরণ না করতে পারার সব চেয়ে বড় কারণ বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের শুরু তো যেদিন তাদের 'সাত পুরুষের ভিটে, কালানুক্রমিক জীবিকা আর পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে' উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হয়েছিল, সেদিন থেকেই। শুধুমাত্র ধর্ম আলাদা বলেই তাদের বাস্তুহারা হতে হলো—

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করা হলো! এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দাঙ্গা বাধিয়ে জোর করে দেশছাড়াও করা হলো। সেই নিজ দেশত্যাগী উদ্বাস্তুরা তো বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হবেই। 'সুবর্ণরেখা'র চরিত্ররা তাই পশ্চিম বাংলার পটভূমিতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক :

> সাধারণভাবে বিচ্ছিন্নতা বলতে একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নির্দেশ করে যেখানে একজন ব্যক্তি তার সামাজিক অস্তিত্বের কতিপয় দিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে। ... সিম্যান (Seeman) নিম্নলিখিত বিভিন্ন অর্থে বিচ্ছিন্নতা প্রত্যয়টি প্রয়োগ করেন। যেমন: (ক) 'কর্তৃত্বহীনতা'—যখন ব্যক্তি মনে করে যে তার বর্তমান মানসিক অবস্থার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, (খ) 'অর্থহীনতা'— যখন ব্যক্তি অনুভব করে যে তার বিশ্বাস ও আচরণের কোন সার্থকতা নেই, (গ) 'আদর্শহীনতা'— যখন ব্যক্তির ধারণা হয় যে লক্ষ্যার্জনের জন্য অবৈধ পথই একমাত্র উপায়, (ঘ) 'সম্পর্কহীনতা— যখন ব্যক্তি সামাজিক উদ্দেশ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, এবং (ঙ) 'আত্ম-সংযোগহীনতা'— যখন ব্যক্তি আত্মসন্তুষ্টিমূলক কোন আচরণ-কর্ম খুঁজে পায় না।[৩২]

আমরা ঈশ্বর চরিত্রটি ব্যাখ্যা করলে দেখবো যে, চরিত্রটি সব সময়ই বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার। সে যে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, একথা সে কখনোই ভুলতে পারে না। কারণ, যে পরিবেশে সে এসে পড়েছে, তা তার চিরকালের চেনা পরিবেশ নয়। গুরুদাস ভট্টাচার্য ঈশ্বর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন :

> পরিবেশে স্থিত চিত্ত যখন স্বাস্থ্যবান, তখন সজ্ঞান ও অসজ্ঞানে সুস্থ ভারসাম্য, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আর, যখন পরিস্থিতির অভিঘাতে বা আন্তর কারণে চিত্ত অস্বাভাবিক বিপর্যস্ত, তখনই বাধে উভয়ের দ্বন্দ্ব, যার ফল মানসিক সংঘর্ষ ও বিক্ষিপ্তি, বিচ্ছিন্নতা ও অবদমন ; ব্যক্তিচিত্তের অধুনা আত্মস্বাতন্ত্র্য ও আদিম সামষ্টিকতা প্রকট হয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। সামষ্টিকতা দেয় গোষ্ঠীচেতনা, স্বাতন্ত্র্য দেয় ব্যক্তিত্ব, বিপর্যাসে উভয়ে পরস্পর বিপ্রতীপ। ঈশ্বর চরিত্রে এই বিপ্রতীপের সংঘর্ষ আদ্যন্ত। কলোনীতে সে গোষ্ঠীভাবনায় উদ্বুদ্ধ, কিন্তু ছাতিমপুরে এসে মন বদলে গেল, ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠায় বহুর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হল ; অথচ বহুর প্রয়োজনে সৃষ্ট নীতি-বিধানকে পরিত্যাগ করল না। অভিরাম-সীতার বিবাহে তার বাধাদানের প্রাথমিক কারণ— চাকরির উন্নতি এবং সামাজিকতার আনুগত্য। চাকরির প্রয়োজনে সে সমাজকে পরিত্যাগ করে, অথচ বিয়ের ব্যাপারে সেই সমাজেরই দোহাই দেয়। ফলে, অচিরেই মানসিক সংঘর্ষ ও সংকটে আক্রান্ত হয়, বিচ্ছিন্ন হয় পরিবেশ ও আপনজনের সান্নিধ্য থেকে।[৩৩]

সিম্যানের স্বতঃসিদ্ধগুলির প্রত্যেকটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সীতা, হরপ্রসাদ প্রত্যেকের বেলায় স্বতঃসিদ্ধগুলি প্রয়োগ করে বিচ্ছিন্নতার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান সম্ভব। বিচ্ছিন্নতার কারণেই প্রত্যেকটি চরিত্র আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

আত্মহত্যা

'সুবর্ণরেখা'য় সীতা দা দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করে ; হরপ্রসাদের স্ত্রী সমাজে টিকতে না পেরে আত্মহত্যা করে, ঈশ্বর সমাজ-আত্মীয়-পরিজন এবং সর্বোপরি নিজের কাছ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গলায় দড়ি ঝুলাতে গিয়েও পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে একটি চলচ্চিত্রে কেন এত আত্মহনন? আত্মহত্যা সম্পর্কে সুব্রত রুদ্র-এর মন্তব্য :

> মানুষ কেন আত্মহত্যা করে—এই জিজ্ঞাসা সভ্যতার প্রথম থেকেই সমাজে ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। মানুষ তার কোনো সমাধান খুঁজে পায়নি বলেই, এই ঘটনাকে সে অশুভ, অন্যায়, পাপ বলে চিহ্নিত করেছে। ধর্মের বিচারে, আইনের চোখে সামাজিক আচরণবিধি হিসেবে আত্মহত্যার উৎস যতই দুঃখজনক বা যন্ত্রণাদায়ক হোক—এই জীবনবিরুদ্ধ ঘটনাকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়নি। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আত্মহত্যা ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ... ফ্রয়েডের (Freud) ধারণায় মানুষের কামনা-বাসনা-ইচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মনে প্রচণ্ড সংক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং তা যদি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে (Aggression) আত্মপ্রকাশ করে,—তা চরম অবস্থায় দু'টি রূপে ফুটে ওঠে। এই ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গি যদি বাইরের দিকে প্রযুক্ত হয়, তখন সে পাত্র-পাত্রী অনুযায়ী হত্যা করে, আর যদি নিজের দিকে প্রযুক্ত হয়, তাহলে মানুষ আত্মহত্যা করে। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত এই যে, হত্যা ও আত্মহত্যা, আসলে একই মুদ্রার দু'টি দিক। ডুর্খাইম (Durkheim) আত্মহত্যাকে সামাজিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, তাঁর কাছে আত্মহত্যা আসলে একটি সামাজিক ঘটনা, তাঁর ধারণায় আত্মহত্যার কারণ বাইরের পরিবেশে খুঁজে পাওয়া যায়, ব্যক্তি-মানসের অন্তর্জীবনে নয়। সামাজিক পরিবেশে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হলে, তার গঠন শিথিল হয়, মানুষ সমাজের কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ; সমাজের বিধি, আচরণ, সামঞ্জস্য বিধান, প্রভৃতি বিষয়ে তার যোগসূত্র ক্ষীন হয়ে আসে। যে-সমাজে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ, অর্থাৎ পারস্পরিক যোগাযাগ ঘনিষ্ঠ এবং নানা সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় যুক্ত সে-সমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে শিথিল তথা ভঙ্গুর সমাজের আত্মহত্যার চেয়ে অনেক কম।[৩৪]

ডুর্খাইম তিন ধরনের আত্মহত্যার উল্লেখ করেছেন : পরার্থ আত্মহত্যা (altruistic suicide), আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (egoistic suicide) এবং আদর্শবর্জিত আত্মহত্যা (anomic suicide)। হরপ্রসাদের স্ত্রীর আত্মহত্যাকে আমরা 'আদর্শবর্জিত আত্মহত্যা' বলতে পারি। সমাজ ব্যবস্থা যখন মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আচার-আচরণকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ সমাজ-জীবনে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং আদর্শবর্জিত আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হরপ্রসাদের স্ত্রীও তাই করেছে। সীতার আত্মহত্যাকে 'আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা' বলা চলে—আপন বড় ভাই ঈশ্বরকে যখন একজন মাতাল খদ্দের হিসেবে নিজের ঘরে সে পায়, তখন আত্মহননের পথ বেছে নেয়া ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না। ঈশ্বরের আত্মহত্যার চেষ্টা এতো সোজা পথে এগোয়নি। ঈশ্বরের আত্মহত্যার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গুরুদাস লিখেছেন :

> ... ঈশ্বর ও সীতার সম্বন্ধ আদিম সৌর উপকথা তথা মাতৃকামের প্রতিলিপি ... আদিম কথায় অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে-বোন মায়ের স্থান গ্রহণ করেছে, অনেক ক্ষেত্রে বোন-মেয়ে মায়েরই প্রতিভূ। সীতাকেও বলতে শুনি 'আমি তো তোমার মা-ই' ... বস্তুত, সীতার প্রতি

> এই বিচিত্র মনোভাবই ঈশ্বরের চরিত্রে জটিলতা দ্বন্দ্ব-ভার-অসমতা ... অভিরাম তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সীতার প্রেমে আপত্তির এইটেই মুখ্য কারণ, বাইরের যুক্তিগুলি অবচেতনে অদমিত বাসনার বহিরঙ্গ তির্যক অভিব্যক্তি। তাই সে আজীবন কুমার, হরপ্রসাদের ভাষায় 'জীবনটাতো ব্রহ্মচর্য কইরা কাটাইলা'। তাই সে সীতার প্রেমেব সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, বলে, 'অন্যকিছু হওয়ার আগে আমি তোর মৃত্যু কামনা করি'; তার বিচ্ছেদে অস্থির অসহায়তায় 'আত্মহত্যা করতে যায়'।[৩৫]

অভিনিস্পত্তি

সমাজবিজ্ঞানের বেশ ক'টি পদ ব্যবহার করে 'সুবর্ণরেখা'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পর, মনে হচ্ছে এই পদগুলি চলচ্চিত্রটি এবং এর চরিত্র-ঘটনা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যেন যথেষ্ট নয়। এই পদগুলি মূলত মার্কিনী সমাজের অভিবাসীদের মনোভাব স্কেল করার প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মার্কিন মুলুকে যে-সব অভিবাসী গেছে, তাদের ওপর গবেষণা করার জন্য পদগুলি ঠিকই আছে— কিন্তু যারা বাংলা-ভাগের কারণে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের শিকার হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, নিঃস্ব-নিমজ্জমান উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়, তাদের মানসিকতা ও মনোভাব পরিমাপ করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ, যারা একক বা দলগতভাবে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে বসতির উদ্দেশ্যে স্ব-ইচ্ছায় যায়, তারা আসলে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য এবং উৎকৃষ্টতর জীবনোপযোগী পরিবেশ অনুসন্ধানের জন্যই যায়— তাদের মন-মানসকিতা থাকে একরকম। কিন্তু যারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়—তাদের মন-মানসিকতা থাকে অন্যরকম। যার প্রমাণ আমরা সুবর্ণরেখার চরিত্রদের মধ্যে পাই। তাই, আমার মনে হয়, বলপূর্বক যাদের উদ্বাস্তু বানানো হয়েছে, তাদের মনোভাব পরিমাপ করার জন্য এবং এর ফলে উভয় বাংলার সমাজ-কাঠামোর মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে, তা জানার জন্য কেইস স্টাডি কেন্দ্রিক তথ্য-নির্ভর ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক একটি গবেষণা-কর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন। উভয় বাংলা থেকে একদা যারা উদ্বাস্তু হয়েছিল, তাদের মধ্যে এই গবেষণা পরিচালনা করা যায়। যেখান থেকে নতুন কিছু পদ সমাজবিজ্ঞানে যোগ হতে পারে এবং এ ধরনের একটি গবেষণা যিনি করবেন, তার কাছে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রগুলি দেশভাগ ও তার পরিণতির একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা ঘটক দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা— সব কিছুর শিল্পিত উপস্থাপন তার চলচ্চিত্রগুলিতে করেছেন। এ সম্পর্কে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> ঋত্বিক একেবারে স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'এখন এদেশের যা অবস্থা সে অব্যবস্থা সমস্তই হচ্ছে ঐ great betrayal সেই সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার result।' এটাই স্বাভাবিক, তাঁর আদর্শের ভিতটা মূলত Marxism। ঐ চরম বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে মানুষের সে সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে গেল, একটা সমাজব্যবস্থা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো, ঋত্বিক একটা অন্ধ আবেগে তুলে আনলেন সেই নষ্ট সম্পত্তি, সেই কঠিন অসুখ। তাই তাঁর ছবিতে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গেই আসে তাঁর দর্শন, মনস্তত্ত্ব, বাঙালি ঐতিহ্য।[৩৬]

এ প্রশ্ন উঠতে পারে : ঋত্বিকের ছবি কতোটা বাংলা ভাগোত্তর সমাজ বাস্তবতার ছবি আর কতোটা সেই বাস্তবতার শিল্পিত ব্যাখ্যা? কতোটা physical reality তাঁর ছবি ধারণ করেছে আর কতোটা anti-realist হয়ে উঠেছে? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের দুই চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক Seigfried Kracauer এবং Rudolph Arnheim-এর চলচ্চিত্র-বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনা করতে হবে। ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কাজ হলে ঋত্বিক-চর্চা আরো বেশি ঋদ্ধ হবে।[৩৭]

ঋত্বিকের চলচ্চিত্র শুধু physical reality অথবা material life-কেই তুলে ধরেনি, real life এর বিভিন্ন দিক— mythology. দর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং বক্তব্যকে তুলে ধরেছে, দর্শককে ভাবতে বাধ্য করেছে। ঋত্বিক একথা ভালো ভাবেই বুঝতেন যে, "The cinema is a sublime art but, at the same time, it is the most effective means of direct inter-human communication."[৩৮]

আমরা লক্ষ করেছি, একটা প্রগাঢ় দায়িত্ব ও দায়বোধ থেকে ঋত্বিক চলচ্চিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। মূলত বাংলা-ভাগের পরবর্তী অবস্থা তাঁর কাজে মুখ্য হয়ে দেখা দিলেও, তিনি মানুষের সম্মিলিত যাত্রার নানা দিক নিয়ে ভেবেছেন, ভাবিয়েছেন। ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা বারংবার এসেছে এবং দুই বাংলার বিচ্ছেদীকরণ ঋত্বিকের চিন্তাকে আবিষ্ট, ব্যথিত ও পীড়িত করেছে। তিনি মানুষের সকল সমস্যার জন্য দেশভাগকে দায়ী করেছিলেন এবং এর জন্য তাঁকে সমালোচনারও মুখোমুখি হতে হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী ঋত্বিকের মধ্যে ইতিহাসচেতনার অভাব ছিল বলেও দাবী করেন।[৩৯]

সকল সমালোচনা সত্ত্বেও, তাঁর চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব, বিশেষ করে 'সুবর্ণরেখা'-র সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে গিয়ে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, ঋত্বিক শুধু একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টাই নন, তিনি একজন সমাজ সচেতন শিল্পী এবং দার্শনিকও বটে।

তথ্যনির্দেশ

১. Arnold Houser, *The Social History of Art*, Vol. IV, 5th Edition, Routledge and Kegan Paul, London, 1972, p. 243

২. ঋত্বিক ঘটক, *'আমার ছবি'*, চিত্রবীক্ষণ, অনিল সেন (সম্পাদক), সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৪২

৩. ঋত্বিক ঘটক, *'মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করা ও আমার প্রচেষ্টা'*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

৪. C.G. Jung, *Modern Man in Search of a Soul*, Routledge & Kegan Paul, London, 13th Edition, 1961, p. 196-97

৫. ইরাবান বসুরায় : *'কোমল গান্ধার'*, ঋত্বিক কুমার ঘটক, অতনু পাল (সম্পাদক), বাণীশিল্প, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৮

৬. কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র ভূমিকা,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,১৯৮০, পৃ. ৮

৭. কার্ল ম্যানহাইম, *সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব* (অনুবাদ : বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২-৩

৮. ঋত্বিক ঘটক, *'আমার ছবি,'* পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ৪২

৯. (সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম উল্লেখ নেই), *'ঋত্বিক ঘটক : একটি সাক্ষাৎকার',* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

১০. ঋত্বিক ঘটক, *'চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও আমার ছবি',* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

১১. গুরুদাস ভট্টাচার্য, *'ঋত্বিক ঘটক ॥ গঙ্গা থেকে সুবর্ণরেখা থেকে তিতাস',* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১২. বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, *'জীবন মৃত্যু ও প্রত্যহ মেঘে ঢাকা তারা',* পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ১৩৯

১৩. ঋত্বিক ঘটক, *'চলচ্চিত্র চিন্তা',* পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ. ৫৩

১৪. গুরুদাস ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৮০

১৫. উদ্ধৃত : শৈবাল চৌধুরী, *চলচ্চিত্রের পটভূমিকায়,* চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯, পৃ. ২৯

১৬. প্রলয় শূর, *'রাজনৈতিক সিনেমার রাস্তা ও ঋত্বিক',* পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ৬৩-৬৪

১৭. গুরুদাস ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৮০

১৮. ঋত্বিক ঘটক, *'সুবর্ণরেখা প্রসঙ্গে',* পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২, পৃ, ৯০

১৯. গুরুদাস ভট্টাচার্য, *'সুবর্ণরেখা,'* চলচ্চিত্র, খালেদ হায়দার (সম্পাদক), সিনেপল চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৫৮

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

২১. অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, *'সমকালীন বাস্তবতার চিত্রণে বাংলা চলচ্চিত্র',* চলচ্চিত্র সমীক্ষা, ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ ইন ইন্ডিয়া, কলিকাতা ১৯৮৩

২২ ড. এ. কে, নাজমুল করিমের মতে, "By social stratification, we mean something which is *essentially objective*, that is, we can find out a social stratum with such objective criteria as occupation, power, income, standard of living, education, intelligence or some other such criteria. But such strata are not necessarily classes— classes are psycho-social groupings, something which is *subjective* in character, dependent upon class consciousness (i.e. the feeling of group membership)."

Dr. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, 4th Edition, Nowroze Kitabistan, Dhaka, 1996, p. 13-14

২৩. ড. রঙ্গলাল সেন-এর বিবেচনায়, "With the partition of Bengal following the division of India into two states the migration of Hindus belonging to the landowning, professional and commercial industrial classes generated a great gap in the social structure of East Pakistan ... In fact, the migration of Hindu Zamindars, money landers and professional people from East Bengal led to the rise of new higher and middle classes in the Bengali Muslim society. And the emergence

of this class in the social structure of the Bengali Muslim society had a great impact on the political development of Pakistan as a whole. So far as the rural social structure of East Bengal was concerned, the migration of Hindu landowning and commercial elements made the Muslim Jotedars and rich peasants very powerful ... The second important measure which brought about some change in the social structure of East Bengal was the East Pakistan State Acquisition and Tenancy Act of 1950 which mainly affected the absentee Zamindars, most of whom were upper caste Hindus who virtually migrated to Calcutta, the capital of present West Bengal, long before the formal partition of India in 1947"

Dr. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, 1st Edition, The University Press Limited, Dhaka, 1986, pp. 20-21.

২৪. ড. সেন এর অভিমত, "The process of urbanization which accompanied the growing commercial activity and industrial development exerted certain influences upon the existing social structure of East pakistan. According to Nafis Ahmed, it was only after partition in 1947 that there was a significant rise in urban population in various towns and cities of East Pakistan, largely due to the influx of Muslim refugees from Bihar and other places of India... Thus, in this process, a non-Bengali bourgeois class emerged in the predominantly Bengali Muslim society of East Pakistan... This urban development for the first time in history of East Bengal led to what Kart W. Deutsch called 'social mobilization" Ibid, pp 21-22

২৫. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২-৩

২৬. গুরুদাস ভট্টাচার্য, '*সুবর্ণরেখা*', পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৯, পৃ. ৬৬

২৭. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*, পূর্বাক্ত, পাদটীকা নং ২৫, পৃ. ৪

২৮. ড. সেন এর মতে, "The central government of Pakistan took active interest in the rehabilitation of the non-Bengali Muslim refugees in different places of East Pakistan. Some industrial and commercial projects were undertaken by the Government in order to settle the refugees, a section of whom eventually become a very dominant economic class in the province". Dr. Rangalal Sen, Ibid, p. 22.

২৯. গুরুদাস ভট্টাচার্য, '*সুবর্ণরেখা*', পূর্বোক্ত. পাদটীকা নং ১৯, পৃ ৫৯

৩০. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২৫, পৃ. ৩১-৩২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১২

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩৪. সুব্রত রুদ্র, '*জ্বালা*', সেই ঋত্বিক, প্রথম সংস্করণ, নাথ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৪-৮৫

৩৫. গুরুদাস ভট্টাচার্য, '*সুবর্ণরেখা*', পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১৯, পৃ. ৬৭-৬৮

৩৬. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *'উৎসমুখী এক বিপজ্জনক যাত্রা'*, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৫, পৃ. ৬৬

৩৭. Kracauer তাঁর গ্রন্থ Theory of Film-এ লিখেছেন :

Films come into their own when they record and reveal physical reality Now this reality includes many phenomena which would hardly be perceived were it not for the motion picture camera's ability to catch them on the wing. And since any medium is partial to the things it is uniquely equipped to render, the cinema is conceivably animated by a desire to picture tramsient material life, life at its most ephemeral. ক্রাকোয়ারের ঠিক বিপরীত একটি তাত্ত্বিক ধারণা আমরা রুডলফ্ আর্নহেইম-এর তত্ত্বে পাই : For Arnheim, if cinema were the mere mechanical reproduction of real life it could not be an art at all. Arnheim acknowledge the existence of a primitive desire to get material objects into one's power by creating them afresh, but he believes that this primitive impulse must be distinguished from the impulse to create art....The very properties that keep photography from reproducing reality perfectly must be exploited by the film artist, for they alone provide the possibilities for a film art.

Siegfried Kracauer, *Theory of Film*, Oxford University Press, London, 1966, p. IX

Gerald Mast and Marshal Cohen, *Film Theory and Criticism*, Second Edition, Oxford Unviersity Press, New York, 1997, p.4

৩৮. Alamgir Kabir, *Film in Bangladesh*, Bangla Academy, Dhaka. 1979, p. 106

৩৯. মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন ·

দেশভাগ বিষয়ে তাঁর মর্মপীড়া এতই গভীর ছিল যে, একাধিক লেখায় দেখতে পাব দেশ ও মানুষের এই নগ্ন দেউলেপনার জন্য তিনি দেশভাগকে বারবার অভিযুক্ত করে গেছেন। এইখানে আমার বক্তব্য হল ঋত্বিকের মধ্যে শেষাবধি অশেষ রোমান্টিকতা এবং শিশুর মতো বাস্তবকে অবুঝ জেদে অস্বীকার করে চলার একটা ব্যাপার স্বভাবেই ছিল। আর যা ছিল, ঋত্বিক অনুরাগীরা রাগুন আর যাই মনে করুন, তাঁর ছিল সেই ইতিহাসচেতনার অভাব যা প্রেক্ষিত প্রাপ্তি এনে দেয়। ইতিহাসচেতনা থাকলে যিনি এত বিষয়ে এত জানতেন, তিনি বুঝতেন, তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর খুবই sheltered ছিল বলে, দেশের গ্রাম-মাঠ-নদী-মানুষ তাঁকে প্রাণরস যোগাত বলে, দেশ-মানুষ-জীবন কিছু সুখে ছিল না। দেশের, যে চেহারা স্বাধীনতার পর থেকে দেখা গেল ইতিহাসচেতনার ফলে যে বিশ্লেষণী পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান জন্মায় তা ঋত্বিকের থাকলে তিনি বুঝতেন, এই নৈরাজ্যনগ্নতা-ছিন্নমূলতা হঠাৎ স্বাধীনতার পরই গজিয়ে ওঠেনি। দেশের ইতিহাস যে পথে চলছিল তাতে ঠিক ঠিক ইতিহাস সম্মত পরিণতিই ঘটেছে এবং আমরা জাতিগতভাবে এর চেয়ে ভাল অবস্থা হবার মতো কোন কাজ কোনো ফ্রন্টেই করিনি। অবশ্যই দেশভাগের পর সমস্যাগুলি তীব্রতর, গগনচুম্বী হয়েছে, রক্তবীজের জেদে প্রবর্ধিত হয়েছে সর্বনাশ, কিন্তু তার বীজ বপন লালন-পালনের কাজ বহুকাল আগে থেকেই চলছিল। ইতিহাসে আকস্মিক কিছু হয় না।

মহাশ্বেতা দেবী, *'ঋত্বিক ঘটক ও তাঁর প্রবন্ধ'*, সেই ঋত্বিক, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩৪, পৃ. ৫৫-৫৬

আমাদের ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ফাটল থেকে ঋত্বিক উঠে এসেছেন*

প্রফেসর এস. আমিনুল ইসলাম

আমরা যারা সমাজবিজ্ঞানী তারা অনুভব করছি আমরা এক গভীর সংকটের মধ্যে বসবাস করছি। সমাজবিজ্ঞানকে আমরা ব্যবহার করে এসেছি পশ্চিম থেকে প্রাপ্তি হিসেবে। তাকে আমাদের মননশীলতার দ্বারা আমাদের মতো করে ব্যবহার করতে পারিনি। সমাজবিজ্ঞান চর্চার দেশজ ঐতিহ্য ঠিক তৈরি হয়নি। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন সংকট তৈরি করেছে মার্কসবাদী তত্ত্বে। উত্তর-আধুনিকতা তৈরি করেছে সংকট সমাজবিজ্ঞানের মূল ধারায়। এই পটভূমিতে আমার ক্রমশঃ মনে হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানকে তার তত্ত্ব নির্মাণ করার জন্য প্রত্যাবর্তন করতে হবে তার দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে—বিশেষ করে যেখানে আমাদের সমৃদ্ধি, আমাদের সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির মধ্যে। সংস্কৃতির বিশ্লেষণের বলয় থেকে সমাজবিজ্ঞানকে আলাদা করে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ নেই।

সাজেদুল আউয়ালকে ধন্যবাদ তিনি এই প্রচণ্ড কঠিন কাজটি করতে এগিয়ে এসেছেন। সাজেদ প্রশংসার দাবি রাখেন— তিনি তাঁর গবেষণার জন্য তাঁকেই নিয়েছেন যাকে বেছে নেওয়া উচিত ছিল— তাঁকে দিয়েই শুরু হওয়া উচিত। আমাদের অজ্ঞতার মধ্যে ঋত্বিক উজ্জ্বল, আমাদের হিসেবী সংখ্যাপাতের মধ্যে তিনি উদ্দাম-সৃষ্টিশীল। আমাদের ইতিহাসের এক ভয়ংকর ফাটল থেকে ঋত্বিক উঠে এসেছেন। সাজেদ যাত্রা শুরু করেছেন সেই ফাটল থেকে— ঠিক যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবার কথা। ঋত্বিক এই ফাটলের 'সন্ত'—যার নাম 'দেশভাগ'।

দেশ ভাগের কোন প্রত্যয় যথার্থভাবে সমাজবিজ্ঞানে নেই। সাজেদ তাই শুরু করেছেন migration দিয়ে। আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে সাজেদ তত্ত্বের জন্য ফিরে গেছেন দু'টি উৎসে। প্রথমটি হচ্ছে শিকাগো ঘরানা যার পরিসরে শুরু হয়েছিল অভিবাসন এবং নগরায়ন নিয়ে গবেষণা এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। দেশ-দেশান্তর থেকে আগত মানুষ কিভাবে—কি প্রক্রিয়ায় নগরে স্থান করে নেয় তার চমৎকার বিশ্লেষণ এবং বিবরণ নির্মাণ করেছিলেন এজরা পার্ক এবং তার সহযোগীরা। তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মানুষের স্রোত দেখে। তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন নগরে

* নিবন্ধটি ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে '৫ম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সেমিনারে পঠিত 'ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'সুবর্ণরেখা' শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা হিসেবে উপস্থাপিত।

মানুষের ঢল, ঘনত্ব এবং নির্জনতার তাৎপর্যকে। কার্ল ম্যানহাইম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন স্বদেশকে। অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন ফ্যাসীবাদেব ভয়াবহতাকে— অনুসন্ধান করেছিলেন উত্তরণের পথ।

সব গুরুর মধ্যে অনেক কিছু থাকে যা বর্জন করতে হয়। সাজেদ গ্রহণ করেছেন। বর্জন করেন নি। তিনি পার্ক বা তাঁর সহযোগীদের তৈরি করা রূপ accommodation, acculturation, assimilation কে বর্জন করেননি। তিনি তার সাথে মেলাতে চেয়েছেন বিচ্ছিন্নতা বা পারক্য ও আত্মহনন। এই বিষয়গুলোকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং মীথের সাথে। এই প্রত্যয়গুলিকে তিনি উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন ঋত্বিকের ছবি, বিশেষ করে 'সুবর্ণরেখা'র ভিতর দিয়ে। এই অন্বয় সাধনের মধ্যে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় আছে। তাঁর প্রবন্ধে আমরা ঋত্বিকের সুবর্ণরেখার একটি নতুন অবয়ব খুঁজে পাই।

তাঁর প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতাও কিন্তু প্রবল। প্রত্যয়গুলো ঠিক মেলে না। তত্ত্ব ও প্রত্যয়ের মধ্যে ফারাক তৈরি হয়ে যায়। ম্যানহাইমের সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব কিভাবে সমাজ কাঠামোর সাথে যুক্ত তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তিনটি প্রত্যয়— উপযোজন, সংস্কৃতিকরণ ও আত্মীকরণ মেলে না সমাজ কাঠামোর ধারণার সাথে। তিনটি প্রত্যয়ই সময়জীর্ণ। ডারউইনের প্রভাবে তৈরি প্রত্যয়গুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হবার প্রয়োজন রয়েছে। তার পরে যে প্রত্যয়টি সাজেদ ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা বা পারক্য। এ প্রত্যয়টি আবার ভিন্ন মাত্রার— এর উৎপত্তি ভিন্ন discursive regime থেকে। আত্মহত্যার প্রসঙ্গে এসেছে দু'টি প্রভিন্ন নাম সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খাইম এবং মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড। তাত্ত্বিক যুক্তিতে না মিলিয়ে এই প্রত্যয়গুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। সাজেদ এ ব্যাপারে সচেতন। যথার্থভাবে তিনি তাই আমাদের উপসংহারে জানিয়ে দেন এসব প্রত্যয় আমাদের সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়। এক অর্থে তাঁর উপসংহারই তাঁর প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি নতুন প্রত্যয় এবং তত্ত্বেব প্রয়োজন অনুভব করছেন।

সমাজবিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় এ প্রত্যাশা পূরণ করা কতখানি সম্ভব তা বলা কঠিন। এখানেও প্রয়োজন রয়েছে সৃষ্টিশীলতার। উত্তর-আধুনিকতার প্যারাডাইম এখন অবসন্ন। সমাজবিজ্ঞানকে নিতে হচ্ছে নতুন দিকে মোড়। আমাদের মতো দেশে এই কাজটি করা সম্ভব ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের সাহায্যে। কেননা ঋত্বিকের মধ্যে ক্রিয়াশীল বিদীর্ণ এক সামাজিক অভিজ্ঞতা— যে রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয় চলমান চিত্রমালা।

সাজেদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন যেখান থেকে এই চিত্রমালাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে forced migration। একদল মানুষ মাটি থেকে, জল থেকে, ফুল থেকে বিচ্যুত হয়। বিচ্যুত হয় তার স্বাভাবিক কম্যুনিটি থেকে। শিকড়হীন মানুষ পায় নতুন পরিচিতি— রিফিউজি। তাদের লড়াই করতে হয় নতুন

পরিবেশে, বৈরী পরিবেশে। সমাজ জীবনের মধ্যে থাকে না organic unity। বরঞ্চ তৈরি হয় যাকে বলা যায় ethnicity এবং সেখান থেকে underclass। প্রান্তিক ধনতন্ত্রের পরিসরে তৈরি হয় অভাব এবং পারক্য। দীর্ণ হয় সত্ত্বা। ঋত্বিক মানুষের চরম পরাজয়কে ব্যবহার করেন সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে। আনেন মীথকে অলঙ্কার হিসেবে। ঋত্বিক কাহিনী বলেন, তিনি বিদ্রোহ করেন। তিনি এসব সজ্জিত করেন অপরূপ শিল্পরূপে।

সুবর্ণরেখার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন অন্তত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ। কোন্ সামাজিক পটভূমিতে এর সৃষ্টি ? চলচ্চিত্রকারের জীবনচক্রের কোন্ অবস্থাকে তা প্রতিফলিত করে ? চলচ্চিত্রের মধ্যে image গুলো কিভাবে সঞ্চিত হয় ? ইমেজগুলো কি সব গূঢ় অর্থ প্রকাশ করে ?

সাজেদ এর বেশ কিছুটা তাঁর আলোচনায় নিয়ে এসেছেন চমৎকারভাবে। তবে এর মধ্যে আনা প্রয়োজন অনেক কিছু, যেমন প্রয়োজন অনেক কিছুর বর্জন। এর পরে সাজেদের যাত্রা হবে একটি বৃহত্তর তাত্ত্বিক পরিসর খোঁজা যার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকবে কাঠামো যা তুলে আনবে নানা সুবর্ণরেখা— নানা চিহ্ন যা সৃষ্টি হয় বৈশ্বিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি মানুষের নির্জন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। এখানে এসে মেলে শিল্পতত্ত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান। এই কঠিন পথে অগ্রসর হবার জন্য সাজেদকে তৈরি করে নিতে হবে নিজেকেই প্রথম। নব ভুবনদৃষ্টির আলোকে তৈরি করা পথেই কেবল সম্ভব ঋত্বিকের চলচ্চিত্র নির্মাণতত্ত্বের শোলক-সন্ধান।

অগ্নিরথের সারথী*

রফিক মাহমুদ

'But that a man in chains should shut
his eyes, the world explode'.
— Octavio Paz

অণুকথন

লুই বুনুয়েল চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে অক্টাভিও পাজ-এর উপর্যুক্ত লাইনটি ব্যবহার করেছিলেন। বুনুয়েল আরও বলেছিলেন— পাজ-এর এই কবিতাটির মতোই চলচ্চিত্রের সাদা পর্দার চোখ উন্মিলিত হলেও—সারা পৃথিবী বিস্ফোরিত হওয়ার ভয় রয়েছে। পাশাপাশি বুনুয়েল অবশ্য ভীত না হওয়ার জন্য আশ্বস্তও করেছেন। কারণ, ধনিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র এমন এক মোড়কে আবৃত হয়ে আসে— যেখানে দর্শকরা বেশ নিরাপদেই থাকতে পারে।

বুনুয়েলের এই বক্তব্য বিষয়ের সারার্থ সত্যিই গভীর। রাজনৈতিক অবস্থান থেকে বিষয়টিকে সরিয়ে, শিল্প-সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার গভীরে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়— সেই নিরিখেও কথাটি বেশ তাৎপর্যময়। স্রষ্টা ও ভোক্তা উভয়েই সত্যিই বিস্ফোরণোন্মুখ এক অনুক্রমে এসে দাঁড়ায়। বিশাল মাত্রায় নিজেকে উন্মোচিত করতে পেরেছেন যে শিল্পী সন্দেহাতীতভাবে তাঁর ভেতরে ঘটে অনন্ত বিস্ফোরণ। সে অগ্নির স্ফুলিঙ্গে বা তাপে ঝলসায় দর্শক-পাঠকও। তৈরি হয় নিরন্তর সংযোগ।

স্রষ্টা বা সৃষ্টি—প্রক্রিয়ার এই স্তরে এসে আমার একটি গ্রীক পৌরাণিক গল্পের কথা মনে পড়ছে। আমার ধারণা এসব গল্প সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা বা বোধেরই Mythical Reflection. গ্রীক পুরাণের গল্পটি এরকম— কিশোর ফিটনের বহুদিনের স্বপ্ন—পিতা সূর্যদেবের রথ চালিয়ে অনন্ত আকাশ পাড়ি দেবে সে। সূর্যদেবের এক প্রতিজ্ঞার সুযোগে ফিটন স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পায়। রথে চড়ার দাবি পেশ করে সে। সেকথা শুনে প্রমাদ গোনেন সূর্যদেব। মরণশীল মানুষ ফিটন তো নয়ই, সূর্যদেব ছাড়া এমনকি জিউসের পক্ষেও রথ চালানো সম্ভব নয়। নানা রকম ভয় এবং প্রলোভন দেখান সূর্যদেব ফিটনকে। ফিটন এই বিপদে নির্ঘাত তোমার মৃত্যু। বরং তুমি তোমার চারদিকে তাকাও। দেখ এই পৃথিবী কত সুন্দর—কত ধন, রত্ন, ঐশ্বর্যে ভরা—এর থেকে যে

* প্রবন্ধটি ঋত্বিক ঘটক-এর ৭৫ তম জন্ম-বার্ষিকী পালন উপলক্ষে 'চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি' ও ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে ৪ নভেম্বর, ২০০০ সালে পঠিত।

কোনটি বেছে নাও তুমি— আকাশটাকে বাদ দাও। কিন্তু কিশোর ফিটনকে আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে তার ইচ্ছায় অনড়। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সূর্যদেব ফিটনকে রথে চড়িয়ে দিলে ঘোড়াদের উড়ন্ত পা বাতাস কেটে, সমুদ্রের কোল ঘেঁষে মেঘগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে রথ চালায় আকাশের ওপরে— আরও ওপরে। ফিটনের আনন্দ আর ধরে না। আর বিপত্তি ঘটে ঠিক তখনই। ঘোড়াগুলো বুঝতে পারে চালকের আসনে বসা কিশোর আসল লোক নয়। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াগুলো প্রথমে আকাশের শীর্ষদেশে উঠে গেল— আবার ঝাঁপ দিল পাতালের দিকে। এতে আগুন লেগে গেল পৃথিবীতে। পাহাড়, উপত্যকা, অন্ধকার বনভূমি— সর্বত্র দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সবকিছু। মাতা ধরিত্রীর কাতর চিৎকারে দেবতা জিউস জেগে উঠলেন— আর তার বজ্রের অশনি ছুড়ে মারলেন ফিটনের দিকে। জ্বলন্ত ফিটনকে গ্রহণ করল এরিডেনাস নামক এক রহস্যময় নদী। মৃত ফিটনের আগুন নিভিয়ে ঠাণ্ডা করল তার দেহ। করুণা বিগলিত নায়েডরা অকালমৃত এই কিশোরের সমাধি তৈরি করে ফলকে লিখে দিল :

এইখানে শুয়ে আছে ফিটন, যে চালিয়েছিল সূর্যদেবের রথ।
বিপুল তার ব্যর্থতা, তবু কি অসীম তার সাহস।

একজন শিল্প-স্রষ্টাকেও ফিটনের মতোই অফুরন্ত স্বপ্নের অধিকারী হতে হয়। পরিণতির কথা ভাবলে চলবে না তাঁর—তাঁকে লক্ষ্যে থাকতে হবে স্থির। তবেই তার শিল্প হয়ে উঠবে অগ্নিস্পর্শী। আর তখনই শিল্প হবে অমর সৃষ্টি।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিরল ধারাক্রমে যে মুখটি আমার সম্মুখে এসে স্থির হয়— সেটি হল ঋত্বিক ঘটকের।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক।

কালজয়ী শিল্প-স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটককে বোঝাতে গিয়েই আসলে আমাকে উপক্রমণিকার আকারে উপরের এই 'অণুকথন'-এর অবতারণা করতে হয়েছে। মূলত ঋত্বিক ঘটককেও যোজন-দীর্ঘ অগ্নিপথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। সে পথে তিনি নিজেও যেমন দহিত হয়েছেন—অপরকেও তেমনি দহন করতে চেয়েছেন। তাই তার ক্যানভাস জুড়ে উঠে এসেছে অনন্ত দ্রোহী মানুষেরা—ধূসর প্রান্তর---পোড়ামাঠ— শুকিয়ে যাওয়া নদীর বুকে ধু-ধু বালুচর ইত্যাদি। এহেন একজন চলচ্চিত্রকার সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই কলম থমকে দাঁড়ায়। কি লিখব— কোথা থেকে লিখব— কোথায় শেষ তার! কিছুই জানি না। সত্যি বলতে কি ঋত্বিক ঘটকের কোন শুরুও নেই—শেষও নেই। এ যেন নিরবধি বয়ে চলা।

মোট ৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন ঋত্বিক ঘটক। প্রচুর অর্ধনির্মিত চলচ্চিত্র। বেশ কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র। প্রথম ছবি 'বেদিনী' ২০ দিন শুটিংয়ের পর দেখা গেল কিছুই Expose হয়নি। প্রথম সমাপ্ত চলচ্চিত্রটিও জীবদ্দশায় মুক্তিলাভ করেনি। শেষ চিত্র রাম কিঙ্করের ওপর। অসমাপ্ত।

ঋত্বিকের এই শিল্পকর্মগুলো মূলত একটি ঐক্যসূত্রে গাঁথা। বিপরীতধর্মী কোনকিছু করেননি ঘটক। তিনি তার চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস ও দার্শনিকতাকে নানান ভগ্নাংশে এই চলচ্চিত্রগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। এ যেন শতমূলী সবজির মতো— শত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে— কিন্তু উৎস এক জায়গায় প্রোথিত।

সত্যি কথা বলতে কি— দুষ্প্রাপ্যতা হেতু ঋত্বিকের এই চলচ্চিত্রগুলো আমার পক্ষে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ছিন্নভিন্ন— উল্টা-পাল্টা— অবিন্যস্ত এক দেখা। বরং সাপেবরের মতো—এই অবিন্যস্ত দেখার ফলেই ঋত্বিক আমার চিন্তা, চেতনা ও বোধে ভিন্ন এক মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে ঘটকের শিল্পকর্ম বা চলচ্চিত্র নিয়ে সুনির্দিষ্ট ধারাক্রমে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ঋত্বিক ও তার চলচ্চিত্র আমার চিন্তায়-চেতনায় ও অনুভবে যে Image ও Passion নিয়ে এসেছে তারই কিছু অনুপ্রাস আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এটাকে বলা যায় অনেকটা আত্মকথনের ছলে ঋত্বিকে অনুপ্রবেশ।

অনুবন্ধ

সে এক উদ্ভ্রান্তসময়। ১৯৭৩ সাল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। হয়তো মাঝখান থেকে কিছু দিন লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের বাঁকেই—সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। অর্থনীতি বিধ্বস্ত, সমাজ নীতিহীন, রাজনীতি চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। রাজনীতিবিদদের অসততা ও ভণ্ডামী বরবাদ করে দিয়েছে এদেশ। সেই বিপর্যয়কর মুহূর্তে— অস্থির সময়ের তাপকে গায়ে না মেখে— পঁচে যাওয়া, ক্লীন্ন রাজনীতিকে পেছনে রেখে—সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পা রেখেছি আমরা। সে হলো আমাদের ভিন্ন এক মানস-পর্ব গঠনের কাল। নাট্যাঙ্গনে আমাদের কাজ চলছে পুরোদমে। শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপক পাঠ চলছে। এতসব কর্মকাণ্ডের ভেতরেই হঠাৎ কোন এক অগ্রজের মুখে শোনা— ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি শেষ হয়েছে। কে এই ঋত্বিক ঘটক ? চলচ্চিত্রকার ? কিন্তু 'তিতাস একটি নদীর নাম'— কোথায় যেন পড়েছি নামটি ? মনে পড়ে গেল স্কুলে থাকতে পড়া— আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'অতীত দিনের স্মৃতি'তে। বইটির রচনাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। মনে পড়ে— আরও পড়েছিলাম— অদ্বৈত বাবু মূল পাণ্ডুলিপিটি ঘুমের মধ্যে ভুলে ট্রামে ফেলে রেখে বাড়ি চলে যান। হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপি না পেয়ে অদ্বৈত বাবু বইটি আবার লেখেন। ভাবছিলাম তাহলে সেই উপন্যাসটিই এটি ? তিতাস পারের বৃত্তান্ত।

আবার দামাল কাজের ঝাপটায় সবকিছু ধোঁয়াটে হয়ে যায়। এরই মাঝে দু'একবার ঋত্বিক নামটি যে আসেনি তা নয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটি সিনেমা হলের সামনে থমকে দাঁড়াই। ব্যানারে চোখ আটকে যায় :

অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস
অবলম্বনে

তিতাস একটি নদীর নাম
পরিচালনা : ঋত্বিক কুমার ঘটক

এই কি সেই ঋত্বিক ? ধীর পায়ে এগোই। দেখি ব্যাপারটা কি ? অজ্ঞাত এক রহস্যের টানে টিকিট কেটে হলে প্রবেশ করি। হল ফাঁকা। সন্দেহ, ভুল করলাম নাকি? কিন্তু ততক্ষণে কালো পর্দায় সেন্সর সার্টিফিকেট দেখা গেল। আর অবাক বিস্ময়ে দেখলাম— পর্দায় অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। স্ক্রীন জুড়ে বিরাট নদী। জলে টইটুম্বুর। জেলেরা মাছ ধরছে। বড় বড় মহাজনি নৌকা যাচ্ছে। এটাই কী তাহলে তিতাস নদী? অবাক করা ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটা দেখে আমার শিরদাঁড়া সোজা হয়ে আসে। সুনির্দিষ্ট কোন কাহিনী কাঠামো নেই। বিবাহ-প্রেম-ভালবাসা-বিরহের প্রথাগত ক্রমপরিণতি নেই। প্রচলিত চলচ্চিত্র ধারার উল্টোদিকে তিতাস এক আশ্চর্য বিন্যাসে এগুতে থাকে। সুনির্দিষ্ট গল্পের ধারাবাহিকতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপঞ্জির সমাহারে গড়ে তোলা হয়েছে একটি সামগ্রিকতা। মালোদের কেন্দ্র করে তিতাস পারের যে ব্যাপক জীবনযাত্রা তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে এর বিন্যাস। মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তিতাস। জল থৈ থৈ তিতাস নদী বয়ে চলেছে। মহাজনি নৌকায় করে চাল যাচ্ছে— যাচ্ছে আলুর কারবারিরা। ভাটিয়ালি গান গেয়ে কোন মাঝি দূর দেশে যাচ্ছে। বাঙালির নাভিমূলে প্রোথিত নৌকা বাইচ উৎসবও হচ্ছে সেখানে। তিতাসের বক্ষ বিদীর্ণ করে নেমে আসে প্রবল বৃষ্টিধারা—তবুও এ নদী কর্ম্মমুখর—জীবন্ত। তিতাসের বিস্তীর্ণ দু'পাড় জুড়ে এক জলজ সভ্যতার বিবরণ আমাকে উত্তপ্ত করে রাখে সারাক্ষণ। স্মৃতিভ্রষ্ট কিশোর, বিধবা বাসন্তী, ডাকাতের আক্রমণে হারিয়ে যাওয়া সেই বধূটি— হয়তো তার নাম রাজারঝি—এমন কি পিতৃ পরিচয়হীন অনন্তকেও আমরা দেখতে পাই। এই যে বিশাল নদী তিতাস, তার তটরেখা ব্যাপী সহস্র মানুষের যে জীবনপ্রবাহ তারই নাড়ির টান টের পাওয়া যায় তিতাসে। যখন আমরা শুনি কোন এক জেলে বলছে— তিতাস আমাদের জান—তিতাসও নেই, আমরাও নেই। আমূল কাঁপিয়ে দেয়ার মতো এই ধরনের সংলাপ বাংলা চলচ্চিত্রে বিরল। এক মহাজন বলছে— আরে ওরা জেলের জাত। তিতাসের পানিতে বুক পর্যন্ত নামিয়ে দে, দেখবি— ওরা মিথ্যা বলতে পারবে না—। তিতাসকে ওরা পূঁজো করে। আমি জীবনে দু'বার আমার ভেতরে ভূমিকম্পের আলোড়ন অনুভব করেছি। আমার হাঁটু থর থর করে কেঁপে উঠেছে। তার একবার— ওড়িশার কোনারক মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে। আর একবার— তিতাসের এই সংলাপটির সামনে দাঁড়িয়ে।

এই যে এত আয়োজন— জীবনের বিপুল প্রবাহ— এরই ভেতরে কখন— কোন অজান্তে সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে যায়— তিতাসের বুকে চর জেগে ওঠে। যেন মৃত তিতাসের লাশ ভেসে ওঠে। জলশূন্য চরাচরে নতুন মহাজন আসে। ধান চাষের আয়োজন চলে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা টেরিকাটা বাবুরা আসে। জেলেদের পদচারণাহীন

শুষ্ক তিতাসের হাহাকার চারদিকে কাঁপে। অনাহারী মানুষের বিলাপ শোনা যায়। রাতে মহাজনের আগুনে জেলেপাড়া জ্বলে ওঠে। পোড়া ভিটায়— কাক ও কুকুরের সঙ্গে বাসন্তী ও তার মা ভাত নিয়ে মারামারি শুরু করে— চিরশত্রুর মতো। ক্ষুধার্ত-জরাক্রান্ত-আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত বাসন্তী একটি ঘট নিয়ে পানির উদ্দেশ্যে তিতাসের বালুচরে গিয়ে ওঠে। বালি খুঁড়ে পানি খোঁজে। বিস্তৃত তিতাসের চরে ক্লান্ত মৃতপ্রায় বাসন্তী বিফল মনোরথ হয়। দূরে অস্তগামী সূর্য। ম্রীয়মান পড়ন্ত আলোয় চিক চিক করে ওঠে বালু; বিরাট এক Silver Plate-এর মতো এই চরে বাসন্তীর হাতের শূন্য ঘট গড়িয়ে পড়ে। অস্তগামী সূর্যের মতো তারও জীবনসায়াহ্ন ঘনিয়ে আসে। বহুকষ্টে স্তিমিত দুচোখ মেলে তাকায় বাসন্তী। ধাম করে ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আদিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। সেখানে লকলকিয়ে ওঠা সবুজ ধান ঢেউ খেলে যায়। তার ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল এক উলঙ্গ শিশু। শিশু বাঁশী বাজাচ্ছে আর ওর কোমরে বাঁধা একটি ঘুঙুরদানা টিং টিং বেজে যাচ্ছে। বাসন্তীর আশান্বিত চোখ দুটি সে দৃশ্য অবলোকন করতে থাকে। তারপর ধপ করে সব অন্ধকার। সমাপ্তিজনক কোন টেলপ্ নেই— কিচ্ছু নেই।

এক বিপুল ঝাঁকুনিতে জেগে উঠি আমি। তুলনা রহিত এক উপলব্ধি স্তব্ধ করে দেয় আমাকে। তাহলে এই ছবিটিই বানিয়েছে ঋত্বিক কুমার ঘটক ? সেই থেকে এই লোকটির প্রতি আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করি। পত্রপত্রিকায় দু'একটি সাক্ষাৎকার— লেখালেখি চোখে পড়ে। ইতিমধ্যে 'তিতাস' উপন্যাসটি পড়া শেষ করি। দু'টি কাজের পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। বিশেষত শেষে। আসলে উপন্যাসটিতে অদ্বৈতের ছিল Autobiographical Approach— যেভাবে সে বেড়ে উঠেছিল ওখানে—তারই বয়ান। সেখান থেকে ছিটকে শহরে এসে পড়েছিল অদ্বৈত। আর ঋত্বিকের ছিল Oblique Eye. নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সভ্যতার বিবর্তনের এক সমাজপাঠ ছিল তার কাছে এটি। ঋত্বিক বলেছেন—আমি দেখাতে চেয়েছি সভ্যতার মৃত্যু নেই— একটি সভ্যতা মরে যাওয়ার পর—সেখানে জেগে উঠে আর একটি নতুন সভ্যতা। ঋত্বিকের এই বিশাল দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা টের পাওয়া যায় চলচ্চিত্রটিতে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের স্রোতধারায়ও এমনটিই ঘটেছিল। নদীমাতৃক সভ্যতার তিরোধানের পর ঘটেছিল কৃষি সভ্যতার উত্থান। আর তাই তিতাস পারের জনমানুষের দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনতে পাই দুই হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার বছর আগে নীল নদের পাড়ে— সিন্ধু নদের পাড়ে— ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস অথবা আইয়োনিয়ার তীরে তীরে।

একথা অবধারিত— যে কোন শিল্পকে চিরায়ত গণ্ডিতে পা রাখতে গেলে একরৈখিক হলে চলবে না।— ভাব ও ভাবনায় তাকে হতে হবে বহুমাত্রিক বিন্যাসে বিন্যস্ত। ফলে বিভিন্ন স্তরে বিচরণের সম্ভাবনা থাকতে হবে সেখানে। এই বিষয়টিকে বোঝাতে ধূর্জটি প্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে একটু ঘুরিয়ে বলেছিলেন 'Art is not a mere expression— it is revelation'. অর্থাৎ শিল্প শুধুমাত্র অভিব্যক্তি নয়,এটি উন্মোচন।

মহৎ শিল্পের ধর্মই এই যে এটি বহুবিধ মাত্রায় উন্মোচিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

এই কথাগুলো এই জন্য বললাম যে— ঋত্বিকের চলচ্চিত্র বুঝতে হলেও স্তারিক বিন্যাসের এই পাঠ প্রয়োজন। ঋত্বিকের ভাবনার বাহনও অনেকটা এরকমই যখন সে বলে— আসলে আমাদের একটা বক্তব্য বা Theme থাকে—। সেই থিমটিকে সহজে বোঝার জন্য আমরা তাকে গল্প-কাঠামোর ভেতর ঢেলে সাজাই। সে গল্পের ভেতর থাকে একটি দেশ—তার মানুষ— তাদের হাসি কান্না—তার সমাজ— থাকে সেই সমাজের অর্থনীতি—তারপর রাজনীতি— তারপর থাকে একটি সুনির্দিষ্ট দর্শন—এসবকে ছাপিয়ে যা থাকে তা হল স্রষ্টার একান্ত নিজস্ব একটি জগৎ— যে জগতে দর্শক-শ্রোতার পক্ষে পৌঁছানো প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। ঘটক যে স্তরগুলোর কথা বললেন সেগুলোও কিন্তু আবার বিভিন্ন আবরণে আবৃত হয়ে থাকে। বাইবে থেকে তা বুঝতে পারা খুবই দুষ্কর। দক্ষ জহুরীই কেবল তার সন্ধান পান। এ বিষয়টিকেও ঋত্বিক বোঝাতে চেয়েছেন এইভাবে— এ যেন মালদহের ল্যাংড়া বা গোপালভোগ আম— বাইরে থেকে দেখতে একদম কাঁচা—কিন্তু আবরণটি সরালেই দেখা যাবে ভেতরটি একদম লাল টকটকে, রসে টইটুম্বুর। শিল্প সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্র কর্মও চিরায়ত হওয়ার এই রসসুধা পান করে বুদ। শিল্পে দ্ব্যর্থবোধকতা বা বহুমাত্রিকতা প্রয়োগে যে বিশেষ মুন্সিয়ানা প্রয়োজন তিতাসের বিশাল Perspective-এ এই দ্যোতনার অনন্য প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। লোকগান, লোকাচার— Folkmotif, Primordial Force বা আদি মাতার Archetype-এর ব্যবহার—প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদির সহযোগে ঋত্বিক জেলে সম্প্রদায়ের গভীর ব্যাপ্তিকে তুলে আনতে চেয়েছেন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ জীবনচক্রের এই ধারা প্রবাহ তিতাস পারের জলাচারী মানুষদের ব্যাপৃত করে রাখে। ফলে ওই অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনাচারের এক বিশেষ পরিভাষা ফুঠে ওঠে চলচ্চিত্রটিতে। সেজন্য ঋত্বিককে গভীর অভিনিবেশ সহকারে ময়মনসিংহ গীতিকা পাঠ করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞান ওঁকে এক দুর্মর চিত্রের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তিতাস পারের এই যে এত প্রাণচাঞ্চল্য—হৈচৈ কর্মমুখরতা—বিচিত্র ঘটনার মহাসমারোহ—এ সবই ঋত্বিকের অন্তর্লীন ভাবনার বাহন মাত্র। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই ঋত্বিক চারদিক থেকে খোদাই করে গড়ে তুলেছেন। ফলে তার চরিত্রগুলো বহুমাত্রিকতার অমর স্পর্শে ঝলসে উঠেছে।

রাজার ঝি নামের যে মেয়েটির বিয়ে হল বিশাল আয়োজনে--- আচার-অনুষ্ঠান গান বাজনা ও আত্মীয়পরিবৃত্ত হয়ে—বাসর রাতের এক দুর্ঘটনায় ছিটকে পড়ে সে। পরিণত হয় নাম-পরিচয়হীন এক নারীতে। যার পিতৃপরিচয় হৃত—স্বামীর পরিচয় লুপ্ত— এমনকি সেই প্রিয় মুখটিও তার স্মৃতির ছায়ায় নিশ্চিহ্ন। এইখানে এসে তার অস্তিত্বের শিকড় নড়ে ওঠে। নিরবলম্ব এই নারীটি পরিণত হয় চিরন্তন বাঙালি নারীত্বের প্রতিনিধি প্রতীকে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বনারীর চিত্রপট প্রতিভাত হয় তার মধ্যে।

নানা রকম উদ্ভট পরিস্থিতি অত্যন্ত রহস্যময় ও জটিল চরিত্রে পরিণত করে এই রাজার ঝিকে। প্রিয় সখী বাসন্তী পিঠা ভাজছে আর রাজার ঝি নানা রকম প্রশ্নের হেয়ালিপূর্ণ উত্তর দিচ্ছে। এবং ক্রমশ ওকে ব্যাপক অস্তিত্ব সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পর্যায়ে এসে সংযোগহীন, নিঃসঙ্গ এক নারীকেই প্রকাশ করে রাজার ঝি। মানুষের Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধের ধারণাটিকে ঘটক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন। Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ আসলে মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদেরকে এক জটিল প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এলিয়েনেশান মূলত মানব বিকাশের ও সমাজ সংঘাতের ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে প্রকাশ লাভ করেছে। From primordial cell to modern man—বিচ্ছিন্নতাবোধ মানব অস্তিত্বের মর্মকোষে সংস্থাপিত হয়েছে। 'The history of man could very well be written as a history of the alienation of man'. জন্ম এবং মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় মানুষ একা। এরই Reflection আমরা দেখি লোক গানে— 'আইছ একা যাইবা একা— সঙ্গে কেউতো রবে না... ।' মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে— এই নিঃসঙ্গ চেতনা নানা Form-এ এসেছে। তদুপরি আমার মনে হয় মানুষ দু'রকম অভিজ্ঞতাতে বেড়ে ওঠে— একটি বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা আর অন্যটি যুথবদ্ধতার অভিজ্ঞতা। এই দ্বন্দ্বমুখরতারই একটি রূপ রাজার ঝি-র মধ্যে ফুটে উঠেছে।

কখনো কখনো ঋত্বিকের চরিত্রগুলো নিজের বৃত্ত ভেঙে ভিন্ন অর্থবোধকতায় সন্নিবেশিত হয়। কখনো সে অর্থের ইন্ধন যোগায়, কখনো নিজেই অর্থবোধক হয়ে উঠে। ভাবনার এই লীলাভূমে রাজার ঝি চরিত্রটি উচ্চকিত হয়ে উঠে যখন সে স্মৃতিভ্রষ্ট কিশোরকে নদীর জলে বিধৌত করতে নিয়ে যায়। সে সময় নেপথ্যে অনবরত রাধা-কৃষ্ণের কীর্তনের সুর বেজে চলে। ফলে ওরা রাধা-কৃষ্ণের আঁকারে পরিণত হয়। এখানে রাধা-কৃষ্ণের মিথুন তত্ত্বের প্রয়োগের বিষয়টি এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণের অবতারণা করে। প্রাচীন কাল থেকে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে প্রচলিত কথকতার বিস্তীর্ণ পটভূমিতে কৃষ্ণের বাল্য লীলা বা নবনীত চৌর রূপ, প্রেম লীলা এবং রাধার হ্লাদিনী রূপই হলো প্রধান। এই ধারা থেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লীলা বা মিথুন তত্ত্বের প্রয়োগ এক মহা মিলনের ইঙ্গিত বহন করে। আদি মাতার বীজ এখানেই প্রোথিত হয়।

সমাজবদ্ধ জীবরা যখন লাঠি পেটা করে মৃতপ্রায় কিশোরকে ফেলে রেখে চলে যায় ক্যামেরা তখন Low angle-এ অবস্থান নেয়। Left frame-এ কিশোর, Right frame থেকে উঠে আসে রাজার ঝি। ওরা পরস্পরকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। এই Impositionটি আমাকে মুহূর্তের জন্য Michelangelo-র The Creation of Man চিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই পুরো আয়োজনটিই ছিলো ঋত্বিকের স্বকল্পিত বা Imposed. শিল্প সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সামগ্রিক বিন্যাসে Intentional use বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত আরোপন দর্শকদেরকে ভিন্ন অর্থবোধকতার দিকে ধাবিত করে। রাজার ঝির মৃত্যু এক কঠিন প্রশ্নের উত্থাপন করে। তার মৃত্যুর হেতু কি? এই আরোপনের আদি

উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার কোন কিছু জানা নেই। তবু তিতাসের জলে এসে রাজার ঝির তিরোধান আমার ধারণায় তিতাসকে তার সন্তানের মাত্রা দান করে। এখানে অনন্ত আর তিতাস সমান্তরাল মাত্রায় এসে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয় বাসন্তীর সংলাপে। পাশাপাশি এখান থেকেই রাজার ঝির ভগধারিণী মহামাতায় রূপান্তর ঘটে।

Mythical Image বা পুরাণ প্রতিমার এহেন প্রয়োগ ব্যাপক ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করে। অনন্তর কাছে ওর মা ভগবতী রূপে দেখা দেয় কেন? এর গূঢ়ার্থ কি? তাহলে কি অনন্তও তার খোলস ভেঙ্গে মহাজাগতিক উপজাত বা Cosmic product-এ রূপান্তরিত হয়? অন্যদিকে বাসন্তীর ভেতরেও অন্তর্গত পরিবর্তন প্রকাশিত হতে থাকে। তিতাসের এ পর্যায়ে এসে দ্বৈত পুরাণ প্রতিমার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। একটি প্রত্যক্ষ—রাজার ঝি-র ভগবতী রূপ ; অন্যটি সন্নিহিত—বাসন্তীর বরাভয় কালী রূপ। সুদূরের পিয়াসী চিরচঞ্চল ঋত্বিক এইভাবে তিতাস পারের অযুত মানুষের জীবনগাথা ধ্রুপদী ও মহাকাব্যিক পরিসীমায় অনুবদ্ধ করতে চেয়েছেন। এই মহাকাব্যিক যোজনার কাজটি করতে গিয়ে ঋত্বিক তিতাসের গঠন প্রকৃতিতে কিছুটা শিথিল ভঙ্গির আরোপ করেছেন। ছোট ছোট ঘটনা— ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনাচার—হাসি কান্নার সমভিব্যহারে—কঠিন স্থৈর্যে— মহাকাব্যের বিশাল লীলাভূমি তৈরি হয়েছে। মহাকাব্য নির্মাণকলায় ঘটক প্রতীচ্য নয়, ভারতীয় ঘরানার দিকেই ঝুঁকেছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন— ভারতীয় মহাকাব্য পাশ্চাত্য প্রকরণে বেড়ে ওঠে নি। ভারতের প্রাচীন দু'টি মহাকাব্য—রামায়ণে করুণ রস ও মহাভারতে শান্ত রসের প্রাধান্য। তিতাসও রামায়ণের মতোই করুণ রসাশ্রিত মহাকাব্য।

আমার মনে পড়ে, বহুদিন আগে, সম্ভবত ১৯৮০-৮১ সালে, ভারতের ডাকসাইটে চলচ্চিত্র সমালোচক ও পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের প্রখ্যাত অধ্যাপক শতীশ বাহাদুর এবং ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম অর্কাইভের কিউরেটর সৌরেন্দ্র চৌধুরীসহ আমরা তিতাস দেখছিলাম। প্রদর্শনী শেষে সৌরেন্দ্র চৌধুরী বললেন— শেষটা যেন কেমন হঠাৎ হয়ে গেল? পাশ থেকে বাহাদুর বাবু উত্তর দিলেন— it is a typical Ghatakian end. বাহাদুর বাবুর এই মন্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি তিতাস নদীর পাড়ের অগণিত মানুষেব বাঁচা-মরা ও জীবন সংগ্রামের অবিরাম অভিলেখ। এর কোন আদিও নেই—অন্তও নেই। এ রকম ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই Negative-এর কোন এক জায়গায় হাত দিয়ে জোর করে ছিঁড়ে ফেলতে হয়।

ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'অযান্ত্রিক' আমি দেখি বেশ কালক্ষেপণের পর। বলতে গেলে অযান্ত্রিকে ঋত্বিকের সাথে আমার দ্বিতীয় মোলাকাত। অযান্ত্রিক প্রথম নির্মাণকর্ম বিধায় হয়তো কিছুটা প্রথাগত রীতিনীতি মেনে এগোবার চেষ্টা করেছেন ঋত্বিক। ঋত্বিক ঘরানার উন্মেষের কাল বলে অযান্ত্রিককে ওঁর অন্যান্য ছবি থেকে কিছুটা অন্যরকম লাগতে পারে। তদুপরি এ চলচ্চিত্রটিতেও সৃষ্টির উন্মাদনার প্রখর প্রকাশ

আছে। গা কাঁপানো বিন্যাসে ঋত্বিক সাজিয়েছেন এ ছবির Theme-কেও। আধুনিক কিন্তু পশ্চাৎপদ ভারতের এক জরুরী প্রশ্নকে তুলে নিয়ে এসেছেন এ ছবিতে। আমার মনে হয় এই ছবির সবচেয়ে ব্যতিক্রমী এবং সঠিক আলোচনাটি করেছেন একজন বিদেশিনী। মারি সিটন। লেখাটিতে সিটন ঘটককে Infant terrible বলে আখ্যায়িত করেছেন। মারি সিটন এই Terrible term-টি কক্‌তোর একটি বই থেকে নিয়েছেন বলে মনে হয়। আর কক্‌তো তার বইয়ের নাম হিসেবে এই টার্মটি বেছে নিয়েছেন নিশ্চয়ই একটা Mythical extention-এর অভিপ্রায় থেকে। ফলে এই অভিধাটি বরং ঋত্বিককেও একটা মাত্রায় নিয়ে গেছে। পৃথিবীতে চূড়ান্ত সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারে শুধু এই Terrible-রাই। সৃষ্টিসুখের উল্লাসে এরা পাগলপারা। উন্মাদগ্রস্ত এই Terrible-রা কিছু গড়তে চাইলে ভেঙে তছনছ করে গড়েন। 'Dream of a queer fellow and other Pushkin essays' গ্রন্থটিতে দস্তয়েভস্কি এই উন্মাদনাকেই শিরোস্ত্রাণ বলে মাথা পেতে নিয়েছেন। মারি সিটনের অভিমত—সহস্র বছরের স্থবির ভারতের লাঙল নির্ভর কৃষি অর্থনীতিকেই আঘাত করতে চেয়েছেন ঘটক অযান্ত্রিকে। জড় ভারতের অচলায়তনকে বোঝাতে ঘটক রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। বিমল ও তার অথর্ব গাড়িটির পৌনঃপুনিক সম্পর্কের মধ্যেই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। একদিকে Tradition-এর প্রতি তীব্র ভালবাসা বা পুরনোকে আঁকড়ে থাকার উদ্ভট পাগলামি— অন্যদিকে নতুনের প্রতি ভয়—এই দ্বন্দ্বের তীব্র যাতনায় পীড়িত এক সমাজের বিলাপ 'অযান্ত্রিক'। বিমলের পাগলামির মধ্যে একটা আদিমতা আছে। বিমল শিশুর মতো— আদিবাসীদের মতো সরল। গাড়িটি তার কাছে যন্ত্র নয় মানুষ—অযান্ত্রিক। জগদ্দল ও বিমলের মধ্যে যে আত্মিক যোগাযোগ—নীরব অন্তরঙ্গ কথোপকথন চলে তার ভাষা বোঝা দুষ্কর। গাড়িটি বিমলের কাছে জীবন্ত প্রেমিকার মতো। বিমল চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকা রাধা-কৃষ্ণ অথবা দান্তে-বিয়াত্রিচের মতোই নিজেকে কৃষ্ণ অথবা দান্তে ভাবতে শুরু করে। একদিন এক সুন্দরী যাত্রীর প্রতি বিমলের দুর্বলতা টের পেয়ে রাগে অভিমানে জগদ্দল সত্যি সত্যি বিগড়ে বসে। বিমল জোড়হাত করে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলে জগদ্দল আবার চলতে শুরু করে।

বিমল যে এক উদ্ভট ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছে সেটা বোঝাতে ঘটক ছোটনাগপুরের মনোমুগ্ধকর অপরূপ নৈসর্গিক প্রকৃতির মধ্যে অথর্ব, হাড়জিরজিরে গাড়িটিকে ছেড়ে দেন— যাতে এই contrast-টি বেরিয়ে আসে। জড় পদার্থে প্রাণ আরোপের ব্যাপারটি বোঝাতে ঘটক শিল্প-সাহিত্যের বেশ একটি আধুনিক Form-এর ব্যবহার করেছেন। বিমল যখন কার্বোরেটরে পানি ঢালছিল, জীবন্ত মানুষের মতোই ঢকঢক করে পানি টুকু খেয়ে নেয় গাড়িটি। Sound Track-এ তখন মানুষের পানি খাওয়ার শব্দ জুড়ে দেয়া হয়। এই ব্যাপারটিকে সাহিত্যের ভাষায় বলে Anthropomorphism. জগদ্দলের প্রতি বিমলের ভালবাসার তীব্রতা এতটা গভীরে গিয়ে পৌঁছায় যে, গাড়িটি চূড়ান্ত পর্যায়ে বিমলের Totem-এ রূপান্তরিত হয়। গাড়িটির

ধ্বংস নিজের অস্তিত্বহীনতা বলেই বিমল ভাবতে থাকে। জীবনের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ব্যয় করে বিমল গাড়িটিকে নবযৌবন দান করার আশায়। কিন্তু বিমলের এই সর্বনাশা ভালবাসা এক বিশাল Tragedy-তে পরিণত হয় যখন চূড়ান্তভাবে বিগড়ে যাওয়া গাড়িটি বিমল Scraps হিসেবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। কালোয়ার যখন গাড়িটির ছিন্নভিন্ন ধ্বংসস্তূপ ঠেলায় করে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও বিমলের মনে হয় গাড়ির Headlight দুটো যেন জীবন্ত চোখের মতোই ওর দিকে করুণভাবে তাকিয়ে আছে। বদ্ধ উন্মাদ বিমলরা এটা বোঝে না—ভালর জন্য, নতুন কিছুর জন্য অনেক সময় মৃত্যুকে—ধ্বংসকেও মেনে নিতে হয়। এটাই হল Law of life. যে মৃত্যু অবধারিত তার লাশ কাঁধে বয়ে বেড়ানো অর্থহীন, বরং তাকে কবর দিয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত জরুরি। এই বিষয়টি বোঝাতেই ঘটক ছবির শুরুতেই কবরস্থান—বিবাহ বাড়িতে যাওয়া—আবার আদিবাসী নৃত্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই Life Circle-এর বর্ণনা—এসবের অবতারণা করেছেন। যে বিরাট মর্মন্তদ Tragedy-টি বিমল বহন করে বেড়িয়েছে— সেই Tragedy-টিকে কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডির ভবিতব্যের মতো অথবা ব্যারোক ট্র্যাজেডির Egoism-এর মতো কোন কিছু প্রস্তুত করে দেয়নি— এক অন্ধ আবেগই তার পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে। এইভাবে একজন গাড়ি চালকের নিষ্ঠুর করুণ কথকতা, অতি সন্তর্পণে একটি জাতির মর্মান্তিক গাথায় পরিণত হয়েছে।

বিষয়ের প্রতি, চরিত্রের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও দরদই ঘটককে এক চিরায়ত শিল্পীর মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তার এই মমত্ববোধ যে শুধু সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। সেটিকে সে দর্শকের প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবিতেও দেখতে চাইতো। এই ব্যাপারটি এক obsession-এর মতো ঋত্বিককে একটা পাগলামির পর্যায়ে নিয়ে যায়—যখন দেখি একটা শো হাউজের সামনে সে দাঁড়ানো। হাউজের লোকেরা শুটিংয়ের সেই জগদ্দল গাড়িটিকে লবির ছাদের ওপর তুলে দিয়েছে পাবলিসিটির চমক হিসেবে। সামান্য হাওয়াতে গাড়িটির হেড লাইট দুটো নড়ে উঠছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঋত্বিক এক সময় দেখেন একটা চড়ুই পাখি এসে হর্ণের হাতলের উপর বসার চেষ্টা করছে। পাখিটার ঠোঁটে গাছের একটা শুকনো ডাল। ঘটক বলছে 'আমি চুপি চুপি ওখান থেকে চলে এলাম। মনে মনে ভীষণ চাইছিলাম চড়ুই পাখিটা যেন জগদ্দলের ভেতরে বাসা বাঁধে'। ঋত্বিক ঘটক ভিতরে বাইরে এই অফুরন্ত আবেগ নিয়েই ছুটে বেড়িয়েছেন আমরণ—একজন অমর স্রষ্টার মতো।

অনুক্ত অনুরণন, তবুও ...

আবার কিছুদিনের বিচ্ছিন্নতার আঘাত সজাগ করে তোলে আমাকে। আমার বিশেষ অনুরোধে ফিল্ম আর্কাইভের সম্পাদনা ক্লাশে 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখানোর ব্যবস্থা হয়। বেশ ঝড়-ঝঞ্ঝা পেরিয়ে 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখা যখন সমাপ্ত হলো আমার ভেতরেও তখন প্রচণ্ড ঝড় ও ঝঞ্ঝায় সব কিছু উথাল পাথাল অবস্থা। এই ঘোর কাটতে বেশ

কয়েকদিন সময় লেগেছিল আমার।

'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রকে অত্যন্ত ঋজু ভঙ্গিতে শক্ত গাঁথুনিতে গেঁথেছেন ঘটক। এই ছবিটিতে ঘটক লক্ষ্য স্থির রেখে স্বয়ম্ভু মূর্তিতে আবির্ভূত। একজন বুনিয়াদী চলচ্চিত্রকারের অপার দক্ষতার সমস্ত গুণাবলী নিয়ে প্রকাশিত হয়েছেন এই চলচ্চিত্রটিতে ঘটক। 'মেঘে ঢাকা তারা' আসলে উন্মূল মধ্যবিত্তদের শ্রান্তিহীন জীবনের পাঁচালী— যা এক অনন্ত চক্রাবর্তে আবদ্ধ। মূলত এই Theme-টিকেই একটি গল্পের ফাঁদে আটকে দিয়েছেন ঘটক। নীতা, গীতা, সনৎ, মা, ভাই ও বাবা—এসব চরিত্রগুলো কেবল গল্পের কলকাঠি নাড়তে থাকে। এই কাহিনীটি একটি নিছক ত্রৈয়ী প্রেমের গল্প হতে পারত— কিন্তু তা হয়নি। হয়েছে—মধ্যবিত্ত পরিবারের নিষ্ঠুর যাতনার এক নির্মম বলিদানের কাহিনী।

আর তার শিখণ্ডী হলো একটি মেয়ে—শ্যামবর্ণা—নীতা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সে সংসার চালায়। পুরো সংসারটি নিয়ে ওর ভেতরেও এক বিরাট Vision কাজ করে। জীবনের সবকিছু বিলিয়ে সে এই সংসারটিকে উন্নীত রাখতে চায়। কিন্তু সর্বংসহা এই মেয়েটির আত্মত্যাগ আত্মাহুতিতে পরিণত হয়—যখন সে দেখে তার প্রেমিক সনৎ তারই ছোট বোন গীতার বাহুলগ্ন। তখন নীতার জীবনের সব স্বপ্ন অর্থহীন বুদবুদে পরিণত হয়। সনৎ যদি অন্য কোন নারীর হাত ধরে বেরিয়ে যেত তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ততটা মর্মান্তিক হতো না। কিন্তু এখানে নীতার antagonist তারই বোন। —আর তখনই ব্যাপারটি ট্র্যাজেডি-র আকার ধারণ করে। শুধু তাই নয় নীতা যখন জানতে পারে এর পেছনে রয়েছে ওরই মার ইন্ধন— ট্র্যাজিডিটা তখন আরও বিশাল আকার ধারণ করে। নীরব, একাকিনী, নিঃসঙ্গ নীতার অন্তর্গত দহন তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। ছবির শুরুতে নীতা ছিল কর্মে, উৎসাহে, যৌবনের উচ্ছ্বাসে ভরপুর পূর্ণাঙ্গ এক নারীর উর্বরা শক্তির প্রতীক। তারই সমান্তরালতায় প্রকৃতি তার অপার সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। ভোরের নিঃসংকোচ প্রকৃতিতে—কোমল সূর্যালোকে— বিশাল বৃক্ষের আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে গায়ক শংকর—পেছনে স্নিগ্ধ নদীর জল—রূপাশ্রয়ী ছোট ছোট প্রকৃতির সঙ্গে টুকরো টুকরো হংসধ্বনি রাগটি শোনা যায়। এসবকে ভেঙেচুরে ট্রেন চলে যায়। আবার পাখির মধুর কলধ্বনিতে ভরে যায় সব। 'Poetry of earth is never dead'. এরকম একটা স্থানে নীতার আবির্ভাব এ কথাই বোঝায় যে— প্রকৃতির এই পূর্ণাঙ্গতার প্রতিচ্ছবিই ঘটক নীতার মধ্যে বাঙ্ময় দেখতে চেয়েছেন। চিরকালীন অখণ্ড বাংলার বিস্তৃত—সামগ্রিক *নৈসর্গিক সৌন্দর্যেরই* Metaphor *নীতা—যার মধ্যে সহস্র বছরের বাংলার রূপ-মাধুর্য* ও ঐশ্বর্য এসে লীন হয়েছে। অনেকটা জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'-এর Metaphor-এর মতো। বাংলার এই অখণ্ড অপরূপ সৌন্দর্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিল দেশ বিভাগ—অসুস্থ রাজনীতির প্রতিক্রিয়া। নীতার অবক্ষয়ের Tragedy-কে দেশ বিভাগের Tragedy-র সঙ্গে একীভূত দেখতে চেয়েছেন ঘটক। এক ষড়যন্ত্রের জাল, দেশ বিভাগের মতো, নীতাকেও টুকরো টুকরো করেছে। তাই বিভক্ত বাংলার মতো

নীতাকেও টুটা-ফাটা নীতারূপে দেখতে পাই। পরাজিত, বিধ্বস্ত চিত্রটি আরও গভীরভাবে ফুটে ওঠে যখন দাদা শংকর ওকে গান শেখায় :

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গল ঝড়ে,
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।

নীতা ওর সঙ্গে গলা মেলায়—

সব যে হয়ে গেল কালো,
নিভে গেল দীপের আলো,
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহারও তরে ?

আর তখন গানের নেপথ্যে দর্শকদের অন্তরকে ফালি ফালি করে দিয়ে চাবুকের শব্দ বেজে যায়। নীতা প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। গানটি ক্রমশ স্বপ্ন-ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়া এক মেয়ের বিলাপ ধ্বনিতে পরিণত হয়। গানটির effect এত গভীরে গিয়ে নাড়া দেয় যে গানটির Subjectivity নীতার Portraiture-এ রূপান্তরিত হয়। মূলত এক দুঃসহ কাল নীতাকে হরণ করতে চায়। নির্মম এক কালান্তক বাসা বাঁধে ওর ভেতরে। এখন নীতার সামনে যে উন্মুক্ত প্রশস্ত পথ তার শেষে যা অপেক্ষা করছে— তা হল মৃত্যুর খোলা দরজা। গ্রীক পুরাণের সিসিফাসের মতো নীতাও এই পরিণতির কথা জানে। ধ্বস্ত নীতা এই যাতনা থেকে—এই রূদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। এক বৃষ্টির রাতে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে। অঝোর বৃষ্টি এসে ওকে মুক্ত করে। বিগলিত করুণা ধারা ওকে ধারণ করে। এক অলৌকিক আলোর স্পর্শ ওকে উদ্ভাসিত করে। ইহজাগতিকতা থেকে মুক্ত নীতার অনাবিল ঐশ্বরিক হাসি ঝরে পড়ে। চোখে অলৌকিক দ্যুতি। পরে ও যে মহাকালের গর্ভে আশ্রয় নেবে এখান থেকেই তার Transformation-এর শুরু। Eternal return of cosmic force. নীতার এই Alienation ওকে মহাকালিক সংযোগের দিকে ধাবিত করে। এই জায়গাটির Construction-এর মুন্সিয়ানা ও অপূর্ব গীতি ধর্মিতা এক অতুলনীয় মাত্রায় উন্নীত করেছে 'মেঘে ঢাকা তারা'কে।

নীতার অমিত উর্বরতা শক্তির নিষ্ফলতা— ওকে মৌল প্রতীকের উৎসের দিকে ফিরিয়ে নেয়।—মাতা ধরিত্রী ওকে ধারণ করবে—মহাকাল ওকে গ্রহণ করবে, এসবেরই আয়োজন দেখা যায় শেষ দৃশ্যে। Sanatorium-এর সামনে নীতা বসে— দূরে পাহাড়—পেছনে আলোর ঝলকানি— দূরাগত এক সঙ্গীত ধ্বনি চলছে— এসব তারই ইঙ্গিত। এখানে শংকর ওদের দোতলা বাড়ির গল্প শোনায়—গীতার ছেলের দুরন্তপনার গল্প শোনায়। নীতা জানতে চায়— ও হাঁটে কিনা, লাফায় ঝাঁপায় কিনা— হাসে কিনা? এখানে জীবন ও মৃত্যু মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। দুরন্ত নবজীবনের প্রাণোচ্ছ্বাস ও শক্তিমত্তার Contrast নীতার রুদ্ধদ্বার খুলে দেয়। নীতা উন্মত্ত চিৎকারে ফেটে পড়ে— দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—দাদা আমি বাঁচতে ভালবাসি। Camera

উন্মাদের মতো প্রকৃতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে—মাটি নদী গাছপালায়। এসব আঁকড়ে ধরে যেন বাঁচতে চায় নীতা। —'দাদা, আমি বাঁচতে চাই'—ওর এই হাহাকার পাহাড়, প্রান্তর, মাটি, নদী পেরিয়ে আকাশের নিঃসীমতায় মিলায়—।

মেঘে ঢাকা তারার শেষ দৃশ্যে এসে আমার আইজেনস্টাইনের কথা মনে পড়ে যায়। এই দৃশ্যটি নির্মাণে আমার মনে হয় ঘটক আইজেনস্টাইনের সাহায্য নিয়েছেন। আইজেনস্টাইন Theodore Dresei-র উপন্যাস An American Tragedy নিয়ে একটি Script লিখেছিলেন Film করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছবিটি নির্মিত হয়নি। ঐ গল্পের প্রধান চরিত্র একজন নিম্নবিত্ত শ্রমিক। একটি ভাল জীবনের প্রলোভনে ও ওর প্রাক্তন প্রেমিকাকে খুন করে। বিচারে ওর ফাঁসি হয়। ছেলেটির মা জেলখানায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে—খোকা তোর শেষ ইচ্ছা কি— তুই কি চাস বল? ছেলেটি তখন হঠাৎ Outburst করে— মা, আমি বাঁচতে চাই— I want to live. আইজেনস্টাইন চিত্রনাট্যে লিখেছেন—Camera কারাগারের ঐ বন্দিদশা থেকে Jump করে প্রকৃতিতে, নদীতে, গাছপালায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। নীতার রুদ্ধশ্বাস জীবনের সমাপ্তি দৃশ্যে আইজেনস্টাইনের দিকে হাত বাড়িয়ে ঋত্বিক চলচ্চিত্রটিকে বিস্ময়কর মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এ রকম লেনদেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বয়ান হল— ঋণ নেয়া দোষের কিছু নয়— কিন্তু সে ঋণ ফেরত দিতে হয়। আমার মনে হয় এখানে ঋত্বিক যথার্থই আনৃণ্য হয়েছেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা যদি নার্স হতো অথবা কোন ধর্মীয় সংস্থার সেবিকা—তাহলে গল্পটি অন্য মাত্রা পেত। যেমনটি ঘটেছে বুনুয়েলের Viridiana-তে। কিন্তু এটি সে রকম আত্মত্যাগ বা বিশ্বাস চ্যুতির গল্প হয়নি। গল্পটি অনবরত আশাভঙ্গের গল্পে পরিণত হয়েছে। এই আশাভঙ্গের জন্য যে নীতার মা দায়ী তা নয়, ওর বোন বা সনৎ দায়ী তাও নয়। ওদের চেয়েও বড় antagonist হয়ে দেখা দেয় এই সমাজ, এই পরিবেশ, এই অর্থনীতি। যে পরিবেশে একটি অনবদ্য প্রেম পূর্ণতা পেতে পারত—তা রুদ্ধ। যে পরিবেশে একটি অপূর্ব জীবন সজীব হয়ে উঠতে পারত— সে পথও রুদ্ধ। এটি যে শুধু কলকাতার শহরতলীর রিফিউজি কলোনির কথকতা তা নয়। এর ছাপ পাওয়া যাবে এশিয়ার নগরে-বন্দরে, ইউরোপের আনাচে-কানাচেতেও। তারই প্রমাণ পাই যখন ইতালির প্রখ্যাত দার্শনিক আন্তনিও গ্রামসি আধুনিক ইতালির দার্শনিক রূপকার মাৎসিনির ভাষায় চিৎকার করে উঠেন— সুস্থ সাবলীল প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত পরিবেশ চাই। তখন সে চিৎকার যেন Ultimately নীতারই চিৎকার হয়ে ওঠে।

ঋত্বিক ঘটক পরবর্তীতে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিটিকে হেলার চোখে দেখতেন বলে শুনেছি। কেউ যদি বলতেন,— হ্যাঁ, আপনার মেঘে ঢাকা তারা দেখেছি, খুব সুন্দর। উনি ক্ষেপে যেতেন। বলতেন— ফিল্মের তুই কী বুঝিস? এটা কোন ছবি হলো? এসব

শুনে লোকটিকে আমার বদ্ধ পাগল মনে হয়েছিল। এমন উচ্চ মার্গের চলচ্চিত্রকেও কেউ হেলার চোখে দেখে? তাও আবার নিজের ছবি। ঋত্বিকের এই কথার সারবত্তা বুঝতে পেরেছি আরও পরে— যখন আমি 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটির মুখোমুখি হই। চলচ্চিত্র শিল্প যে কি রকম অকল্পনীয় উচ্চমার্গে গেলে 'মেঘে ঢাকা তারা'র মতো ছবিও কিছুটা ম্রীয়মান লাগে 'সুবর্ণরেখা' না দেখলে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

চৌকুণো পর্দার মধ্যে যে আলো-ছায়ার খেলা চলে তাই দিয়ে অংকিত হয় অমর চিত্রাবলী। এরই বিচ্ছুরণে নড়েচড়ে উঠে ধূসর অবয়ব। যেন একরাতের ঝড়ে একদল উড়ুক্কু পাখির মতো জড়ো হয়েছে এরা। উদ্বাস্তু। এদেরই মধ্য থেকে দুজন লোক নড়াচড়া করে ওঠে। হরপ্রসাদ ও ঈশ্বর। স্পষ্ট বাণী নিসৃত হয় এদের মুখ থেকে— শ্লোক পাঠের মতো। প্রবল ভাঙনের মুখেও এরা সবকিছু ধরে রাখতে চায়। প্রবল Vision-এ তাড়িত এরা। অনন্ত স্বাপ্নিক। যেখানে জড়ো হয়েছে এই বিশ্রস্ত লোকেরা— তার নাম দেয় এরা নবজীবন কলোনি। স্কুল খোলা হবে—পাঠ হবে— আর এখান থেকেই শুরু হবে নতুন জীবনের সূত্রপাত। যেন স্বপ্নের ভেতরে কোথাও ভেসে উঠে জীবন নদীর ছবি— নাম তার 'সুবর্ণরেখা'। তার তীরে নতুন বাড়ি — সেখানে বাগান— বাগানে রঙিন ফুল—বিচিত্র রঙের প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায় সেখানে।

এই 'স্বপ্ন' ব্যাপারটি 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটিকে মূল সুরে বেঁধে রাখে। আশাবাদ। বলতে গেলে সুবর্ণরেখার অদ্বিতীয়ত্ব বহু প্রকোষ্ঠে বেড়ে উঠেছে। এই স্বপ্নের চালটি পুরোব্যাপারটিকে একটি ঐক্যে গ্রোথিত রাখে। যদিও সুবর্ণরেখা নদী সম্পর্কিত গল্পটি প্রত্যক্ষ করা যায় আরও পরে ছাতিমপুরে Steel মিলের Care Taker যখন সীতাকে গল্পটি শোনায়; তবুও এই 'স্বপ্নটিই' বিভিন্নরূপে জেগে থাকে জীবনাচারী মানুষের ভেতরে।

'সুবর্ণরেখা'র আখ্যানভাগ সরাসরি উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে। যে খন্ডিত বাংলার Nostalgia ঘটককে সারাজীবন চাবকে বেড়িয়েছে—'সুবর্ণরেখা'তে এসে সে ব্যাপারটিকে তিনি ধরতে চেষ্টা করেছেন প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীতে। তাই এই ছবিটিতে তিনি ততধিক সোচ্চারে—দ্যুতিত ও ক্ষিপ্ত সংরাগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মনুষ্য জীবনের বেঁচে থাকার পরিহাসকে—অবক্ষয়কে নানা দ্ব্যর্থবোধকতায় ধরার চেষ্টা করেন এবং একেবারে অন্তরীক্ষে আঘাত হানেন। তাই এর জীবনচক্র নানারকম চড়াই উৎরাইতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপ্রবাহ, বিভিন্ন চরিত্র—হরপ্রসাদ, ঈশ্বর, সীতা, অভিরাম—ছাতিমপুরের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, উপজাতীয় মেলা, বর্ণপ্রথা, ধ্রুপদী সঙ্গীত, ইউরোপীয় ক্লাব,—গল্প ও কথার সমারোহ—Symphonic orchestra-র মতো অথবা রাগ সঙ্গীতের আরোহণ অবরোহণের মতোই সুবর্ণরেখাকে গ্রোথিত করে। ঋত্বিকের বেশিরভাগ ছবিরই বনুন অটুট—বিন্যাস অসাধারণ। প্রত্যেকটি Sequence, প্রত্যেকটি Shot, প্রত্যেকটি Frame-ই একটা Participatory ভূমিকা রাখে। ঘটকের ছবির দৃশ্যপট,

চরিত্রসমূহ, শব্দ ও সঙ্গীত, কাটিং, ঘটনার পারম্পর্য সরল রৈখিক নয়। বহু অর্থবোধকতায় জারিত। ছাতিমপুরের সেই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিত্যক্ত পুরনো Aerodrome—যেখানে সীতা ও অভিরাম খেলা করে, লাফায়-ঝাঁপায়, হাততালি দেয়—সেই aerodrome-টিও কিন্তু ঘটনার object নয়; এটি নানান Dimension-এ আবির্ভূত। এর একটি দিক হল Aerodromeটি সাহিত্যের ভাষায়—ক্রীড়ারত শিশু দু'টির ভবিষ্যৎ জীবনের Fore-shadowing effect. ভবিষ্যৎ জীবনে এই শিশু দুটির জন্য অপেক্ষা করছে এক বিরাট জীবন যুদ্ধ। সে যুদ্ধ কখনও সমাজের সঙ্গে— কখনও নীতির সঙ্গে—কখনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অথবা আরও অনেক কিছুর সঙ্গে। সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজিতের পরিণতি রূপে আসে এই পরিত্যক্ত Aerodrome. এটি যে শুধু সীতা-অভিরামের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতিরই প্রতীক তাই নয়। অন্য অর্থে, আরও বৃহত্তর পরিসরে—২০০০ খ্রি. পূর্বাব্দে রণদেবী যখন তার রণভেরী বাজিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন— সেই হতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা তার পর পর্যন্ত কালে কালে যুগে যুগে— লোকালয় জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের যে ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী রূপ, দেশ বিভাগের বীজও যার মধ্যে নিহিত, তারই মূর্ত প্রতীক এই Aerodrome-টি। এভাবে স্থান, কাল ও পাত্রের গণ্ডী পেরিয়ে এই Aerodromeটি মহাকালের প্রতীকে, সমগ্র মানব প্রজন্মের ভূত, বর্তমান—হয়তোবা ভবিষ্যতের মর্তমান প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। এই Aerodromeটি বিরাট ব্যাখ্যার দাবী রাখে এবং একটি শক্ত চরিত্রে রূপান্তবিত হয়। আর এই যে দুটি অবুঝ শিশু এতবড় একটা প্রতীকের ওপর দাঁড়িয়ে হাসছে খেলছে— এই ব্যাপারটি Sub-conscious-এ ঘটককেও কাঁপিয়ে দেয়। আর তাই ঘটক ধাম করে ওদের চণ্ডীমূর্তির সামনে দাঁড় করিয়ে দেন— বিষয়টির ভয়াবহতার সূত্র ধরিয়ে দিতে। এভাবে পুরো ব্যাপারটি বিঘটনের কোলে এসে পড়ে। যে বহুরূপীটি কালীর মুখোশ পড়েছিল—তাকে ধরে ফেলা হয়। বরাভয় তারার মুখোশের পেছনে যে ছিল প্রকৃতপক্ষে সে ভীত-নিরীহ একটি প্রাণী।

সীতা নামটিও বেশ দ্যোতনাময়। ওকে রামায়ণের সীতার গল্পটি শোনান হয়। আর তখনই পৌরাণিক সীতার Myth-টি ওর উপর প্রযুক্ত হয়। সেই থেকে পুরাণের সীতার সমস্ত বিড়ম্বনা, সমস্ত ক্লেশ ওকে বয়ে বেড়াতে হয় মৃত্যু অবধি।

ছাতিমপুরের আদিম মনোমুগ্ধকর প্রকৃতিতে সীতার বেড়ে ওঠাটাও বেশ ব্যঞ্জনাময়। বয়োসন্ধির সময়টায় আমরা ওকে প্রকৃতিতেই পাই। ও যেন প্রকৃতিরই সন্তান। গহীন বনে বাতাসের দোলা, পাতা ঝরার শব্দ, নদীর কলতান সীতার রেণুতে গান হয়ে বেজে ওঠে। এই প্রকৃতির সামনে উপস্থিত পুরুষ। অভিরাম। এই জায়গাটুকু ঘটকের ভাষাতেই বলি— 'যদি কেউ ছবিটি দেখে থাকেন, তার মনে পড়বে সেই শালবনের মধ্যে বসে থাকা সীতা আর দাঁড়ানো অভিরামের প্রথম পরস্পরকে জানার প্রশ্নের দৃশ্যটা। সেই যে সেখানে সীতা দুষ্টুর মতো নাক হাতের বাজুতে ডলছে দুষ্টু দুষ্টু চোখ করে,—সেখানে লক্ষ করলেই দেখবেন— ক্যামেরা একেবারে স্থির—আর সীতার গুঁড়ো

গুঁড়ো চুল থেকে আরম্ভ করে শালবনের সারি, তার পেছনে উদাত্ত মাঠ, তারও পেছনে আকাশে মেঘ, সবকিছু মিলিয়ে এই সরল, প্রথম প্রেমের অভিব্যক্তি। সমস্ত প্রকৃতি এই নবকুমার-সম্ভবের সূত্রপাতের সাক্ষী। তাদেরকেও সম্মানের আসনে বসাতে হবে বৈকি! কাজেই এই সব ব্যাপার।'

এইভাবে প্রকৃতি—সীতা ও অভিরামের আত্মার গ্রন্থি বন্ধনকে সূত্রবদ্ধ করে রাখে। নীল আকাশ, নদী, অরণ্যানী, ঝিরি ঝিরি পাতার ফাঁক দিয়ে আলোর ঝরণা ধারা ওদেরকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। প্রচুর টুকরো টুকরো শট দিয়ে ঘটক এই ব্যাপারগুলোকে গ্রন্থিবদ্ধ করেন। ফলে, সমগ্র Image-গুলোর গ্রন্থনায় অপূর্ব ছন্দোবদ্ধতা ও গীতলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এখানে যৌবনপুষ্ট সীতার Image, প্রকৃতিতে তার Texture, সবমিলিয়ে সীতার যে Graphics ফুটে উঠেছে মুহূর্তের জন্য Fellini-র $8^1/_2$ ছবির দু-একটি মেয়ের ইমেজ ঝিলিক দিয়ে যায়।

মানুষ ও প্রকৃতির এই মহাসমারোহ—জীবনের এই গভীর স্ফূরণ একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। এক বর্বর বর্ণবাদী আক্রমণে এই কাঁচের স্বর্গটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—যখন অভিরামের বংশ পরিচয় উদঘাটিত হয়। সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে অভিরাম ওর মায়ের কোলে ফিরে যায়। ঈশ্বরের শূণ্যগর্ভ একগুয়েমি, অনিন্দ সুন্দর প্রকৃতির মতো, সীতা ও অভিরামকে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর পুঁজিবাদী সমাজের নির্মম পেষণে ঈশ্বর Personal নয় চরম Individual-এ পরিণত হয়। যা হয়েছিল আগের ম্যানেজার। নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতা ঈশ্বরকে গ্রাস করে। এক দুঃসহ শূন্যতাবোধ থেকে ঈশ্বর এক অন্ধকার রাতে আত্মহননের প্রস্তুতি নেয়। হঠাৎ জানালার পর্দা সরিয়ে একটা ভৌতিক ভাঙাচোরা মুখ উঠে আসে— হরপ্রসাদ। ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত মুখটি নড়ে উঠে—'রাত কত হইল, উত্তর মেলে না। ঈশ্বর তুমিও তো দেখি শূন্যে দোদুল্যমান হইতে চাও?' হরপ্রসাদ আজ সত্যিকার অর্থে উদ্বাস্তু— চিন্তা-চেতনা থেকে, বিশ্বাস থেকে— যা ঈশ্বর আগেই হয়েছিল। নিরবলম্ব বায়ুভূত হরপ্রসাদ যখন বলে— রাত কত হইল, উত্তর মেলে না।—তখন আমি এক ঝটকায় 'সূর্যাবর্তে' নিক্ষিপ্ত হই। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যগ্রন্থেই একটা কবিতা আছে 'শিশুতীর্থ'। ঐ কবিতাটিরই একটি লাইন— রাত কত হইল,উত্তর মেলে না। আমার সমস্ত চিন্তাগুলো ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে। ঝটিতি 'সুবর্ণরেখা'র শেষে চলে যাই। সেখানে একটি টেলপ— 'জয় হোক মানুষের—ঐ নবজাতকের...'। আর এক জায়গায় দেখি হরপ্রসাদ বলছে—ঈশ্বর এটা Realise করেছিল। তাই বলছে আর কি—মাতা দ্বার... খোল ...। আবার আর একটি Transition টাইটেলে দেখি লেখা- 'এ রাত্রিরও শেষ আছে'—। চমকে উঠতে হয়। তাহলে কি ছবিটির শুরু থেকেই আরম্ভ হয়েছে এই বিপাক ক্রিয়া বা Metabolism. তাহলে— এই উদ্বাস্তু, হরপ্রসাদ, ঈশ্বর, সীতা, নবজীবন কলোনি— এসব বাস্তব কিছু নয়— Structure মাত্র। আর সে জন্যই ঘটক এ ছবিতে অনেকটাই Stylistic পদ্ধতিতে এগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ঘটকের দ্বৈরথ অভিযাত্রা চলচ্চিত্রটিকে আকাশচুম্বী

মাত্রায় তুলে নিয়েছে। ফলে চলচ্চিত্রটিতে একটার পর একটা Layer unfold হতে থাকে। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিকে টুকরো টুকরো করে নানান ভঙ্গিতে— নানান সুরে ঢেলে দেয়া হয়েছে 'সুবর্ণরেখা'-য়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতেও আবার রয়েছে বহুমাত্রা। কবিতাটিও একটি Structure—কতগুলো ঘটনা— কতকগুলো Movements— কতকগুলো Human elements— উদ্বাস্তু মানুষের কাফেলা ছুটে চলেছে জীবনের উৎসের দিকে— ওরা এসে দাঁড়ায় বদ্ধ দ্বারের সামনে— সেখানে নবজাত শিশুর কান্না শুনতে পায়। আর অলক্ষ্যে এই শিশুই বেথেলহেমের যীশু হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অন্তস্রোতে এই Imageটিই ছিল। কবিতাটি এইভাবে দ্বৈতসত্তায় প্রকাশিত হয়। ফলে 'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটিও বিস্তীর্ণ ভাবনার জালে জড়িয়ে পরে। সভ্যতার গতি ধারার নাভি মূলে গিয়ে আশ্রয় নেয় ছবিটি।

সময়ের যে হিংস্র থাবা—তাও সে দেখে।
যে শোণিত ধারায় ধরিত্রী রঞ্জিত হয়— তাও সে দেখে।
মানুষের যে অবিনাশী অন্বেষণ—সেই সত্য।
সময়কে খোদাই করা যায় না—সময়ই সত্য।

'সুবর্ণরেখা' চলচ্চিত্রটির পরিপ্রেক্ষিত জুড়ে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে নানান বিশ্লেষণে দেখার চেষ্টা আছে। ক্ষয়িষ্ণু সময়— পরাজিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস—এসব মিলিয়ে রূঢ় বাস্তবতার কৌণিক দিকগুলো বেরিয়ে এসেছে ছবিটিতে। ঘটকের চরিত্রগুলো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না— কারণ তৎকালীন সময় ও তার রাজনীতি। সে ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর কাজ হল পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। আর সে কাজটি করতে গিয়ে একটি মুহূর্তকেও সট্‌কে যেতে দেননি ঘটক। হরপ্রসাদ বলে— 'ঈশ্বর, আমারে একবার কলকাতা লইয়া যাবা? আমার তো পযসা নাই। তোমার অনেক অনেক পয়সা আছে। কলকাতায় এখন মজা। দোকানে, হোটেলে, রেসের মাঠে। সে কী বীভৎস মজা। তুমি দাঁড়িয়ে দেখবা আর অবাক হয়ে যাবা।' সংলাপটি সুদূরপ্রসারী—কাব্যিক— আবার রূঢ় এবং জ্বালাময়ী। সংলাপের প্রখরতা অতল তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। আবার হরপ্রসাদ : 'উত্তাল উদ্দাম স্রোতের মধ্যে আকণ্ঠ ভোগ। সে কি নেশা, সব বিকাইয়া যায়। তবু নেশা। যাবা? যাবা সেই দাতার হাটে?' ঈশ্বর : 'যাব'। হরপ্রসাদ : 'চলো। জন্মের শোধ ভাইসা যাই।' হরপ্রসাদের অবিশ্রাম সংলাপ সেই সমাজ ও সময়কে কেটে চৌচির করে দেখায়। হরপ্রসাদের সংলাপগুলো সচেতন নিরীক্ষণ ও বহুমাত্রিকতার দাবীদার হয়ে ওঠে। কথা ও বাক্যের এই Form-কে প্রাচীন ভারতের 'মহাবাক্য'-এর সাথে তুলনা করা চলে। বিশেষত সনাতন হিন্দুধর্মের দার্শনিকেরা ব্রহ্ম-র স্বরূপ অন্বেষণে 'মহাবাক্য' নামক চারটি সূত্রের প্রয়োগ করেছেন। 'আদিনাথ' বা 'ওঁ-কার' এবং 'মহাবাক্য' মিলিয়ে ব্রহ্ম-র অনন্ত স্বরূপ সন্ধানের বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায় এই দার্শনিকদের ভেতর। সংলাপ ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটক যে Form ব্যবহার করেছেন—প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ব্যবহৃত Form-এর সাথে তার সাযুজ্যতা

রয়েছে। Visual-এর ক্ষেত্রে Mythical Image ব্যবহার করে ঘটক যেমন বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করেছেন চলচ্চিত্রে, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তেমনটি করেছেন বলে আমার মনে হয়। সংলাপের বহুমাত্রা এবং চরিত্রের দ্বৈততা মিলিয়ে হরপ্রসাদ বেশ আকর্ষক চরিত্রে পরিণত হয়। আমার মতে, হরপ্রসাদ এযাবৎকালের শ্রেষ্ঠ আধুনিক চরিত্র। হরপ্রসাদ সমগ্র ভারতের কালিক মানচিত্র।

ভোগের নেশায় ঈশ্বর এক বেশ্যার ঘরে গিয়ে ওঠে। ঈশ্বর তাকিয়ে দেখে যার ঘরে সে উঠেছে সে আর কেউ নয়— তারই বোন সীতা। এ কিন্তু আমাদের পুরাণের সেই সীতা। পৌরাণিক সীতার মতো এই সীতার অগ্নিপরীক্ষার জন্য অন্য কেউ এগিয়ে আসেনি— এসেছে পুরুষ। বিনষ্টীর চক্রবৃদ্ধিতে ভরপুর। সীতা যখন চিনতে পারল— এইই ঈশ্বর, তার ভাই। মুহূর্তে প্রায়শ্চিত্য হয়ে গেল তার—মুক্তি। আর ঈশ্বরের অবমৃত্যু। ঘটক বলতে চাচ্ছে—বেশ্যার ঘরে সীতার যে দুরবস্থা—রাজনীতির হাতে বাংলারও সেই দুরবস্থা। বাংলার মর্মন্তুদ পরিণতি সীতার মতোই। 'সুবর্ণরেখা'র ক্রমপাঠে সচেতন দৃষ্টি রাখা দরকার। ভোগবাদে Entertainment একতরফা আর সচেতন ধারায় Entertainment পৌনঃপুনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। 'সুবর্ণরেখা'ও সচেতন সম্ভোগে লিপ্ত শিল্পকর্ম।

শেষ দৃশ্যে আমরা দেখি— সীতার ছেলে বিনু আর তার মামা ঈশ্বর গাট্রি-বোঁচকা নিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে 'স্বপ্নের' সেই বিহঙ্গম বিনুর কাঁধে ভর করেছে। মাথার ভেতরে ধান ক্ষেত— সেখানে রৌদ্র ছায়ার খেলা। ও সামনের দিকে তাকিয়ে। মাথা ঘুরালেই ও দেখতে পায়—লকলকে ধান ক্ষেতের Close shot.— বাতাসে উড়ছে পাতা। বিনু মামা ঈশ্বরকে টেনে নিয়ে যায়। 'মামা, চলো চলো, তুমি বুড়ো হলে কেন— চলো আমাদের নতুন বাড়িতে—সীতা মা বলেছে।' তারপরই গা শিউরে ওঠা সেই ব্যাপারটি ঘটে। সত্যি সত্যি বিণু স্বপ্নের ভেতরে পা রাখে সবাসরি। ওর মামাকে টেনে নিয়ে যায়।

আর জ্বলে ওঠে মহাযজ্ঞের অগ্নিশিখা। হোমের ধোয়ায় মহামানবের গান বেজে উঠে। কান পাতেন অগ্নিহোত্রী। শোনেন সেই মহাকালের গান :

জয় হোক মানুষের।
ঐ নবজাতকের।
ঐ নবজীবিতের।

'সুবর্ণরেখা'র শেষ দৃশ্যটি আর একটি ছবির শেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সেটি হল— সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার'-এর শেষ দৃশ্য। রায়ের ঐ দৃশ্যটিও খুব Haunting। বিভূতিভূষণের ইচ্ছা ছিল Camus-র Outsider-এর চরিত্রটির মতো একটি বোহেমীয়ান, Derail—সমাজ বিচ্ছিন্ন চরিত্র নির্মাণের। তারই একটা Reflection হয়তো অপূর মধ্যে পড়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অপু—লব্ধক বা Orion's Hound হয়ে পড়ে। সমস্ত সংযোগ রহিত হয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারকে ছিন্ন করে সে আবার জীবনে ফিরে আসে। কাঁধে তুলে নেয় মাতৃহীন শিশুটিকে। তাবপর সেই

অপূর্ব Shot-টি শুরু হয় যেখানে— Frame-এর নিচ থেকে উঠে আসে অপু— কাঁধে তার শিশুপুত্র। বিপুল বেগে Music বেজে ওঠে। পেছনে একদম Candid প্রকৃতি। এ দুটি ছবির শেষ দৃশ্যের সঙ্গে আর একটি দৃশ্য যোগ হয় ২০০০ বছর আগে রচিত Virgil-এর Aeneid মহাকাব্যটির সঙ্গে। Aeneid-এ আছে—প্রচণ্ড যুদ্ধের তোড়ে পালাচ্ছে মানুষের Caravan। সেখানে ঈনিসও যাচ্ছে। কাঁধে তার অথর্ব পিতা—সামনে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে শিশুপুত্র। সাহিত্যবিশরদরা এই দৃশ্যটিকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দেখতে চেয়েছেন। তারা বলেন—Virgil বোঝাতে চেয়েছেন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। এইখানে এই তিনটি দৃশ্যের Treatment-এর এই অর্থই দাঁড়ায়— বর্তমানকে ভবিষ্যৎ টেনে নিয়ে চলেছে— নব জীবনের সন্নিধানে। 'সুবর্ণরেখা' বা 'অপুর সংসার' বা Aeneid আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এভাবে মনুষ্য ধর্মের স্তবে সোচ্চার হয়েছে—আর ঋদ্ধ হয়েছে অনন্য অনিমায়।

বিশেষ করে ঋত্বিক সমগ্র জীবন বিলিয়ে এই কাজটিই করে গেছেন। ক্লান্তিহীন।—'I will not rest'. হয়তো তাকেও কাল তাড়া করেছে— সমাজ তাড়া করেছে। সবচেয়ে নির্মম হল— এ সমাজ তাকে না খাইয়ে রেখেছে। একটা ছবি দেখেছিলাম— মডিগ্লিয়ানি বা অন্য কোন চিত্রশিল্পীর ওপর। পরিচালকের নামও মনে নেই। ক্ষুধার্ত ক্লিষ্ট চিত্রশিল্পী গিয়েছে Gallery-র মালিকের কাছে— খাওয়ার জন্য পয়সা চাইতে। মালিক ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখনও সময় হয়নি। মালিক জানে, অনাহার ওকে বারুদে পরিণত করবে। আর ও ফেটে পড়বে এক সময়। আর সে কাজ বেশ চড়া দামে বিক্রি করা যাবে। সেই নিষ্ঠুর পরিকল্পনা এই সমাজ করেছে ঘটকের সঙ্গেও। তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কেটে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। Divided Self. আর সেই ফাটল দিয়ে কোন অজান্তে ওর হাতে উঠে এসেছে মদিরা পদ্য। নিজের নাম বদলে রেখেছে নীলকণ্ঠ। সদর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। সামনে সমগ্র বাংলাদেশ। নদী-নালা, পাহাড়, অরণ্যানী, সবুজ ধানক্ষেত— সব ওঠে এসেছে তার সামনে। জানা অজানা বহু চরিত্র এসে তার চারপাশে ভিড় করে। নচিকেতা, পঞ্চানন, জগন্নাথ, বঙ্গবালা ...। শুরু হয় প্রবল তর্ক আর যুক্তি। এসব পেঁচিয়ে একটি গল্পও ফেঁদে বসেন বুড়ো নীলকণ্ঠ বাগচী। নিজে যেমন নামাবলী পড়েছেন— অন্যদেরকেও পড়িয়ে দিয়েছেন তেমনি। আর তৈরি হয় allegory. নীলকণ্ঠ সে। একদিকে শিব— অন্যদিকে নটরাজ। প্রলয় ও সৃষ্টির সমাহার। যে কালকূট পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছে— তার প্রেমে পড়েছে সে। শিল্প। 'আমি প্রেমে আবদ্ধ। তাতে আনন্দ আছে, ব্যথা আছে। ... আমার প্রতি অঙ্গে বাঁশি বাজে'। এই পথে তার যত যুক্তি— যত তর্ক— আর গল্প— তার অনেক কিছুই আমাদের চেনা। সারা জীবনব্যাপীই সে এটা করে গেছে। তার কাছে যে বঙ্গবালা আসে— সে বাংলাদেশের আত্মা। পাক-হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের শিকার। সে মাতৃকা মূর্তি। উর্বরা শক্তির প্রতীক। সে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মাতা। এ রূপটি আমরা দেখি 'মেঘে ঢাকা তারা'য়— 'সুবর্ণরেখা' ও 'তিতাস একটি নদীর নামে'। জমি

নিয়ে যে লড়াইটি হয় সেটি আসে 'আমার লেনিন' থেকে। পঞ্চানন যে ছৌ নাচ দেখায়— সেটি আসে প্রামাণ্য চিত্র থেকে— 'অযান্ত্রিক' থেকে। তার বিস্তীর্ণ সৃজন ক্ষেত্রের মোকাবিলা হয় এখানে। তবুও পঞ্চানন ও জগন্নাথ যে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়— সেটি হল Culture clash—সেটি আসে ইতিহাসের পাতা থেকে। যেটি হয়েছিল Aryans আর Non-Aryans-দের মধ্যে। যেটি হয়েছিল এক হাজার বছর আগে বাংলায়— চর্যা গীতিকার সময়, বাংলা ভাষার উন্মেষের লড়াইতে। 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও বেরিয়ে আসে।

নীলকণ্ঠ বাগচীর এই অভিযাত্রা— রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মতো অথবা কক্‌তোর 'অরফি'র মতোই বহুমাত্রিক। নীলকণ্ঠ একদিন বনের ভেতরে ভোরের প্রথম সূর্যালোকে পুত্রের মুখ দেখতে চেয়েছিল। রাতে বনের মধ্যে ঢোকলে, একদল নকশাল ছেলে ওদেরকে ঘিরে ফেলে। একটি ছেলের প্রশ্ন : কে আপনি? উত্তর : ঐ শিশুটি যা বলল— একটি মাতাল। ছেলে : সোজা খুলির মধ্যে গুলি চালিয়ে দেব একটা। উত্তর : আমি একজন ভাঙা বুদ্ধিজীবী Broken Intellectual— তোমাদের ভাষায় ক্ষয়িষ্ণু— ক্ষয়ে যাওয়া শ্রেণীর একটি ফুরিয়ে যাওয়া প্রতিনিধি। নাম— নীলকণ্ঠ বাগচী।

তদুপরি Broken Intellectual নীলকণ্ঠ বাগচীর কারণ বারী পান চলছেই। এর জন্য সে তলিয়েও যেতে পারে। কিন্তু শিল্পের বাজারে সে অটুট। 'মাল খাবার পয়সা জুটানোর জন্য চূড়ান্ত মিথ্যা কথা বলে যাবো, চুরিও করব। কিন্তু নাম, যশ ও পদমর্যাদার জন্য একটি মিথ্যাও আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না'। বনের ভেতরে ঘেরাও করা পুলিশের হঠাৎ আসা গুলিতে মারা যায় নীলকণ্ঠ। নকশালদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছাড়া নীলকণ্ঠের এই মৃত্যু কারণহীন— Useless. তার এই মৃত্যুকে কী শহীদের মৃত্যু বলা যাবে? অথবা এটি কী একটি কিঞ্চিৎকর যেনতেন মৃত্যু? ঋত্বিককে একবার শিশির ভাদুরী যেমনটি বলেছিল—'এ দেশে শিল্পীর শেষ পরিণতি হইতেছে পথ কুক্কুরের মৃত্যু'— সে রকম কিছু একটা। অথবা 'সুবর্ণরেখা'য় হরপ্রসাদ যেমনটি বলেছিল? মৃত্যুর আগে নীলকণ্ঠ মানিকের মদন তাঁতীর সুতাহীন তাঁত চালানোর গল্পটি শুনিয়ে একথা বলতে চাচ্ছেন— এ মৃত্যু অর্থহীন হলেও— প্রতারক বা লাইনচ্যুত কোন কিছু নয়। এ আকণ্ঠ সচেতন শিল্পীরই মৃত্যু।

এখানে আমার Fellini-র $8^1/2$-এর গুইডোর মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। গুইডোর মৃত্যুর সঙ্গে নীলকণ্ঠের মৃত্যুর তফাৎ অনেক। গুইডোর মৃত্যু যেখানে Narrative— নীলকণ্ঠের মৃত্যু সেখানে Analytical। মনে রাখা ভাল— Fellini বলেছিল— 'আমিই গুইডো'। আর এখানে নীলকণ্ঠই ঋত্বিক। গুইডো বিশাল আয়োজনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। কল্পনার চরিত্রগুলো তার চারপাশে ভিড় করে। শিল্পীর অসীম Expectation-এ তা ধরতে চান তিনি। কিন্তু পারেন না— সব Fail করে। অভিনেতা অভিনেত্রী— কলাকুশলী—নানা অন্তরায় এসে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। নয় নম্বর

ছবিটি হয়ে যায় ফেলিনির সাড়ে আট নম্বর ছবি। নীলকণ্ঠ বাগচীও বাউলের কণ্ঠে বলেন—'নামাজ আমার হইল না আদায়— দারুন খন্যাসেরও জ্বালায়'। গুইড়োর যেখানে শুধু শিল্পের চূড়ান্ত achievement-এর ব্যর্থতার জ্বালা— নীলকণ্ঠের সেখানে আরও অনেক জ্বালা আছে— চূড়ান্ত পর্যায়ে তার প্রধান একটি হল— শিল্পের পেছনে উদ্দেশ্যের বিফলতার জ্বালা। শিল্পী নীলকণ্ঠ বাগচী—সৃষ্টির এক গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। নানা রকম অন্তরায় এসে তাঁকে বাধা দিয়েছে। নানা রকম খন্যাস এসে তাকে উত্যক্ত করেছে। সেখানে সারি সারি পাঁচিল।

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' অথবা 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ কিছুটা বিষ্কম্ভক ব্যাপার আছে। এটা অনেকের পছন্দ হয়নি। শিল্পের 'নিটোলত্ব' বা 'নিখুঁদত্ব' জাতীয় এক প্রকার ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্ব দ্বারা যারা নিজেদেরকে পাকিয়েছেন, ঋত্বিকের কাজ তাদের কাছে খটকা লাগবেই। ঋত্বিকের সঙ্গে তাদের বনিবনা হবে না। শিল্পে ঋত্বিক বেজন্মা নন— ভিন্ন জাতের। এটা বুঝতে হলে ইউরোপ নয়— ভারতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে। ভারতীয় শিল্পধারা যে ইউরোপ সহজাত নয়— উল্টো— সে কথা আমি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি। নিখুঁদত্বের যে নন্দনতত্ত্ব দুই হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে ইউরোপীয় শিল্পধারাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল— সে ধারাটি তৈরি করে দিয়েছিল Aristotle. এটাও আবার Aristotle আহরণ করেছিলেন পূর্ববর্তী হোমার, এসকিলিস, সফোক্লিস ও ইউরোপিডিস থেকে। নিখুঁদত্ব ব্যাপারটি উৎসারিত হয়েছিল Aristotle-এর Imitation তত্ত্ব থেকে। Aristotle-এর Imitation তত্ত্বটির পেছনে আবার ইন্ধন যুগিয়েছে Greek Democracy-র ভেতরে নিহিত যুক্তিবাদ। Imitation-এর সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে ঘুরপাক খেতে খেতে শিল্প নিখুঁত আকার ধারণ করেছিল। এর গণ্ডির প্রাচীরে পিঠ ঠেকেছিল পরবর্তী শিল্পীদের, Industrial Revolution-এর পরে। এই দেয়াল তারা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছিল। বেরিয়ে এসেছিল Dadaism, Surrealism, Impressionism, Expressionism. Cubism, Fauvism ইত্যাদি ধারা। এসেছে ভ্যান গগ, গগ্যাঁ, মনে, দালি, পিকাসো, সেজান, পিসারো, মাতিস, বুনুয়েল, ব্রেখ্‌ট, আইজেনস্টাইন, ফেলিনি ও গদারের মতো শিল্পীরা। ভাঙচোরের এই কাজটি করতে ইউরোপীয় শিল্পীদের একটা বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। চৈনিক, ল্যাটিন বা আইল্যান্ডার্স, আফ্রিকান ও ভারতীয়দের তা করতে হয়নি। কারণ তারা এই প্রক্রিয়ার ভেতরেই ছিলেন। ইউরোপীয় শিল্পীরা এসব জায়গায় হাত বাড়িয়েই ওই কাজটি করেছিলেন। আমার ধারণায়, বিশ্বের সমগ্র শিল্প প্রধান কয়েকটি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে। ইউরোপীয়, চৈনিক, ল্যাটিন ও দ্বীপবাসী, আফ্রিকান, ভারতীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের ধারায়। একমাত্র ইউরোপীয় ছাড়া আর সব ধারার শিল্পই— তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও ভাবগত প্রকরণে বেড়ে উঠেছিল। সহস্র সহস্র বছর ধরে এরা রস সিঞ্চন করেছিল নিজস্ব ভূমিতে দাঁড়িয়ে।[১] তার ভিন্ন মাত্রা আছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে জ্যাঁ লুক গদার যখন বলেন, আমি চলচ্চিত্রে Essay রচনা

১. ইদানিং চার্লস সীফ নামক একজন বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক 'The Biography of a Dangerous Idea' নামক একটি চিত্তাকর্ষক বই লিখেছেন। বইটিতে সীফ দেখাতে

করি— অর্থাৎ তত্ত্ব রচনা করি— তখন তিনি ইউরোপের বাইরেই অবস্থান নেন। এই ব্যাপারটি ইউরোপীয় শিল্পধারায় অর্বাচীন। মূলত এই ব্যাপারটি ভারতে শুরু হয়েছে ২০০০-২৫০০ বছর আগে। গৌতম বুদ্ধকে যখন একটি আসনে বসিয়ে দেয়া হয় সেটা কিন্তু একটা তত্ত্ব। সে যার উপরে বসে আছে সেটি পদ্ম— যে ভঙ্গিতে বসে আছেন সেটি পদ্মাসন, তাতে স্থাপিত পদ্মপাণি। আবার এলায়িত বুদ্ধের পায়ের দিকে তাকান—যদি দেখেন দুটি পা অসমানভাবে স্থাপিত তাহলে বুঝবেন বুদ্ধ শায়িত, আর যদি দেখেন পা দুটি সমান ভাবে স্থাপিত আছে তাহলে বুঝবেন বুদ্ধ মৃত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে যখন বাঁশি ধরিয়ে দেয়া হয়—তখন তিনি হন মুরলী ধারী— গায়ের রঙ হয় নীল, কারণ তিনি প্রেমে অমিত বর্ণ ধারণ কবেছেন। শ্রীচৈতন্য যখন ত্রিভঙ্গ মূর্তি ধরে নেচে উঠেন তখন তার মধ্যে আশ্রয় নেয় রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের যুগল রূপ। দশভূজা দুর্গা ত্রিনয়ণ নিয়ে উপস্থিত হন। কালী চার হাতে আসেন, তার রক্ত জিহ্বা নিয়ে— রক্ত জবা তার প্রতীক। আবার ১০০০ বছর আগে বাঙলা ভাষার সূতিকাগারের দিকে তাকান। সেখানে চর্যাগীতিকা বা দোহাগুলো কিন্তু তত্ত্ব গান। এই স্রোতধারা কিন্তু চর্যাতেই শুরু হয়নি। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারা— নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, চার্বাক , বৌদ্ধ ধর্ম— চর্যাগীতিকা ছুঁয়ে বাউল ধর্মে— লালনের গানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মুর্শিদা বা ভাটিয়ালীরও তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। আসলে এগুলো সবই Structure, এই Structure-এর ভেতরেই বাসা বাঁধে তত্ত্ব— তার ওপর ভাব, সব শেষে জারিত হয় রস। ভারতীয় শিল্পের এই মৌলিক Structure—ভাব বা রসও কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে তোলাকাপ্পীয়ন, ভরতমুনি, দণ্ডি, অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন, ভামহ, নায়ক. গুণচন্দ্র, সংঘরক্ষিত, ভোজা, কবি কর্ণপুর, বামন, বিষ্ণু ধর্মোত্তর, রূপগোস্বামী প্রমুখদের হাত ধরে একটা তাত্ত্বিক ভাষ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এঁদের প্রবর্তিত নয়টি, মতান্তরে দশটি রস—Structure-এ জারিয়ে গিয়ে শিল্প রূপ লাভ করে। ভারতীয় শিল্পের ধারায় চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঠিক এই জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে। ভারতীয় শিল্পের মূল ধারায় করুণ ও শান্ত রসের যে কারবার— ঋত্বিকও সেখানেই হাত রাখেন। শিল্প সৃষ্টির আর একটি যে মূল তত্ত্ব—Make Belief নানান প্রকরণে ঋত্বিক তার পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। লোকধারায় আমরা এই Form পাই—মধ্য প্রদেশের নওটঙ্কী ও পাণ্ডবাণীতে—বাংলার পালা গান, গাজীর গান ও যাত্রায়—কেরালার কথাকলি এবং কর্ণাটকের যক্ষগানে। বহু ভাঙচুরের ভেতর দিয়ে

চেয়েছেন-—সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিত বিশারদরা কেন 'শূন্য' বা 'zero' নামক সাংকেতিক চিহ্নটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—এবং প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা পারেন নি। সীফ দেখাতে চেয়েছেন 'শুন্য' বিহীন পশ্চিমী সভ্যতা—বহুলাংশে হেলেনিক সভ্যতারই ফল। তারই ফলশ্রুতিতে পিথাগোরাস, অ্যারিস্টটল এবং টলেমীর চিন্তায় 'শূন্য' কোন স্থান দখল করতে পারেনি। ভারতীয় দার্শনিকদের 'শূন্য' আবিষ্কারের পেছনে এক সুদীর্ঘ দার্শনিক ভিত্তি কাজ করেছে। হিন্দু দার্শনিক চিন্তায় 'শূন্য ব্রহ্ম' ব্যাপারটি ছিল। বিশ্বচরাচরের 'শূন্য' বা 'মায়া' রূপটিও ভারতীয় দার্শনিকেরা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এর সমান্তরালে 'অনন্ত' বা infinity ব্যাপারটিও তারা বুঝতেন। এসব বিস্তীর্ণ দার্শনিক ভিত্তিভূমি থেকেই 'শূন্য' এর জন্ম।

ঋত্বিক সেখানে গিয়েই পৌঁছান। তাইতো তিনি ছোটেন আলাউদ্দীন খাঁর কাছে, রাম কিঙ্করের কাছে। তাই তার চলচ্চিত্রের শিকড় ভারতীয় শিল্প-ঘরানার ভূমিতেই বিস্তার লাভ করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর অন্ত:প্রকরণে বাংলার লোকজ ধারা—যাত্রার Form প্রবিষ্ট হয়। এইভাবে Structure বা Form এবং Content-এর মহাখেলায় মেতেছিলেন ঘটক। এসব করেছিলেন বক্তব্যের একটি ঝড় বইয়ে দিতে। এগুলো তাঁর কাছে অস্ত্রের মতো— যা দিয়ে তিনি আঘাত করতে চেয়েছেন। তিনি জীবনের মহাসমারোহের কথা বলেছেন। একটা গভীর আশাবাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং সেটা খুব তীব্রভাবে—ঝাঁকানি দিয়ে করতে চেয়েছেন। মূলত ঘটক বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে চেয়েছেন। পর্দায় জ্বলে উঠতে চেয়েছেন। 'বহতা, অমোঘ, দূর্ণিবার। সব পুড়ছে। আমি পুড়ছি। ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে।' যে অনল ঘটক বয়ে বেড়িয়েছেন তা নির্বাপিত হয়নি। বরং সহস্র ধারায় জ্বলে উঠেছে। চিন্তার আগুন—যেটা উনি নিজে জ্বেলেছেন। ক্ষুধার আগুন যেটা এই সমাজ দিয়েছে। এসবের নির্মম পেষণে ব্যক্তি ঘটক পর্যদস্তু হয়েছেন। দুঃসহ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছেন এবং পাগলা গারদে গিয়ে পৌঁছেছেন। আমার মনে পড়ে Van Gogh-এর সেই চিত্রটি—যেখানে পাগলা গারদের ভেতরের চত্বরে রোগীরা Circle করছে। বিধ্বস্ত, ক্ষয়ে যাওয়া—বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষেরা চক্রাকারে ঘুরছে। সেই সারির একদম পেছনে Van Gogh নিজের চিত্রটি বসিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কল্পনায় ঠিক তার পেছনেই ক্লান্ত, অবসন্ন— যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ঘটকের চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি। এভাবে গৃহহীন, অর্থহীন, খাদ্যহীন ঘটক—সর্বোতভাবে একজন Declass Artist-এ পরিণত হয়েছেন। আর তাঁর এই অভিজ্ঞতাগুলোকেই আমাদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন— ভয়ংকরভাবে।

অনন্ত অনলে দগ্ধ ভাল

আর অনন্ত অনলে দগ্ধ ভাল এক কাপালিক যেন উঠে আসে—
সে কি প্রতিহারী—না সংহারী ?
হয়তো অনন্য দ্বৈততার সমাহার সে—
প্রতিহারী বলছে —
'দেশটা ক্রমশ ইতরের দেশ হয়ে যাচ্ছে —
আর নিজের দেশকে ইতর হিসেবে দেখানো কোন শিল্পীর জন্য মহাপাপ—'
(যুব মন্ত্রণালয়ের ছবি না করার ভাষ্যে এই ছিল তাঁর জবাব)।
আর সংহারী বলছে—এই পাপ মোচন করো—
আর তাই Frame জুড়ে শশ্রুমণ্ডিত গ্রন্থিক— অবিনাশী শ্লোক পাঠ করে যায়—
দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে রব ওঠে—
বেদ-উপনিষদ--আর চরৈবেতি-র অমিত বাণী—
আদি স্তোত্র ঘুরে ফিরে আসে—
আর এই পৃথিবীর বিশাল আলোড়ন —অগ্ন্যোৎপাত সবই গলাধকরণ করেন তিনি—

"He has a sun in his gut".
অনুভবের লেলিহান শিখা হাড়কে পোড়ায়—
লাফিয়ে উঠে অগ্নি কাঠ—
ছিন্ন ভিন্ন অস্থি ও মাংসের উৎসব—
সমাজ না জীবন কেউ জানে না—
তারপর ক্ষণিকের চোরা-অন্ধকার*— ।



ঋত্বিক ঘটকের ৭৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে প্রবন্ধ পাঠ করছেন রফিক মাহমুদ

* চোরা-অন্ধকার এখানে প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম— চিত্রধারণ ও প্রক্ষেপণের সময় হলো প্রতি সেকেন্ডে ২৪ ফ্রেম। কিন্তু সময়-বিভাজনের দিক থেকে চিত্রধারণ বা প্রক্ষেপণ হয় প্রতি সেকেন্ডের ৪৮ ভাগের ১ ভাগ। অর্থাৎ ২৪ ফ্রেমের সময় ধরে আলো প্রক্ষেপিত হয় বাকী ২৪ ফ্রেমের সম-পরিমাণ সময় অন্ধকার থাকে। আর একটু সহজ ভাবে বললে— আমরা হলে যতক্ষণ ছবি দেখি তার অর্ধেক সময় আলোকিত থাকে বাকী অর্ধেক সময় থাকে অন্ধকার। মজার ব্যাপার হলো সেই অন্ধকার আমরা বুঝতে পারি না। ঋত্বিকের মৃত্যুকে আমি ফ্রেমের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে থাকা সেই অদৃশ্য অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করেছি। যা আছে কিন্তু দেখা যায় না। অর্থাৎ ঋত্বিকের কোন মৃত্যু নেই।

[বন্ধুবর সাজেদুল আউয়াল-এর সাথে আমার গত ২৮ বছর ধরে চলচ্চিত্র ও শিল্প সম্পর্কে যে কথোপকথন চলে তারই নির্যাস এই প্রবন্ধ। তার ক্রমাগত তাগিদ ছাড়া এ প্রবন্ধ অরচিতই থাকত। আমার ভেতর একবিন্দু কৃতজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকলেও তা ওর জন্য তোলা থাকল। আমি তার শিল্পীসত্তার বহুমুখী বিস্ফোরণ কামনা করি।]

মৃত্যু-সংবাদ



ঢাকার মহাখালী যক্ষ্মা হাসপাতালে শুয়ে আছেন যক্ষ্মা-আক্রান্ত ঋত্বিক ঘটক

পরলোকে ঋত্বিক ঘটক

[রোববারের দৈনিক বাংলা, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ১/৩]

কলকাতা, ৭ই ফেব্রুয়ারি (সমাচার)।— প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক কুমার ঘটক শুক্রবার রাতে এখানে পরলোকে গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন : ঋত্বিক কুমার ঘটকের জন্ম ঢাকায়। তিনি বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা বিমল রায়ের সহকারী হিসেবে প্রথমে চলচ্চিত্র জগতে আসেন। ভারতের চলচ্চিত্র জগতে তিনি এক ব্যতিক্রমী ও বিপ্লবী স্রষ্টা। তিনি গণনাট্য সংঘেরও একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। চলচ্চিত্র জগতের কমিটেড শিল্পী ঋত্বিক ঘটক খুব বেশী ছবি তৈরি করেন নি। তাঁর ছবি ব্যবসায়িক সাফল্যও আনেনি তেমন। তবু চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের উপর তিনি বেশ ক'টি চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক' আজো মুক্তিলাভ করেনি। উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে তিনটি ছবি, ১. মেঘে ঢাকা তারা, ২. কোমল গান্ধার, ৩. সুবর্ণরেখা ঋত্বিক ঘটককে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রথম সারিতে স্থান করে দেয়। দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'অযান্ত্রিক' নামে তাঁর আর একটি ছবিও বহুল প্রশংসিত । তিনি ছোটদের জন্যে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' নামে একটি ছবি করেন। ঋত্বিক ঘটক ঢাকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন। তাতে তিনি অভিনয়ও করেন।

এই প্রতিভাবান শিল্পীকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর সর্বশেষ আত্মজীবনীমূলক ছবি 'যুক্তি তক্ক আর গপ্পো' এখনো মুক্তি লাভ করেনি। ঋত্বিক ঘটক পুনার টিভি ও ফিল্ম ইনস্টিটিউটের উপ-অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ক বহু নিবন্ধও রচনা করেছেন।

Ritwik Ghatak Dead

The Bangladesh Times, February 8, 1976, p. 1/12
]

Calcutta, Feb. 7 : Noted Film Director Ritwik Ghatak died at hospital here last night, says Samachar.

He was 51.

He is survived by his wife, a son and two daughters.

Our Staff Reporter adds : The Dacca film industry and film trade circles were shocked at the sudden death of India's prominant Film Director Ritwik Ghatak on Saturday.

The shootings at different studios were suspended and crew members working on the sets observed one minute silence to pay respects to the departed soul of Ghatak.

Film Director Ritwik Ghatak was the pioneer of Indian cinema and had influenced younger generations. He was also adjudged the best Film Director by the Bangladesh Cine Journalist Association in 1974 for making directorial debut in "Titas Ekti Nadir Nam".

Great Loss

The General Secretary of the Bangladesh Film Distribution Association, Mr. Azizur Rahman Buli, expressed his profound sorrow over the sudden death of Film Director Ritwik Ghatak and said that his loss was irreparable to Indian cinema.

May his soul be in peace, he said.

Uttaran, cine and cultural organisation condoled

the death of Ritwik Ghatak. In a statement issued by the organisation, the General Secretary, Prof. Parvin A. Hashem, said that Ritwik Ghatak's sudden death was a great loss to the cultural movement of the sub-continent.

Ritwik Ghatak, a champion of Indian neo-realistic film movement and a pioneer of the parallel cinema breathed his last on Saturday at a Calcutta hospital after prolonged illness. He was 51. With his passing away the Indian cinema has lost one of its foremost film makers.

From the core of his heart Mr. Ghatak was a true artist. Film is a realistic art comprising intrinsic social values and emotional powers, and he was committed to this concept.

"I think I cease to have the right to practice fine arts if I fail in my duty to project the problem of my country in some way or other," said he. In fact this was the key note of his philosophy and throughout his whole carrer as a film-maker he never deviated from this standpoint.

Starting from 'Ajantrik' his maiden venture, to 'Jukti-Takko-Gappo', his latest, he devotedly examined with a missionary zeal the eternal human struggle for existence and analysed the causative factors in all his movies that are responsible for man's sufferings because by the term 'commitment' he understood profound akinness to the have-nots.

In the contemporary Indian cinema he inspired such young talents as Moni Koul, Kumar Shahani and many others.

His 'Titas Ekti Nadir Nam' made in Bangladesh, received wide applause from the connoisseurs. In 1974 the Bangladesh Cine Journalists Association adjudged him the best director.

ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন

[সংবাদ, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ১/৮]

উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান চলচ্চিত্র স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক অল্প রোগভোগের পর গত শুক্রবার রাতে কলকাতার এক হাসপাতালে মারা গেছেন বলে কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা সমাচার জানিয়েছে। মৃত্যুকালে শ্রী ঘটকের বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।



শ্রী ঋত্বিক ঘটক ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে শ্রী ঘটক একজন প্রগতিশীল সাহিত্যসেবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কলকাতার বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক সাহিত্যপ্রয়াস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর সাহিত্য-কর্মেও একজন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী লেখকের পরিচয় মেলে। বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে তিনি অভিনয় জগতে পরিচিতি লাভ করেন। ভারতীয় গণ-নাট্যসংঘের একজন সক্রিয় কর্মীও ছিলেন তিনি। শ্রী ঘটক প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক বিমল রায়ের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন।

'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা'. 'যুক্তি তক্ক আর গপ্পো' এবং ঢাকায় নির্মিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' শ্রী ঘটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে সফল না হলেও স্বদেশে ও ভেনিস, বেলজিয়াম, ইতালী ও ফ্রান্সে তিনি নিজের শিল্পকর্মের জন্য একজন প্রতিভাবান ও কৃতী চলচ্চিত্রকার হিসেবে স্বীকৃত।

ভারত সরকার শ্রী ঘটককে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। শ্রী ঋত্বিক এক সময় পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন।

শ্রী ঘটক মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও দু'মেয়ে রেখে গেছেন।

পরলোকে ঋত্বিক কুমার ঘটক

[দৈনিক বাংলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ৫]

মাত্র একান্ন বছর বয়সে ঋত্বিক ঘটক মারা গেলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই ব্যতিক্রমী ধারার পরিচালক আজীবন তাঁর শিল্প কর্মের মাধ্যমে মানুষ ও সমাজের প্রতি নিবেদিত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। উপমহাদেশের খুব কম সংখ্যক শিল্পীই তাঁর মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন, 'শিল্পকে কমিটেড হতেই হবে। সর্ব শিল্পের শেষ কথা মানুষ। যারা শোষিত তাদের স্বার্থের বাইরে কোন শিল্প করা আমি পাপ মনে করি। কমিটেড মানে সংগ্রামী দুঃখী মানুষের সঙ্গী হওয়া যাতে ভালবাসা ও ঘৃণা দুটোই তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে।'

ঋত্বিক ঘটকের এই জীবন চেতনার উৎস হচ্ছে মার্ক্সীয় দর্শন। প্রথম জীবনে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আইপিটিএ-এর একজন সামনের সারির নেতা ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মতো পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট না থাকলেও তিনি বিচ্ছিন্ন এবং এককভাবে তাঁর সাহিত্য এবং চিত্রকর্মে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করেছেন। চিত্র পরিচালক হিসেবে ঋত্বিক ঘটকই ভারতে সত্যজিৎ রায়ের সমান্তরাল একটা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পেরেছেন। রায়ের শিল্পদর্শন ও ঘটকের দর্শন এক নয়। দু'জন দু'টি বিচ্ছিন্ন ধারার সৌধ নির্মাণ করেছেন। নির্মাতা হিসেবে ভারতীয় চিত্র-সমালোচকদের কাছে এঁরা দু'জনই সমানভাবে আলোচিত হলেও সত্যজিৎ অনেক বেশি খ্যাতি ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। ঋত্বিক ঘটক তাঁর শিল্পকর্মে সংগ্রামী দুঃখী মানুষের সঙ্গে একাত্মতার প্রকাশ তীব্রভাবে ঘটিয়েছেন বলে বুর্জোয়া সমালোচকরা তাঁর শিল্প কর্মকে অসংলগ্নতা ও মাত্রার প্রশ্ন তুলে সমালোচনা করেছেন। সমগ্রের চেয়ে অংশের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়ার জন্য মার্ক্সীয় সমালোচকদের হাত থেকেও ঘটক রেহাই পাননি। যার ফলে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের প্রতিষ্ঠানগত সুযোগ থেকে তিনি বার বার বঞ্চিত হয়েছেন— নিঃসঙ্গ অহঙ্কারী নাবিকের মতো। তিনি বিচরণ করেছেন জীবনের পরিধিতে এবং শিল্পের গন্ডীতে।

সত্যজিৎ রায়ের বাস্তব— নমিত, সহনীয় এবং কখনো কোমল। ঋত্বিক ঘটকের বাস্তব হচ্ছে দূর্বিনীত, দুঃসহ এবং প্রায়শঃ মাত্রাবর্জিত। মাত্রাকে তিনি অতিক্রম করেন তাঁর বক্তব্যকে জোরালোভাবে উপস্থিত করবার জন্য এবং এভাবেই তিনি তাঁর ছবির দর্শকদের উপলব্ধির গভীরে আঘাত করেন। ঋত্বিককে কখনো সত্যজিৎ রায়ের দর্শনের মাপকাঠিতে বিচার করা উচিত নয়। বাংলাদেশে ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' নির্মাণ করে একটি বিশেষ মহলের সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর প্রধান কারণ হল, শিল্পকর্মে বক্তব্যের চেয়ে বিশুদ্ধবাদকে তাঁরা বড় করে দেখেন। এটা ঠিক যে

বক্তব্যকে অনেক সময় বলিষ্ঠ অবয়ব দানের প্রয়োজনে প্রচলিত নান্দনিক লংঘন করতে হয়। ঋত্বিক ঘটক ইচ্ছামতো এই প্রচলিত রীতি ভেঙেছেন। এই ভাঙার ভেতরই তাঁর বিশ্বাস নিহিত রয়েছে।

বিগত তিন দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর ভেতর ঋত্বিক ঘটক সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়েছেন ভারত বিভক্তি এবং উদ্বাস্তু সমস্যা দ্বারা। ঋত্বিক ঘটক নিজেও ছিলেন এই উদ্বাস্তুদের একজন। যার ফলে এই সমস্যা তাঁর একাধিক ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপস্থিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে ঋত্বিক ঘটক এই সমস্যা দ্বারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। যার ফলে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র ছিলো তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ঘটক একাই লড়াই করেছেন তাঁর এই নিত্য-সঙ্গীদের বিরুদ্ধে, আরো বেশি নিঃসঙ্গতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, বারবাব হতাশ হয়েছেন, ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং সব কিছু ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিতে চেয়েছেন। মাত্রা-যতিহীন এই খেয়ালী শিল্পী দীর্ঘদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করার পর গত ৬ই ফেব্রুয়ারি রাতে কোলকাতার এক হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে।



ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক স্মরণে

[পূর্বাণী, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ৯]

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক পরলোকগমন করেছেন। ভারত তথা উপমহাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। সুশিক্ষিত, সম্পন্ন। অস্থির ও জটিলও।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের কোনো অনুসারী নেই। কিংবা চলচ্চিত্রলোকের ভাষায় বলা যায়, তাঁর কোনো স্কুল গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু নির্মাতাদের মধ্যে যে তিনি ছিলেন একমেবাদ্বিতীয়ম, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

যুগযন্ত্রণা কথাটি বহুল ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তবু বলতে হয়, এই নির্মাতা তাঁর নির্মিত গরিষ্ঠসংখ্যক ছায়াছবিতে যুগযন্ত্রণাজর্জর মানুষের জীবনমৃত্যুর কথাই বলেছেন। এই নির্মিতি-তে তিনি কতদূর সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে বিচার করবেন বোদ্ধা দর্শক ও সমালোচক। আমরা শুধু এই কথাটিই বলতে পারি যে, তাঁর নিজস্ব একটি স্টাইল ছিল। বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ ছিল।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের কোনো অনুসারী নেই সত্য। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশে নির্মিত একাধিক ছায়াছবিতে তাঁর ব্যবহৃত টেকনিকের অনুকৃতি লক্ষ করা গেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির বঞ্চিতা-অবহেলিতা নায়িকার মনোযন্ত্রণা বোঝাতে তিনি চাবুকের শব্দের ব্যবহার করেছিলেন। এই এফেক্ট সাউন্ডের ব্যবহার হাল আমলে নির্মিত একাধিক ছবিতে লক্ষ করা গেছে।

ঋত্বিক ঘটক তরুণ ও তরুণতর নির্মাতাদের সব সময় উৎসাহ যুগিয়ে যেতেন। প্যারালাল সিনেমা আন্দোলনের সম্প্রসারণে তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চলচ্চিত্র জগতের এই ঋত্বিক কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হননি। কিন্তু তিনি ছিলেন যে- কোনো বিরল প্রতিভাসম্পন্ন নির্মাতার মতই বহুল আলোচিত।

ঋত্বিক কুমার ঘটক আজ নেই। শুধু রয়েছে তাঁর নির্মিত মর্তদুর্লভ সুখে নয়, দুঃখে ভরা কয়েকটি ছবি।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা ছায়াছবির জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে ঋত্বিক ঘটক

[দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ৪]

উপমহাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার শ্রী ঋত্বিক কুমার ঘটক গত ৬ই ফেব্রুয়ারি পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুর আগে কিছুদিন ধরে তিনি গুরুতর পীড়ায় ভুগছিলেন।

ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর সংবাদে স্থানীয় চলচ্চিত্রাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য যে, শ্রী ঘটক অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিরচিত ও বাংলাদেশে নির্মিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন।

ঋত্বিক ঘটক বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ছবি নির্মাণ করেন। 'অযান্ত্রিক', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণ রেখা' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি। সম্প্রতি তাঁর পরিচালিত 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে।

ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুতে শোক

এদিকে ঋত্বিক ঘটকের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করে গত রবিবার 'সংস্কৃতি সংসদ'[১] -এর পক্ষ হতে বলা হয় যে, শিল্পের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, সমাজ সচেতনতা এবং নিজের শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস সমূহকে গণমুখী করার জন্য ঋত্বিক ঘটক অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

---

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুতে উত্তরণের শোক প্রকাশ

[সংবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, পৃ. ৬]

উত্তরণের কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষা পারভীন এ. হাশেম, উত্তরণের নীতি নির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব হারুনুর রশীদ খান ও উত্তরণের চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মঈনুল হোসেন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন :

গত শুক্রবার কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভারতের তথা উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র স্রষ্টা ঋত্বিক কুমার ঘটক লোকান্তরিত হয়েছেন। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর মৃত্যুতে উপমহাদেশের চলচ্চিত্রলোক একজন নির্ভীক, সাহসী, সংগ্রামী কর্মী ও শিল্পীকে হারাল।

ঋত্বিক ঘটক একটি জ্বলন্ত প্রতিভা। নাট্যকর্মী, অভিনেতা এবং চলচ্চিত্রকার। তাঁর পরিচয় একজন তীব্র সমাজসচেতন দ্বান্দ্বিক দার্শনিকতায় বিশ্বস্ত প্রজ্ঞাবান আপোষহীন সংগ্রামী চলচ্চিত্র শিল্পী হিসেবে। তাঁর কাছে চলচ্চিত্র ছিল জীবনচেতনার অভিব্যক্তি প্রকাশের শিল্প-মাধ্যম। মানবতাবাদ, প্রগতি ও সুস্থ জীবন, সমাজ-চেতনাব অভিব্যক্তি তাঁর চলচ্চিত্র কর্মগুলোতে বিষয়-মহিমা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ক্রমাগত আর্থিক অনটন আর প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও তাঁর শিল্পাদর্শ বিচ্যুত হয়নি। তাঁর বলিষ্ঠ অনমনীয় প্রাগ্রসর চেতনাদীপ্ত সাহস ও মানসিকতা উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পালোকে জ্বলন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ঋত্বিক ঘটকের প্রতিভা ও মানসের যথাযোগ্য মূল্যায়ন হোক।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমমর্মিতা এবং তাঁর গুণগ্রাহীদের সঙ্গে গভীর শোকজ্ঞাপন করি।

কলকাতার চলচ্চিত্র সংসদ সংবাদ

অশোক মজুমদার

[সংবাদ, ১৩ মে, ১৯৭৬, পৃ. ৭]

উপমহাদেশের স্মরণীয় ও বরণীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন। ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার থেকে ওঁর কর্মময় জীবন মুখর হয়ে ওঠে নাটক অভিনয় ও পরিচালনার মাধ্যমে। নাটক থেকে চলচ্চিত্র অভিনয়— তারপর পরিচালনা ও অন্যান্য আঙ্গিকের কাজে ঋত্বিক বাবু নিজেকে নিয়োজিত করেন। ঋত্বিক বাবু প্রথম 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয় করেন, ছবির পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট পরিচালক নিমাই ঘোষ। ওঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'নাগরিক' আজও মুক্তি পায়নি, পরের ছবিগুলো হোল, লাহিড়ী প্রযোজিত 'অযান্ত্রিক' এবং 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। এরপর ঋত্বিক বাবু 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'কোমল গান্ধার' ছবি পরিচালনা করেন। দু'টি ছবির কাজ শুরু করেও শেষ করতে পারেননি, ছবিগুলো হোল শংকরের 'কত অজানারে' এবং 'বগলার বঙ্গদর্শন'। 'সুবর্ণরেখা' ছবির পর বাংলাদেশে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রচেষ্টা 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং কলকাতায় 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' এফ. এফ. সি প্রযোজিত— এই ছবিটি এখনও কলকাতায় মুক্তি পায়নি। এ ছাড়া উনি পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ থাকাকালীন ওখানে 'ফিয়ার' নামে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি পরিচালনা করেছেন।

সম্প্রতি ঋত্বিক ঘটকের আকস্মিক মৃত্যুতে ফেডারেশান অব ফিল্ম সোসাইটিজ ইন ইন্ডিয়া এক স্মরণ সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় সংস্থার সভাপতি সত্যজিৎ রায় বলেন, ঋত্বিক বাবু কাজের লোক ছিলেন, তাঁর প্রত্যেক ছবি থেকে অল্প বিস্তর বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি ওঁর 'নাগরিক' ছবিতেও ওঁর চিন্তাধারা আজকের পরিচালকদেরও বিস্মিত করবে, ওঁর দ্বিতীয় ছবি 'অযান্ত্রিক'-এর দৃশ্য পরিকল্পনা, অভিনয় ও আঙ্গিকে অনেক কিছু দেখানো হয়েছে। আজকের যুগেই অনেকের কাছে আজও তা অচিন্তনীয়। 'সুবর্ণরেখা' ছবিতেও ঋত্বিক তাঁর বাস্তবানুগ দৃশ্য রচনার পরিচয় দিয়েছেন। ওঁর ছবিতে কোন ইউরোপীয় ছবি, ব্রিটেন বা আমেরিকারও কোন প্রভাব নেই, হয়তো রাশিয়ার ছবির বাস্তবতা ঋত্বিক বাবুকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

সহ-সভাপতি মৃণাল সেন আই. পি.টি. এ. থেকে শুরু করে (যখন) বাংলাদেশে 'তিতাস একটি নদীর নাম'এর পরিচালনা করতে(করতে) অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন পর্যন্ত মৃণাল বাবু স্মৃতি চারণ করেন। প্রখ্যাত নাট্যকার ও বিশিষ্ট অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য ঋত্বিক বাবুর গুণাবলীর প্রশংসা করেন। সভাশেষে ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবিটি দেখানো হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশনের শোক প্রস্তাব

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। তাঁর অকাল প্রয়াণে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের তথা বাংলা সংস্কৃতির ক্ষতি অপরিমেয়।

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে চিত্রজগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঋত্বিক ঘটক। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রচিত তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক' সাধারণভাবে প্রদর্শিত হয়নি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'অযান্ত্রিক' যাঁরা দেখেছিলেন,তাঁরা ঋত্বিকের অসামান্য বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। 'অযান্ত্রিক'-এর পর নানান অন্তরায় হেতু ঋত্বিক বিশ বছরে মাত্র ছ'খানি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সংখ্যায় কম হলেও বিবিধ গুণে সমৃদ্ধ এ ছবিগুলো উপমহাদেশীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সমকালের নানান সমস্যা এই সমাজ-সচেতন শিল্পীর ছবিতে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশ বিভাগজনিত যে বিপর্যয় উদ্বাস্তু বাঙালির জীবনে নেমে এসেছিল, তার সংবেদনশীল আলেখ্য চিরায়ত হয়ে আছে ঋত্বিকের ছবিতে। ঋত্বিকের মানবিকতা, তাঁর প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা, চলচ্চিত্র শিল্পের যাবতীয় সমস্যার সমাধান— এই সব কিছুরই পরিচয় তাঁর প্রতিটি ছবিতে পরিব্যাপ্ত। এই সব ছবি তাই আগামী দিনের চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে, এ বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। আমরা বিশ্বাস করি— ঋত্বিকের শিল্পকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই তাঁর প্রতিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ন রাখার এবং তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সভা তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছে।



ঋত্বিক ঘটকের স্মরণে আয়োজিত 'ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ ইন ইন্ডিয়া'-এর অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন

স্মৃতিচারণ



[illegible] চাকলাদার অঙ্কিত ঋত্বিক ঘটক-এর স্কেচ (১৯৭৬)

চৈত্রের পরিচয়ে সে সূর্য হয়েছিল

মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন

ঋত্বিক কুমার ঘটককে চোখে দেখিনি। অনুভব-উপলব্ধি করেছি বাস্তবতা প্রকাশের নির্মমতায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আর দেশ বিভাগ নিয়ে আসে মধ্যবিত্ত সমাজের এক তীব্র যুগ-যন্ত্রণা। বেকারত্ব-হাহাকার-কালোটাকায় ছেয়ে যায় দেশ। এক এক করে মূল্যবোধগুলো অবলুপ্ত হতে থাকে। যুগ-যন্ত্রণায় তাড়িত ঐ যুবকের প্রথম ফসল অযান্ত্রিক। সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতায় যেখানে যন্ত্রও প্রাণ পায়। কিন্তু আর্থিক অনটনে নিমজ্জিত হন তিনি। অভাব অনটন কোন কিছুই তাঁকে শিল্প সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি। তবুও জীবন ঘষে ঘষে এক একটি স্ফুলিঙ্গ প্রসবিত হয়— 'কোমল গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা'। মাঝখানে জীবনের করিডোরে তিনি পরিভ্রমণ করে আসেন ছোটদের মায়াময় রাজ্যে— 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। আবার কঠিন বাস্তবতার নিগূঢ়তায় নিমজ্জিত হন। অদ্বৈত মল্লবর্মণের কালজয়ী উপন্যাস্ 'তিতাস একটি নদীর নাম' সেলুলয়েডের ফিতায় আবদ্ধ করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের দর্পণে নিজেরই মুখ দেখেন 'যুক্তি-তক্ক আর গপ্প'-তে।

প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে এবং সমাজের সাথে সংগ্রাম করে যে সব সৈনিক এগিয়ে যাচ্ছে ও ইতিহাসের চাকাটাকে গতিশীল করছে— গভীর মমত্ববোধ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের ঋত্বিক কুমার ঘটক। তাদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। সমাজটাকে পাল্টানোর সংগ্রামে অগ্রণী হয়েছেন দুঃসাহসিকভাবে। নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন অনেকবার। তাই তিনি সত্যকে প্রকাশ করতেন নির্মমভাবে। জীবনটাকে দেখেছেন লাঙলের লাল ফালে— কাস্তে-হাতুড়ির তীব্র নিনাদে, হাপরের উষ্ণ নিঃশ্বাসে। তাই তিনি ফ্যাঁকাশে রুগ্ন সভ্যতাকে জ্বালিয়ে দেবার সুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

দৈন্য বিড়ম্বিত জীবনের নিয়তিকে দুমড়িয়ে বিদ্রোহী ঋত্বিক আমাদের নিয়ে যান 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়'— জীবনের কাছাকাছি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নীল পাহাড়ে যেখানে লাল-নীল-হলুদ ফুল ফোটে আর রঙীন প্রজাপতি ওড়ে। সেখানে আছে আশা, সুখ, ভালবাসা, প্রেম ও জীবন।

কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম। সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সর্বত্রই সহ-অবস্থান আর বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব। আর এই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বই মানুষকে নিয়ে যায় অন্ধকারের পঙ্কিলতায়— কোলকাতার ভাইয়ের কাছে বোন বেসাতি। তবুও এই বাস্তবতার কষাঘাত নিয়ে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তারা এগিয়ে যায়— বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

তিতাসের জল উদ্ভিন্ন যৌবনা রমনীর ঢলঢলে শরীর নয়— রাজপুত্রের সপ্তডিঙ্গার নদী নয়। এ নদী আশার— এ নদী চকচকে সোনালী সুখের। তিতাসের বুকে মালোরা (জেলেরা) ভাসে—ভাসমান কচুরীপানার দোলায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বান-বন্যায় লড়াই করে। তিতাসের স্বর্ণ প্রসবিনী চর লোভ-লালসারা আর কামনারা জয় করে। তিতাস শুকিয়ে যায় কিন্তু মরে না। মরা গাঙে বান জাগে সোনালী ফসলের সম্ভাবনায়। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তারা আবার মেতে উঠে।

আদিম গুহামানবের কাল হতেই মানুষের পারস্পরিক যে মমত্ববোধের উন্মেষ, ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবেই তা একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করেন ঋত্বিক। তিনি শুধু ইতিহাসের নীরব দর্শক ছিলেন না— ইতিহাসের চাকাটাকে পাল্টিয়ে দেয়ার সংগ্রামে অগ্রণী ছিলেন। তাই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে তিতাসের বাসন্তী। মূর্ত হয় বাসন্তীর সচেতন মনের সঙ্গে অবচেতন মনের লড়াই। বাসন্তী যেন প্রকৃতির অন্ধ শক্তির হাতে পুতুল। জীবন-ইতিহাস মানেই পুতুল নাচের ইতিকথা। জীবনের অন্ধ বাঁকাচোরা পথের সেঁজুতি ঋত্বিক বাবু।

ঋত্বিক কুমারকে বুঝতে হলে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথেষ্ট নয়, আরেকটি ইন্দ্রিয় চাই— হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকার সাথে মস্তিষ্কের সংযোজন চাই। হৃদয় নিংড়ানো সতেজ সবুজ ভালোবাসার সাথে সূর্যের তীব্র জ্বালা চাই।



ঋত্বিক ঘটক নির্দেশিত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ রাজার ঝি কবরী



ঋত্বিক নিজেই ছিলেন দক্ষ অভিনেতা, স্বপরিচালিত প্রায় ছবিতেই তিনি কোন না কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং সেই চরিত্রটি প্রায়ই বিবেকের রূপক হয়ে ওঠেছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ তেমনি একটি চরিত্রে অভিনেতা ঋত্বিক ঘটক।

ঋত্বিক ঘটক
সূর্য সারথী

গত ডিসেম্বরের ষোল তারিখে মহেন্দ্র'র সঙ্গে দেখা পার্ক সার্কাসের সৈয়দ আমীর আলী এভিন্যু-এ। মহেন্দ্র বল্ল, ঋত্বিকদা হাসপাতালে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। বল্লাম, আবার হাসপাতালে ? মহেন্দ্র গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, অত অত্যাচার মানুষের কি সয় ?

সয়নি। ঋত্বিক দা নেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে না হলেও বিশ্বাস করতে হবে। নশ্বর দেহ ছেড়ে গেছেন উনি। হাসপাতালে গিয়ে ওঁর ওয়ার্ডের পর্দা সরিয়ে আমি দেখে এসেছিলাম। সদা কর্মচঞ্চল কর্মনিষ্ঠ বেপরোয়া মানুষটি শুয়ে রয়েছিল এক প্রশান্তিতে।

আজ কি লিখবো ঋত্বিক দা'কে নিয়ে ? নিজের জীবন দিয়ে তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াতে। ঘরের সুখকোণ ছেড়ে যিনি ফুটপাতে দিন কাটিয়েছেন। ছ'আনার ছাতু খেয়ে জীবন সংগ্রামকে উপলব্ধি করবার জন্য, তাঁর সম্বন্ধে লেখবার সাহস আমার নেই। লিখছি, কারণ না লিখলে আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে নিজেকেই ধিক্কৃত করবো বার বার।

শিল্পী, ভাবুক, কবি এবং সৃষ্টিকর্তা ঋত্বিক দা'কে শুধু ভবঘুরে ঋত্বিক ঘটক হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। ঋত্বিক দা' জীবনকে জানতে চেয়েছেন সবার আগে। সেলুলয়েডে যে জীবনকে তিনি তুলে ধরেছেন তাকে নিজের জীবন দিয়ে তিনি আগে উপলব্ধি করে নিয়েছেন। তাই তাঁর শিল্পের স্বাদ আলাদা। তিনি ফিল্ম মেকার আবার ফিল্ম ডাইরেক্টর। তিনি ফর্ম ব্রেকার আবার ফর্ম ক্রিয়েটর। এই ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে ঋত্বিক দা'র জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর ফিল্ম আমাদের অন্তস্থমূল ধরে নাড়া দিয়ে যায়।

স্বাধীনতা কি ? দু' বাংলার মানুষ তা হাড়ে হাড়ে জানেন। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁরা জানেন না বা জেনেও জানতে চান না। ঋত্বিক দা'র লক্ষ্য ছিলো এই দ্বিতীয় স্তরের মানুষদের তাঁর ফিল্মের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া যে, ডাইলেক্‌টিক্সের নিয়ম ধরেই মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতার স্বাদ মেহনতি মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তাই তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছিল, 'দলিল', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা'। ঋত্বিক দা'র জীবনে স্বাধীনতা বয়ে এনেছিল রক্ত, অশ্রু আর দারিদ্রের সীমাহীন অশান্তি। তাঁর অধিকাংশ ছবিতে ছাপ রয়ে গেছে অশান্তির। ঋত্বিক দা' প্রবলেম ক্রিয়েট করে ছবি করতে চাননি। তিনি প্রবলেম তুলে ধরে সলিউশন চেয়েছেন মাত্র। তাঁর প্রবলেমের সমাধা কেউ করতে পারেনি।

ঋত্বিক দা' বলতেন, ছবি তৈরি করবার আগে যা দেখাতে চাইছি কিংবা যা স্যুট করতে চাইছি তাঁর সঙ্গে একাত্মতার প্রয়োজন। এই একাত্মতার তাগিদে জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে ঋত্বিক দা' কোথায় না কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। এই যে জানার আগ্রহ এর থেকে এসেছে অদম্য সৃষ্টির অস্থিরতা। ঋত্বিক দা' তাই 'ইনার ভায়লেন্সে' ভুগতেন। যে মাঝি নৌকা বায় তার পেশল-হাত আর জলে-ভেজা শরীরের ধমনীতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তার রূপ দিতে হবে। যে জেলে মাছ ধরে তার জালের প্রতি কতখানি আকুলতা জানতে হবে। যে কৃষক মাঠে হাল চাষ করে তার ফসলের প্রতি মমত্ববোধ পরিস্ফুট কবতে হবে। কলেজে পড়া নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের প্রেম-ভালবাসা-হতাশার রূপ দিতে হবে। জানতে হবে আজকের সমাজের আসল 'ল্যাকুনা' কোথায়? কত অজানারে জানতে গিয়ে বিদ্রোহী ঋত্বিক দা' তাই জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ নিভে গেলেন।

পুনার ফিল্ম ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজে অনায়াসে ডাইরেক্টর হয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন? উত্তরে বলেছিলেন, অফিসিয়াল সাইকোফ্যান্ট হয়ে থেকে মানুষের সঙ্গে বেইমানী করতে পারবো না। মানুষের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। সেইসব মানুষ, যারা চিরদিন বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। যারা অত্যাচারে অত্যাচারে মূক-বধির হয়ে গেছে। তাদের জন্য ফিল্ম করতে হবে।

ঋত্বিক দা'র শ্লোগান ছিল 'ম্যাস ফিল্ম' । জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'যুক্তি তক্ক আর গপ্প' দ্বারা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, ঐ যে কৃষক—মাথাল মাথায় নদীর ধারে বসে রয়েছে— ঐ শ্রেণীর জন্য বারবার বহু কমোদ্যম নেয়া হয়েছে, প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু আসলে তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি। কৃষক চৈতালী ঘূর্ণির দিকে তাকিয়ে আশায় বুক বেঁধেছে। কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরপাক খেয়ে সেই ঘূর্ণি নেমে এসেছে শুকনো বালুকাবেলায় হতাশা নিয়ে।

ঋত্বিক দা'র জীবনজিজ্ঞাসার এই যে প্রয়াস তা চিরায়ত। তাই তাঁর ফিল্মে নেই কোন কম্প্রোমাইজ, নেই কোন শ্লোগান। ঋত্বিক দা' শ্লোগান বেঁচে ফিল্ম করতে চাননি। তিনি মাপা হাসি হাসেননি কোথাও। মানুষকে প্রবলেম থেকে কখনও সরিয়ে নিয়ে যেতে চাননি। প্রবলেমকে সামনে রেখে মেহনতি মানুষেরা নতুন পথের সন্ধান করেছেন মাত্র।

তাঁর ফিল্মে তিনি নিজেই নেতা। তিনি তাঁর সৃষ্টির নেতৃত্ব দিয়েছেন একান্ত অনুগতভাবে।

তিনি বলেছিলেন 'শিল্প মানেই লড়াই'

অভিনয় কুমার দাশ

সেই দিনটির কথা আজো মনে পড়ে। বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারির একটি সকাল। জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ঢাকার কতিপয় সাংবাদিক পরিবেষ্টিত হয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের অন্যতম দিকপাল ঋত্বিক কুমার ঘটক।

ওখানেই প্রথম মুখোমুখি পরিচয় হলো শ্রী ঘটকের সঙ্গে। তীক্ষ্ম চেহারা। সতেজ কণ্ঠ। চশমার কাচের ভেতর একজোড়া উজ্জ্বল চোখ। সে চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

স্বাধীনতার পর বাহাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়সহ ঋত্বিক ঘটক ঢাকায় এসেছিলেন। সে সময় সত্যজিৎ রায়কে সাংবাদিকদের সঙ্গে কেউ পরিচয় করিয়ে দেননি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যেমন করে হোক সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে কথা বলেছেন। কারো কারো বগলদাবা হয়ে থাকার কারণে সেবার আমরা সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। তিনি চলে গিয়েছিলেন। ঋত্বিক বাবু রয়ে গিয়েছিলেন।

প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই কলকাতার প্রথম পংক্তির চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক ঢাকার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে অনেকানেক কথা বলেছিলেন। তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সেদিনের কথাগুলো আজো স্মৃতির মনোবীণায় অনুরণন তুলছে।

ঋত্বিক কুমার ঘটক আমাদের এ বাংলারই মানুষ। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তিনি আমাদের সর্বাগ্রে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর শৈশব কেটেছে এই ঢাকায়। আমরা জানতে চেয়েছিলাম একাত্তর পরবর্তী ঢাকা সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া কি। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : ঢাকায় এখন আগেকার সরলতা খুঁজে পাচ্ছি না। এখন দেখছি আভিজাত্য চারদিক জাঁকিয়ে বসেছে। জীবন যখন বদলায়, মানুষও বদলায়। জীবন হচ্ছে বহতা নদীর মতো। নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঋত্বিক বাবু বলেছিলেন : বিহারী, পাঞ্জাবিরা আগে ডমিনেট করেছিলো, বাঙ্গালিরা সেই শেকড় এবং শেকল ভেঙ্গেছে! কিন্তু আজো আমি ভিখিরি দেখছি! ওরা হাত পাতে। তবে সমস্যা এখন অনেক সহজ। আপনাদের হাতে এবং সরকারের হাতে তা নিশ্চয়ই নির্মূল হবে। সমস্যা নেই, বাংলাদেশ স্বর্গে পরিণত হয়েছে, এমন ধারণা আমার অত্যন্ত কম। ঋত্বিক বাবু সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন : সমস্যা কোথায় নেই বলুন তো? কাজেই আপনারা আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন না করে ফিল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন।

আমাদের মধ্যে থেকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁর মতামত কি? জবাব দিতে গিয়ে তিনি পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সদ্য

নিঃশেষিতপ্রায় বিড়ির আগুনে নতুন বিড়িটি ধরিয়ে জোরে একটা টান দিয়েছিলেন। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন : বাংলাদেশের ছবি আমি তেমন দেখিনি। জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া', 'স্টপ জেনোসাইড' এবং সুভাষ দত্তের 'আয়না' ছবি তিনটি আমি দেখেছি। এই ক'টা হাতে গোনা ছবি দেখে তো আর মন্তব্য করা যায় না। তবে একটা জিনিস আমি বুঝেছি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখানকার তরুণদের দিয়ে কিছু হবে। কিন্তু আমরা ? আমরা সবাই ডুবে যাচ্ছি। ধসে যাচ্ছি।

কথার পিঠে পাল্টা কথা বলে উঠেছিলেন আমাদেরই এক সাংবাদিক বন্ধু। তিনি বলেছিলেন : আমাদের সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা নেই তো ? ঋত্বিক বাবু সহজ ভঙ্গীতে বলেছিলেন : সেটা আপনাদের হাতে। এখানে উপকরণ আছে। সম্ভাবনাও আছে। শিল্পের ব্যাপারে আমি হাততালি চাই না। বাঙ্গালি জাতি মরে গেছে ভাবলে বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বাঙ্গালির হৃদয়ে নবতর জাগৃতির জন্ম হয়েছে। দুঃখ-দুর্দশা থাকবে। থাকবে অভিযোগ। গ্রামে-শহরে-গঞ্জে রটে গেছে বাঙ্গালি বলে একটা জাতি আছে। কলকাতার রকের ভাষায় : 'কাটেমচাস কারবার' করেছে বাঙ্গালি। আমার বিশ্বাস, এপারের সংস্কৃতি, ওপারের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নতুনভাবে মোড় নেবে। আমাদের প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু ভাবছেন ?

তিনি বলেছিলেন : ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছুই ভাবছি। আমি দেখোছি, দুই বাংলার সংস্কৃতি এক। তাই ভাবছি, এ বাংলায় আমি কিছু করতে পারবো কিনা। আমি মনে করি, মানুষকে জানতে হলে জাগাতে হবে। ঋত্বিক বাবু বাংলাদেশে একটি ছবি পরিচালনা করবেন, এই রকম কথা বার্তা চলছিল। সম্ভবত সে জন্যেই তিনি সে দিনকার সমবেত সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি পশ্চিমবঙ্গের কোন পরিচালক বাংলাদেশে ছবি পরিচালনা করতে চান, তাহলে কারো আপত্তি আছে কিনা। সেদিন সবাই একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন, উপযুক্ত পরিচালক যদি এ ব্যাপারে দায়িত্ব নেন, তাহলে কারো আপত্তি নেই। তবে এটা যদি সব পরিচালকের বেলায় প্রযোজ্য হয়, তাহলে আপত্তি আছে।

সেদিন কথার কথায় ঋত্বিক ঘটকের মনের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছেটার প্রকাশ ঘটেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমরা 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি পেয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ছবির মধ্যে কোন চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে কিনা। তিনি জানিয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং তপন সিংহের ছবি সম্পর্কে সিরিয়াসলি ভাবা যেতে পারে। আর এপার বাংলায় ছবি অত্যন্ত কাঁচা। তবে চিন্তাধারা স্বচ্ছ। এখানকার চিত্রনির্মাতাদের মনে শুভ ইচ্ছে রয়েছে তা বোঝা যায়। চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে টেকনিকটা হচ্ছে ভীষণ মূল্যবান। শুধু চিন্তাধারা দিয়ে তো আর ছবি হয় না। টাইম এবং কনটেক্সট্ সম্পর্কে চিত্রনির্মাতাকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এপার বাংলায় ওঁপার বাংলার ছায়াছবির বাজার সম্প্রসারণ কি সম্ভব ? ঋত্বিক বাবু বলেছিলেন:

বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কে আমার ভাবনার কোন মূল্য নেই। আমি আমার মাতৃভূমিতে বেড়াতে এসেছি। দেখতে এসেছি।

আমরা প্রশ্ন করেছিলাম : চলচ্চিত্র আপনি কাদের জন্য নির্মাণ করেন ? জবাবে ঋত্বিক ঘটক সোচ্চার কণ্ঠে বলেছিলেন : আমি মানুষের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করি। আইজেনস্টাইন-পুদভকিনও তাই করতেন। চলচ্চিত্রকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে হবে। ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। বাংলাদেশের মা-বোনেরা যাত্রা-পালা পার্বন দেখতে অভ্যস্ত। এক সময় যাত্রার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হতো। এখন যাত্রার ধর্মটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের নাড়ি বুঝে চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে-গ্রামান্তরে ফ্যামিলি প্লানিং কিংবা সরকারি প্রচারণামূলক ছবি দেখালে চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো উন্নতি হবে না। মশাই স্কুলে কি কবিতা শেখানো যায়। ভ্রাম্যমান ভ্যানের সাহায্যে চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় শুধু নয়, সাধারণ মানুষের কাহিনীকে রূপায়িত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অভ্যস্ত জীবনের ছবি আমি আমার সবগুলো ছবিতে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। আমি ছবি করে অর্থ বানাতে চাই না। জানি, ইমিডিয়েট সাকসেস শিল্পের শেষ কথা নয়। কোন্ ছবি অর্থ দেবে, কোন্ ছবি অর্থ দেবে না, তা নির্ণয়ের জন্যে কোনো ফিল্মের ডাক্তার পাওয়া যায় না।

আমি ছবি করছি আমার মানুষের জন্য। সংগ্রামে আমি বিশ্বাস করি। শিল্প মানে লড়াই। প্রেস ক্লাবে সেদিন ঋত্বিক কুমার ঘটক অনেক কথাই বলেছিলেন। কখনো উত্তেজিত, কখনো অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তখন পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছাড়া অন্য কোন ছবি দেখিনি। পরে অবশ্য 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'সুবর্ণরেখা' এবং 'অযান্ত্রিক' দেখেছি। মোদ্দাকথা, ঋত্বিক ঘটক একজন নিবেদিত প্রাণ চলচ্চিত্র স্রষ্টার নাম। শিল্পসৃজনের ব্যাপারে তিনি আগাগোড়াই ছিলেন সৎ এবং আন্তরিক। আপোষকামী মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কতো গভীর হতে পারে, তা তাঁর প্রতিটি ছবির দৃশ্যে-দৃশ্যে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। দু'কলাম তিন কলাম লিখে ঋত্বিক ঘটকের শিল্পী আত্মার পরিচয় দেয়া যাবে না। প্রতিটি ছবিতেই তাঁর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। আপোষহীন লড়াকু মনোভাবের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অবিচল। ঋত্বিক কুমার ঘটক নিজেই নিজের তুলনা, অন্য কেউ নন।

'ডোন্ট ট্রাই টু গ্ল্যামারাইজ মি'

মনোয়ার আহমেদ

অর্থহীন চটুল প্রমোদ ছবির স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে যাঁরা চলচ্চিত্রের ভাষায় জীবনের ছবি পর্দায় তুলে ধরতেন ঋত্বিক কুমার ঘটক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই।

১৯৭২ সালের দিকে ঋত্বিক বাবু ঢাকায় এসেছিলেন। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র পরিচালক। 'মেঘে ঢাকা তারা' যখন ঢাকায় মুক্তি পায় তখন কতই না বয়েস আমার। স্কুলে পড়ি। সেদিনের কিশোর মনেও একটা প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির পরিচালককে দেখার। যে এত সুন্দর ছবি বানাতে পারে।

ঢাকায় এসেছেন ঋত্বিক বাবু। ঋত্বিক বাবুকে দেখবো তাঁর ছবি তুলবো আমার লালিত স্বপ্ন স্বার্থক হবে এ আনন্দে মন ভরে উঠেছিল। অফিস থেকে আমার এসাইনমেন্ট হলো ঋত্বিক বাবুর ছবি তোলার। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ঋত্বিক বাবু ঢাকার গ্রীণ হোটেলে আছেন।

আমি এবং আমার সহকর্মী আখতারুজ্জামান স্কুটারে রওনা দিলাম গ্রীণ হোটেলের দিকে। যেতে যেতে ভাবছিলাম ঋত্বিক বাবু হচ্ছেন পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। কিভাবে তার ছবি তোলা যায়। লাইট এণ্ড সেড না একটু গ্লামারাইজ করে। ভাবতে ভাবতে গ্রীণ হোটেলে এসে হাজির হলাম। হোটেলের রুমের মধ্যে ঢুকেই দেখি— নাকের ডগায় চশমা রেখে খালি গায়ে বিছানার উপর বসে চা পান করছেন তিনি।

আমার সহকর্মী ঋত্বিক বাবুকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, আর ঋত্বিক বাবু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে ঋত্বিক বাবু পাল্টা প্রশ্নও করছিলেন।

ঋত্বিক বাবু আর আমার সহকর্মীর মধ্যে আলোচনার এক ফাঁকে ঋত্বিক বাবুকে বললাম—

: দাদা আপনার ছবি তুলতে হবে।

: ছবি তুলতে হবে, তোলো।

ঢাকায় যে সব নামী দামী গুণী ব্যক্তি এসেছেন তাঁদের অনেকেরই ছবি তোলার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যেমন মার্লোন ব্রান্ডো- সত্যজিৎ রায়-নার্গিস-মালা সিনহা-ওয়াহিদা রহমান আরো অনেকের। তারা কেউ না কেউ চিরুণী ছাড়াই হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিয়েছিলেন ছবি তোলার আগে। আর আমার সামনে খালি গায়ে বসা ঋত্বিক ঘটক বললেন- 'তোলো'।

আমি ঋত্বিক বাবুকে বললাম দাদা অন্তত চাদরটা গায়ে দিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঋত্বিক বাবু চাদরটা গায়ে দিলেন। বললেন 'ডোন্ট ট্রাই টু গ্ল্যামারাইজ মি।'

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই আমাকে বলেন দেখ, আমার ছবিটি ভাল করে তুলো। আর ঋত্বিক বাবু? তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।



ঋত্বিক ঘটক

প্রবেশ নিষেধ

আজিজ মিসির

পৃথিবীতে এমন কিছু সংখ্যক মানুষ জন্মায় যাঁদের ঘাড়ের রগটা একটু বাঁকা থাকে। রগটা বাঁকা বলেই এঁরা ভীষণ রাগী। সহজ কথা এঁরা সহজভাবে বলেন না। বাঁকা কথা বলেন। পৃথিবীটাকেও বাঁকা চোখে দেখেন। পরলোকগত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক ছিলেন ঠিক এমনি জাতের মানুষ। কারো তোয়াক্কা ধাঁতে সইতো না। কাছে বা দূর থেকে দেখলে তাকে একজন চিত্রপরিচালক বলে ধারণা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। চিত্রপরিচালক বলতে ধোপদুরস্ত চমক ঠমক লাগানো একজন মানুষের যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঋত্বিক ঘটক ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাদামাটা পায়জামা পাঞ্জাবি পরনে। মুখে পান। হাতে বিড়ি। দেখলে কে বলবে ইনিই হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক ঋত্বিক ঘটক। কিন্তু হ্যাঁ একটু ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলে, কথা বললে বোঝা যেতো ইনি কে। কি বা তার পরিচয়। মুখের ভাষার চেয়ে স্যালুলয়েডের ভাষা যে কতটা জোরালো কতটা তীব্র সে পরিচয় মেলে তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে। শক্তিপদ রাজগুরুর মধ্যবিত্ত জীবনের একটি পানসে উপন্যাস অবলম্বনে একটি হতবাক করা ছবি তৈরি হতে পারে সে কথা কে ভাবতে পেরেছিল। ছবি তো নয় যেন মধ্যবিত্ত জীবনের এক অত্যাশ্চর্য দলিল। এ দলিল উপস্থাপিত করতে গিয়ে ঋত্বিক ঘটক আপোষের পথ ধরেননি। যা বাস্তব, তাকেই আরো ভয়াবহভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। অভাব, অনটন, রাজনৈতিক ঘটনা আর দুর্ঘটনা সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন থেকে স্নেহ, মায়া-মমতাকে কিভাবে শুষে নিয়েছে তাই দেখিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নায়িকা শেষ দৃশ্যে করুণ কণ্ঠে বলছে— দাদা আমি বাঁচতে চাই। নায়িকার এ আর্তনাদ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মরল অসহায়ভাবে। তারপরে দেখা গেল নায়িকার মতই আরেকটি মেয়ে অফিসে যাচ্ছে। তার পায়ের স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপটি হঠাৎ ছিঁড়ে গেছে ঠিক যেমনটি এক দিন ছিঁড়েছিল ছবির নায়িকার স্যান্ডেলের স্ট্র্যাপ। অদ্ভূত। বাংলা ছবিতে এমন ব্যঞ্জনাময় সমাপ্তি দৃশ্য খুব কমই আছে।

'সুবর্ণরেখা'তেও শ্রী ঘটক একই কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। দেশ বিভাগের পর যে ছেলে আর মেয়েটি ছিটকে পড়েছিল কক্ষচ্যুত তারকার মত, তারাই আবার সাময়িক ভাবে সুখের সন্ধান পেলো। অবশ্য সে সুখ বেশিদিন রইলো না। মেয়েটি ভালবাসলো শিল্পমনা একটি ছেলেকে। মেয়েটির দাদা তা পছন্দ করলো না। ওরা

পালিয়ে গেল বাড়ি থেকে। কলকাতায় এসে নতুনভাবে জীবন গড়তে চাইলো। কিন্তু পারলো না। ছেলেটি মারা গেল মোটর দুর্ঘটনায়। সংসারে অভাব অনটন অক্টোপাশের মত শতবাহু বিস্তার করে গ্রাস করতে এলো। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো দেহ বিক্রি করতে। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস প্রথম রাতে প্রথম যে ব্যক্তি মেয়েটির ঘরে এলো সে তারই দাদা। মেয়েটি বটি দিয়ে গলা কেটে আত্মহত্যা করলো। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা গেলো মেয়েটির দাদা সেই হতভাগ্য দম্পতির একমাত্র সন্তানটির হাত ধরে এগিয়ে চলছে অজানার দিকে। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে। 'মেঘে ঢাকা তারা'র মতই ব্যঞ্জনাময় প্রতীকধর্মী ছবির সমাপ্তি।

ঋত্বিক ঘটক যে জীবনটাকে বাঁকা চোখে দেখতেন অন্যান্য ছবি বাদ দিয়ে তার উল্লেখিত ছবি দু'টো দেখলেই বোঝা যায়।

ভাবতে অবাক লাগে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থেকেও কিন্তু তিনি তাঁর ছবিতে রাজনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করেননি। 'আমাদের দাবি মানতে হবে', 'সংগ্রাম চলবেই চলবে'— এ ধরনের সোচ্চার ধ্বনি তাঁর ছবিতে কোথাও নেই। কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরে তিনি এ কথাই বারে বারে বলতে চেয়েছেন এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। তাঁর এ বাস্তবতাকে অনেকে ভুল বুঝেছেন, এ নিয়ে তর্কবিতর্কও হয়েছে। তিনি আপোষ করেননি। যা ভেবেছেন তাই তিনি সারা জীবন করেছেন। তাঁর ছবি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, আমি ছবি তৈরি করি আমার নিজের জন্যে, অন্য কারো জন্যে নয়। এমন উক্তি বোধহয় ঋত্বিক ঘটকের পক্ষেই করা সম্ভব— কারণ আগেই বলেছি তিনি ছিলেন সাংঘাতিক রাগী মানুষ। জন্মেই তিনি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমিকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর ভেতরে ছিল বিক্ষোভ। এ বিক্ষোভ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ছিল। বিক্ষুব্ধ মানুষটার আত্মার সদগতি হোক এ কামনাই করি।

রোগশয্যায় তাঁকে যেমন দেখেছি*

নির্মল কুমার দাস

এমন একজন মানুষের কথা জানাচ্ছি যিনি চলচ্চিত্রের এই শক্তিশালী মাধ্যমে অনেকগুলো অবিস্মরণীয় সৃষ্টি আমাদের উপহার দিয়েছেন। অথচ আমাদের যা করা উচিত ছিল, অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্য, আমরা তা তাঁকে ঠিকমত দেইনি। আমি যখন অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে এ কথাটা জানালাম তিনি দাপটের সঙ্গে বললেন : আই নেভার মেক ফিল্ম ফর মানি।

বললেন বটে তবে ছবি ফ্লপ হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কত সংখ্যক দর্শক ছবিটি দেখলেন এই পরিসংখ্যানের উপর। ছবি চললেই বোঝা যায় ছবিতে পরিচালক যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা অনেক মানুষ শুনেছেন। চায়ের দোকানে বসে বা কফি হাউসে মিলিত হয়ে আমরা 'আঁতেলেকচুয়াল' সেজে এই প্রতিভাধর চলচ্চিত্রকারকে স্বীকার করি, তাঁর গুণকীর্তন করি কিন্তু ছবি দেখবার সময় চলে যাই সেই সব ছবি দেখতে যেগুলি চোখ দু'টোকে বেশ চনমন করে তোলে এবং মনটাকে পৌঁছে দেয় উচ্চমার্গে।

এই প্রতিভাবান চলচ্চিত্রকারকে এ কথাটা জানাতেই তিনি বললেন : আমরা সেমিনার করি, লেখা-লেখি করি, পাছে লোকে অশিক্ষিত বলে। আসলে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তিনি আরো বললেন : ভালো ছবি ফ্লপ করলে ক্ষতি যেমন ছবি করিয়ের, ঠিক তেমনি ক্ষতি দর্শকদের, কারণ রাজেনের 'পালঙ্ক' ছবি মার খেল, ফলে রাজেন ভাল ছবি করতে দশবার ভাববে এবং যে-সব নতুন ছেলেরা ভাল ছবি করার জন্যে মনঃস্থির করবে, তারাও হয়তো ভাববে একশোবার। সুতরাং একটি ভালছবি দর্শকরা না দেখলে সঙ্গে সঙ্গে হারাবেন আরো দশটা।

আমি জানতে চাইলাম এর পর তিনি ছবি করবেন কিনা। শুনে অবাক হয়ে বললেন: কেন করবো না। এদের মত বছরে সাতটা আটটা নয় দুতিন বছরে একটা । মাথা নীচু করবো কেন ? স্যেটিশফেকশন বলেওতো একটা কথা আছে।

কথাগুলো শেষ করতেই দমবন্ধ করা কাশিতে ফেটে পড়লেন। শিয়রের কাছে রাখা টেবিল থেকে একটা ছোট কাচের গ্লাস তুলে নিলেন। সেখানে অনেক ধরনের ওষুধপত্র, বই আর ফাইল। হয়ত এই ফাইলের মধ্যেই আছে তাঁর আগামী ছবির চিত্রনাট্য।

* লেখাটি 'আনন্দলোক'-এ প্রথম প্রকাশিত। চিত্রালী-তে এটি পুনঃমুদ্রিত।

উনি এখন রীতিমত অসুস্থ। একথা হয়তো অনেকেই জানেন না। কেননা, তিনি তো স্টার নন। সিনেমা জগৎ থেকে কদাচিৎ কেউ দেখা করতে আসে মাত্র। মুখের সামনে থেকেই গামছাটা নামালেন তিনি এবং আরো অনেক কথা বললেন। এমন সময় বেজে উঠলো ঘন্টা ধ্বনি, তাঁর কাছ থেকে ওঠে চলে যাওয়ার জন্যে সংকেত ধ্বনি। বিদায় নিয়ে বাইরে আসতেই মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন। কেন আমরা মূল্য দেই এবং দেই না— যাঁকে দেওয়া উচিত নয় এবং অত্যন্ত উচিত— এইসব প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর পেলে হয়তো তাঁর পরিধানের পাঞ্জাবিটার ফুটোর সংখ্যা কিছু কম হতো।

এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমি যখন টাল মাটাল তখন ওদিকে প্রতিভাবান চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক পিজি হসপিটালের উডবার্ণ ওয়ার্ডের রোগশয্যায় শুয়ে নির্মিলিত নেত্রে হয়তো তাঁর আগামী ছবির কথা ভাবছেন।



মহাখালী যক্ষা হাসপাতালের বেডে বসে উন্মন ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটকের রাজনৈতিক চেতনাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে

চিন্ময় মুৎসুদ্দী

একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। একটু ভ্যাপসা গন্ধ বাতাসে। অফিস থেকে হেটে পুরানা পল্টনের মোড়ে একটি চীনা রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি আমরা ক'জন। সবাই সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। দিন মনে নেই, তারিখ যতদূর মনে পড়ে ২০শে জুলাই। সন্ধ্যা তখন। আজ থেকে চার বছর আগে। ঋত্বিক কুমার ঘটক তখনও এসে পৌঁছাননি। তিনি সাংবাদিকদের ডেকেছিলেন কিছু বলার উদ্দেশ্যে। আমরা বসে গল্প করছি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রযোজক এবং অন্যান্যরা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। ঋত্বিক কুমার ঘটকের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। একটা ছোট জটলা চোখে পড়ল। ভীড়ের মধ্যে খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর পায়জামা পাঞ্জাবিতে বেশ লম্বা এক ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে যেন কিছু বোঝাতে চাচ্ছেন। আর একটু কাছে গিয়ে মনে হল লম্বা ভদ্রলোক আমার চেনা। তিনি বললেন খেয়েছি তো কি হয়েছে ? আরো একটু খেতে হবে । না খেলে আমি জোর পাই না। অন্য একজন বললেন বুঝতে পারছেন না এখানে সব সাংবাদিকরা এসেছেন। অন্তত এই সময় আপনার খাওয়া উচিত হয়নি। ওরা কি মনে করবেন। তিনি বললেন, কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত হয়ে— থুইয়া দেও তোমার সাংবাদিক। হেরা কি ফেরেশতা ? আমি ফেরেশতারে ডরাই না। আমি কারেও ডরাই না। আমি কি চুরি করতাছি নাকি !

লম্বা ভদ্রলোকটি ছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক। তাঁর দেরী হচ্ছিল কারণ লনে বসে তিনি দেশী মদ খাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হল অন্য কথা। নিজের উপর কতটা কনফিডেন্স থাকলে একজন মানুষ জোর নিয়ে এসব কথা বলতে পারেন ? ঋত্বিক কুমার ঘটকের এই তেজী ব্যক্তিত্বই সবাইকে আকৃষ্ট করত।

এসব কথা সেদিন আমি লিখিনি। লিখিনি নানা কারণে। সাংবাদিকদের সঙ্গে মিনিট তিরিশের আলোচনা হয়েছিল ... আনুষ্ঠানিকভাবে। এরপর আলাদাভাবে কিছু আলোচনা হয়েছিল। আমার মনে হল তাঁর কথা শেষ হয়নি। আরো অনেক কথা বলার আছে।

তাঁর সঙ্গে আমি চলে গেলাম নারায়ণগঞ্জে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি অনর্গল কথা বলেছিলেন। অনেক কথা। ছবির কথা। ব্যক্তিগত কথা। দুঃখের কথা। অভাবের কথা যন্ত্রণার কথা। সব কথার শেষ কথা ছিল মানুষের কথা। তিনি মানুষের প্রতি ছিলেন নিবেদিত। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। কিন্তু যখন ছবি বানিয়েছেন তখন

পাবলিকের কথা চিন্তা করেননি। নিজের কমিটমেন্টই ছিল প্রধান। যার জন্য বার বার তিনি মার খেয়েছেন আর্থিকভাবে। তবু তিনি দমে যাননি। নিজের কমিটমেন্ট থেকে সরে দাঁড়াননি। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন শিল্পকে কমিটেড হতেই হবে। সব শিল্পের শেষ কথা মানুষ। যারা শোষিত তাদের স্বার্থের বাইরে কোন শিল্প করা আমি পাপ মনে করি। কমিটেড মানে সংগ্রামী, দুঃখী মানুষের সঙ্গী হওয়া যাতে ভালবাসা ও যুদ্ধ-দু'টোই তীব্রভাবে প্রকাশ পাবে।

২০শে জুলাই ১৯৭২ গভীর রাত পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে একটি সাক্ষাৎকার বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়েছিল ২৭শে জুলাই ১৯৭২।

ঋত্বিক কুমার ঘটক বলেছিলেন, মশাই আমি সিনেমার লোক নই। আমার কথা আছে, আমার মন্তব্য রয়েছে তা আমাকে বলতে হবে। চলচ্চিত্র হল মিডিয়া অব এক্সপ্রেশন এবং শক্তিশালী মিডিয়া। অন্যদের মত আমি তাই সিনেমার লোক নই মশাই। আমি কিছু একটা বলতে চাই। সিনেমার লোক তারাই যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত অন্তত মানসিকভাবে। যাদের নিয়ে একসাথে সংগ্রামে নেমেছিলাম আমি। সবাই আজ সরে দাঁড়িয়েছে। তারা পরাজিত । তারা সিনেমার লোক হয়ে গেছে। আমি কমপ্রোমাইজ করিনি। কোনদিন করব না।

৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি তার কথা রেখেছেন। কম্প্রোমাইজ করেননি। যা মনে করেছেন সঠিক নির্ভুল প্রয়োজনীয় তাই-ই করেছেন। তার পক্ষে অন্য রকম করা বা কম্প্রোমাইজ করারও আর সম্ভাবনা নেই। তাঁর পরিপূর্ণ মূল্যায়ন এখন করা যেতে পারে।

বেশকিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবিসহ মোট ৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর সর্বশেষ ছবি 'যুক্তি তক্ক আর গপ্পো'। প্রথম ছবি 'নাগরিক' আজও মুক্তি পায়নি। অন্যান্য ছবিগুলো হচ্ছে 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ছবিতেও ঋত্বিক ঘটককে একজন জেদী মানুষ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যা বলতে চেয়েছেন জোর দিয়ে বলেছেন। বার বার সেখানে হ্যামার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, আমার কথা আমি তোমাকে বোঝাবই। একবারে না বুঝলে একশবার বলব। দরকার হলে বারে বারে বোঝাব। আমার কথা শুনে কেউ শুধু আহা আহা করে দুঃখ প্রকাশ করবে, আমি তাতে তৃপ্ত নই। আমি চাই আমার কথা শুনে মানুষ রি-এ্যাক্ট করবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এইটুকু না হলে শিল্পীর সার্থকতা কোথায়। আমি তাই পুতুপুতু মার্কা প্রেমের গল্প বলিনা।

ঋত্বিক তাঁর ছবিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনে তিনি

মেরে তাঁর কথা বুঝিয়েছেন। একটা সিকোয়েন্স দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য ঘটক ছবিতে সমগ্রের চেয়ে অংশের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন 'অযান্ত্রিক' ছবিতে আদিবাসী ওঁরাওদের নাচের দৃশ্য অসম্ভবভাবে বড় হয়েছিল বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। ঋত্বিক এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এর জন্য আমি অনেক গাল খেয়েছি। কিন্তু ঐ দৃশ্য আমার কাছে অসংযত— বড় মনে হয়নি। আমার যে প্রোটাগোনিস্ট বিমল তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনই এক সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণের আবেগ আনার প্রবণতা এবং এটি একটি আর্কিটাইপাল রিয়েকশন, আদিম প্রতিক্রিয়া। শিশুর যে কোন অসার বস্তু দেখে জুজু কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে ক্ষেপে ওঠা এবং অনাহূত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা, একেবারে একই প্রক্রিয়া। অযান্ত্রিকের মেইন থীম ছিল এটাই। যাকে আমরা দ্য ল' অব লাইফ বা জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরনোটি ভুলে যাবার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য যা বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল— এগুলো সেই কথাই প্রকাশ করেছে। এ যেন ভেরিয়েশন অন এ মাইনর স্কেল অব দ্য মেইন থীম। এ সর্ট অব ইকো যা যে কোন সিম্ফনিক স্ট্রাকচার-এর প্রাণবস্তু। আমার ভুল হয়েছিল সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারিনি। কিন্তু উপায়ও ছিল না বিষয়বস্তু ও পটভূমির জন্য। কাজেই ইসোটেরিক হয়ে থাকতে হল। সাধারণগ্রাহ্য হওয়া গেল না'। (বিচিত্রা, ২৭-৭-৭২)।[১]

সেই রাতে তিনি অবিশ্রান্ত কথা বলেছিলেন আর একনাগাড়ে পান করছিলেন দেশীমদ। এক সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, পার্টি ছেড়ে দিয়েছেন কেন ? কোন জবাব তিনি দেননি অনেকক্ষণ। পরে বলেছিলেন, সেখানে থেকে যা করব বলে ভেবেছিলাম তা করতে পারছিলাম না বলে।

ঋত্বিক ঘটক প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আইপিটিএ-এর একজন সামনের সারির নেতা ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক অটুট না থাকলেও কখনো তিনি পথভ্রষ্ট হননি। তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকর্মে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করেছেন।

ঋত্বিক ঘটক শিল্পকর্মে বিশুদ্ধতার চাইতে বক্তব্যকে বড় করে দেখেছিলেন। এ জন্যে তাঁর ছবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংলগ্ন থেকে গেছে। সত্যজিৎ রায় বুর্জোয়া দর্শনের

১. ঋত্বিক ঘটক এই কথাগুলো বলেছিলেন 'চলচ্চিত্র চিন্তা' শীর্ষক এক প্রবন্ধে, যা মুভি মন্তাজ—প্রথম বর্ষ-দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। চিন্ময় মুৎসুদ্দীকে ঐ কথাগুলোই ১৯৭২ সালের ২০ জুলাই কি করে হুবুহু ঋত্বিক বললেন— তা বোধগম্য নয়।

মাপকাঠিতে কথা বলেছেন আর ঋত্বিক মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনার বিচার করতে চেয়েছেন। এই দুই চলচ্চিত্রকারের মধ্যে এটা ছিল মৌল পার্থক্য। তবে বক্তব্য প্রকাশে সত্যজিৎ যতটা পরিমিত, সংযত ঋত্বিক ততটা অসংযত এবং উগ্র। সত্যজিৎ তাঁর বুর্জোয়া মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কোমলভাবে, রোমান্টিকতার আবরণে এবং বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক বিশুদ্ধতার প্রতি তিনি বরাবর সজাগ। এ জন্যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সত্যজিৎ রায় বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা করলেও তিনি একজন সার্থক চলচ্চিত্রকার (কৌশলী অর্থে)। পক্ষান্তরে ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন অত্যন্ত উগ্রভাবে। পরিমিত বোধের অভাব তাঁকে পরিপূর্ণ চলচ্চিত্রকার হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে।

ঋত্বিক কুমার ঘটক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার চাইতে একজন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এবং আমার মনে হয় সেটাই তাঁর জন্য বড় সম্মান।

মেঘে ঢাকা তারা : সুফিয়া

সত্য ঘোষ

'মেয়েটিকে আমার চাই'।

এক হালকা পাতলা লম্বাটে বুড়ো মতোন লোকের জুল জুল চোখের দৃষ্টি আর চাঁচাছোলা গলার স্বর শুনে একহারা লম্বা গড়নের ছটফটে আলাপী আড্ডাবাজ মেয়ে সুফিয়া প্রথমে চমকে উঠেছিল, পরক্ষণেই প্রবল বিতৃষ্ণায় মনে মনে বলেছিল--- ' আঃ বুড়ো মিনসের কথার ছিড়ি দ্যাখ না।'

বাংলাদেশ বেতার ভবনের একটি কক্ষে সুফিয়া আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন পরিচিত বন্ধুজনের সাথে। সুফিয়ার স্বভাবে রাখ্‌ঢাক খুব বেশি নেই। তাই, গল্প যখন করেন মজাসে আসর জমিয়েই করেন। একেবারে ঘরোয়া মেজাজে। তাই তার বসার ফলে পায়ের গোড়ালি থেকে অনেকটা কাপড় সরে গিয়েছিল। আর বুড়ো লোকটা সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল অন্য মনে।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য বুড়ো ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া গেল।ঋত্বিক ঘটক। 'তিতাস একটি নদীর নাম'- ছবি করার জন্য ঢাকায় এসেছেন। তাঁর ছবির জন্যে তখন তিনি নতুন মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সুফিয়াকে সহজেই নির্বাচন করেছিলেন। একসময় ঋত্বিক ঘটক সুফিয়াকে বলেছিলেন : 'তোর পায়ের গোড়ালি দেখেই ভাল লেগেছে পাগলী। তোর হবে।'

প্রথম দর্শনের বিতৃষ্ণা পরে গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। কাজের মধ্য দিয়ে বুড়ো মানুষটিকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছিলেন সুফিয়া। পাগল, কাজ পাগল মানুষ। যার সাথে পরিচয় যতো বেশি হয়, দেখাশোনা যত কাছের হয়— ততই আকর্ষণ বাড়ে, শ্রদ্ধা আসে। এমনই এক ব্যক্তিত্ব।

সুফিয়া বলেন, 'ঋত্বিক দা'র ছবিতেই আমার প্রথম অভিনয় বলতে পারেন। দাদাকে আমি শুধু বলেছি, আপনি কি চান আমার কাছ থেকে তা একবার নিজে অভিনয় করে দেখান, তারপর আমি তার পুরোটাই করে দেখাতে পারবো।'

এবং তা পেরেছিলেন সুফিয়া। 'তিতাস একটি নদীর নাম'- এর অনেক নামী দামী তারকার পাশে সুফিয়া নিজের জায়গা করে নিলেন উদয়তারার চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করে। তিতাস যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই কখনো না কখনো উদয়তারার চরিত্রের অভিনেত্রীকে মনে করেছেন। ওই চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে ১৯৭৩ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে 'জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার' পেয়েছেন।

সুফিয়া বলেন, "দাদাই বলেছিলেন, 'দেখিস, তিতাসের উদয়তারা তোকে পুরস্কার

এনে দেবে।' দাদার বুলবুলি তো পুরস্কার পেল, কিন্তু তা জানবার জন্যে দাদা আর এ পৃথিবীতে রইলেন না।" ওকে বুলবুলি নামে ডাকতেন ঋত্বিক ঘটক।

... সম্ভাবনার অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে সুফিয়া উদয়তারায় উদিত হয়েছিল, সে আবার মেঘের আড়ালে ডুবে আছে। মেঘে ঢাকা তারা সুফিয়া। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর পরে সুফিয়াকে দেখা গেছে 'হারজিৎ', 'কি যে করি' ইত্যাদি ছবিতে। কম সংখ্যক ছবি। এবং উল্লেখ না করার মত, চোখে না পড়ার মত চরিত্র ...।



সুফিয়া বোস্তম

ঋত্বিক ঘটক প্রসঙ্গে

নির্মল ধর

'বিদ্রোহী শিশু' ঋত্বিক ঘটক আর নেই। ফেব্রুয়ারির এক রাত্রিতে এই তিতি-বিরক্ত পৃথিবীটাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেছেন।

যে কটা দিন ছিলেন নিজের অসুখী ভাব সক্রোধে ছুঁড়ে মেরেছেন আর পাঁচজনের দিকে। কখনও ছবি দিয়ে, কখনও নাটকে। আর যখন কিছুই পারেন নি তখন আত্মহনন দিয়ে।

ক্রোধ ছিল তাঁর কবচ কুণ্ডলের মত, সর্বদা বুকের ভিতর বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। সময়ে-অসময়ে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত উদ্‌গীরণ করেছেন ক্রোধ, স্থান-কাল-পাত্র ভেদাভেদ করেননি।

ফেব্রুয়ারির সেই রাতের পর উদ্‌গীরণ থেমে গেছে। আর হবে না। সমাজের গলিত দিকও আর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ঋত্বিক ঘটক বলবেন না, 'এসব বন্ধ করো, ভেঙ্গেচুরে ফেলো সব কিছু।'

নীরবে তাঁর ছবিগুলোই এখন কথা বলবে। 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা আর 'সুবর্ণরেখা'র সীতাই হয়ে থাকবে তাঁর প্রতিবাদের আর্কিটাইপ। 'অযান্ত্রিক'-এর সেই ভাঙ্গা গাড়িখানা স্রষ্টার মমতাকে বুকে আগলে ধরে রাখবে চিরদিন।

তাই তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গিয়েছিলাম সত্যজিৎ-মৃণাল-পুর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখের কাছে। ঋত্বিক হারানোর বেদনায় তাঁরা কতখানি ব্যথিত, কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তারই মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি ওঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে।

ঋত্বিকের সঙ্গে সত্যজিতের প্রথম পরিচয় হয়েছিল অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অফিসে। শ্রী রায়ের 'পথের পাঁচালী' তখন সবে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দেখাতেই সেই ছবি নিয়ে চোখাচোখা যে কথাগুলো ঋত্বিক শুনিয়েছিলেন তাঁকে, তা থেকেই সত্যজিৎ বাবু বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে।

'ওঁর প্রতিটি ছবিতে যে হৃদয় নিংড়ানো ব্যথার প্রকাশ তা অন্য কারো ছবিতে পাই নি আমরা। ঋত্বিক ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালি, তাঁর ছবির চেহারায়-বিন্যাসে সেই খাঁটি বাঙালিয়ানার ছাপ প্রকট। ওঁর মত বাঙালিয়ানার বড়াই আমিও হয়ত করতে পারি না।'

চারিত্রিক এই বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়াও ঋত্বিকের ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় নীরব নন। তিনি বলেছেন, 'আমরা সবাই-ই কোনো না কোনো ভাবে হলিউড প্রভাবান্বিত।

হলিউডের ছোঁয়া আমাদের ছবিতে পড়েছে বেশ প্রকটভাবেই। কিন্তু ঋত্বিক ছিলেন সম্পূর্ণ এই প্রভাব-মুক্ত। রাশিয়ান নাটক ও চলচ্চিত্রের প্রভাব তাঁর ছবিতে কিছু মাত্রায় দেখা গেলেও স্বকীয় বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে সেই প্রভাব এমন করে মিশিয়ে দিতে পারতেন তিনি, যা নিজস্ব এক ধারার সৃষ্টি করেছিলো ছবিতে, সে ধারা অপর কারুর ছবিতে দেখা যায় নি।'

ঋত্বিকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই 'রাগী ছবি' তৈরির ধারণাটাও বোধ হয় পাল্টে যাবে।

তরুণ পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী ঋত্বিকের সরে যাওয়ায় ছবি করিয়ে হিসেবে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত।

তিনি বললেন, 'তিনি আরো কিছুদিন বেঁচে থেকে আরও কিছু দিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো, তাঁর কাছ থেকে তো আমাদের পাওয়া শেষ হলো না। কারণ তখন ভাবতে পারতাম ঋত্বিক ঘটকের মত বলিষ্ঠ চেতনাসম্পন্ন একজন আমাদের পাশে রয়েছেন। ছবি করি না করি তাঁর উপস্থিতিটাই ছিল মস্ত প্রেরণা।'

পূর্ণেন্দু বাবু ঋত্বিকের ছবি থেকে প্রেরণা পেয়েছেন কিভাবে জানতে চাইলে বললেন, 'প্রেরণা পেয়েছি তো নিশ্চয়ই। 'সুবর্ণরেখা'র কিছু কিছু শট্ কম্পোজিশন এক সময় প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিলো। গানের সিচুয়েশন উনি দারুণ তৈরি করতে পারতেন। ওঁর ঐ গুণটা আমার কাছে রীতিমত ঈর্ষার বস্তু। বিশেষ করে 'মেঘে ঢাকা তারা'য় 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' গানটি যেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে নতুন করে জন্ম নিয়েছিল। গানের এরকম ফুটে ওঠা বাংলা ছবিতে কখনও দেখিনি।'

কথাগুলো বলতে বলতে তিনি যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন। ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রায় গুরু-শিষ্যের মত। ওঁর প্রতিটি ছবি একাধিকবার দেখেছেন তিনি।

—ওঁর ছবিগুলির সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে কি? নির্দ্বিধায় তিনি বললেন, 'না। বিদগ্ধ রুচিবান দর্শক যদি ছবিগুলি তেমন দৃষ্টি দিয়ে না দেখেন,তাহলে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সমালোচকদের দায়িত্বও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওঁর ছবির বৈশিষ্ট্যগুলোকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব তো তাঁদেরই'।

তাঁর ছবিতে সমাজের যে বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি যে আশার সুরের ছোঁয়া থাকে— সেই বৈশিষ্ট্যই তাঁর ছবিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। পূর্ণেন্দু বাবু এই প্রসঙ্গে বললেন, 'এই সমাজের প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল, বেদনা ছিল, দুঃখ ছিল— সেই সঙ্গে আশাও তিনি কম করতেন না। তবে বেদনায় তিনি এত কাতর ছিলেন যে, আশার স্বপ্ন তাঁর মাঝে মাঝে ছিঁড়ে কুঁড়ে একাকার হয়ে যেত। সৃষ্টির বেদনায় তিনি ছিলেন ব্যথিত। শিল্পীর এই বেদনা চিরন্তন।'

এই বেদনাই তাঁকে বোধ হয় নিয়ে গেছে আত্মহননের পথে; স্থির থাকতে পারেন নি তিনি।

হাসপাতালে-বাড়িতে যখনই দেখা হয়েছে, ঋত্বিক ঘটক সেই এক ধরনের বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলেছেন, 'কি করলাম এসব। শুধু ফাজলেমি। কিস্‌সু হবে না এদেশে।'

আর ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছেন। নীরবে বুকের ব্যথা সয়ে সয়ে নীলকণ্ঠ হতে চেয়েছিলেন তিনি। হয়েছিলেনও তাই। 'যুক্তি তক্‌ক আর গপ্পো'র নীলকণ্ঠ। গলায় বিষ নিয়ে কিছু উদগীরণ করেছেন ঐ ছবিতে।

পরিচালক মৃণাল সেন ছিলেন ওঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম। বিভিন্ন সরকারী সাহায্য, ঢাকা থেকে অসুস্থ ঋত্বিককে নিয়ে আসা, শেষ মুহূর্তে মাথার কাছটিতে বসে থাকার দায়িত্ব বুঝি তিনিই নিয়েছিলেন।

উনি বললেন,'ঋত্বিক শুধু আমার কেন, আমার মনে হয়, ভালো সমাজ-সচেতন ছবি যাঁরা করেন, এবং ভবিষ্যতে করবেন, তাঁদের সকলেরই প্রেরণা হওয়া উচিত ঋত্বিক ঘটক। চলতি প্রথার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে তিনি একাধিক বিতর্কিত ছবি করে গেছেন। চলচ্চিত্র মিডিয়মটির ওপর যে তাঁর কি প্রচণ্ড দখল ছিল, তা ওঁর যেকোনো ছবিতেই প্রকাশিত।'

ঋত্বিকের ছবি সম্পর্কে মৃণাল সেন তেমন মুখর নন। তিনি ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আগ্রহী। কোন ছবির জন্ম কিভাবে হয়েছে, চিত্রনাট্য রচনায় তিনি কিভাবে কত সময় ব্যয় করতেন তাই নিয়ে অনেক কথা বললেন মৃণাল বাবু।

ওঁর ছবির বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন ঠিকই ; কিন্তু ঋত্বিকের প্রতিভাকে তিনি অস্বীকার করেন না। 'বক্তব্য প্রকাশে ঋত্বিকের ঋজুভঙ্গি ও সমাজের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ ছিল ঠিকই ; কিন্তু সেই ক্রোধ কখনই প্রতিরোধের বাক্যে গড়ে উঠেনি।' এটুকুই তাঁর বক্তব্য। তাঁর সর্বশেষ ছবি 'যুক্তি তক্ক গপ্পো'তে অবশ্য প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের ভাষা বাক্য পেয়েছে, সরব হয়েছে অনেক। এ ছবি কবে মুক্তি পাবে, আদৌ পাবে কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়।

কিন্তু ঋত্বিক যা দিয়ে গেছেন তার মূল্যই বা কম কিসে ? 'মেঘে ঢাকা তারা','সুবর্ণ রেখা' বা 'অযান্ত্রিক'-এর সঠিক মূল্যায়নই তো হলো না এখনও।

আমার ভাই ঋত্বিক ঘটক

প্রতীতি দেবী

ঋত্বিক ঘটক ও আমি যমজ ভাই-বোন। আমরা একই সঙ্গে মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর আলো দেখি। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর আমাদের জন্ম হয় ঢাকার ২, ঋষিকেশ দাশ রোডের ঝুলন বাড়িতে। আমার বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক, তখন ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ঋত্বিকের কথা বলতে গেলে, আমাদের পরিবার সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমাদের পূর্বপুরুষ সোয়া দু'শ বছর আগে কাশ্মীর থেকে পাবনা এসে বসতি করেন। আমার মাতুল বংশও একই সঙ্গে আসেন। তারা রাজশাহীতে বসতি স্থাপন করেন। বাবার মুখে শুনেছি, নেহরু ও রবীন্দ্রনাথদের পরিবারও একই সময় কাশ্মীর থেকে এসেছিলেন।

আমার বাবা অত্যন্ত সুদর্শন ও মেধাবী ছিলেন। জীবনে কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন নি। আটটি ভাষায় এম. এ. করেন। ঢাকায় পোস্টিং-এর সময় বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। প্রতি মাসে ৬টি লেকচার দিতে হত। ঢাকা থেকে বদলীর সময় বাবা তাঁর গ্রীক লিটারেচারের সমস্ত কালেকশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে যান। আমার বড় ভাই মনীশ ঘটক, কল্লোল যুগে যুবনাশ্ব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর কন্যা, খুকু যিনি সাহিত্য মহলে মহাশ্বেতা দেবী নামে সুপরিচিত। আমাদের চাইতে মাত্র আড়াই মাসের ছোট। আমার মেজদা সুধীশ ঘটক লন্ডন ও জার্মানী থেকে সিনেমাটোগ্রাফির ওপর কোর্স করেন। বম্বের বিমল রায় তাঁরই কাছ থেকে ছবি বানানোর শিক্ষা নেন। প্রতি মাসে তিনটে পত্রিকা বেরুতো আমাদের বাড়ি থেকে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্ররা হরহামেশা আসা-যাওয়া করতেন, আড্ডা দিতেন। হৃষিকেশ রোডের ঝুলন বাড়ি গুনীজনদের মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঝুলন বাড়িতে গিয়েছিলেন, আমার বাবার অতিথি হয়ে। সে ছবি বলধা গার্ডেনে রয়েছে, শুধু আড্ডা নয়, নিয়মিত গানের আসরও বসত। প্রতি সন্ধ্যায় আমার মা পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতেন। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে শুনতেন। আমরা সবাই লাইন দিয়ে চুপ করে সেই গান শুনে যেতাম। এই রুটিনের একচুল এদিক ওদিক নড়াচড়ার উপায় ছিল না। নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে আমাদের চলতে হত।

বাবার বদলির চাকরি ছিল বলে, ঋত্বিক আর আমার পড়াশুনা ভীষণ ব্যাহত হয়। সে সময় ভাইদের কেউ কেউ সংসারী হয়ে যার যার কর্মস্থলে ব্যস্ত। কেউ কেউ বিদেশে পড়াশোনা করছেন। দিদিদেরও সবাইর বিয়ে হয়ে গেছে। পাঁচ ভাই, চার বোনের মধ্যে

আমরা দু'জন কনিষ্ঠতম। আমাদের বড় যে ভাই—লোকেশ ঘটক তিনিও আমাদের চাইতে আট বছরের বড়। সুতরাং আমাদের দু'জনকে ছেলেবেলাতেই দার্জিলিং পাঠান হল পড়তে। আমাদের দু'জনের ডাক নাম ছিল ভারি মজার। আমার নাম ছিল ভবি আর ঋত্বিকের ডাক ছিল ভবা।

আমার তিন মাস বয়সে বাবা বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন মেদিনীপুর। ঢাকার কথা আমি যা শুনেছি সব বাবা-মা-ভাই-বোনদের মুখে। তাঁদের কাছে সবচেয়ে আলোচিত ছিল 'ঝুলন পুজো'। এই পূজো শ্রাবণ মাসে হয়। ঢাকার ব্যবসায়ী শ্রেণী সাহা ও বসাকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পূজো হত। কিন্তু সাজানোর মাল-মশলা আসতো নবাববাড়ি থেকে। সোনা, রূপোর গাছ হাতির ওপরে বসিয়ে মিছিল যেত নবাবপুর রোড দিয়ে। আর মহররমের 'তাজিয়া' বের হত খুব ধুমধামের সঙ্গে। আমার বাবা ঢাকার খুব প্রশংসা করতেন। তার মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী কলেজকে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে তুলনা করতেন। আর করবেন না কেন, আমি ওই কলেজে পড়েছি। সে সময় ডঃ স্নেহময় দত্ত ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল, আবু হেনা পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য। ডঃ এমদাদুল ইসলাম ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। সে সময় রাজশাহী কলেজ থেকে অধ্যাপকরা বদলী হয়ে যেতেন প্রেসিডেন্সীতে। প্রেসিডেন্সী থেকে আসতেন রাজশাহী কলেজে।

বাবা বদলি হওয়ার পর রাজশাহী এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করলেন। ঘোড়ামারায় আমাদের বিশাল বাড়ি। কাছেই সাবার পাড়ায় থাকতেন আমার মাতামহ, নামকরা এডভোকেট শ্রী মহেশ্বর ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্র মৈত্র পাকিস্তানের সংসদ সদস্য, সুরেণ মৈত্ররা ছিলেন আমার মায়ের পিসতুতো ভাই। অখণ্ড ভারতের সংসদ সদস্য কিশোরী মোহন চৌধুরী ছিলেন আমার মায়ের পিসতুতো কাকা।

আমরা যখন রাজশাহী, সে সময় সেখানকার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল উঁচু মানের। পুটিয়ার রাজা, নাটোরের মহারাজা, দীঘাপাতিয়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর শীতকালে সাহিত্য-সঙ্গীত সম্মেলন হত। এইসব সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আমার বড় ভাই মনীষ ঘটক। আমাদের রাজশাহীর বাড়িতে এই সূত্রে, পদাপর্ণ ঘটেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যালের। শরৎচন্দ্রের কথা আমার মনে আছে। তিনি চা-কফি ছাড়া কিছু খেতেন না। এত শান্ত আর কথা এত কম বলতেন যে, আমি আমার দাদাকে বলি— 'এই তোমাদের শরৎচন্দ্র ? ইনি তো কথাই বলেন না।' আমার বড় দাদার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন হুমায়ুন কবীর, সৈয়দ মুজতবা আলী, শেষোক্ত জনের চাচা আইসিএস এস.এম. আলী ছিলেন আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু। সে সময় রাজশাহীতে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিভেদ ছিল না। 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটাই কখনও শুনিনি। আমাদের বাড়িতে মুলসমান সম্প্রদায়ের

জ্ঞানী-গুণীজনরা তো আসতেনই। সাধারণ শ্রেণীরও ছিল অবাধ প্রবেশ। হিন্দু-ছেলেদের পাশে বহু মুসলমান ছেলে আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেছেন। শিল্পী জয়নুল আবেদীনও আমাদের বাড়িতে থেকেছেন। মিউজিক কনফারেন্সে যোগ দিতে ৩৫ সালে এসেছিলেন ফয়েজ খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, ওঙ্কার নাথ ঠাকুর, তারাপদ ঠাকুর, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। উদয় শঙ্করও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ঋত্বিকের ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরে, ঋত্বিক উদয় শঙ্করের কলকাতার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেছে।

শিশুকাল অবসান পর, রাজশাহীর আলো বাতাস টেনেই আমাদের কৈশোর-তারুণ্য সবুজ পাতা উর্দ্ধমুখী হয়েছিল। আমরা দু'ভাই বোন ছিলাম দু'জনের পরম বন্ধু। এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি। এক সঙ্গে খেলেছি। এক সঙ্গে ঘুমিয়েছি। একই রকম পোশাক পরেছি। একই সঙ্গে সাইকেল চালিয়েছি। ঘোড়া দাবড়িয়েছি। ঘুড়ি উড়িয়েছি। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না। আট বছর বয়সে আমার ডিপথেরিয়া হল। ভয়ানক ছোঁয়াচে বলে আলাদা ঘরে আমাকে রাখা হয়। সকলের ও ঘরে ঢোকা বারণ। কিন্তু ঋত্বিক লুকিয়ে আমাকে ঠিকই দেখে যেত। ধরা পড়লে মা বকুনি দিতেন। চারদিনের দিন ওকেও ডিপথেরিয়ায় ধরল। ওতো মহাখুশী। আমার পাশে শুয়ে পড়ে বলল 'তোকে ছাড়া একদম ভাল লাগছিল নারে। অসুখ হয়ে ভালই হল।'

যে ছেলে ইনজেকশন দেখে ভয়ে মরত, সেই কীনা দাঁতে দাঁত চেপে বড় বড় সিরাম ইনজেকশনগুলো হজম করত। ওর জন্য কি যে কষ্ট হত তখন আমার।

নয় বছর বয়সে আমি টাইফয়েড-এ আক্রান্ত হলাম। সে যুগে টাইফয়েডের কোন ওষুধ ছিল না। ৮৬ দিন পর আমার জ্বর ছাড়ল। পরে শুনেছি, আমার অসুখের সময় ঋত্বিক ঘরের সব জিনিসপত্র পাগলের মত ভেঙ্গে ফেলত। আমার খেলনা, বই বুকে চেপে আমাদের খেলা ঘরে বসে বসে শুধু কাঁদত।

এগার বছর বয়সের আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের রাজশাহীর বাড়ির বিশাল ছাদের ওপরে আমরা দু'ভাই বোন ঘুড়ি ওড়াতাম। বাড়ির কাজের লোকেরা কাঁচ গুড়ো করে সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে দিত। আমাদের ঘুড়িটা হঠাৎ কেটে যায়। সেটির সুতো ধরতে গিয়ে আমি ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত দু' টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু ঋত্বিকের 'মা- মা' করে বুক ফাটা কান্না শুনে, সবাই ওকে নিয়েই টানাটানি করছে। সবাই ভাবছে ঋত্বিকের কিছু হয়েছে, আর আমি ? ওই ভাঙ্গা হাত ব্যান্ডেজ করে আবার ছুটেছি ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে। দুপুর হলেই, ঋত্বিক আর আমি ছাদে চলে যেতাম। আমার কণ্ঠে ওর প্রিয় গান ছিল 'মধ্য দিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি/ হে রাখাল, বেনু তবে বাজাও একাকী।'

ছাদের নহবতখানায় বসে ও বাঁশী বাজাত। আর আমাকে বারবার গাইতে হত ওই গানখানি। ঋত্বিক খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারত। আড়বাঁশী । রাগ সঙ্গীতেও ওর ছিল সহজাত দক্ষতা। ভাল আঁকত। পাঁচ বছর বয়সে ও ছাদের ঘুরন্ত ফ্যানের ছবি এঁকে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ঋত্বিক যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে, তখন 'দেশ' পত্রিকায় ওর কবিতা ছাপা হয়। পঞ্চাশ বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনে ঋত্বিকের কবিতাও আছে। গল্প লিখত। নাটক করত, এত প্রতিভা নিয়েও ও ক্রমান্বয়ে ছন্ন ছাড়া হয়ে ওঠে। টেক্সবুক ও ছুঁয়েও দেখত না। বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে কবিতা মুখস্থ করে ফেলত। ওর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত বাবার কাছে এসে আপসোস করতেন, ও যদি একটু বই খুলে দেখতো তো ফার্স্ট হতো।

পড়া লেখার প্রতি অমনোযোগিতার জন্য ও যখন নাইনে পড়ে—বয়স কত আর, বড়জোর পনের, টেকনিক্যাল লেখাপড়া শেখার জন্য ওকে কানপুর পাঠিয়ে দেয়া হল। ছয় মাস পর আমার চাইতে আধ হাত লম্বা হয়ে ফিরে এল। না, মাকে ছাড়া ও কানপুরে থাকবে না, মাকে ও ভীষণ ভালবাসত।

আবার আমাদের যৌথ অভিযান শুরু হল। পদ্মা নদীর চরে বেড়াতে ও খুব ভালবাসত। বিকাল হলেই, সাইকেলের পেছনে বসিয়ে ওকে নিয়ে পদ্মার চরে চলে যেতাম। বালির ওপর দিয়ে সাইকেল চালান সোজা কথা নয়। ও পারত না। আমাকে চালাতে হত।

শ্রমজীবী মানুষ ছিল ওর প্রাণ। রাজশাহীতে থাকতে থাকতেই ঋত্বিক বাম রাজনীতির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। মহাশ্বেতা যেমন উপজাতিদের নিয়ে কাজ করেছে,ঋত্বিক ডুয়ার্সের শ্রমিকদের ভেতর বহুদিন কাজ করেছে।

রাজশাহীর পদ্মার চরের একটা ঘটনা আজও আমার চোখের ওপর আবছা আবছা ভাসে। একদিন পদ্মার চরে বেড়াতে যাওয়ার সময় দেখি, ও টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়েছে। ভাবলাম, আমাদের জন্যে। কিন্তু না, সেই খাবার সে বড় পদ্মার চরে, খেঁজুর পাটির একটা ঘরে দিয়ে এল। বেশ কতদিন ধরে ও সেই খেঁজুর পাটির ঘরে খাবার পৌছে দিয়ে আসতে। কাকে দিত, কোন দিন সে তার নাম বলেনি।

৫০ সালে, আমার বিয়ে আর ওর বি.এ পাশ একত্রে হল। ও কলকাতায় রয়ে গেল। আমি শ্বশুর বাড়ি কুমিল্লায় চলে এলাম। ও জীবনে দু'টো জিনিস কখনও মেনে নিতে পারেনি। এক. দেশ বিভাগ, দুই. আমার বিয়ে।

যাই হোক। ঋত্বিক তখন গণনাট্যের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লে যে কি হত ভাবতে পারি না। ক্রমে নাটক হয়ে উঠল তার জীবন। নাটক করতে করতেই ঋত্বিক-এর একদিন সিনেমা বানানোর চিন্তা মাথায় চাপল। কিন্তু ওই টুকুন ছেলেকে কোন্ প্রডিউসার পয়সা দেবে? মেজদা সুধীশ ঘটক ওর পাশে এসে সেদিন না দাঁড়ালে

আজকে চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের নাম হয়ত কেউ জানতে পেত না। পরিবারের আর্থিক সাহায্যে তৈরি হল 'নাগরিক'।

ছবি করার আগে আমাকে চিঠি লিখে ওর সঙ্গে কাজ করার জন্য আহবান জানাল। কিন্তু আমার শ্বশুর মশাই ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত[১] আমার ওপর এত দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন যে, সে সব ছেড়ে একচুল নড়ার ক্ষমতা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পর ১৯৬০ সালে আমি কলকাতা গেলাম। সুচিত্রা সেনের শ্বশুরবাড়ি 'বালিগঞ্জ' প্যালেসে ঋত্বিক পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতো। ওর কাছে গিয়ে উঠলাম। আমাকে দেখে প্রথমেই বলল, 'এই মহিলার এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার কোন যুক্তি দেখিনা।'

সে সময় ওর কাছে যতদিন ছিলাম, ওকে নেশার বস্তু স্পর্শ করতে পর্যন্ত দেখিনি। একমাত্র নেশা তার ছবি বানানো।

'মেঘে ঢাকা তারা' সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে। টিকেট কেটে আমাকে নিয়ে গেল ছবি দেখাতে। 'অযান্ত্রিক'ও আমাকে দেখায়। ওর নতুন বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মীদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়, 'এই আমার ইন্টারন্যাশনাল পেয়ার। মাতৃজঠর থেকে পৃথিবী ভ্রমণ করার জন্য দু'জনে একত্রে ল্যান্ড করেছি।'

ঋত্বিক 'সুবর্ণরেখা'র নির্মাণ-প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি গেলাম বেড়াতে ওর ওখানে। ও আমাকে দেখে মহাখুশী। 'সুবর্ণরেখা'র স্ক্রীপ্ট আমার হাতে দিয়ে বলল, বিকেলে একটি মেয়ে আসবে, দেখিস তো এই গল্পের সঙ্গে মানাবে কি না। সত্যি, বিকেল বেলা দেখি আট পৌরে শাড়ি পরা, একটি মেয়ে ম্লান মুখে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভেতরে আসার সাহস পাচ্ছে না। ওর ভীরু, ম্রিয়মান করুণ চেহারা দেখে একটুও ভাবিনি যে ঋত্বিক ওর কথাই আমাকে বলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ বাড়িতে এসেছেন ? মেয়েটির বিনম্র উত্তর, হ্যাঁ, ঋত্বিক দা আমাকে আসতে বলেছিলেন।

ঋত্বিক ঘরে ছিল না। আমি মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে আসলাম। সঙ্কুচিতভাবে মেয়েটি তার নাম জানাল মাধুরী মুখোপাধ্যায়। বরিশাল থেকে এসে রিফ্যুইজী কলোনীতে বাসা বেঁধেছে। সরকার একটা সেলাই কল দিয়েছে। তা দিয়েই মা-মেয়েদের দু'বেলার আহার জোটে। একটা ছবি করেছে 'বাইশে শ্রাবণ'। ভীরুতার সঙ্গে বিনয়-নম্রতার মাখামাখি মেয়েটির মুখে যে ব্যক্তিত্ব সেদিন দেখেছিলাম, ঋত্বিক ফিরতেই বললাম, 'তোমার গল্পের জন্য এ মেয়েটিই যথার্থ।'

১. সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আইন সভার সদস্য ও প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনিই প্রথম ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদে প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়া হোক এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

বেনু মানে সুপ্রিয়া চৌধুরীর 'মেঘে ঢাকা তারা' করে খুব নাম ডাক হয়েছে তখন। ওরও খুব লোভ ছিল 'সুবর্ণরেখা'র জন্য। কিন্তু ঋত্বিককে একথা জানানোর সাহস ওর ছিল না। বেনু আমাকে বলেছিল, ঋত্বিকদা ভুল করেন না, যাকে যে চরিত্রে মানাবে, তাকেই নেবেন। অনুরোধ সেখানে অচল। হাসতে হাসতে আরও বলেছিল, 'মেঘে ঢাকা তারা'য় অভিনয় করার সময় ঋত্বিক তাকে কিভাবে ছিপ দিয়ে মেরেছিল, অবশ্য এটাও স্বীকার করেছিল যে, ওভাবে না শেখালে কিছুই হয়ত হত না। ঋত্বিককে ঘটনাটি অবহিত করলে ও জানিয়েছিল, এরকম মানসিকতা না থাকলে কিছু শেখা যায় না।

'৬৪ থেকে '৭১ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়, ঋত্বিকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল কম। '৬৪ তে আমার শ্বশুর রাজরোষে পড়লেন। তাঁকে জেলে নিয়ে গেল। হাইকোর্টে রীট করে তাঁকে বের করে আনলাম। আবার '৬৫ সালে জেলে নিয়ে গেল। একাত্তরের ২৮ মার্চ। সাড়ে সাতশত মিলিটারী আমাদের কুমিল্লার বাড়ি ঘেরাও করল। নৃশংসভাবে ওরা আমার শ্বশুরকে হত্যা করল।[২] আমার দশ বছরের ছেলেটাও সেদিন ওদের নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। সেই জের আজও বয়ে চলেছে আমার নিরপরাধ পুত্র সন্তানটি।

শ্বশুরের রক্তের ওপর দিয়ে দু'টি সন্তানের হাত ধরে সেদিন একবস্ত্রে বাড়ি ত্যাগ করি। কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌছে দেখি আমার চার ভাই আর তিনবোন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ঋত্বিককে দেখে কেঁদে ফেললাম। 'আমি আজ সর্বহারা। আমার আর কেউ রইল না।' আসলে আমার শ্বশুর ছিলেন নরোত্তম। তাঁর স্নেহ, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ছায়ায় আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আমার পিতৃ পুরুষরা কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। রক্ষণশীলতা ভঙ্গ করে ওই পরিবারের আমিই ছিলাম প্রথম বিদ্রোহিনী। কায়স্ত ঘরে বিয়ে করার জন্য আমার বাবা মনের দুঃখে মৃত্যু বরণ করেন— সমস্ত বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমার শ্বশুরের স্নেহময় ব্যবহারে। ঋত্বিক আমার যন্ত্রণা বুঝেছিল। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তোর সব আছে। আমরা আছি, তোর ছেলে আছে। মেয়ে আছে। স্বামী আছে। আর কি চাই। আবার সব হবে।'

'৭৩-এর প্রথম দিকেই আমি ঢাকায় ফিরে আসি। কিছুদিনের মধ্যে ও এল। আমাকে বলল, ও এবার 'পদ্মা নদীর মাঝি' বানাবে। কিন্তু সে সময় রাজশাহী ছাড়া পদ্মা করা মুশকিল। রাজশাহীর যোগাযোগ ব্যবস্থা তখনও ঠিক হয়নি। ব্রিজ ভেঙ্গে গেছে। রাস্তা উড়ে গেছে।

আমি ঋত্বিককে কুমিল্লায় আমার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে এলাম। সব লুটপাট হয়ে গেছে। আমার শ্বশুরের বিশাল লাইব্রেরী ছিল। সেটাও শেষ। কয়েকখানা বই কুড়িয়ে পেলাম, বাড়ির আশপাশে খানা-ডোবার মধ্যে। তার মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস

২. কুমিল্লার বাড়িতে তাঁকে হত্যা করা হয়নি—তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওখানেই নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয় ২৯ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে, ১৯৭১-এ।

একটি নদীর নাম' বইটি ছিল। অদ্বৈত কুমিল্লার জেলে সম্প্রদায়ের সন্তান। লেখাপড়া শিখে নিজের সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠিকে নিয়ে এই উপন্যাসখানা লেখেন। ঋত্বিক তাঁকে চিনতো না। ওর হাতে বইটি দিয়ে পড়তে বললাম। আমার পাশে শুয়ে শুয়ে বইটি যখন শেষ করল রাত তখন প্রায় তিনটে। বলল 'দ্যা আইডিয়া, এটিই ছবি বানাব'। তক্ষুণি স্ক্রীপ্ট লেখার জন্য বসে গেল। কলম আছে। কিন্তু কাগজ নেই। এতরাতে দোকানও খোলা নেই। শেষে আমার পরার একটা সাদা কাপড় দিলাম। তাতেই ও তিতাসের স্ক্রীপ্ট লেখা শুরু করল। একটানা পাঁচদিন বসে ও তিতাসের স্ক্রীপ্ট লিখে শেষ করল। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, এ পাঁচ দিনের মধ্যে একটি দিনও ও মদ্যপান করেনি। নেশার প্রতি কোন ঝোঁক আমি দেখিনি। তাই, তিতাস করতে করতে অসুস্থ হয়ে মহাখালী ভর্তি হল, যেদিন চিত্রালী'র এস এম পারভেজের টেলিগ্রাম পাই, সেদিন আমি সত্যি অবাক না হয়ে পারিনি। আমি কুমিল্লা থেকে ছুটে গেলাম মহাখালীতে। আমাকে দেখে সুবোধ বালকের মত মুখ করে বলল, 'কে তোমাকে খবর দিয়েছে। আমার কিচ্ছু হয়নি। আমি সুস্থ আছি। ওরা আমাকে ভালবাসে তাই এখানে নিয়ে এসেছে'। কি আর করা, আমি ফিরে গেলাম কুমিল্লায়। ও চলে গেল কলকাতায়। শেষ বারের মত চলে যাওয়ার স্মৃতি কোনদিন ভুলব না। কখনো যদি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ি তবু ওই দিনের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছবে না। আজও ছবির মত সেই স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভাসে।

সকালেই আমি কুমিল্লা থেকে ঢাকা পৌঁছেছি। এসেই ছুটে গেলাম সাইয়ীদ আতিকুল্লাহর বাসায়। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'এইমাত্র ঋত্বিক এয়ারপোর্টে চলে গেল'। গাড়ি নিয়ে আমিও এয়ারপোর্টে ছুটে গেলাম। প্লেন তখনও ছেড়ে যায়নি। দৌড়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, ঋত্বিক আর ক্যামেরাম্যান মহেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। পাঞ্জাবি ছেলে মহেন্দ্রর পাশে ছয়ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা ঋত্বিককে সেদিন এত সুন্দর লাগছিল যে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। বহুদিন পর ওকে দেখলাম ধবধবে ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবিতে।

আমার দু'চোখ বেয়ে অবিরল জল পড়ছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এল। তারপর জড়িয়ে ধরে কান্না আর কান্না। এয়ার ইন্ডিয়াকে বলল, দশমিনিট অপেক্ষা করতে। পাগলের মত বকে চলেছে, 'তোকে এখানে রেখে যাব না। আমার সঙ্গে এক্ষুণি যাবি। পাসপোর্টের কোন অসুবিধা হবে না', ইত্যাদি। এভাবে দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেল। প্লেন তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। লোকজন কেউ সামনে আসছে না। অনেক কষ্টে শান্ত করে বললাম, 'তুমি যাও। আমি দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি'।

তারপর সিঁড়িতে একপা রাখে। আর আমাকে ঘুরে দেখে। সেই আমাদের শেষ দেখা। আজ একা বসে ভাবি, মরে যাবে বলেই কি সে দিন ও আমাকে ছেড়ে যেতে চায়নি ?

মাতৃজঠর ভাগ করে নিয়েছিলাম দু'জনে। মৃত্যুকে ভাগ করাও তো আমাদের ভবিতব্য ছিল ?

'৭৬ সালে ঋত্বিকের মৃত্যু হল। একই সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আমাকে নিয়ে চলছে যমে-মানুষে টানাটানি। একটানা ছয় মাস পর, বসার মত একটু শক্তি এল শরীরে। প্রতিদিন, বহু-বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন-শুভার্থীরা আমাকে দেখতে আসতো। কিন্তু ঋত্বিকের মৃত্যুর খবর সবাই সতর্ককতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছে। ডাক্তার-নার্সরা পর্যন্ত আমার ঘর থেকে রেডিও সরিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে যম দেবতা রেখে গেলেন বটে। কিন্তু আমাদের বড় ভাই লোকেশ ঋত্বিকের সহযাত্রী হলেন।

তারপর কলকাতায় গিয়েছি। ঋত্বিকের ছেলে-মেয়েরা শান্তি নিকেতনে পড়ছে তখন। আমার অশক্ত দেহ শান্তি নিকেতন পর্যন্ত যাওয়ার মত ছিল না। ভাইঝি-ভাইপোদের খোঁজ খবর করা আর হয়নি। বছর পাঁচেক আগে, ঋত্বিকের ছেলে ঋতবান ঘটক ঢাকায় এল। 'তিতাস'এর একটা কপি কেনার জন্য। শিল্পী কালিদাস চক্রবর্তীর ছেলে ওর বন্ধু। শান্তি নিকেতনে একত্রে পড়াশোনা করেছে। আমি কুমিল্লা থেকে ফোন করলাম। বললাম, 'তুমি এসো। আমার কাছে না এলে যে তোমার আসাই হত না।' চলে যাওয়ার ঠিক আগের দিন দুপুরে ঋতবান এলো প্রবলভাবে কড়া নাড়িয়ে। পরের দিন সকাল বেলাই প্লেন। রাত নটা পর্যন্ত একটি কথা না বলে, শুধু আমার দিকে চেয়ে রইল। চলে যাওয়ার সময় আমার গলার লাল তিলটি দেখিয়ে বলল, বাবার গলাতেও এ রকম একটা তিল ছিল। সামান্য একটা কথায় আমার বুকে ঝড় তুলে ঋতবান চলে গেল।

ছেলে-মেয়েরা ঋত্বিকের কাছে ছিল ভীষণ প্রিয়। 'মেঘে ঢাকা তারা'য় ঋত্বিকের বড় মেয়ে শিশু অবস্থায় অভিনয় করেছেন। এছাড়া ওর ছবিতেই শিশুরা ছিল আশার প্রতীক। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' বাচ্চাদের জন্য করা ছবি। ছবির ব্যাপারে ও ছিল একেবারেই আনকম্প্রোমাইজিং। আবেগ প্রবণ ছিল অসম্ভব, বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধি একেবারেই ছিল না। ওর সরলতার সুযোগ নিয়েছে অন্যরা। ওর সবচেয়ে ভাল সময় কেটেছে পুনার ফিল্ম ইন্সটিটিউটে। ও ছিল ওখানকার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল। ওর মৃত্যুর পর শত্রুঘ্ন সিনহা চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। আমার একটাই দুঃখ, ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে ওর পাশে আমি থাকতে পারিনি।

অনুলিখন : মাহমুদা চৌধুরী

ঋত্বিক ও আমি : আমাদের ছেলেবেলা

প্রতীতি দেবী

খুব ছোটবেলায় যতটুকু মনে আছে এবং আজ এতো দিন পরে স্মৃতিও তো সব ধরে রাখতে পেরেছে কি ? অনেক বিস্মৃতও বটে। এ অবস্থায় আমার-ই হাতে লেখা কি হবে জানি না, তার মূল্যায়ন বা কতটুকু হবে ভেবে শঙ্কিতচিত্তে কিছুটা চেষ্টা করছি সভয়ে পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে।

ঋত্বিক, আমার এবং আমাদের সমগ্র পরিবারটিই একটি সেলুলয়েডের ছবির মতনই।

বাবা যখন যশোরে কর্মরত, আমাদের বয়স তখন দুই আড়াই হবে। তা ছোটদের একটা ছায়া ছায়া আবছা সামান্য যা কিছু মনে হয় বোধহয় যার অনেকটাই স্বপ্নের মতো, সে থেকেই শুরু করতে চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর (উচ্চ রাজকর্মচারী) উৎসাহে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি যাত্রা করলাম। নিভৃত মনেতে আশা যশোরে নব্বই বিঘের ওপর ক্লাইভের আমলের বহু বিচিত্র গল্পের নায়িকা সে বাড়িটি দেখে আসবো। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লিখে নিলাম আবছা স্মৃতির টুকরো টুকরো অংশ, দেখে মিলিয়ে নেবার জন্য। খুবই কম, তবু যা ভেবেছিলাম প্রায় মিলে গেল। বাকি সব বাড়িতে শোনা গল্পের সঙ্গে মেলালাম। দোতলায় ওঠার মস্ত কাঠের সিঁড়ির নিচের অন্ধকার সেই কুঠুরি যাকে গুমঘর বলা হতো নিচ থেকে নাকি কান্নার শব্দ শোনা যেত। মিলে গেল। যে বারান্দায় কাঠের ঘোড়ায় চড়ে রেস দিতাম তাও মনে হলো চিনলাম। পরে যে মাঠে বাবার সঙ্গে সত্যি ঘোড়া চড়া শেখার জায়গা সেটা ভালোই চিনলাম। তিনটে পুকুর ছিল, যেখানে মা নিয়মিত মাছ ধরতেন। ছোট্ট আমরা সেগুলোকেই নদী বলতাম। আসল নদীতে তো বোটে যাওয়া হতো কিন্তু মনে নেই ভালো করে।

বাবা বদলির পরপরই বাইশ দিনের ট্যুরে মফস্বল চলে গেলেন। কুড়ি-বাইশটা লণ্ঠন ও হ্যাজাক নিয়ে আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে মা রইলেন; ভূতের বাড়ি বলে স্থানীয় কোনো কর্মচারী পাহারাদার সন্ধ্যের পরে থাকে না। পুলিশ বাধ্য হয়ে থাকতো শুনেছি, কিন্তু গার্ডের ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকতো।

অসীম সাহসী মা সারারাত বই পড়ে আর রাতভর ঘুরে ঘুরে কিছুই দেখতে পাননি। সাহসীদের ভূতেরাও বোধহয় ভয় পায়। এদিকে দিনের বেলা পুলিশরা আমাদের গলা কাটা সায়েবদের গল্প বলতো। মা শুনে তাদের পাহারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যেসব কাজের লোক পরিবারের সঙ্গে গিয়েছিল শুধু তারাই থাকলো।

মা না দেখলেও অন্যেরা নাকি কাউকে কাউকে দেখেছিল। মাঝখানের খুব বড় ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা, সে ঘরে অন্য দু'ভাইবোনও থাকতেন তাঁদের আলাদা খাটে। ঘুমোনোর সময় ভারি মিষ্টি গলায় কে গান গাইত সে কি মা না অন্য দিদিরা মনে নেই, তবে গানটা মনে আছে। 'আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা'। (বড় হয়ে মা-র কাছে জীবনের প্রথম শেখা আমার এই গানটি)।

সবাই বলতো ঘুমপাড়ানো একটি সুন্দর মেয়ে নাকি গাইতো। ঋত্বিক ও আমি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। প্রথম জ্ঞাত হয়েই ভূতেদের সান্নিধ্যে এক বিরল জীবনরাম্ভ। পরে তো নিজেরাই ভুত হয়ে গেলাম। যতদিন দু'জন এক সঙ্গে ছিলাম মাথার কাছে বই এবং গান না শুনে ঘুমোতে পারতাম না। আমি পরে অনেকদিন সে অভ্যেস ছাড়তে পারি নি কিন্তু ঋত্বিক পরে কি গান শুনতে পেত ? ওর বাড়িতে তো তখন সুর ছিল না বলেই জানি। অনেক পরে কলকাতায় দেখেছিলাম গান শুনতে তবে বাড়ির কারোরই নয়। রেকর্ডে নামকরা গাইয়েদের গান। আমিও অবশ্য কুমিল্লায় গভীর রাতে রেকর্ড প্লেয়ারে তাই শুনতাম।

ভূতরা যে কতো ভালো বন্ধু হয় আমি জানি কিন্তু ঋত্বিক ভারি ভীতু ছিল তাই ওরা ওর বন্ধু হয়নি। একটু বড় হয়ে মাকে জড়িয়ে ছাড়া শুতে পারতো না। ভূতদের গল্প শোনার আমার অত্যন্ত উৎসাহ তাই বাবা 'ইউনিভার্সাল ঘোস্ট স্টোরি' থেকে আমাদের শোনাতেন। ঋত্বিক কানে আঙ্গুল দিয়ে মাকে জড়িয়ে বসে আমাকে আস্তে আস্তে ভীষণ বকতো। আমার জন্যই তার এ শাস্তি। সেসব গল্পের খুব বিখ্যাত একটি (সত্যি ঘটনা) গল্প আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। সে গল্প ভীতুদের জন্য নয় তাই আলাদা হলদে কাগজ জড়ান ছিল। বড় হয়ে ঋত্বিকের যখন ভয় একটু কমলো আমার কাছে অনেকবার এ গল্প সে শুনেছে। এগুলো একটু বড় হবার পরে।

আগেই বলেছি কিছু আগে পরে হতে পারে স্মৃতির ধারাবাহিকতা বিঘ্নের জন্য।

এরপরে ময়মনসিংহ। সেখানে আমাদের চার বছর থেকে সাত পর্যন্ত যা মনে আছে লিখতে চেষ্টা করছি। এখানকার স্মৃতি বেশ ভালো মনে আছে কম হলেও।

ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে মস্ত মাঠ, তারপরে বাগানঘেরা ভারি সুন্দর বাড়ি। অনেক সুখ-স্মৃতি আজ স্বপ্নের মতো দুঃখ-সুখের পাখিদের গান হয়ে আমার হৃদয়তন্ত্রে এক গভীর অনুভূতি জাগায়।

এখানেই পাঁচ বছর বয়সে আমাদের আনুষ্ঠানিক হাতেখড়ি। সে বৃহৎ অনুষ্ঠানের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু সবকিছু খুব পরিষ্কার মনে করতে পারি না। তবে পেটুক ঋত্বিক পুরোহিতের খাবার থালা থেকে রসগোল্লা ছোঁ মেরে নিয়ে খেয়ে ফেলা ছাড়া। যে কোনো খাবার আমার ভাগেরটাও খেয়ে ফেলতো। আমারও খাবার দাবারের প্রতি অনুরাগ কম তাই তাতে আমি অখুশি হতাম না।

শুনেছি পরবর্তী জীবনে খেতে দেয়া হতো না বা পেত না— আমার মা-বাবার সৌভাগ্য সে দৃশ্য দেখতে হয় নি।

এরপর আমাদের মিশনারী স্কুলে ভর্তি হবার পালা। এই প্রচণ্ড দুরন্ত দু'টিকে নিয়ে মা গেলেন স্কুলের পথে। খুব বেশি দূরত্ব বোধ হয় ছিল না মনে হয় এখন । গাড়ির ভেতরেই দু'জনকে নিয়ে মা-র উদ্বিগ্ন মুখ আবছা মনে আছে। মা হয়তো ভাবছেন এদের কি সত্যিই স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মে রাখা যাবে ? কি অঘটন ঘটিয়ে বসবে, নানা চিন্তা। যথাসময়ে গেটে প্রিন্সিপ্যাল, ইংরেজ মহিলা মিস হগবেন সাদরে তাঁর আপিস ঘরে নিয়ে বসালেন। মা প্রথম থেকেই আমাদের সব রকম গুণকীর্তণ বর্ণনা করেছেন, তখন আমরা দু'জন মিস হগ্‌বেনের গোল টেবিলের নিচে ঢুকে খুবই অশোভন খেলা অর্থাৎ তাঁর জুতো-মোজায় A.B.C.D লিখে চলেছি। সবিনয়ে মা বললেন, এদের কি তিনি সামলাতে পারবেন ? হেসে তিনি বললেন, 'সে ভার তো আমার মিসেস ঘটক। আমরা শিক্ষাব্রতী, শিশুকে মানুষ করাই আমাদের ব্রত এবং প্রধান ধর্ম।' সে স্নিগ্ধ সৌম্য ইংরেজ মহিলাকে আজও ভুলতে পারি নি অনেক কিছু ভুলে গেলেও। ওইরকম ডানপিটে ছেলেমেয়ে নিয়ে মা এবং বাড়ির সকলের যে দুশ্চিন্তা ছিল (বাবা ছাড়া) কিছুদিনের মধ্যে তা নিরসন হয়েছিল শুনেছি। তিনি আমাদের প্রতিদিনের সহচরী ছিলেন কিছুদিন। রাত্রে শোবার সময় আদর করে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প-কথা বলতেন। শেষ কথাটি ছিল whatever you do, do with your mind—আজও প্রতি রাতে তাঁকে স্মরণ করে কথাটি মনে করি। যা করি মন দিয়েই করি, যা করি না তা কখনওই করিনা। কোনো আপোষ-মীমাংসা সেখানে নেই। ঋত্বিক তার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে। যা সে করে বা বিশ্বাস করেছে তা যে কোনো মূল্যেই করেছে। যা সে করে না, কোনো অবস্থাতেই তা সে করে নি। আমার চেয়ে অনেক বড় লেখকরা তার মূল্যায়ন করে গেছেন এবং করছেন। সে তার সেলুলয়েডের ফিতেয়ই তো সব গেঁথে দিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা বা ভাবমূর্তি যদি নিতে পারেন, ওর নিরলস ক্রিয়াকাণ্ডের সার্থকতা সেদিনের জন্যই তোলা রইল। যে এতো ভোজনবিলাসী ছিল, নিদারুন খাদ্যাভাবও তাকে কর্মবিমুখ করতে পারেনি। দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে গেছে এতো বড় দেশ ও দশের সম্পদ, ক্ষণজন্মা ঋষি ঋত্বিক ঘটক।

আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান বাবা-মায়ের বিবাহ বার্ষিকী। কত রকমারি সাজে সকলে সাজতো, বাড়িতে লেখা নাটক হতো, কতো নাচ-গানের অনুষ্ঠান যে হতো, কত মানুষের আনাগোনা, খাওয়া-দাওয়া সে এক উৎসবমুখর দিন হতো। একবার ঋত্বিক— রাম, আমি—লক্ষণ, দিদির মেয়ে টুসকি সীতা হয়েছিল। কি যে সুন্দর অনুষ্ঠান, আমার ভালোভাবেই মনে আছে। সেদিনের বাবা-মায়ের সঙ্গে রাম-লক্ষণ ঋত্বিক-প্রতীতির ছবি এখনও আছে। রাম রুপী ঋত্বিক সেদিন কিন্তু অনেকের খাবার খেয়ে ফেলেছিল মেহেদী গাছের আড়ালে গিয়ে, আমাকে পাহারায় রেখে!

ব্রহ্মপুত্র নদীতে দাদা-দিদিরা সাঁতার কাটতে যেতেন। কখনও বাবা-মাও যেতেন। সে যায়গাটা খুব মনে আছে। ওঁরা যে রেলিং-এর ওপর থেকে ঝাঁপ দিতেন, মাছের চেয়েও সুন্দর করে সাঁতরিয়ে চরের থেকে তরমুজ পিঠে নিয়ে ফিরে আসতেন, তাই দেখে আমাদের যে কি ভীষণ ইচ্ছে হতো ওঁদের মত সাঁতার কাটতে। কি বলব বিধি

বাম—ঐ মিস হগবেন বেল্ট বাঁধা চেয়ারে দু'জনকে বসিয়ে শুধু দেখতে দিতেন। বলতেন একটু বড় হলেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে। পদ্মার মতো ঘুর্ণি না থাকায় ব্রহ্মপুত্রে অত ভয় ছিল না। কিছুদিন পরে লাইফ বেল্টের সঙ্গে দু'জনকে বেঁধে একদিন শুধু নামান হয়েছিল।

ব্রহ্মপুত্র নদী আমাদের সকলের খুব ভাল লাগত। দাদা-দিদিদের সাঁতারের জন্য বাবা সুন্দর কাঁচা কটেজ করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দুঃখের কথা আর কি বলব, চার পাঁচজন লোক ও ভাইবোনদের সঙ্গে ছাড়া আমাদের ওমুখো যাবার হুকুম ছিল না।

এরপরে সুসং-এ যাবার কথা বেশ মনে আছে। বাবার নিজের কাজ ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণে পরিবারের সুসং যাত্রা। তাঁরাই বোধহয় হাতি ও অপূর্ব সুন্দর পালকি পাঠিয়েছিলেন। মা পালকিতে, বাবার হাতিতে আমরা দু'জন, অন্যেরা অন্য হাতিতে মরা নদীর ওপর দিয়ে সুসং চললাম। কি সুন্দর সে নদীপথ। নদী পার হতেই কমলালেবুর গাছ। আমাদের ছোট ছোট হাতে কতো যে কমলালেবু ছিঁড়ে হাতিকে খাওয়ালাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে ; কি বলবো কি যে আনন্দ। সে অপরূপ দৃশ্য খুব পরিষ্কার মনে আছে কিন্তু সুসং রাজবাড়ির স্মৃতি খুব কম। আমাদের বাড়িতেই তাঁদের অনেকবার দেখেছি।

এক সময় শ্রী মণি সিংহ ঢাকায় কোনো এক বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই বাড়িতেই আমি কুমিল্লা থেকে এসে উঠলাম। আমার নাম শুনে আমাকে ডেকে অবাক হয়ে আদর করে বলেছিলেন, 'এ নামতো মনে রাখার মতো, তুমিই সেই ছোট্ট প্রতীতি।'

সে আমলে প্রবাদবাক্য ছিল, একশ বছরে একবার টর্নেডো হয়। আমরা ময়মনসিংহ থাকাকালীন সেই ভয়াবহ টর্নেডো সমস্ত জেলা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। বিকেল চারটের দিকে নদীর ধারে আমাদের খেলতে নিয়ে যেত দু'জন, কারণ একজন আমাদের সামলাতে পারতো না। হঠাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল সারা আকাশ, সঙ্গে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কোলে উঠিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হতে চেষ্টা করছে, এমন সময় দেখি নদীর মাঝখান থেকে লম্বা হাতির শুঁড়ের মতো গোল কি ভীষণ একটা কিছু আকাশে গিয়ে ছুঁয়েছে। এরপরই প্রচণ্ড ঝড় এবং আমাদের নিয়ে কিছুতেই ফিরতে পারছে না। বাবা তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরেই সব লোকজন নিয়ে এলেন অতি কষ্ট করে। একটা ছোট ঘর ছিল, সে ঘরে সকলকে ঢুকিয়ে (কাজের সব লোকদেরও) চুপ করে বসে থাকতে বলা হলো। সে অবস্থায় ঋত্বিক বললো, 'চল চোরপুলিশ খেলি।' আমাদের ওপরের ছোড়দা তখন বারো তেরো বছরের ছেলে, খুব ধীর স্থির শান্ত ছিল। সে হারমোনিয়ামের বাক্স এনে বোর্ড বানিয়ে স্কুল স্কুল খেলতে লাগলো কিন্তু ঋত্বিক ও আমি সে খেলা খেলতে চাই না। একটু ঝড়ের তাণ্ডব কমলে বাবা-মার খাটে মশারী টাঙ্গিয়ে জাহাজ তৈরি করে বাড়িতে যত ভালো খাবার ও পানীয় ছিল তা খাওয়াতে ঋত্বিক বশ মেনে গেল। সেই ভাই লোকেশ ঘটক পরবর্তী জীবনে নেভাল কমোডর

ছিলেন কিন্তু আসলে তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতেন, লেখায়ও পারদর্শী। বম্বের থেকে নিজের কাগজ 'ওশেনাইট' এডিট করতেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় অতি শিশু বেলা থেকে ঋত্বিক ছবি আঁকা ও ছবি তৈরির অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

এদিকে জেলা অধিকর্তা হিসেবে বাবাকে তক্ষুণি জেলা, মহকুমা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হলো আর মা তাঁবু খাটিয়ে অনেকগুলো টেম্পোরারি হাসপাতাল বানিয়ে তাঁদের সেবায় নিযুক্ত হয়ে গেলেন। তারও হালকা ছবি কিছু মনে আছে।

এ অবস্থায় এই দুই দুরন্ত শিশুদের নিয়ে ভাইবোনদের কি অবস্থা হয়েছিল তাঁদের কাছে পরে সে গল্প শুনেছি। কিন্তু ত্রাণনেত্রী ঐ মিস হগবেন। তখনই তিনি আমাদের দায়িত্বে এলেন। আমাদের Rit ও Prit বলে ডাকতেন। সে কণ্ঠ স্বপ্নের ঘোরে এখনো কখনও কখনও বেজে ওঠে। কখনও কানে। কখনও প্রাণে। চমকে যাই আজ এতো বছর পরেও তিনি আমাদের ছেড়ে যাননি। ঋত্বিক তো তাঁরই কাছে, আমি কেন এতোদূরে ?

তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল করেছে ঋত্বিককে— আমাকে করেছে মানসিক শক্তির অধিকারী। প্রণাম তোমায়, শত শত কোটি প্রণাম তোমার পায়ে, বুকে-মুখে।

এতো যে দুরন্তপনায় জ্বালিয়েছি তবু তো কখনও একটি জোরে কথাও শুনিনি কারোর কাছে। এমনকি যাঁরা কাজের লোক ছিলেন তাঁদেরও কি অকৃত্রিম স্নেহ পেয়েছি। সবাই তাঁরা প্রণম্য আমাদের কাছে।

এরপরে কলকাতায়। সেসব কথা এ স্বল্প পরিসরে লেখা হয়তো যাবে না। অল্প লিখে এ লেখা শেষ করা সমীচীন বোধ করছি।

দু'জনে প্রথমে একই মিশনারী স্কুল, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে না পারার কারণে। পরে ও বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট হাই স্কুলে ভর্তি হলো। রোজই আমাকে নিয়ে গাড়ি ওর স্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে ফেরা। কিন্তু ঋত্বিকের স্কুলে গেলেই ড্রাইভার শিউনন্দনকে ছোলা ভাজা খেতে দিয়ে আমাকে থামিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট বা অন্য কিছু খেলে বাড়ি ফেরা। এতো দেরী হয় দেখে বাবা ভাবলেন শিউনন্দন নিশ্চয় দেশওয়ালী ভাইদের সঙ্গে গল্প করে আমাদের আনতে দেরী করে । মা শুনে বললেন কনিষ্ঠদের যদি এখনও চিনে না থাক তবে তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। বাবাকে নিয়ে মা নিজেই একদিন আমাদের আনতে গিয়ে দেখালেন কনিষ্ঠদের যুগল বাঁদরামো। ওঁদের দেখেই দু'জন দু'জনের কোলে বসে আনন্দে চৌরঙ্গীর ফিরপো থেকে চকোলেট ও কেক খেয়ে ও নিয়ে বাড়ি ফেরা। অন্য ভাইবোনদেরও লাভ হলো তাতে, তারাও মহাখুশি। সেই সময়ই বিকেলে খেলতে গিয়ে পার্কে স্লিপ খেয়ে পড়ে আমার হাত ভাঙল। সেই হাতে আজও ধন্বন্তরী ডাক্তার স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ের হাতের স্বর্ণাক্ষর বহন করছি। হাত ভেঙে যেন স্বর্গ উদ্ধার করেছি মনে হলো। যেমন প্রচুর জিনিস তেমনি খাওয়া দাওয়া। সেইসব জিনিস দিয়ে বাড়িতেই একজিবিশন হলো। তাতেও আমি পুরস্কৃত হলাম। এই শোকে ঋত্বিক অস্থির হয়ে গেল, কেন ওরও হাত ভাঙছে না। ভীষণভাবে প্যারালাল বার ইত্যাদিতে লাফালাফি করে অবশেষে ওরও এক হাত ভাঙল কিন্তু ওর বেলায় পুরস্কার কিছু কমতি হওয়ায়

আমার সব জিনিস ওর বলে দাবি জানিয়ে নিজের বলে ঘোষণা করলো। বয়স সাড়ে ৭ বছর। সব জিনিসে নিজের নাম লিখে আঠা দিয়ে সেঁটে দিল। কারণ দেখালো সেছাড়া আমার দাবিদার কেউ নেই। ওর একবারই ভেঙেছে আমার কিন্তু তারপরেও হাত চারবার, পা চারবার ভেঙেছে। সব কিছুতেই ওরই বেশি কষ্ট হয়েছে। যেমন কান্না তেমনি ভালোবাসা।

সেজদা, ছোড়দা বাবার দেয়া চকচকে টাকা সব আমার হাত বুলিয়ে দু'টো চকোলেট দিয়ে নিয়ে যেত সিগ্রেট খাবার জন্য। ভীষণ মনকষ্ট ঋত্বিকের। বাবা বার্মা চুরুট খেতেন। একদিন আমাকে বলল, ওরা সিগ্রেট খাকগে, তুমি বাবার ওখান থেকে চুরুট নিয়ে এসো, ওদের দেখিয়ে আমিও খাব, বয়স ১০ বছর। আনলাম চুরুট কিন্তু হা হতোস্মি— দাদারা সেখানেও দাদাগিরি ফলিয়ে চুরুট খেতে লাগল। বোধহয় এসব অতীতের মন-দুঃখেই শেষ জীবনে বিড়ি ধরেছিল। হয়তো ভেবেছিল এ জিনিসে আর কেউ ভাগ বসাবে না। বসায়ওনি। ভালো কিছু তো অন্যেরা নিয়ে গেছে। এদিকে দাদারা মাকে ভীষণভাবে বুঝিয়ে বললো কুকুরের স্টিম্যুলেন্ট প্রয়োজন নইলে রাত জাগা সম্ভব নয়। তাদের জন্য গোল্ড ফ্লেক, ক্যামেল, ক্রাভেন-এ লাকিস্ট্রাইক জাতীয় ভালো ভালো সিগ্রেট আসতে লাগল। খুব সঙ্গত কারণেই সেসব কুকুরের চেয়ে মনিব পুত্রদের কাজেই বেশি লাগলো তবে প্রচণ্ড নেশা করিয়েছিল ওই দুই কুকুরকে। শেষের দিকে দাদারা বাড়িতে না থাকলে তারা সোজা মার কাছে চলে যেতো। পশু অনেক আবেগপ্রবণ ও অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের চেয়ে, আজ জীবন সায়াহ্নে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেই একথা বলছি।

এরপরের অনেক কাহিনী সেকথা পরে আসবে আশা রাখি এবং যদি লিখতে পারি শেষ পর্যন্ত। অবিচ্ছিন্ন দু'টি প্রাণের দোসর কেউ হতে পারলো না, আমাদের জীবনে প্রমাণিত সত্য এটি। দূর দেশী ঐ রাখাল ছেলেটি আমার বাটের বটের ছায়ায় সারাবেলা খেলে সন্ধ্যেয় কোথায় ফিরে গেল আর খুঁজে পেলাম না। আমাদের জীবনেতিহাস একটি সফল সেলুলয়েডের ফিতে।

আমি একা বয়ে চলেছি এ মর্মবেদনার ছোট্ট একটা সাদা পাল তোলা ডিঙি— অনেক নদী পেরিয়ে ঢেউ-এর পর ঢেউয়ে ভেসে কোথায় গিয়ে ঠেকবে জানি না। হয়তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে নয়তো সেই যে মস্তবড় নদীটা যার ওপার দেখা যায় না, শুধু ভাবা যায় দিকচক্রবাল রেখার ওপারে কি আছে, তাতো আমি প্রতীতি জানি না— জানে ঋত্বিক ঘটক।

চলচ্চিত্র কেন্দ্রের ঋত্বিক স্মরণাঞ্জলি

গোলাম হায়দর কিসলু

বিশ্ব চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী ঋত্বিক কুমার ঘটকের ৭০তম জন্ম দিবসে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র গত ৪ঠা নভেম্বর '৯৫, তাঁর তিনটি নির্বাচিত চলচ্চিত্র নিয়ে ঋত্বিক ঘটক রেট্রোস্‌পেক্‌টিভের আয়োজন করে। সিনেমার শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় এটি ছিল চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের ত্রয়োদশতম অনুষ্ঠান। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের আমন্ত্রণে এসেছিলেন বরেণ্য চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকেরই যমজ বোন শ্রীমতি প্রতীতি দেবী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের উপদেষ্টা কবি সাংবাদিক অরুন দাশগুপ্ত। চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র-র উপদেষ্টা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের পরিচালক শৈবাল চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্যে তিনি ঋত্বিককে আমাদের চলচ্চিত্রের নীলকণ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'পুরাণে কথিত আছে শিব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গরল আকণ্ঠ ধারণ করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। তেমনি ঋত্বিকও আমাদের এই বিপর্যস্ত সমাজের অন্যায় ও অসংগতির বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে স্থাপন করে গেছেন। সমস্ত গরলকে ধারণ করে গেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে এবং অন্যান্য সৃষ্টিতে'। এরপর প্রতীতি দেবীকে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী সদস্যা ডাঃ সালমা সুলতানা পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করেন এবং সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশীষ রায় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। ৭০তম জন্মদিবসে শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদের একটি আঁকা চিত্রকর্ম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতীতি দেবীকে শিল্পীর কন্যা উম্মে নাহিদা রুহী উপহার দেন।

তিন দিন ব্যাপী ঋত্বিক ঘটক রেট্রোস্‌পেকটিভ-এর উদ্বোধনী ভাষণে প্রতীতি দেবী তাঁর যমজ ভাই ঋত্বিকের সাথে বাল্যস্মৃতি তর্পণ করেন এবং বলেন, 'সমগ্র জগতের কাছে তিনি কোন কৈফিয়ত রেখে যান নি। নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি বলে গেছেন— আমি তোমাদেরই লোক। আমার আহার-বাসস্থান নেই— আমার অভ্যস্থ জীবন নেই। কিন্তু আমি দেহ মনে প্রাণে, জ্ঞানে অজ্ঞানে নিপিড়িত মানব সন্তানের বন্ধু এবং রক্তের আত্মীয়। ঋত্বিক তাঁর অপরূপ রূপদিয়ে কাউকে ভোলান নি— ভালোবাসায় ভুলিয়ে গেছেন সকলকে।'

অতিথি ভাষণে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের উপদেষ্টা কবি সাংবাদিক অরুন দাশগুপ্ত ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের এবং শিল্পী জীবনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেন এবং চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রের প্রশংসা করে বলেন, 'চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র সিনেমার শতবর্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। চট্টগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামবাসীর তথা সকল

চলচ্চিত্রামোদীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছে তাদের উল্লেখযোগ্য সব আয়োজনের মাধ্যমে'।

সভাপতির বক্তব্যে ভাস্কর আব্দুল্লাহ্ খালিদ ঋত্বিক ঘটকের সাহস-সততা এবং ত্যাগের প্রতি আলোকপাত করে বলেন, 'নিজের ঐতিহ্য, সমাজ এবং মানুষকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলেই তিনি এসব কিছুতে যে স্খলন দেখতে পেয়েছেন তা মর্মবেদনার সাথে তুলে এনে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের ভুল শোধরানোর জন্যেই।' এরপর মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রতীতি দেবী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক নাজিমুদ্দীন শ্যামল। উদ্বোধনী দিবসে ঋত্বিকের ৭০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র সংগ্রহে রাখার মতো একটি পোস্টার প্রকাশ করেছে। চট্টগ্রামের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গসহ হল উপচে পড়া দর্শকদের সমারোহে ঋত্বিক কুমার ঘটকের ৭০তম জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালার প্রারম্ভ সূচিত হয়। প্রদর্শনীর প্রথম ছবি ছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সঙ্গীত সম্বলিত কালজয়ী এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, গীতা দে, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং গীতা ঘটকের মতো প্রতিভাবান অভিনয় শিল্পীরা।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় প্রতীতি দেবী 'আমার সাত মিনিটের বড় ভাই ঋত্বিক' ও 'ঋত্বিক ও আমার ছেলেবেলা' শীর্ষক নিজের লেখা দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিন সন্ধ্যায় ঋত্বিকের কাহিনী ও চিত্রনাট্যে সলিল চৌধুরী সুরারোপিত এবং বিমল রায় পরিচালিত 'মধুমতি' প্রদর্শিত হয়। দীলিপ কুমার ও বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত কিংবদন্তীসম এই ছবিটি পিনপতন নীরবতায় দর্শকেরা উপভোগ করেন। তৃতীয় দিনে ঋত্বিকের আত্মজৈবনিক চলচ্চিত্র 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রদর্শনী নির্ধারিত থাকলেও যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তা সম্ভব হয়নি। পরিবর্তে পুনরায় 'মধুমতি' ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

শেষ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্টাডি সার্কেল। গত ২৪ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠিত মাসিক স্টাডি সার্কেলে এ মাসের বিষয় ছিল, 'ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র'। এতে প্রথমে ঋত্বিকের শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রদর্শিত হয়। এবং পরে এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে ঋত্বিকের সামগ্রিক চলচ্চিত্র কর্ম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে সুন্দর ও ব্যতিক্রমধর্মী এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমরা চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প রি শি ষ্ট



শিল্পী লুৎফল হক কৃত ঋত্বিক ঘটক-এর প্রতিকৃতি

পরিশিষ্ট : ১

জীবনপঞ্জি :

জন্ম : ৪ নভেম্বর ১৯২৫ ; স্থান : ২ ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা : পিতা : সুরেশচন্দ্র ঘটক (আইসিএস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) ; মাতা : ইন্দুবালা দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : মনীশ ঘটক (কবি যুবনাশ্ব বলে খ্যাত) বহুগুণের অধিকারী, সুসাহিত্যিক— তাঁরই কণ্যা প্রথিতযশা বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও সমাজ সেবিকা মহাশ্বেতা দেবী। দ্বিতীয় ভ্রাতা : সুধীশ ঘটক। ১৯৩৭ সালে লন্ডন ও জর্মানী থেকে ফটোগ্রাফিতে উপমহাদেশে প্রথম শিক্ষা নিয়ে দেশে ফেরেন। তিনিও রামেশ্বর বাগচী ছদ্মনামে লিখেছেন, তবে কম। পাঁচ ভাই ও চার বোনের সংসারে ঋত্বিক ভাইদের মধ্যে সবার ছোট— তাঁর যমজ বোন প্রতীতি দেবী বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি- অভিনেতা সঞ্জীব দত্তের স্ত্রী এবং শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের (১৮৮৬-১৯৭১) পুত্রবধূ।

পারিবারিক পটভূমিকা : ঋত্বিকের পরিবারের ইতিহাস অনেক ঐতিহ্যময়। বংশের আদি পুরুষ ছিলেন পন্ডিত কবি ভট্টনারায়ণ। কিংবদন্তী অনুসারে, গৌড়ের রাজা বল্লাল সেন কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনে বসিয়েছিলেন তাঁদেরই একজন ভট্টনারায়ণ। তাঁর দুই পুত্রের একজন রাঢ় ও একজন বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। রাঢ় দেশে যাঁরা যান তাঁরা রাঢ়ীশ্রেণী--- এঁদেরই বংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। আর এই বরেন্দ্রভূমের বারেন্দ্রশ্রেণীতে শাণ্ডিল্য গোত্রের জমিদার বংশে ঋত্বিক ঘটকের জন্ম। ঘটক এ বংশের উপাধি, আদি পদবী বাগচী।

শিক্ষা : পাঁচ বছর বয়সে প্রথম পাঠ ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে, তারপর কলকাতার বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে ক্লাশ থ্রি থেকে পড়া শুরু। ক্লাশ ফোর-ফাইভ থেকে রাজশাহীর গভ: কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন— এখানে কিছুদিন পড়ার পর ঋত্বিক তাঁর বড় ভাই মনীশ ঘটকের কাছে কলকাতায় চলে যান। ওখানে তাঁকে পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশন স্কুলে ভর্তি করানো হয়। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁকে কানপুরের টেকনিক্যাল স্কুলে পাঠানো হয়— কানপুর তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা---এখানে এসে শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্ট খুব কাছে থেকে দেখার ফলে তাঁর মন-মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে। ঋত্বিক শ্রমিকদের ওভারটাইম আদায়ের সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এসব দেখে ঋত্বিককে আবার কলকাতায় এনে পদ্মপুকুর ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করানো হয় এবং এখান থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে পরিবারের সঙ্গে রাজশাহী আসেন এবং রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে আই. এ. পরীক্ষা দেন। এই সময় নাটক করতে শুরু করেন— স্কুলে পড়ার সময়েও নাটক করতেন। ১৯৪৮ সালে কে. এম. কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হন কিন্তু এম. এ.

পরীক্ষা না দিয়েই পড়ালেখার ইতি টানেন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন— এই সময় নাটক লেখেন, অভিনয় করেন এবং নাটক নির্দেশনাও দেন।

বিবাহ : ১৯৫৫ সালের ৮ মে শিলং এ বিয়ে ; স্ত্রী- সুরমা ঘটক ; দুই কন্যা ও এক ছেলের জনক।

মৃত্যু : ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬, কলকাতা।

কর্মজীবন : ঋত্বিক ঘটক নানা গুণের অধিকারী ছিলেন। কবিতা লেখা দিয়ে শুরু, তারপর গল্প লেখা, গল্পের পর নাটক। ১৯৪৭-'৪৮ সালে অনেকগুলো গল্প লেখেন ঋত্বিক। সেগুলো বেরিয়েছিল দেশ, শনিবারের চিঠি, গল্পভারতী, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য, ফতোয়া প্রভৃতি কাগজে। ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ ভাঙার পর শম্ভু মিত্র 'নবান্ন' করেন সেপ্টেম্বর মাসে। ঋত্বিক 'নবান্ন' নাটকে অভিনয় করেছিলেন একটি ছোট্ট ভূমিকায়। নবান্নর পরে বহুরূপী গঠন করা হয়— ঋত্বিক, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, কলিম শরাফী, ইজরাইল, বিজন ভট্টাচার্য এঁরা ছিলেন বহুরূপীতে। ১৯৪৯ সালে নাট্যচক্র থেকে 'নীলদর্পণ' করা হয়। এতে ঋত্বিক চাষীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৫০ সালে ঋত্বিকের প্রথম নাটক 'জ্বালা' লিখিত হয়— তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তার প্রকৃত অবস্থাকে যেন নতুন ভাষা দিয়েছিল 'জ্বালা'। ১৯৪৯-১৯৫০ সালে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ' নাটকে এক বৃদ্ধ কৃষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন ঋত্বিক। ১৯৫১ সালে ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের ব্যানারে হয় পানু পালের নাটক 'ভাঙা মন্দির'— এতেও ঘটক অভিনয় করেন। সেক্সপীয়ার অ্যানির্ভাসারিতে শ্রীরঙ্গমে অভিনীত হয় 'ম্যাকবেথ'— উৎপল দত্তের পরিচালনায়— ঋত্বিক ডাইনির ভূমিকায় অভিনয় করেন এতে। ১৯৫২ সালে ঋত্বিক গোগলের ইন্সপেক্টর জেনারেল অবলম্বনে লেখেন 'অফিসার'। নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল— একমাসে ৫২টি শো হয়েছিল। ব্রেশট-এর 'গ্যালিলীও' নাটকটিও অনুবাদ করেন ঋত্বিক ঘটক। পানু পালের 'ভোটের ভেট' ও উৎপল দত্ত পরিচালিত 'বিসর্জন' নাটকেও ঋত্বিক অভিনয় করেন। ১৯৫৩ সালে গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় বোম্বে সম্মেলনে ঋত্বিকের লেখা 'দলিল' নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা ঋত্বিক নিজে। তারপর গ্রুপ থিয়েটার গঠন করে ঋত্বিক 'সাঁকো' নামের একটি নাটক লেখেন। ১৯৭০ সালে লেখেন 'সেই মেয়ে' নাটক। ঋত্বিকের কর্মজীবনে 'চাকুরী জীবন' বলে তেমন কিছুই নেই— শুধু পঞ্চাশ দশকের মধ্য ভাগে ৩০০ টাকার মাসিক বেতনে বোম্বের ফিল্মিস্থান স্টুডিওতে কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে চাকুরি নেন। কিন্তু তিন মাসের বেশি তিনি সে চাকুরী করতে পারেন নি। এরপর ১৯৬৫ তে পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের উপাধ্যক্ষ ছিলেন কিছুদিনের জন্য— এই তাঁর চাকুরী জীবন, বাকিটা শুধুই চলচ্চিত্র সৃষ্টি।

পরিশিষ্ট : ২

চলচ্চিত্রপঞ্জি :

তথাপি, ১৯৫০, সহকারী পরিচালক

বেদেনী/অরুপকথা, ১৯৫১-৫২, অসম্পূর্ণ।

নাগরিক, ১৯৫২-৫৩

(পরিচালকের জীবদ্দশায় এ চলচ্চিত্র মুক্তি লাভ করেনি। মুক্তি পায় মৃত্যুর দেড় বছর পর)।

আদিবাসীও কা জীবন স্রোত, ১৯৫৫, হিন্দী তথ্য চিত্র।

বিহাব কে দর্শনীয় স্থান, ১৯৫৫, হিন্দী তথ্যচিত্র।

ওরাওঁ, ১৯৫৭।

অযান্ত্রিক, ১৯৫৭-৫৮।

বাড়ি থেকে পালিয়ে, ১৯৫৯।

কত অজানারে, ১৯৫৯, অসম্পূর্ণ।

মেঘে ঢাকা তারা, ১৯৬০।

কোমল গান্ধার, ১৯৬১।

সুবর্ণরেখা, ১৯৬২।

সিজারস, ১৯৬২, বিজ্ঞাপন চিত্র।

(সুবর্ণরেখা চলচ্চিত্রটি সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়)।

আলাউদ্দিন খান, ১৯৬৩,অসম্পূর্ণ প্রামাণ্য চিত্র।

বগলার বঙ্গদর্শন, ১৯৬৪, অসম্পূর্ণ কাহিনী চিত্র।

ফিয়ার, ১৯৬৫, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, হিন্দী।

রঁদেভু, ১৯৬৫, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, হিন্দী।

সিভিল ডিফেন্স, ১৯৫৬. (ভারত-পাকিস্তানে যুদ্ধের সময় তৈরি হয়।)

সায়েন্টিষ্টস অফ টুমরো, ১৯৬৮. তথ্যচিত্র।

রঙের গোলাম, ১৯৬৮, অসম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র।

পুরুলিয়ার ছৌ, ১৯৭০, তথ্যচিত্র।

আমার লেনিন, ১৯৭০, তথ্যচিত্র।

ইয়ে কিঁউ, ১৯৭০, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, হিন্দী।

দুর্বার গতি পদ্মা, ১৯৭১, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত)।

ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৭২, অসম্পূর্ণ তথ্যচিত্র।

তিতাস একটি নদীর নাম, ১৯৭৩।

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, ১৯৭৪।

রাম কিংকর, ১৯৭৫ অসম্পূর্ণ তথ্যচিত্র।

(এই তথ্য চিত্রের ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডট্র্যাকের কাজ শুরু হওয়ার মুখে ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু হয়)।

এছাড়াও ঘটক অন্য পরিচালকদের জন্য চিত্রনাট্য লিখেছেন ৭টি। অভিনয় করেছেন ৫টি চলচ্চিত্রে। ২১টি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বা চিত্রনাট্যের খসড়া রচনা করেছিলেন জীবনের নানা পর্যায়ে— যেগুলো কখনোই চলচ্চিত্রে পরিণত হয়নি। চলচ্চিত্র শিল্পের নানা দিক নিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন ঋত্বিক ঘটক।



ঋত্বিক ঘটক-এর পঁচাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ঋত্বিকের যমজ বোন প্রতীতি দেবী, তাঁর বন্ধু কলিম শরাফী ও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতিনিধি শ্রীমতী রীভা গাঙ্গুলী

পরিশিষ্ট : ৩

তিতাস একটি নদীর নাম-এর ইতিবৃত্ত :

স্যুটিং শুরু : ১৬ জুলাই, ১৯৭২
সাংবাদিক সম্মেলন : ২০ জুলাই, ১৯৭২
প্রেস শো : ২৬ জুলাই, ১৯৭৩
স্থান : মধুমিতা সিনেমা হল
মুক্তি : ২৭ জুলাই, ১৯৭৩

Titas Ekti Nadir Nam
A River called Titas

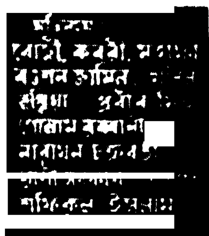
35mm, Black & White
Duration : 159 minutes
(Released on 27.7.73 at Dhaka)
Production
Purba Pran Katha Chitra
Original story
Adwaita Malla Barman
Theme Music, Script, Direction
Ritwik Ghatak
Cinematography
Baby Islam
Editing
Basheer Hussain
Music
Bahadur Khan
Key play-back singer
Dheeraj Uddin Fakir

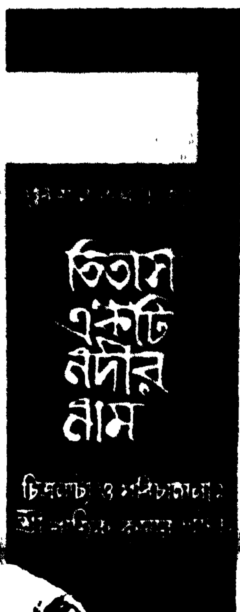
Play back singers
Rathindranath Roy, Neena Hamid, Abeda Sultana, Dharmeedan Barua
Cast
Basanti—Rosy Samad
Rajar Jhee — Kabori Chowdhury
Basanti's Mother— Roushan Jamil
Basanti's Father — Abul Khair
Munglee— Rani Sarkar
Udayatara — Sufia Rustam
Kishore— Probir Mitra
Ramprosad & Kader Mian— Golam Mustafa
Tilak Chand— Ritwik Ghatak
Nibaran Kundu— Fakrul Hasan Bairagi
Ananta— Shafikul Islam
Magan Sardar — Sirajul Islam

পরিশিষ্ট : ৪

সগৌরবে ৮ম সপ্তাহ !

আগে কথা শুনুন। তার পরে কথা বলুন। কেননা তিতাসের কথাই তিতাসের প্রাণ। তিতাসের বুকে ভাসমান জেলেদের জীবনের বিচিত্র কাহিনী আপনাকে আনন্দিত করবে, অনুভূতিকে করবে অনুরণিত। কিন্তু কথা না শুনলে কাহিনী বুঝবেন না, আর কাহিনী না বুঝলে ছবি দেখাই তো অর্থহীন।



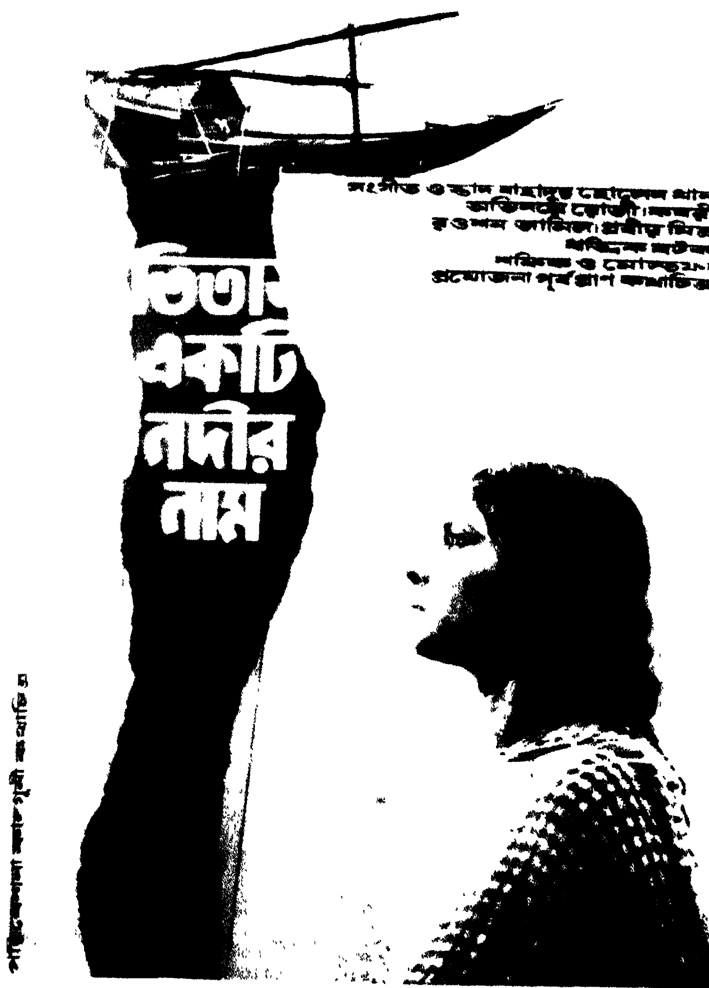




নাজ (ঢাকা) চলছে
১২, ৩, ৬ ও ৯টা

তিতাস একটি নদীর নাম-এর বিজ্ঞাপন

পরিশিষ্ট : ৫



তিতাস একটি নদীর নাম-এর পোস্টার

পোস্টার শিল্পী : আব্দুস সবুর

পরিশিষ্ট : ৬

তিতাস একটি নদীর নাম-এর স্থিরচিত্র
ক. স্যুটিং-পর্ব :





















খ. অভিনয়-পর্ব























পরিশিষ্ট : ৭

উত্তরণের জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার— ১৯৭৩ :

শ্রেষ্ঠ ছবি : তিতাস একটি নদীর নাম
শ্রেষ্ঠ পরিচালক :ঋত্বিক কুমার ঘটক (ঐ)
শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার : অ.ম.ব.[১] (ঐ)
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা (দ্বিতীয়) : প্রবীর মিত্র (ঐ)
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : রোজী (ঐ)
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী : (দ্বিতীয়) সুফিয়া রোস্তম (ঐ)
শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক : বাহাদুর হোসেন খান (ঐ)
শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক : বেবী ইসলাম (ঐ)
শ্রেষ্ঠ সম্পাদক : বশীর হোসেন (ঐ)
শ্রেষ্ঠ পোস্টার শিল্পী :আব্দুস সবুর (ঐ)

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

পরিশিষ্ট : ৮

ঋত্বিক ঘটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্মশালাসমূহ :

ক. Title : *Ritwik Ghatak and Indian Cinema*
Conducted by : Ms. Haimanti Banerjee, Guest lecturer, National Film Archive of India, Pune.
Date : 24 February, 1 March, 1987
Venue : Indian Cultural Centre, Dhaka
Organised by : Bangladesh Film Society and High Commission of India, Dhaka.

খ. Title : *Ritwik Ghatak and His Films*
Conducted by : Mr. Sanjoy Mukhopadhyay
Head of Film Studies, Jadabpur University, Kolkata
Date : 15-17 September, 1996
Venue : German Cultural Institute
Organised by : Chalachitram Film Society in cooperation with the Goethe-institute, Dhaka.



Sanjoy Mukhopadhyay

পরিশিষ্ট : ৯

ঋত্বিক ঘটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সেমিনারসমূহ :

ক. Subject : *Ritwik Ghatak*
Paper presented by : Kumar Shahani, Film Maker, Critic.
Date : 17 February, 1995
Venue : Public Library Children Auditorium
Organised by : Bangladesh Short Film Forum.



Kumar Shahani, Prof Kabir Chowdhury and Tanvir Mokammel

খ. Subject : *Ritwik Ghatak's 'Titas Ekti Nadir Nam' : A Mohakabyo of Bengal.*
Paper presented by : Erio O' Donnell
Date: 17 December, 1997
Venue : CBRB - AIBS Auditorium
Organised by : Centre for Development Research, Bangladesh-American Institute of Bangladesh Studies (CBRB-AIBS).

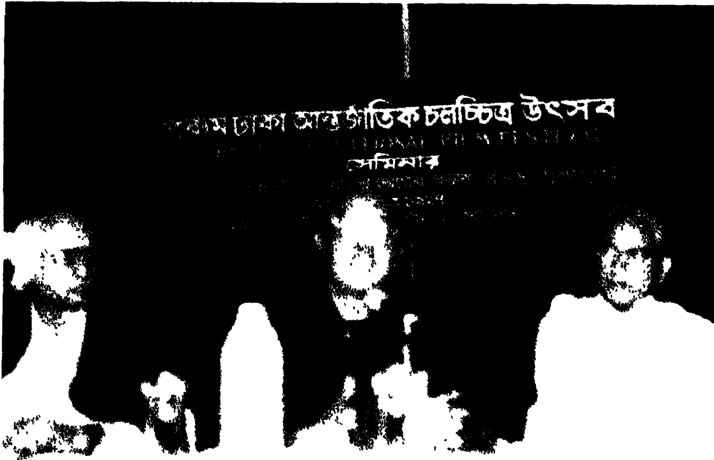
গ. বিষয় : *ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে বাংলা-ভাগের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'সুবর্ণরেখা'*

প্রবন্ধ উপস্থাপক : সাজেদুল আউয়াল

তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

স্থান : জর্মন কালচারাল ইন্সটিটিউট

আয়োজক : রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ



জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাস গুপ্ত ও প্রবন্ধকার সাজেদুল আউয়াল

বিষয় : *অগ্নিরথের সারথী*

প্রবন্ধ উপস্থাপক : রফিক মাহমুদ

তারিখ : ৪ নভেম্বর, ২০০০

স্থান : ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

আয়োজক : চলচ্চিত্রম ফিল্ম সোসাইটি ও ভারতীয় হাই কমিশন

পরিশিষ্ট : ১০

ঋত্বিক ঘটক রচিত 'সেই মেয়ে' নাটকের অভিনয় :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের নাটক 'সেই মেয়ে'

চিত্রালী রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মঞ্চাবতরণের অভিজ্ঞতা থাকবে না এমন নয়, তথাপি কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী থাকে নাটকে উৎসাহ থাকলেও মঞ্চাবতরণের সুযোগ তাদের হয় না। প্রায় সব তেমন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের তৃতীয় প্রযোজনা ঋত্বিক ঘটকের 'সেই মেয়ে' নাটকটি।

সম্ভবত ঋত্বিক কুমার ঘটক যখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তখনই লিখেছিলেন 'সেই মেয়ে' নাটকটি।[১] আজকের সময়ে এবং এই পারিপার্শ্বিকতায় 'সেই মেয়ে' উপস্থাপনা করতে গিয়ে সাংস্কৃতিক দল মূল নাটকের কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেছে। এবং সে দায়িত্বটি পালন করেছেন এই নাটকের নির্দেশক এনএসডি স্নাতক বাহারউদ্দিন খেলন।



'সেই মেয়ে' নাটকের একটি দৃশ্য

---

১. 'সেই মেয়ে' নাটকটি ১৯৭০ সালে ঋত্বিক ঘটক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রচনা করেন, ওখানেই তা অভিনীত হয়। গণনাট্য সংঘের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় বহু আগেই।

খেলনের এই রূপান্তরের প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ প্রশ্নের অবকাশ রাখলেও নির্দেশক হিসেবে নবীন শিল্পীদের কাছ থেকে যেভাবে কাজ আদায় করে নিয়েছেন তাতে সন্দেহাতীত ভাবেই তিনি প্রশংসার দাবিদার। গত ১৮ই নভেম্বর টিএসসির কমন রুমের স্বল্প পরিসরে আয়োজিত 'সেই মেয়ে' নাটকের প্রথম প্রদর্শনী দেখে দর্শক এই রায় দিতে সম্ভবত আপত্তি করবেন না।

সাংস্কৃতিক দল প্রযোজিত 'সেই মেয়ে' নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ দর্শককে কতখানি সন্তুষ্ট করতে পারবে সে প্রশ্নে না গিয়েও বলতে হবে দেশীয় নাট্যচর্চায় এই উদ্যোগ বেশ কিছু নাট্য কর্মীদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। সাংস্কৃতিক দলের একটি উদ্দেশ্যেও তাই।

'সেই মেয়ে' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিল্পী সরকার অপু, নাসরীন লাকী, শাহিনা পারভীন শিখা, ইনামুল হক কিসলু, অসীম চক্রবর্তী, মনোয়ার সুলতানা মঞ্জু, জাকিয়া সুলতানা কবিতা, নাজনীন সুলতানা শম্পা, ইকবাল জামাল জুয়েল, খান স্বপন, সেলিম মোজাফ্ফর আহমেদ. মোস্তফা কামাল মিলন, আবদুল কুদ্দুস, তসলীম উদ্দিন শাহীন এবং মনিরউদ্দিন আহমেদ।



'সেই মেয়ে' নাটকের একটি দৃশ্যে অসীম চক্রবর্তী, শিল্পী সরকার অপু ও শম্পা

পরিশিষ্ট : ১১

ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে নির্মিত হচ্ছে 'দি নেম অফ এ রিভার'

জিয়া টিটো

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জীবন, সময় ও সৃষ্টির ওপর 'দি নেম অফ এ রিভার' নামে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট, ভারতের এনএফডিসি এবং বাংলাদেশের প্রযোজক হাবিবুর রহমান খানের যৌথ প্রযোজনায় একটি ডকুফিচার ফিল্ম নির্মিত হচ্ছে। গত ৩০ মার্চ থেকে একটানা ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে নারায়ণগঞ্জ, পাটুরীয়া, সোনারগাঁও-এ এ-ছবির চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং, পুনা, বম্বে প্রভৃতি স্থানে ছবির বাকি অংশের চিত্রগ্রহণ ইতোমধ্যে করা হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ময়মনসিংহ ও রাজশাহীতে তিনি শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঋত্বিক ঘটক পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। কিন্তু দেশ বিভাগে দুই বাংলার বিভক্তিকে তিনি কোনো দিন মেনে নেননি। তাই তাঁর বিভিন্ন ছবি যেমন কোমল গান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা, নাগরিক, সুবর্ণ রেখা, যুক্তি তক্ক আর গপ্পো প্রভৃতিতে এ বেদনা বারবার তুলে ধরেছেন।

'দি নেম অফ এ রিভার' ছবিটি পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দুই পাঞ্জাবি। পরিচালক হলেন ভারতের পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউট ও ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে ডিগ্রিধারী অনুপ সিং এবং চিত্রনাট্য রচনা করছেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির ইংরেজির অধ্যাপক মদন গোপাল সিং। ...। ছবির চিত্র গ্রহণ করেছেন উপমহাদেশের প্রথম দশজন চিত্রগ্রহকের একজন হিসেবে খ্যাত বম্বের কে কে মহাজন ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন 'মাচিস' ছবির সুরকার বিশাল। 'দি নেম অফ এ রিভার' ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন ভারতের মাধবী মুখার্জী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, শিব প্রসাদ মুখার্জী ও বাংলাদেশের রোজী আফসারী, কবরী সারোয়ার, আবুল খায়ের, প্রবীর মিত্র, গোলাম মুস্তাফা, শমী কায়সার, এবং ঋত্বিক ঘটকের বোন প্রতীতি দেবী ও ভাগ্নি এরোমা গুণ। উল্লেখ্য প্রতীতি দেবী হচ্ছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এক সময়ের অভিনেতা ও বিশিষ্ট এম এল এ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সঞ্জীব দত্তের পত্নী। ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশে একটিই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ছবিটি হচ্ছে 'তিতাস একটি নদীর নাম'—যেটিতে রোজী, কবরী, আবুল খায়ের, প্রবীর মিত্র ও গোলাম মুস্তাফা অভিনয়

করেছিলেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে ঋত্বিক ঘটক বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। ঢাকায় এসে ঋত্বিক ঘটক কুমিল্লায় তার বোন প্রতীতি দেবীর বাড়ি বেড়াতে যান। তখন তিনি 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা করছিলেন। কুমিল্লায় অবস্থানকালে প্রতীতি দেবী তাঁকে অদ্বৈত মল্ল-বর্মণ রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি পড়তে দেন। একনাগারে উপন্যাসটি পড়া শেষ করে গভীর রাতে ঋত্বিক ঘটক তাঁর বোনকে জাগিয়ে তোলেন কাগজের জন্য। কিন্তু বাসায় তখন কাগজ ছিল না এবং এতো রাতে তা যোগাড় করা সম্ভব নয় দেখে ঋত্বিক ঘটক প্রতীতি দেবীর হাতের মধ্যে লিখতে থাকেন। এতে প্রতীতি দেবী অভিভূত হয়ে তাঁকে একটি সাদা শাড়ি এনে দেন। সেই শাড়ির ওপর ঋত্বিক ঘটক 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের প্রাথমিক আইডিয়াগুলো লিখে রাখেন। 'দি নেম অফ রিভার' ছবির নির্বাহী প্রযোজক আকন্দ সানোয়ার মুর্শেদ ও সংলাপের বাংলা অনুবাদক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার আখতারুজ্জামান বলেন, এ ছবিটিই শমীর প্রথম অভিনীত চলচ্চিত্র। এখানে শমী ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবির 'অনসূয়া' চরিত্রে এবং শিব প্রসাদ মুখার্জী 'নচিকেতা' চরিত্রে অভিনয় করছেন। অনসূয়া ও নচিকেতা হচ্ছে 'দি নেম অফ রিভার'-এ ঋত্বিক ঘটকের ছোট বেলা থেকে তাঁর কর্মময় জীবন ও তাঁর ছবির বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর বক্তব্যের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী, যাকে আমরা সূত্রধর বলি। শমীর অভিনয়ে পরিচালক অনুপ সিং খুবই খুশি। এবং তাকে বিপুল সম্ভাবনাময়ী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হিসেবে মন্তব্য করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের টেকনিশিয়ানদের নিরলস পরিশ্রম ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে পরিচালক অনুপ সিং, চিত্রনাট্যকার মদন গোপাল সিং ও চিত্রগ্রাহক কে কে মহাজন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 'দি নেম অফ এ রিভার'-এর প্রিমিয়ার শো যে কোনো একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে করা হবে।

পরিশিষ্ট : ১২

সাক্ষাৎকার

ফিউরি খোন্দকার

[ঋত্বিক ঘটক শ্রদ্ধাস্পদেষু]

তাঁকে ডেকে এনে এখন শীতের এই শেষ রাতে
হাল্কা অন্ধকারের পোশাকে মুখোমুখি বসিয়ে রেখে
আমার সবিনয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে ইচ্ছা করছে।
আচ্ছা বলুন তো : আপনার কাছ থেকে জীবন বেশি
গ্রহণ করেছে, না আপনি ? কনফিউজ করে থাকলে
আমি ব্যাপারটা স্পষ্ট করছি---এই ধরুন আপনি সারা
জীবন আত্মা খরচ করে, দৈহিক শ্রম দিয়ে যে বাসনা
নির্মাণ করে পেছনে ফেলে চলে গিয়েছিলেন--- তার কতটুকু
আপনি ফেরৎ পেয়েছেন, আদৌ পেয়েছেন কি ?
আপনি নতুন বাড়ির কতটুকু কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন ?



ঋত্বিক ঘটক ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর
স্থিরচিত্র গ্রাহক সুনীল আমিন